স্মরণে মননে বিবেকানন্দ

দ্বিতীয় খণ্ড

মুখ্য-উপদেষ্টা

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ [illegible]

উৎসর্গ

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দবাদ' সমগ্র বিশ্ববাসীকে শান্তি,
প্রীতি ও জাতীয়-সংহতিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক

নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতাত্মার প্রতিফলন—এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে তিনি যেমন মানুষের আত্মার মুক্তি চেয়েছিলেন, তেমনি আবার একই সঙ্গে জনগণের বন্ধনমুক্তিও ছিল তাঁর কাম্য। ব্যক্তিগত একক হৃদয়ে সার্বজনীন অনুভূতির সমুদ্র তিনি ধারণ করেছিলেন। তাঁর হৃদয়েও সেই ব্যাপ্তি ছিল। জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় তিনি বেদনার বেদে নব্যতন্ত্রী যুক্তিবাদী জীবনের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন পথে-প্রান্তে, রাজপ্রাসাদে, গরীবের কুটীরে প্রসন্ন ও প্রসারিত হৃদয় নিয়ে তিনি নিরন্তর ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজেই স্বদেশ ও গণ-হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন। যুগের সুস্থ পরিচয়কে কোন্ পথে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, জাতির প্রয়োজন কোন্ পন্থায় সিদ্ধ হয়, জাতির ব্যথার উপশমই বা কোন্ পথে সম্ভব—বিবেকানন্দ সেই সত্যই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর অভ্রান্ত পথ-নির্দেশনা এবং সত্য-আবিষ্কার জাতির ধমনীতে প্রাণ-সঞ্চারের মহামন্ত্র ধ্বনিত করেছে।

অসীম সম্ভাবনায় পূর্ণ ভারতের নব-অভ্যুদয় তিনি জাতির উদ্দেশ্যেই কামনা করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের ইতিহাসে তিনি একজন গণ-নায়ক।

স্বামীজী তাঁর জীবনে দূরদৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের সেবাকেই ভারতের বর্তমান ধর্মরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন—'খালি পেটে ধর্ম হয় না—ঠাকুর বলতেন না? এই (সেবা) ধর্ম প্রচার করাই আমার লক্ষ্য। ভোগভূমি পাশ্চাত্য-দেশে ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন, আর এদেশে সেখানকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, উন্নত চিন্তাগুলি, সামাজিক স্বাধীনতা—ধর্মের ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রচার করতে হবে।" নিজের গুরুভাইদের কাছেও নবযুগের এই নতুন ধর্ম-ঘোষণাই ছিল বিবেকানন্দের লক্ষ্য। ভারতের জনসাধারণের সেবায় আত্মিক-উৎসর্গই তাঁর মতে ধর্ম। বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে মানবিক শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে সেবা-প্রসঙ্গ একাত্ম হয়ে আছে। যুগোপযোগী শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান জনগণের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়ে সামাজিক স্বাধীনতা আনবার নতুন সংকল্পে তিনি ছিলেন দৃঢ়বদ্ধ। ভারতের চিরায়ত ধর্মকেই স্বামীজী জাতি-গঠনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৯৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্য সভায় এই দৃষ্টিতে জাতি-গঠনের কারণে সমাজের যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যুবশক্তি তাঁর মতে জাতীয় মহাস্তম্ভ। মাতৃভূমির জন্য যুবশক্তিকে আহ্বান করে জানিয়েছিলেন—"কলিকাতাবাসী যুবকগণ! ওঠো, জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে। ওঠো, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করিতেছে।" স্বামীজীর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একদা পরাধীন জাতির গতিধারাই পরিবর্তিত হয়েছিল। তিলে তিলে আত্মবলি দিয়েছিলেন তিনি নিজে। প্রাপ্ত কাজের চাপে বিবেকানন্দ নিজে মানুষের ডাকে বিশ্রামহীন অনিঃশেষ সাড়া দিয়েছিলেন। সেই কারণে স্বাস্থ্যও

ভেঙ্গে পড়েছিল। যুবসম্প্রদায়েরাও তাঁরই পথে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মাতৃভূমি সত্যই মহাবলি চাইছে। জনগণের জন্য রুটি ছিল স্বামীজীর দাবীর প্রথম শর্ত, কিন্তু তাঁর চেয়েও অনেক বড় দাবী ছিল জনগণের সার্বিক জাগরণ। জনগণকে জাগ্রত করতে চেয়ে যুবসম্প্রদায়ের উপর অগাধ আস্থায় তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—"তাদের ভিতর থেকেই আসবে আমার কর্মীদল। তারা সিংহের মতো কাজ করবে। তারাই করবে সমস্যার সমাধান।" জাতীয় জীবনে স্বামীজী খুব বড় মাপের আগাগোড়া সংস্কার চেয়েছিলেন। এ পথ ছিল সংগঠনের, তাই স্বামীজীর বক্তব্য: "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই আমি বৃদ্ধিতে বিশ্বাসী।" মানুষের জাগরণের জন্য তিনি মানুষেরই সহানুভূতি প্রার্থনা করেছিলেন। জাতির জাগরণের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট নির্ভরতার প্রয়াস তাঁর চিন্তা-চেতনার কোথাও ছিল না। একজন পরিত্রাতার দিকে চেয়ে থেকে মুক্তির মনোভাবকে তিনি ধিক্কার জানাতেন। শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত মানুষকে নিজেই নিজের শৃংখল মোচনের জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।, এই শক্তিশালী স্বাস্থ্যকর মতকেই তিনি তাঁর 'সমর নীতি' বলে ঘোষণা করেছিলেন। লোকশিক্ষা দিয়ে লোকশক্তি আনতে চেয়েছিলেন। জীবনের মূলে প্রবেশ করে আমূল সর্বাত্মক সংস্কার বা পরিবর্তন এনে অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠনে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানবমুক্তির পরিকল্পনায় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়হীনতার একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। লক্ষণ-বিচারে এবং আত্ম-ঘোষণায় 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তায়' তিনি ছিলেন একজন 'সোসালিস্ট'। এই সমাজতন্ত্রের আদর্শে কোন তাত্ত্বিক মৌখিক বুলি-সর্বস্বতা নয়—নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই নিজেকে ঐ পরিচয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ভারতে ও পাশ্চাত্যে সামাজিক অবস্থান মানুষকে কি পরিমাণে নিঃস্ব করতে পারে তা তিনি নিজে ঘুরে ঘুরেই দেখেছেন। পাশ্চাত্যে যাবার আগে ভারত-পরিভ্রমণ শেষে স্বামীজী যখন কন্যাকুমারিকায় এসেছিলেন, ঠিক তখনকার তাঁর মানসিকতাকে তাঁর জীবনী-লেখক তুলে ধরেছেন—"তিনি দেখলেন, সর্বস্থানে সর্বকালে দরিদ্র অবনত মানুষ··· উৎপীড়িত ও পদদলিত হয়েছে, শত শত বৎসর ধরে···সমাজে ভয়ানক ভেদাভেদ সৃষ্টি করে অধিকাংশ মানুষকে অপাংক্তেয় করে রাখাই ভারতের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। বিরাট মানব-সমষ্টির সঙ্গে তাঁর হৃদয় উঠতে পড়তে লাগল—তিনি যেন চরম অনুভূতির এক মহারাজ্যে প্রবেশ করলেন।" "বিবেকানন্দের দৃঢ় অভিমত ছিল—গণ-উন্নয়নই জাতির মুক্তি ও অগ্রগতির পথ।"

স্বামীজী মানুষের কাজ ও চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য চেয়েছিলেন। জাতীয় স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই শক্তিসম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। জনগণের নামেই বিবেকানন্দ প্রথম শাসনতন্ত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করে ব্যক্তি-নেতৃত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন বেশী।

জাতীয় বিকাশ ও মানবতার মহিমার স্বপ্ন বিবেকানন্দ দেখেছিলেন — বহুজনের বহুদিনের সাধনায় ও পরিশ্রমে আমাদের সেই বোধে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্থান-পতন-ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই নিখিল বিশ্ব-মানব স্বীকৃতির পথে চলেছে। বিবেকানন্দ-নির্দিষ্ট সেই চলমানতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ অংশীদার।

'স্মরণে মননে বিবেকানন্দ' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় খণ্ডে বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা, তাঁর মৌল শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি, স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ শিক্ষা এবং হার্বার্ট স্পেনসারের 'Education : Intellectual Moral and physical' নামক গ্রন্থের বিবেকানন্দকৃত অনুবাদ-গ্রন্থ 'শিক্ষা' প্রসঙ্গে সুবিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষাদর্শনে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা এবং চিন্তাধারায় ক্রমপর্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের প্রভাব প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজীর চিন্তায় নারীমুক্তি প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। বিবেকানন্দের মতে -"শক্তি মানে - যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র ··জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।···যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা।"

স্বামীজী বলেছিলেন, জড় জগতকে বুঝতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। আবার তেমনি চৈতন্যের উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও ধ্যানের প্রয়োজন। স্বামীজীর এই বিজ্ঞানচেতনা প্রসঙ্গেও সুবিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ডারউইনের বিবর্তনবাদের সঙ্গে স্বামীজীর বিজ্ঞান-চিন্তার তুলনামূলক বক্তব্যও এক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বামীজীর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার আলোকে তাঁর শিল্প ও সঙ্গীতচর্চা, নিজের উক্তির আলোকে বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা, সঙ্গীতের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ, বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের শিল্প-স্থাপত্য বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বিবেকানন্দের সাহিত্য ভাবনার নানাদিক প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বাংলা সাহিত্য কবি বিবেকানন্দ, স্বামীজীর ইংরেজী কবিতা, বিবেকানন্দের গদ্যশিল্প, বিবেকানন্দের পত্র-সাহিত্য এবং তার সংখ্যাভিত্তিক আলোচনা, বিবেকসাহিত্যও গণজাগরণে কিভাবে সার্থক হয়েছে — এ প্রসঙ্গগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আলোচিত হয়েছে। সন্ন্যাসী-সাংবাদিক হিসেবে বিবেকানন্দের পরিচয়, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস এবং সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ নিয়ে তথ্যভিত্তিক বিবরণের পূর্ণ আলোচনা এই খণ্ডে সংযুক্ত হয়েছে। স্বামীজীর কর্মযোগ, যোগী ও কর্মী হিসেবে স্বামীজীর বিশেষ ভূমিকা, 'যুববর্ষ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির আলোচনা এ খণ্ডে বিবৃত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে সোভিয়েতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে দুই সোভিয়েত

লেখক' এবং 'সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার, আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনামূলক দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও শংকর, বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য, 'গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, পাঞ্জাব এবং স্বামী বিবেকানন্দ', রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী, 'সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজীর চিন্তা ও রচনায় স্বামীজী ইত্যাদি বিষয়গুলি সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের ভূমিকাকেও ঐতিহাসিক বিবেচনা করে বিরোধীদের স্বীকৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

স্থানিক পটভূমিকায় বিবেকানন্দের পরিচয়কে নানা তথ্যের স্বীকৃতিতে পূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা 'ইউরোপে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা, দক্ষিণ ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ' ইত্যাদি তথ্যমূলক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

'বিবিধ প্রসঙ্গে' শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দধারার প্রাসঙ্গিকতা ও 'একশো পঁচিশ বছরে বিবেকানন্দ-উপলব্ধি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও সংকলিত হয়েছে।

সমাপ্তিতে নিজ উক্তির আলোকে চিন্তানায়ক বিবেকানন্দের ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব, ভারতের অবনতির কারণ, জনসাধারণ ও অভিজাত সম্প্রদায়, সমাজ-সংস্কার, জাতিভেদ, জনসাধারণের উন্নতি বিধান, বিদ্যাশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শারীরিক উন্নতি বিধান প্রবল আত্মবিশ্বাস, জাতীয় আদর্শে শ্রদ্ধা, বিবেকানন্দের চিন্তায় সেবা ও সেবক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সংকলিত হয়েছে। বিষয়গুলি পাঠে পাঠক-পাঠিকারা স্বামীজীর নিজের রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন, প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের উপলব্ধির সঙ্গে তাঁদের মানসিক সংযোগ ঘটবে।

'স্মরণে মননে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের পরিকল্পনা ক্ষেত্রে মুখ্য-উপদেষ্টারূপে আমার শিক্ষাগুরু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হয়ে আমায় অসীম ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্দেশনা এক্ষেত্রে আমাকে অমোঘ মন্ত্রের মতো পরিচালিত করেছে। তাঁর লিখিত একটি সুদীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকা গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

'বর্ণালী' প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। এই বিশাল গ্রন্থত্রয়ী তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশের ভার গ্রহণ করে, বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-আনুগত্যের সঙ্গে একটি জাতীয় কর্তব্যও পালন করেছেন। আমার প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী অসিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই সূত্রে আমি আশীর্বাদ জানাই—গ্রন্থখানির পরিকল্পনা থেকে প্রকাশন-সংক্রান্ত নানা পর্যায় পর্যন্ত তাঁর সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা আমার পরিশ্রম লাঘব করেছে।

গ্রন্থ প্রকাশন-সংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয়া অভয়া দাশগুপ্ত। নানা দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ করে দিয়ে আমায় বাধিত করেছেন —তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। 'গোলপার্ক ইন্‌স্টিটিশন অব্‌ কালচার'-এর গবেষণা-সহায়ক শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ বিভিন্ন বিদগ্ধজনের কাছ থেকে স্বামীজী-সম্বন্ধে রচনাদি সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করেছেন। তিনি আমার অগ্রজকল্প। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের অন্যতম সক্রিয় কর্মী শ্রীপরিমলকান্তি দাস মহাশয় নানা পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করে গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সহযোগী হয়েছেন। তাঁর উদার মনকে অভিনন্দন জানাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ স্বামীজীরা আমাদের এই উদ্যোগে সক্রিয় অংশ নিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং সমগ্র গ্রন্থের মূল্য বিবর্ধনে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলকে এই প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা অসম্ভব ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি বিভাগের কর্মী অনুজকল্প শ্রীমান প্রভাস চক্রবর্তী নানাভাবে যুক্ত থেকে আমাকে এ গ্রন্থ সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আরও নানাভাবে আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সাহায্য করেছেন। তাঁরা হলেন – পলাশ ভূইঞা, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, গৌরী গঙ্গোপাধ্যায়, রূপা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, ছবি ঘোষ, ছায়া ঘোষ, শর্মাবিন্দু জানা।

যে সমস্ত বিদগ্ধ লেখক এ গ্রন্থে তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দবাদী নানা জন, সহৃদয় সাধারণ পাঠক পাঠিকার আন্তরিক রসানুমোদন লাভ করলে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

বিনীত –
প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

স্মরণে মননে বিবেকানন্দ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

"শিক্ষা কি-সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা বলে। অগ্নির দাহিকাশক্তি যতক্ষণ আমরা উপলব্ধি না করি, ঐ জ্ঞান যতক্ষণ না আমাদের ধমনী ও মজ্জাগত হয়, ততক্ষণ আগুনের জ্ঞান জন্মায় না। ন্যায়, বিজ্ঞান কতকগুলি মুখস্থ করিলেই শিক্ষা হয় না। যাহা জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যায়—তাহাই যথার্থ শিক্ষা।······যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের মৌল শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি

সুধীরকুমার নন্দী

জীবনদর্শন যেমন মানুষের সমগ্র জীবনধর্ম এবং জীবন চর্চার মধ্যে নিহিত থাকে, ঠিক তেমনই শিক্ষাদর্শন শিক্ষকের সমগ্র ধারণাকে এবং ধ্যানকে পরিশীলিত করে। শিক্ষাদর্শকে জীবনদর্শনের প্রত্যঙ্গ বললে সত্যের ব্যত্যয় ঘটবে না। অনৃতভাষণ-দায়মুক্ত সুস্থ চিত্তে একথা বলা চলে। স্বামীজীর মহৎ জীবনের দিগ্বলয় অনন্ত-আশ্রয়ী; একদিকে মুক্ত-পুরুষের লব্ধ অলৌকিক আনন্দ যে জীবনবলয়কে সুস্নাত করছেঃ সে অলৌকিক আনন্দের দ্যুতিতে সন্ন্যাসীর জীবন দেদীপ্যমান; অন্যদিকে জীবজগতের দুঃখের দাহ সন্ন্যাসীকে নিরন্তর পীড়িত করেছে। সন্ন্যাসী ভেবেছেন এই লক্ষ কোটি দুঃখী মানুষের কথা। সে মানুষেরা তাঁর দেশের মানুষ, তাঁর আত্মার আত্মীয়। তারা খেতে পায়নি, পরতে পায়নি; আশ্রয়হারা হয়ে তারা আশ্রয় খুঁজেছে। স্বামীজী বিরাট বটবৃক্ষের মত তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে: ভীত ত্রস্ত নরনারীর বিশৃঙ্খল মিছিল দেখেছেন স্বামীজী তাঁর মহাদেশের সর্বত্র। ভারত পথিক বিবেকানন্দ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পদব্রজে পর্যটন করেছেন; দেখেছেন তাঁর স্বদেশবাসীকে; অকারণ ভয়ে ভীত; পরমুখাপেক্ষী তামসিক নিষ্ক্রিয়তাসমাচ্ছন্ন তাঁর দেশের মানুষকে। এদেশের মধ্যে লুপ্ত আত্মপ্রত্যয়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। তিনি শোনালেন সেই অমৃত মন্ত্র -তুমিই সেই আত্মা, তুমিই ব্রহ্ম। পঙ্গু, অক্ষম, দুর্বল মানুষ সেই মন্ত্র শুনল। বৈদান্তিকের আহ্বান ধ্বনিত হ'য়ে উঠল সারা দেশের আকাশে বাতাসে। মানুষ আত্মবিস্মৃত; বিস্মৃতির অতলে শায়িত দেবত্বের বোধটুকু উজ্জীবিত করতে চাইলেন স্বামীজী। তিনি বললেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' আত্মবিস্মৃত নরনারী, তোমরা জাগো, নিদ্রা আলস্য ত্যাগ কর। মানুষের মধ্যেই শিব বিরাজ করছেন; তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; তাঁর আত্যন্তিক মর্যাদাটুকু রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব ব্যক্তি মানুষের।

শিক্ষার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বললেন যে, শিক্ষা হ'ল আপন আত্যন্তিক পূর্ণতাটুকুকে পরিস্ফুট করার পন্থা। অর্থাৎ যে দেবত্বটুকু তামসিকতার অন্তরালে অবলুপ্ত হয়েছে তাকে আবার স্বপ্রকাশ করতে হবে ব্যষ্টিজীবনের পটভূমিতে। ভয়, দুর্বলতা, আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব—এরা যুক্ত হয়েছে যথার্থ জ্ঞানের অভাবের সঙ্গে এবং তার ফল হয়েছে ভয়াবহ। মানুষ আত্মার সব ঐশ্বর্য হারিয়ে পশুর মত ব্যর্থ জীবন যাপন করছে। তারা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে সব রকমের দুঃখ বরণ করে নিচ্ছে, এটা স্বামীজীর পক্ষে অসহ্য। পূর্ণতার অর্থ সব রকমের

পূর্ণতা ; তাঁর দেশের মানুষের জন্য অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, ঐশ্বর্য চাই। অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্য রাজসিক জীবনদানকেও আশ্রয় করতে পারে। পূর্ণ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঐশ্বর্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে, তাঁর অনন্ত বীর্যের কিছুটাও ধারণার মধ্যে আনতে হ'লে, আমাদেরও বীর্যবান হওয়া চাই। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা কেমন ক'রে আমরা বুঝব যদি না আমরা কিছু পরিমাণ সেই দৈব ঐশ্বর্যের আস্বাদন করি ? অনন্তবীর্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতার অমৃতরসধারায় স্নানপান সবই আমাদের জীবনে নিরর্থক হ'য়ে পড়বে যদি না আমরাও আমাদের অতিসীমিত শক্তির চর্চা না করি। তাই ত স্বামীজী আমাদের দেশের ছেলেদের ফুটবল খেলতে বললেন ; গীতাপাঠ এবং তার চর্চা পরে করলেও চলবে। প্রথমে ছেলেরা শরীরচর্চা করুক ; সুস্থ দেহ ও নীরোগ স্বাস্থ্য তাদের আয়ত্তে আসুক। রোগে পঙ্গু ভারতবর্ষের মানুষ আগে রোগমুক্ত হোক্, এটা স্বামীজী কায়মনোবাক্যে চাইলেন। অধ্যাত্মশক্তির পীঠস্থান হ'ল মনুষ্যদেহ ; সে দেহ যদি রোগাকীর্ণ পঙ্গু হয়, তা হ'লে পূর্ণতাপন্ন অধ্যাত্ম মানুষ কাকে আশ্রয় করবে ? সাহসবিস্তৃত বক্ষপটেই ত দুর্মদ দুর্জয় মন বাসা বাঁধে। যে ত্যাগী মানুষ সম্রাট আলেকজান্দারের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে, তার আলাকসামান্য নির্ভরতা আশ্রয় করবে বিশাল বক্ষকে। তাই আমরা দেখি স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনে শরীরচর্চার যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য এ কথা এই প্রসঙ্গে অনুধেয় যে স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায় যে কারণে শরীরচর্চা প্রাধান্য পেয়েছিল সেই কারণে স্বামীজী তাঁর শিক্ষাদর্শনে শরীর-চর্চাকে গ্রহণ করেন নি। স্পার্টা চেয়েছিল সুস্থ, সবল, দীর্ঘদেহী স্পার্টান তৈরী করতে ; এই স্পার্টানেরা যাতে বিজিত মানুষদের তাঁবে রাখতে পারে তার জন্যই স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায়, তাদের শিক্ষাদর্শনে শরীরচর্চার এতো সমারোহ। আর স্বামীজী চাইলেন ভয়ে ভীত, তামসিক নিষ্ক্রিয়তায় পঙ্গু লক্ষ কোটি মানুষের বন্ধন-মুক্তি। সে মুক্তির উপায় হ'ল মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মশক্তির পুনরুজ্জীবন। যা ঘুমিয়ে ছিল বহুদিন ধরে, তাকে জাগিয়ে তোলার সাধনা হ'ল স্বামীজীর ; তাই তাঁর শিক্ষাদর্শনে, তাঁর সমাজদর্শনে সেই একটি মূল সুর বারবার ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমায় মানুষ কর।'

স্বামীজী-কথিত শিক্ষা হ'ল মানুষ তৈরী করার শিক্ষা। বৈদান্তিক বলবেন, রজ্জুতে যে সর্প তুমি ক্ষণিকের জন্য অবলোকন কর তা পুরোপুরি মিথ্যা নয়। তা 'আকাশকুসুম' এবং বন্ধ্যানারীর সন্তানের মত একেবারে 'অসৎ' নয়, একেবারে মিথ্যা নয়। কাজে কাজেই ব্যবহারিক জীবন, তার তাগিদ, তার দাবী, তার প্রয়োজন স্বামীজীর চোখে মিথ্যা নয় ; তারা সত্য, তারা নির্মমভাবে সত্য। সেই নির্মম রূঢ় বাস্তব সত্যকে বৈদান্তিক স্বামীজী স্বীকার করেছেন বলেই ঐশ্বর্যের লীলাভূমি আমেরিকার ধনীগৃহে আতিথ্য পেয়েও তাঁর দেশের বুভুক্ষু মানুষের দুঃখে অঝোর ধারে তিনি কেঁদেছেন। ধনী গৃহস্বামীর সযত্ন-রচিত সুকোমল শয্যা তাঁর কাছে কণ্টক মনে

হয়েছে। তিনি নিজে মুক্তি চান নি ; লক্ষ লক্ষবার তিনি এই দরিদ্র নিরন্ন দেশে জন্ম নিতে চেয়েছেন তাঁর দেশের মানুষের কষ্ট লাঘব করবার জন্য ; তিনি এই হতভাগ্য দেশের প্রতিটি নরনারীকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে চেয়েছেন, ভালবাসতে চেয়েছেন সকলকে। তিনি নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করেছেন সমস্ত মানুষের মধ্যে। তাই ত বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সেবার মন্ত্র, প্রেমের মন্ত্র প্রচার করলেন। এই সেবা এবং প্রেমের পথেই মানুষের দেবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটবে এবং সেইটুকু সংঘটন করলেই হ'ল স্বামীজী-কল্পিত শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষা অর্থে তথ্য-আহরণ এবং তত্ত্ব-পরিবেশন নয়। আমার দেবত্বলাভের পথে সকল বাধা-বিমুক্তি ঘটানোই হ'ল শিক্ষার কাজ। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সারা দেশের মাটি পায়ে পায়ে পার হলেন স্বামীজী আর দেখালেন দেশজোড়া ভয়ের বিকট মূর্তিটাকে। তার নানান্ ছদ্মবেশ ; কখন রাজভয় রূপে, কখন দেবভয় রূপে, কখনো বা লোকভয় রূপে তার প্রকাশ। আমরা সেদিন ভয়ের মুখোসটাকে দেখে ভীত হয়েছি, পঙ্গু হয়ে পড়েছি ; একটা তামসিক নিষ্ক্রিয়তা সমস্ত জাতির মেরু-দণ্ডটাকে অচল করে রেখেছিল। মানুষ পশুর ভূমিকা নিয়েছিল ; জড়ত্বলাভ করেছিল আমাদের আত্যন্তিক দেবশক্তিটুকু। স্বামীজী বিমূঢ়, বিস্মৃত স্বদেশবাসীর কর্ণে 'অভী'র মন্ত্রটি বারবার উচ্চারণ করলেন। ভয় থেকে মুক্ত হ'তে হবে সে যে ভয়ই হোক্ না কেন। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন যে, সকলেই দেবতার সন্তান, অমৃতের পুত্র। জোলা, তাঁতি, মেথর, মুচি, কেউই অন্ত্যজ নয়, অস্পৃশ্য নয়। মানুষই দেবতা, নরই নারায়ণ। মানুষের মধ্যে এই দেবত্ব আনতে হ'লে প্রথমে তাকে ভয়কে পরিহার করতে হবে। কেমন ক'রে তা পরিহার করব ? এটি খুবই বড় প্রশ্ন। স্বামীজী বললেন যে প্রথমে শরীরচর্চা কর, সবল সুস্থ শরীরের অধিকারী হও। সাহসবিস্তৃত বক্ষপটের অধিকারী হ'তে হবে ভারতবর্ষের প্রতিটি নরনারীকে। বলশালী হলে ভয়কে কিয়ৎ পরিমাণে জয় করা যায়। তবে শরীরচর্চার মাধ্যমে পুরোপুরি ভয়কে জয় করা যায় না ; কেননা আমি বলবান হ'লেও বলবত্তর ব্যক্তির অসদ্ভাব ত নেই। তা হ'লে কেবলমাত্র শরীরচর্চার মাধ্যমে ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায় না ; প্রয়োজন আত্মজ্ঞানের। আমাকে উপলব্ধি করতে হ'বে যে দেহটা থেকে আমি পৃথক ; আমি দেহী বটে, তবে আমি দেহটা নই। দেহের মোহ থেকে যদি একবার মুক্ত হওয়া যায়, তা হ'লে দেহের ক্ষতিটা আর আমার ক্ষতি বলে পরিগণিত হয় না। ভয় আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে তার প্রায় সবটাই দেহগত। দেহগত দুর্বলতা আমাদের মানসিক দুর্বলতার ভিত্তিভূমি ; স্বামীজী বললেন যে, আমাদের সমস্ত দুঃখের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশের জন্য আমাদের দুর্বলতাই দায়ী। এই দুর্বলতাকে জয় করতে হবে দ্বিতীয় পথে। প্রথম কথা হ'ল শরীরটাকে মজবুত করতে হবে। স্নায়ুগুলোকে ইস্পাত-স্নায়ু ক'রে তুলতে হ'বে, তবেই ইচ্ছাশক্তি দুর্জয় হয়ে উঠবে। এটি হ'ল আমাদের প্রথম কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের উপলব্ধি করতে হ'বে যে দেহগত

বিকার আত্মার বিকার নয়। তবেই দেহগত ক্ষতি-সংশ্লিষ্ট সকল ভয় অপগত হবে। আমরা মৃত্যুকেও জয় করতে পারব। যেমন পেরেছিলেন —অতীত ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় অনেক নরনারী। এই ত সেদিন স্বামীজী এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আমরা দেখেছি। মৃত্যুভয়কে এঁরা জয় করেছিলেন ; এইটুকু জেনে মৃত্যুকে সুভাষচন্দ্র তুচ্ছ করেছিলেন যে মানুষ ত দেহটা নয়। মানুষ হ'ল অবিনাশী আত্মা। তাই ত শত্রু-বোমা-বিধ্বস্ত বনজঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন যে এমন কোন বোমা তৈরী হয়নি, যা তাঁকে আঘাত করতে পারে। মূর্খ সমালোচকেরা একে দম্ভোক্তি বলে উপহাস করলেন। এর অন্তর্নিহিত মহাসত্যটুকুকে অনুধাবনের প্রয়াস পেলেন না। স্বামীজীর শিক্ষা নেতাজীর জীবনে সত্য হ'ল ; স্বামীজীর মানুষগড়ার শিক্ষা বিমূর্ত হ'ল নেতাজীর জীবনে। বীজ যথাযোগ্য আধারে উপ্ত হ'ল। স্বামীজীর অধ্যাত্মশিক্ষা সত্য হ'ল নেতাজীর জীবনের সুবিপুল পরিসরে।

মানুষের এই অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণবিকাশ ঘটবে তখনই, যখন তার যোগ ঘটবে সকলের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বন্ধনমুক্তির জন্য সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য তাঁর জীবন-দেবতার কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন ঃ

"যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধ"

স্বামীজী বললেন ভয়ের বন্ধনটুকু কাটাতে পারলেই সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়, সকলকে ভালবাসার পথ সুগম হবে। অবশ্য এই ভয়টুকুর প্রাক্-অবস্থা হ'ল বিভেদবোধ ; আমি আমার থেকে যাকে পৃথক্ ক'রে দেখি, সে-ই হয় 'অপর' ; যাকে অপর মনে ভাবি, সে-ই হল আমার ভয়ের উৎস। যাকে 'অপর' ভাবি না তার থেকে আমার ভয়ও নেই ; এবং যেখানে ভয় নেই, সেখানে হিংসাও নেই। কেননা ভয় পেলে তবেই না আমি আঘাত করার কথা ভাবি ; আর আঘাত করলেই তার সহচর প্রত্যাঘাতও আসে। এরই ফলে অশান্তির সূত্রপাত। তা-হ'লে দেখা গেল যে সকল অশান্তির মূলে রয়েছে আমাদের বিভেদবোধ। তাই আমাদের মূলগত আধ্যাত্মিক জীবনের ঐক্যসূত্রটি স্বামীজী আমাদের শিখিয়ে দিলেন। যীশুখ্রীষ্টও প্রতিবেশীকে ভালবাসার মন্ত্রটুকু দান ক'রে আমাদের সেই একই শিক্ষা দিলেন। স্বামীজী বললেন ঃ

"জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সত্যাগ্রহীর-জীবনদর্শনও এই প্রেমভিত্তিক ; গান্ধীজী ছিলেন সত্যাগ্রহী। তাঁর জীবনেও এই সত্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখেছি। তিনি সবাইকে আপন জ্ঞান করেছেন। তাই ত তিনি কাউকে ভয় করতেন না। জীবনের সায়াহ্নবেলায় তাই ত প্রার্থনা-সভায় তিনি কোন শান্ত্রী চাইলেন না ; প্রত্যাখ্যান করলেন শান্ত্রী বিভাগের সাহায্য। ফল হ'ল দেহের পতন। আত্মার ত পতন হয় না ; সে নিত্য ঊর্ধ্বাভিমুখী। ব্যষ্টি-মানুষ হ'ল এই আত্মা। সে অবিনাশী।

ব্যবহারিক জীবনে আপন কর্তব্য পালন ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার জন্য স্বামীজী আমাদের বললেন। আর্ত মানুষ, অসহায় মানুষ, পীড়িত মানুষের সেবা করতে হবে তাদের দেবতা জ্ঞান ক'রে। উপর থেকে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে যেন আমরা আর্তের সেবা না করতে যাই। একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবের মধ্যে বলেছিলেন ঃ 'দূরে শালা, তুই কাকে সাহায্য করবি? তুই যাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিস সে-ই ত নারায়ণ।' স্বামীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরের এই কথার মধ্যে মহত্তম সত্যের সন্ধান পেলেন এবং প্রচার করলেন সেই সত্যটুকুকে। তিনি কর্মের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বকে জীবন্ত করে তুললেন। দেবজ্ঞানে মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই সে সেবা সার্থক হবে। এই সেবার মধ্য দিয়ে সেবকের যে অলৌকিক শক্তি লাভ হয়, সে কথা স্বামীজী বলেছেন। যাঁরা যোগ-যাগ জানেন না, জপ-তপে যাঁদের নিষ্ঠা নেই, তাঁরাও যোগজ শক্তির অধিকার পেতে পারেন, এ কথা তিনি বললেন, তিনি একটা গল্প বলেছেন, সে গল্পের বিষয় হল এই যে একজন যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী যোগ করে যে শক্তি লাভ করেন, সেই শক্তিই লাভ করেছিলেন একজন গৃহবধূ কায়মনোবাক্যে তাঁর স্বামী-স্বজনের সেবা ক'রে। সেবা করা, কর্তব্য করা এটি হল স্বামীজীর শিক্ষা-দর্শনের প্রধান নির্দেশ। মহাদার্শনিক ব্রাডলি তাঁর নীতিশাস্ত্রে এই কর্তব্য করার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর আলোচনা বুদ্ধিআশ্রয়ী। আর স্বামীজীর কথা বুদ্ধির আবেদনকে অতিক্রম করে আমাদের চেতনার মর্মমূল আশ্রয় করে।

স্বামীজী ব্যবহারিক জীবনকে পুরোপুরি স্বীকার করেছিলেন, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাই সেই জীবনকে সুস্থ, সহজ, সুন্দর, এবং দীপ্তিমান ক'রে তোলার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করলেন পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানকে। পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে বিজ্ঞানকে জানতে হ'বে, তাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। ওদের টেক্‌নোলজিকে আমার দেশ থেকে দারিদ্র্য-নির্বাসন যজ্ঞের হোতা করতে হবে। ব্যবহারিক জীবনকে সুস্থ এবং সহজ করতে হ'লে ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। আমেরিকার ঐশ্বর্য দেখে, তার মানুষদের সুন্দর স্বচ্ছল জীবনযাত্রা দেখে স্বামীজী কেঁদেছেন তাঁর দেশের মানুষদের জন্য। এই অমিত বিত্তের কিছুটা পেলেও স্বামীজী তাঁর দেশের মানুষদের মহাবুভুক্ষা কিয়ৎপরিমাণে দূর করতে পারতেন। তাই তিনি বিজ্ঞানের শিক্ষাকে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যগ্রাহ্য বিষয় হিসেবে নির্দেশ করেছেন। বিজ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে পশ্চিম দেশ ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে; আমাদের ঐশ্বর্য চাই। সুতরাং বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষা অপরিহার্য। তবে মানুষের ব্যবহারিক জীবনটাই ত তার সবটুকু নয়। তারপরে তার পারমার্থিক সত্তা; সেখানে সে অধ্যাত্মলোকের অধিবাসী; সে-ই ব্রহ্ম। আমাদের সব যাত্রা, সব অভিসার, জীবাত্মার সর্ব-প্রয়াসের শান্তি ঐখানে। শিক্ষকের লক্ষ্য অধ্যাত্মমূল্যে শিক্ষার্থীর চিত্ত-সংস্থাপন। যথার্থ বৈদান্তিকের মতই স্বামীজী পরম অধ্যাত্ম-লক্ষ্যটুকুকে তাঁর শিক্ষাদর্শনের চরম প্রতিবেদ্যরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত

করলেন। শিক্ষকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভক্তিযোগে তিনি বললেন যে গুরু "তিনিই যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।"

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামীজী অধিকারবাদকে স্বীকার করলেন। অধিকার অর্জন-সাপেক্ষ; জন্মগত অধিকার অধিকার নয়। এই অর্জনটুকুই হল শিক্ষার্থী-জীবনের প্রেয় এবং শ্রেয়। আমাদের অস্তিত্বের পরম লক্ষ্যে উপনীত হ'বার এটি হল একমাত্র পন্থা; নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। একে আমরা শিক্ষা বলতে পারি। স্বামীজী কল্পিত শিক্ষাদর্শন অধ্যাত্ম লক্ষ্য-আশ্রিত এবং বৈদান্তিক নীতিশাস্ত্রসম্মত।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ শিক্ষা

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী

নিজের একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনায় বিবেকানন্দ মানুষের যেটি মূল প্রার্থনীয় একান্ত প্রয়োজন তা প্রকাশ করে গেছেন—'মা! আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।' সর্বপ্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্তি এবং মনুষ্যত্বলাভ যে মানুষের মূল প্রয়োজন—একান্ত প্রয়োজন তা নিঃসন্দেহ। কারণ মানুষ যে ধর্মের ও যে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তই হোক, নানা প্রকারের দুর্বলতা বশতঃই তার চরিত্র, সংস্কৃতি ও ধর্ম বজায় রাখতে পারে না। শারীরিক দুর্বলতা এবং ততোঽধিক মানসিক দুর্বলতাই ঐ সকল স্খলন ও চ্যুতির কারণ। অনেক কিছু করা উচিত, বা উচিত নয় জেনেও আমরা মানসিক দুর্বলতাবশতঃ তা করতে, বা পরিহার করতে পারি না। কার্যকালে মানসিক নানা প্রকারের দুর্বলতাবশতঃ যা করা উচিত বলে জানি, তা করতে পারি না; যা করা উচিত নয় বলে জানি তা পরিহার করতে পারি না; ফলে মনুষ্যচরিত্র বা মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে পারি না।

মানসিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থেকে, মানসিক সবলতা লাভ করতে হলে শারীরিক সবলতাও অনেকটা প্রয়োজন। কারণ শরীর দুর্বল বা রুগ্ন থাকলে অকারণ নানা ভয় ও মানসিক রুগ্নতারও সম্ভাবনা থাকে। তাই বিবেকানন্দ অনেক স্থলে শরীরের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার কথা বলেছেন। শরীর সুস্থ সবল থাকলে তবেই একটি সুস্থ সবল মন লাভ করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। কিন্তু শরীর সবল থেকেও বহু লোকেরই মন অত্যন্ত দুর্বল—মনুষ্যত্বহীন, ও পশুভাবাপন্ন—তা সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং মানসিক বলই চরিত্রলাভের মনুষ্যত্বলাভের প্রধান কারণ—একথা স্মরণ রাখতে হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বলহীন আত্মাকে লাভ করতে পারে না—উপনিষদের এই বাণীতে প্রধানতঃ মানসিক বল—মনন বলের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এই মানসিক দুর্বলতার বা সবলতার অভাবের কারণ কী? বিবেকানন্দ অনেকবার করে ভয় ত্যাগ করবার 'অভীঃ' হবার কথা বলেছেন। কিন্তু বিচার করে বুঝতে হবে, কোন্ ভয় ত্যাগের কথা তিনি বলেছেন। ভয় ত্যাগ করলেই মনের রোগ—মনের দুর্বলতা যাবে কেমন করে? চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, সৈনিক এদের তো মরণভয়, সমাজভয় বিশেষ নেই; তারা কি মানসিক সবল, সুস্থ? বিবেকানন্দ কি বলতে চেয়েছেন—বুঝতে হবে। উপনিষদ্ কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মাকেই অভয়-স্বরূপ বলেছেন। 'অভয়ং তিতীর্ষতাং পারম্'—ব্রহ্ম বা আত্মাই তরণেচ্ছুর (জীবন সমুদ্র পার হতে ইচ্ছুর) অভয় তীর-স্বরূপ। সুতরাং—'আমি ব্রহ্ম, আমি

আত্মা' –এই নিশ্চয় করে মৃত্যুভয় ত্যাগ করা –এটাই অভয়ের মুখ্য বা প্রধান অর্থ। কিন্তু এরূপ আত্মজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুভয় ত্যাগ করা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? সুতরাং এই চরম অর্থ ছেড়ে নিম্নতর অর্থও বুঝতে হবে, যা আমাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব। আমাদের যে ঠক্‌বার ভয়, হারবার ভয়, হারাবার (loss) ভয়, অপমানের ভয়, যে কোনো দিকে লোকসানের ভয়, অভিলষিত-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়ার ভয় - এগুলিও আমাদের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুস্বরূপ। ঐ সকল ক্ষুদ্র মৃত্যুর ভয়েও আমরা সর্বদা শঙ্কিত থাকি। নিজের কামনা বা ইচ্ছা প্রবল হলে, তা না পাবার ভয়ও প্রবল হয়ে পড়ে। তাই সেই লোকসানের ভয়ে, বা না পাবার ভয়ে দুর্বল হয়ে আমরা যা করা উচিত নয় তাই করি, যা করা উচিত তা করতে পারি না। আমরা সব সময় লাভ করতে চাই, জিততে চাই, ঠক্‌তে বা হারতে চাইনা। এই জিতবার লোভ পদে পদে আমাদের স্বার্থপর করে তোলে, আমরা 'উচিত' থেকে মনুষ্যত্ব থেকে চরিত্র থেকে স্খলিত হই। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন, তুমি যদি সত্যি জিততে চাও তবে 'সেই সব জিনে নিজে জিনে যেই, ফাঁদে পা দিও না জেনে তত্ত্ব এই।'[১] নিজের ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করতে পারলে সব কিছুকে জয় করা যায়। বাহিরে জেতবার চেষ্টা নিরর্থক।

এতক্ষণ যা বলা হল তা হল, বুঝেও জেনেও যে আমরা যা উচিত, যা চরিত্র, যা ধর্ম তাতে কেন থাকতে পারি না, সেই দুর্বলতার কথা এবং তা পরিহারের কথা।

কিন্তু বহু লোক স্খলিত হয়, চরিত্রভ্রষ্ট হয়, না জানার দরুণ, না বোঝার দরুণ, অজ্ঞতাবশতঃ। আজকাল কিশোর সমাজে ও যুবক সমাজে এই অজ্ঞতাও একটা বড় কারণ চরিত্রহীনতার ও স্খলনের। গৃহের (পিতা মাতা ভ্রাতার) শিক্ষা, সমাজের শিক্ষা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থাই এই অজ্ঞতার কারণ। তারা শুনতেই পায় না ও জানে না কোনটা উচিত, কোন্‌টা ধর্ম, কোনটা সুচরিত্র। বরং অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত জ্ঞান, বিপরীত শিক্ষাই পেয়ে থাকে। পিতামাতার অর্থসংগ্রহাদি বিষয়ে অতিব্যগ্রতায় পুত্র-কন্যা বিষয়ে দায়িত্ববোধ ক্রমশঃ লুপ্ত হওয়াতে তাঁরা ভাববারই অবসর পান না, কী শেখালে, কীরূপ আচরণ করলে সন্তানদের সুশিক্ষা সুচরিত্র হবে, তাদের জীবনটা শোভন কল্যাণময় ও কল্যাণকর হবে। তাঁরা নিজেরাও যেমন টাকা ও ক্ষমতার লোভকে জীবনের সুখের প্রধান কারণ বলে মনে করেন, সন্তানদের সম্পর্কেও সেটাই শুধু আকাঙ্ক্ষা করেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখেন না, টাকা ও ক্ষমতার জন্য কী জঘন্য পশুত্ব সমাজে বেড়ে চলেছে, এবং ঐ দুটি থাকা সত্ত্বেও মানুষ কত দরিদ্র, অসহায় ও হীন হয়ে পড়েছে। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন

'পশিতে পারে না কভু তথা সত্য,
কাম-লোভ-বশে যেই হৃদি মত্ত।'[২]

মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলেছেন, 'এই তিনটি হল নরকের দ্বার যা মানুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়—কাম, ক্রোধ ও লোভ; সুতরাং এই তিনটিকে ত্যাগ কর।' কিন্তু 'ত্যাগ

কর' বললেই তো ত্যাগ করা যায় না। এই রিপুগুলি একবার মনে এসে গেলে, লড়াই করে তাদের দূর করা খুবই দুঃসাধ্য। সুতরাং ওরা যেন মনে আসতেই না পারে, ঢুকতেই না পারে প্রথম থেকে সেই ব্যবস্থা করলে তবেই নিস্তার। এর জন্য বিবেকানন্দ যা যা ব্যবস্থা করতে বলেছেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সুশিক্ষা। শিক্ষার অর্থ বিবেকানন্দ এক স্থানে বলেছেন, 'Education is nervous association of certain ideas.' অর্থাৎ শিক্ষার অর্থ হল কতকগুলি উচ্চ ভাবকে স্নায়ুর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। আমাদের প্রাচীন ভাষায়—কতকগুলি শুভ সংস্কার উৎপন্ন করা। 'শুভ সংস্কার' বা 'উচ্চ ভাবের স্নায়ুর সঙ্গে মিশ্রণে'র উপায় হল, সে বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও তদনুরূপ আচরণ। কারা সে শ্রবণ করাবে, আচরণ করাবে? সে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রয়েছে গৃহে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদের। পরে সে দায়িত্ব স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরও। কিন্তু আজ শিক্ষকরা তো রাজনীতি ও দুর্নীতি দিয়ে নিজেদের ও বিদ্যার্থীদের সর্বনাশ করছেন। গৃহেও পিতা-মাতা-ভ্রাতাদের যদি নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, সুচরিত্র না থাকে, তবে সন্তানদের কী শিক্ষা দেবে? তাই সকলের জন্যই বিবেকানন্দ বলেছেন, 'পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা এবং ইন্দ্রিয়সংযম —এইগুলিই ধর্মের মূল কথা।' ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করতে ও করাতে হবে। আজকাল তো বাপ-মায়েরা সন্তানদের সকল আবদার পূর্ণ করা, যা চাই তাই দেওয়াকেই ভালবাসার চরম নিদর্শন ব'লে মনে করেন। কিন্তু তাতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ইচ্ছা দমন করার, ইন্দ্রিয় সংযম করার অভ্যাস না হওয়াতে জীবনে কোনদিনই তা করতে পারে না। তাই পিতা মাতার কর্তব্য নিজেদের স্নেহ ও সহানুভূতি প্রমাণ করবার জন্য না চাইতেই সন্তানদের উপযোগী প্রিয় দ্রব্য ও আহার্য তাদের দেওয়া। আবার চাইলেও অনেকক্ষেত্রে না দেওয়া, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে তাদের চাওয়াগুলি অসঙ্গত সে-সব ক্ষেত্রে। এতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরইচ্ছা দমনের অভ্যাস হবে, ইচ্ছা হলেই যে তা পূরণ করতে নেই -এই ধারণা জন্মাবে। এ অভ্যাস, এ ধারণা না জন্মালে কোনদিনই সে ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারবে না, সুতরাং চরিত্রবান ও ধার্মিক বা সৎ হতে পারবে না। অভ্যাসের ফলে, দৃঢ়-সংস্কার জন্মালে তবেই সংযম, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতির দ্বারা সুচরিত্র ও ধর্মলাভ সুসাধ্য হয়, নতুবা দুঃসাধ্য।

তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ছোটবেলা থেকে যাদের এ শিক্ষা, এ অভ্যাস হয়নি তাদেরও নিরাশ হবার কারণ নেই। যৌবনের শক্তি থাকতে থাকতে যদি জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে, যদি আদর্শকে বরণ করে নিতে পারে, তাহলে সে আদর্শের শক্তি ও আকর্ষণে ক্রমে ইন্দ্রিয় সংযম, নিঃস্বার্থতা আপনি এসে পড়ে। উচ্চ আদর্শ কিছু গ্রহণ করলে, তার প্রতি টান হলে, তখন ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা সুসাধ্য হয়ে ওঠে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে আদর্শ বলতে বোঝায় কোনও ইন্দ্রিয়াতীত জৈব প্রয়োজনের বাহিরের বস্তু, যা মনুষ্যজীবনে বাঞ্ছনীয় এবং লাভ করা সম্ভব। মুক্তি, আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরভক্তি, ত্যাগ, পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, অথবা এই সবের মূর্ত

বিগ্রহস্বরূপে মহাপুরুষগণ—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ। এ সকলের যে কোন একটিকে ভালবেসে, শ্রদ্ধা করে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করলে সংযম, ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, সেবা প্রভৃতি সুচরিত্র সুসাধ্য হয়ে আসে। এই জন্য বিবেকানন্দ 'আদর্শ' বিষয়ে এত বলে গেছেন।

এ আদর্শ বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আদর্শকে কখনও নীচু করা উচিত নয়।··· ···আমি আমার আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিব না।···মনুষ্যস্বভাবে ভয়ানক রক্ষণশীলভাব (জড়তা) রহিয়াছে।···অতএব (সেই জড়তা ভেঙ্গে) সর্বদাই আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে খাটো করিয়া তোমার স্তরে নামাইয়া আনিতে চায়, যদি কেহ শিক্ষা দেয় ধর্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না।···যখন কোনও ব্যক্তি দুর্বলতা সমর্থন করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে তো ইন্দ্রিয় সমূহে আবদ্ধ হইয়া নিজদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তারপর আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্বোক্তভাবে (ধর্ম আদর্শ নহে -এই ভাবে) শিক্ষা দিতে চায়, এবং তুমি যদি ঐ উপদেশ অনুসরণ কর, তবে কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না। ···মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে হইবে।'[৩]

বিবেকানন্দ এখানে মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করার -দেবত্বে তুলে দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু পশুত্ব থেকে দেবত্বে ওঠা যায় না। পশুত্ব দূর করে 'মানুষ হবার জন্য বিবেকানন্দ অনেক কিছু বলে গেছেন। তার মধ্যে প্রধান হল, আলস্য ত্যাগ করে কর্ম ও সেবায় আত্মনিয়োগ করা। ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করা, নিজের নিজের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা।

এসব ছাড়াও বিবেকানন্দ উপনিষদের একটি বাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, 'আহার শুদ্ধ হলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হলে ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয়।' আহারের অর্থ শুধু খাদ্য নয়, চক্ষু, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি বহিরেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা কিছু আহরণ করি বা গ্রহণ করি, সে সবই আহার। সেই আহার শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। চক্ষু, শ্রোত্র, রসনায় কোনও অশুদ্ধ অপবিত্র চিন্তা না করলে চিত্তের শুদ্ধি লাভ হয়। চিত্তের শুদ্ধি হলে কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ের স্মৃতি বা জ্ঞান ঠিক ঠিক হয়; চিত্ত অশুদ্ধ থাকলে ঠিক ঠিক কর্তব্য নির্ণয় হয় না। আত্মজ্ঞান, বা ঈশ্বরভক্তি-রূপ উচ্চতর আদর্শের স্মৃতিও অবিচল থাকে, তাই আদর্শচ্যুতি ঘটে না।

চিন্তা ও যুক্তিহীন অনেকের ধারণা এই যে, প্রাণ যা চায়, তাই করাই হল পথ। এই প্রাণের চাওয়াকেই তারা আবার বিবেক নাম দিয়ে চালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বোঝে না বা বুঝতে চায় না যে, আমাদের অসংস্কৃত বা অশুদ্ধ মন (বা প্রাণ) যা চায় সেটা কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) নয়, সেটা হল প্রেয়ঃ বা সুখকর। ওরূপ মনের প্রেরণা বিবেকও নয়। শাস্ত্র বা মহাপুরুষের বাক্য অনুশীলন করার ফলে যে শুদ্ধ উজ্জ্বল

বুদ্ধির উদয় হয় তাই বিবেক, অশুদ্ধ অসংস্কৃত মনের প্রেরণা অবিবেকপ্রসূত, সুতরাং বিপথগামী হয়ে থাকে।

দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলে যতদিন না নিজেদের বিবেক লাভ হয়, সত্য চিন্তার শক্তি লাভ হয়, ততদিন আমাদের মান্য করে চলতে হবে—ঋষি, গুরু ও গুরুজনদের বাক্য ও উপদেশকে। যারা আমাদের সংস্কৃতির রাজ্যে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-যুক্ত পুরুষ (moral or spiritual superiors) তাঁদের বাক্য বা উপদেশ মান্য করে চলা ছাড়া সাধারণ মানুষের আর কোন পথ নেই। তাই বিদেশের ভাষণেও বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমাদের সমাজে এটা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে, মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। সে জন্যই আমাদের জীবন অনেক বিধি-নিষেধের অধীন। এগুলি সৌন্দর্যহীন মনে হইলেও ইহা শক্তি ও আলোকপ্রদ।'

(১) স্বামী বি[illegible]র বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড; পৃঃ ৪৫২,
(২) ঐ, পৃঃ ৪৫৪,
(৩) ঐ ২য়, পৃঃ ২২৭-৮,
(৪) ঐ, ১০ম, পৃঃ ৩৪০।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে একটি শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। বাংলাদেশের নানা প্রান্তের শিক্ষাবিদেরা সে সম্মেলনে সমবেত হয়ে, স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার উৎস ও প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা করেছিলেন। যতদূর জানি, সে সম্মেলনে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা-প্রসঙ্গে উদ্বোধন ও অদ্বৈত-আশ্রম-প্রকাশিত বইগুলিই ছিল প্রধান অবলম্বন। সেইসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনাও স্বাভাবিক কারণেই প্রাধান্য পেয়েছিল। হার্বার্ট স্পেনসারের Education : Intellectual, Moral and Physicial' নামে যে গ্রন্থখানি স্বামীজী তাঁর প্রথম জীবনে অনুবাদ করেছিলেন, সেই বইখানি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা তখন সম্ভব হয়নি। কারণ বসুমতী-প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের 'শিক্ষা'-গ্রন্থটিই যে হার্বার্ট স্পেনসারের বইটির অনুবাদ —তখনো সেকথা আমরা জানতাম না। অথচ বসুমতী-কার্যালয় থেকে এই বইখানির অনুবাদ 'শিক্ষা' 'স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত' এই পরিচয়ে বহু আগে থেকেই মুদ্রিত হয়ে আসছে। বইখানি স্বামীজীর প্রণীত নয়, অনূদিত। তবু স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা-আলোচনায় গ্রন্থখানি অপরিহার্য। এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা দেবার চেষ্টা আগে করেছি।[১] বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা।

বিবেকানন্দের দর্শনের মূল প্রতিজ্ঞা যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, সে বিষয়ে নরেন্দ্রপুরে আয়োজিত স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রে যোগদানকারীরা মোটামুটি একমত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর শিক্ষা-দর্শনও এই অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার ক্রমপর্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেদিক থেকে ছাত্রজীবনে তাঁর সতীর্থকল্প[২] বন্ধুবর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিচারণ আমাদের অনেক পরিমাণে সহায়তা করে। তারপরেই উল্লেখযোগ্য স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী।'

বিবেকানন্দ-মানসের গঠনপর্বের অন্যতম সাক্ষী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কথায়— "খুব কম লোকেই তাঁর অন্তরের মানুষটির সংগ্রামের কথা জানতো, তাঁর অন্তরাত্মার সমস্ত বিক্ষোভ রূপ পেতো বেপরোয়া অস্থিরতায়।"

মানস-ইতিহাসের এই সঙ্কটমূহূর্তেই তিনি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন, স্থাপিত হয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ-ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। ব্রাহ্মসমাজের বহিরঙ্গ অংশ থেকে যে বালকসুলভ আস্তিক্য ও সহজ বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন, জন স্টুয়ার্ট মিলের 'ধর্ম-সম্পর্কিত তিনটি প্রবন্ধ' (Three Essays on Religion) পড়ে তা বিপর্যস্ত হলো। সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে হেতুবাদ এবং বিশেষ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা তাঁর পক্ষে আর নির্ভরযোগ্য রইলো না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন; স্রষ্টার সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার ধারণার সঙ্গে কিছুতেই এই অমঙ্গলবোধকে তিনি মেলাতে পারছিলেন না। জনৈক বন্ধু তাঁকে হিউমের সংশয়বাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার পর তাঁর অবিশ্বাস ক্রমে দার্শনিক সংশয়বাদের রূপ ধারণ করল।"[১]

মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা-অনুযায়ী স্বামীজীর দর্শন-চর্চা-প্রসঙ্গ "কলেজে তিনি হ্যামিল্টনের 'মেটাফিজিক্স' পড়িয়াছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সার তিনি অতিশয় পড়িতেন। মিল ও স্পেন্সারের প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ কার্য করিয়াছিল। তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' পুস্তকখানা বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় হার্বার্ট স্পেন্সার নিজ হস্তে অনুবাদের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পত্রখানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না বিবেচনা করার যত্ন করিয়া রক্ষা করা হয় নাই…।"[২]

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মূলতঃ স্বামীজীর অনুবাদগ্রন্থটি সম্বন্ধেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো বলে তাঁর দর্শনচিন্তার পটভূমি নিয়ে আর বিস্তৃত তথ্যে অগ্রসর হবো না। প্রধানতঃ যে কয়টি কারণে আমাদের কাছে স্বামীজীর অনূদিত 'শিক্ষা'-গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান তা এই -(ক) বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ-বিভাগে দর্শন-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেকথা স্বামীজী তাঁর তরুণ বয়সেই অনুধাবন করেছিলেন এবং মাতৃভাষাকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আলোচ্য অনুবাদগ্রন্থ 'শিক্ষা' সে প্রচেষ্টার এযাবৎ প্রাপ্ত একমাত্র সম্পূর্ণ উদাহরণ।[৩] স্বামীজীর আর একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদের প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনার কারণ—সেটি টমাস-আ-কেম্পিসের 'ঈশানুসরণ' ('ভাব্বার কথা' দ্রষ্টব্য)। (খ) বিবেকানন্দ-মানসে

---

১. অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Life of Swami Vivekananda (বিবেকানন্দ-জীবনী) : Eastern & Western Disciples (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দ-রচিত); পঞ্চদশ সংস্করণ ; পৃঃ ৭৭

২. শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী : মহেন্দ্রনাথ দত্ত : দ্বিতীয় সংস্করণ : পৃ ১৬৩-১৬৪

৩. স্বামীজীর অনূদিত একাধিক গ্রন্থ থাকা আশ্চর্য নয়।

দার্শনিক স্পেন্সারের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার উপকরণরূপে এ অনুবাদগ্রন্থের বিশিষ্ট মূল্য। (গ) বিবেকানন্দ-শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে হার্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তাধারার পর্যালোচনা। (ঘ) সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের নবলব্ধ সংযোজনরূপে অনুবাদগ্রন্থ 'শিক্ষা'র তাৎপর্য।

হার্বার্ট স্পেন্সারের Education (শিক্ষা) বইখানির প্রথম সংস্করণে দেখি প্রকাশক Williams And Nograte, London, বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯০। বসুমতী প্রকাশিত 'শিক্ষা' বইখানি ছোট আকারের মাত্র ৯৯ পৃষ্ঠার বই। মূল বইটির আক্ষরিক অনুবাদ স্বামীজী করেননি, মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আলোচনার মূল বক্তব্য কোথাও বাদ যায়নি এবং অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ।

পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহল-নিরসনের জন্য হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ ও স্বামীজীর অনুবাদ উদ্ধৃত করছি--

Chapter—I

What Knowledge Is of Most Worth ?

It has been truely remarked that, in order of time, decoration precedes dress. Among people who submit to great physical suffering that they may have themselves handsomely tattooed, extremes of temperature are borne with but little attempt at mitigation. Humbolt tells us that an Orinoco Indian, though quite regardless of bodily comfort, will yet labour for a fortnight to purchase pigment wherewith to make himself admired ; and that the same woman who would not hesitate to leave her hut without a fragment of clothing on, would not dare to commit such a breach of decorum as to go out unpainted. Voyagers find that coloured beads and trinkets are much more prized by wild tribes, than are calicoes or broadclothes. And the anecdotes we have of the ways in which, when shirts and clothes are given, savages turn them to some ludicrous display, show how completely the idea of ornament predominates over that of use."

স্বামীজীর অনুবাদ—

শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, বসনের পূর্বে ভূষণের সৃষ্টি। ইহা অতি সত্য কথা। অসভ্যেরা সর্বাঙ্গে উল্কি ভূষিত করিবার তীব্র যাতনা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সহ্য

করিবে, তথাপি নিদারুণ শীত হইতে আত্মত্রাণের কোনও চেষ্টা করিবে না। হুম্বোল্ট একটি আদিম আমেরিকার বিষয় লিখিয়াছেন যে, সে সামান্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত করিয়া, স্ব-সমাজে গৌরবলাভের আশায় দুই সপ্তাহকাল সকল প্রকার ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, যে-সকল অসভ্য স্ত্রীলোক চীরমাত্রবিরহিতা হইয়া অসঙ্কোচে গৃহের বাহিরে গমন করে, তাহারাও জনসমাজে অচিত্রিত বপু প্রদর্শন অতি লজ্জাকর মনে করে। সমুদ্রযাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া-অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং কামিজ অথবা কোর্তার তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ গণ-আন্দোলন ও ধর্ম-আন্দোলনের যে একাত্মতা অনুধাবন করেছিলেন, 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচেতনা-প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। আধুনিককালে প্রধানতঃ মার্কস্ ও এঙ্গেল্সের চিন্তাধারার অনুসরণকারীরা ধর্মচিন্তাকে মানব-ইতিহাসের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকেন। পৌরাণিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ধর্মসংস্কৃতিকে বর্তমানকালের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করতে না পেরে একদিকে অতীতের যা-কিছু পুজো-অর্চনা, মন্ত্র-তন্ত্র সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রবণতা যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল, তেমনি এ যুগে অর্থনীতির বিবর্তনেই সমাজ-চেতনার প্রাণসত্যকে নির্দিষ্ট করে দেখাবার ফলে যা-কিছু সাময়িক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অননুমোদিত তাকেই উপহাস করার প্রবণতা সমাজে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিশ্লেষণে এক ভাবে নয় আর এক ভাবে সমাজচেতনার সমগ্র স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সমকালীন মতবাদগুলিই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তাৎপর্য সম্বন্ধেও এযুগের সমাজশাস্ত্রীদের চিন্তায় তাই অনিশ্চয়তার নিদর্শনই বেশী। একদল মনে করেন, প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুয়ানির অন্ধ অনুকরণই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের পরিণামফল, আর একদল মনে করেন সর্বধর্মসমন্বয়ের পর থেকে আর আমাদের কোনো ধর্মানুসরণেই নিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, ভাসাভাসা ভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুদের বচনসংগ্রহেই ধর্মচিন্তার চরিতার্থতা। তাছাড়া মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক বলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের ফলে আমাদের পাশ্চাত্যমুখী প্রগতির দ্বার

রুদ্ধ হয়ে গেছে—এ জাতীয় মতবাদের সমর্থক 'আধুনিক' পণ্ডিত তো শিক্ষিত সমাজে অনেকই মেলে।

সেদিক থেকে ভারত-ইতিহাসের পর্যালোচনাকালে 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে স্বামীজীর ইতিহাস-বিশ্লেষণে ভারতের বিভিন্ন যুগের মানস-সংঘাতে "সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ"[১]—এই বিশ্লেষণটি অবশ্য-স্মরণীয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতের ধর্মচেতনার দ্বৈত থেকে অদ্বৈত সব কয়টি স্তরকে মর্যাদার সঙ্গে সুবিন্যস্ত করে মানবচিন্তার সোপান-পরম্পরা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় সাকারবাদী ঈশ্বর-উপাসনার অন্তর্নিহিত মহাসত্যই যে যোগীঋষিদের ধ্যানে পরমতত্ত্বের নিরঞ্জন নিরাকার অদ্বৈত চেতনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে—এ কথাটি শুধু দার্শনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা তাঁরা ভারতবাসীর সামনে প্রমাণ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-আন্দোলনে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম চিন্তানায়কেরা যখন সমগ্র দেশেও ঐতিহ্যকে তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চাইছিলেন, তখন বিশেষ কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্যশিক্ষিতের ধর্মীয় ধ্যান-ধ্যারণার বাইরে চিরন্তন ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনায় প্রতিভাত হ'লো তারই ফলে ভারতীয় জীবনপ্রবাহের মূল স্রোতস্বিনী 'আর্য'-সভ্যতার ধারায় নূতন গতিবেগসঞ্চার। সেই সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্টীয় সাধনার অন্তরঙ্গ সত্যের সম্মেলনে নবযুগের ধর্মচেতনার বিশ্বতোমুখী প্রসার।

পাশ্চাত্যের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনধারা—এসব কিছুর প্রবল প্রভাবে আত্মস্থতার প্রয়োজনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা আমাদের অন্তরে যথার্থ আদর্শগত গৌরববোধ জাগিয়ে নবজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিল তার পিছনে ইতিহাসের আরো অনেক উপকরণের কথা মনে রেখেও বলা চলে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জাতির আত্মস্থতার মূল ভিত্তিটি এযুগে নূতনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন বলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এ জাগরণ সম্ভব হতে পেরেছিল।

আবার স্বাধীনতালাভের পর আধুনিককালে যখন "অভাবের হাত থেকে" আমরা মুক্তি চাইছি, তখনও গণ-জাগরণের আহ্বানে স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের বাণী ভারতের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত—"…নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড; বর্তমান ভারত: পৃঃ ২৩৭

মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"[১]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই 'নূতন ভারত' বলতে কি আজকের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহে মত্ত শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন বোঝাবে? বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক কালের গণজাগরণ নিশ্চয় বিবেকানন্দ-আদর্শের বিপ্লব নয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই সব আন্দোলনও যে সাধারণ মানুষের অন্তরে নানা প্রশ্ন তুলছে, সচেতনতা এনে দিয়েছে —তাও অস্বীকার করা যায় না। এখন প্রয়োজন, এই গণচেতনাকে ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ-সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে তোলা।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'Education'-গ্রন্থে ইতিহাসের যে গণভিত্তিক রূপ দেখতে চেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে দু'চারটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সাধারণ মানুষের জীবন-প্রবাহ-ই ইতিহাসের মূল বিষয়,—এ সিদ্ধান্ত আজকের দিনে অনেকেই মেনে নেবেন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষেরই মধ্যে বিভিন্ন গুণের তারতম্যে সাধক, মহাপুরুষ, রাজা, সেনাপতি, নেতা —এঁরা দেখা দিয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউ ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ সমাজে বা রাষ্ট্রে নানাভাবে নূতন চিন্তা ও কর্মের তরঙ্গ তুলে যান। পরবর্তীকালের অনেক মানুষ তাঁদেরই চিন্তাপদ্ধতিকে রূপায়িত করতে গিয়ে সভ্যতার বিভিন্ন যুগ গড়ে তোলে। সুতরাং স্পেন্সারের মন্তব্য —"রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব?"[২] —কতদূর সমর্থনযোগ্য তাও ভেবে দেখা দরকার। আসলে গণচেতনার প্রবক্তারা একথা ভুলে যান যে সমাজে যেমন সাধারণ মানুষ আছে, তেমনি আছে সাধারণ মানুষের পরিচালক নেতৃস্থানীয় মানুষ। প্রথম দল যদি ইতিহাসের উপকরণ হয়ে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় দলও ইতিহাসের উপকরণ। বরং যাঁদের জীবনে ও মননে অন্যদের উদ্বুদ্ধ, প্রভাবিত ও পরিচালিত করার শক্তি আছে, তাঁদের কথা ইতিহাসে বিশেষভাবেই আলোচ্য। সাম্যবাদী দেশগুলির ইতিহাসেও দলনেতাদের জীবনবৃত্তান্ত এই কারণেই অনেক পাতা জুড়ে থাকে। তবে মতবাদের অনুরোধে ইতিহাসকে প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন করার চেষ্টা সাম্যবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমাণে দেখা দেয়।

সুতরাং রাজ্যশাসনের পদ্ধতিও যেমন জানা দরকার তেমনি জানা দরকার কাদের মননে ও প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কোনো মতবাদ বা রাষ্ট্রনীতিকে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যহীন ভাবমূর্তির দ্বারা পুরোপুরি জানা যায় না।

---

১. তদেব : পরিব্রাজক : পৃঃ ৮২

২. শিক্ষা : হার্বার্ট স্পেন্সার : স্বামী বিবেকানন্দ অনূদিত : শশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ : পৃঃ ৩২

অতীতের কীর্তিগাথা বর্তমানকেও ভালবাসতে শেখায়। সুতরাং গণচেতনার স্বাক্ষর যেমন ইতিহাসে প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবন-চরিত। হয়তো সেযুগে তাঁরা রাজা বা সেনাপতি, এযুগে দলনেতা বা অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক—এই পার্থক্য।

দেশের ইতিহাসকে আমরা বিশিষ্ট আদর্শের প্রকাশরূপে যদি দেখতে চাই, তাহলে সেই বিশিষ্ট আদর্শ যাঁদের জীবনে রূপায়িত হয়েছে তাঁদের জীবন-কাহিনী থেকেই আমাদের অনুসরণযোগ্য সম্পদ আহরণ করতে হবে। ভারতের ইতিহাস যদি ধর্ম-প্রাণতার ইতিহাস হয়ে থাকে তাহলে সুদূর অতীত থেকে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলয়ের কাহিনীর দ্বারাই ভারতীয় চেতনার বিশ্লেষণ সম্ভব! আবার এক একটি বিশেষ ধর্মান্দোলনের প্রাণপুরুষকে অবলম্বন করেই জাতির অন্তরের বাণীটি উপলব্ধির আলোকে ধরা দেয়।

এদিক থেকে বেদ বা উপনিষদের ঋষিদের প্রত্যক্ষ জীবনচরিত না থাকাটা আমাদের জাতীয় অভাব। কিন্তু বেদ-উপনিষদের সেই উপলব্ধিই তো যুগে যুগে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, দাদু, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মতো মহামানবদের জীবনে রূপায়িত। সুতরাং এঁদের জীবনেতিহাস বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা ভারতীয় মানসের ক্রমবিকাশ যেমন ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করতে পারি, তেমনি আবার রাজনৈতিক ইতিহাসের ছিন্নসূত্রগুলি উদ্ধারের দ্বারা রাষ্ট্রীয় চেতনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও পেতে পারি।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছিলেন। আর বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' খুঁজেছেন অধ্যাত্ম তথা গণচেতনার ইতিহাস। কারণ ধর্মই ভারতের মর্মবাণী। ভারত-ইতিহাসের মর্মসূত্র নিহিত রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উত্থানপতন।

চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৭৬, 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর অনুবাদ-গ্রন্থ 'শিক্ষা' প্রসঙ্গে লিখেছিলাম যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে এ বইয়ের ১৯১৭ সালের একটি সংস্করণ দেখেছি। সম্প্রতি শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীমতী বাণী বসু সংকলিত অতি মূল্যবান পুস্তিকা "বিবেকানন্দ গ্রন্থপঞ্জী"-তে (বাক্-সাহিত্য প্রকাশিত) আরো আগের একটি সংস্করণের উল্লেখ পেয়েছি। বইটি গ্রন্থপঞ্জীতে এইভাবে তালিকাভুক্ত—শিক্ষা: শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯১৫, ০'২৫। অবশ্য বইয়ের মূললেখক হিসাবে স্বামীজীরই নাম আছে।

১৯১৫ সালের এ বইটি জাতীয় গ্রন্থাগারে পাইনি। কিন্তু উক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত যে বইটির কথা আছে, সেটিকে বলা হয়েছে ২য় সংস্করণ, ১৯১৭, ১৪ পৃষ্ঠা (এটি স্পষ্টতঃ মুদ্রণ-বিভ্রাট, বইটি আসলে ৬৪ পৃষ্ঠা) এর দাম ০'৫০। জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯১৭ সালের বইটির প্রচ্ছদে লেখা আছে—শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত: বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বাস্তবিক, এই সংস্করণটির ছাপা অতি সুন্দর।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উক্ত গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্কলয়িতাদ্বয় ১৯১৭ সালের বইটিকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলছেন কেন? জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইটিতে কোথাও একথা নেই। ১৯১৫ সালের বইটি যদি তাঁরা দেখে থাকেন, তাহলে সেটিই যে প্রথম সংস্করণ এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হলেন কেমন করে? বরং নানা কারণে এ কথাই মনে হয় যে, বইটি স্বামীজীর জীবৎকালে (এমন কি খুব সম্ভব তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের আগে) ছাপা হয়। কিন্তু সে যাই হোক, ১৯১৫ এবং ১৯১৭--এই দুই সংস্করণেই মুদ্রাকর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আর বইটি যে খুবই জনপ্রিয় তার প্রমাণ এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটি সংস্করণ এবং ১৯১৭-র সংস্করণটিতে দ্বিগুণ মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও পরবর্তী-কালে সমান প্রচার।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের যে সংস্করণটি আমরা পেয়েছি তার প্রচ্ছদে লেখা—শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৬৬ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকরের নাম আখ্যাপত্রের (title page-এর) দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—শ্রীশশিভূষণ দত্ত, এই পৃষ্ঠায়ই দামের উল্লেখ —বারো আনা।

বইটি 'শিক্ষা' সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে ধরে নিয়েই প্রকাশক ও পাঠকেরা এতদিন নিশ্চিত ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা নিয়ে যাঁরা এতাবৎকাল আলোচনা করেছেন, তাঁরা কেউই এই বইটির উল্লেখও করেননি। অপরপক্ষে অনুবাদ হলেও বিশ্বসাহিত্যে শিক্ষাচিন্তার একটি অমর গ্রন্থের অনুবাদরূপে এবং স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার বিবর্তনে এই গ্রন্থের বিশিষ্ট ভূমিকার দিক থেকে আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটি আমাদের অপরিসীম ঔৎসুক্যের কারণ।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের নাম —Education : Intellectual, Moral and Physical. বসুমতী-প্রকাশিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটির[১] সূচনায় একটু পার্থক্য লক্ষণীয়—শিক্ষা : শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। স্পেন্সার যেখানে শারীরিক শিক্ষাকে শেষে স্থান দিয়েছেন, এ অনুবাদ-গ্রন্থের নামে সেখানে 'শারীরিক' শব্দটি আগে স্থান পেয়েছে। কিন্তু অধ্যায়-বিভাগে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক পর্যায়টি ঠিকই বজায় আছে।

বসুমতী-সংস্করণে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই পর্যায়ে 'শিক্ষা'কে দেখবার প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার নিগূঢ় মিল লক্ষণীয়। স্পেন্সার শারীর চর্চাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করলেও তাঁর গ্রন্থে সর্বশেষে আলোচনা করেছেন এবং

১. জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯১৭ সালের সংস্করণ লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত শশিভূষণ দত্ত সংস্করণে সূচনায় শুধু 'শিক্ষা' আছে। 'শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক' —কথাগুলি বর্জিত।

ব্যক্তিগত জীবনে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি চরম ঔদাসীন্যই দেখিয়েছেন। অপর পক্ষে স্বামীজীর চিন্তাধারায় জ্ঞানলাভের যন্ত্ররূপ এই দেহের সুস্থতা ও সবলতার কথা সর্বাগ্রে চিন্তনীয়। আপন স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী যথেষ্ট সচেতন হ'লেও স্বল্পজীবনসীমায় বিপুল কর্মভার তাঁর অকাল প্রয়াণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিজের এবং অনুগামী গুরুভাই ও শিষ্যবৃন্দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজকে যাঁরা জীবন-সায়াহ্নেও শরীরচর্চায় প্রচেষ্টারত অবস্থায় দেখেছেন, তাঁরাই এ বিষয়ে স্বামীজীর আদর্শের কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনের একটি অপূর্ব স্বপ্নকথা উল্লেখযোগ্য। "একদিন ভোর রাত্রে অখণ্ডানন্দ স্বপ্নে দেখিলেন, স্বামীজী বহরমপুরের রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের ভাষায়ঃ দেখলুম, স্বামীজীর প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকীরের দেহ —কোমরে লোহার শিকল, পরনে আলখাল্লা, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা, তাঁর মাথায় একটা লোহার বল, সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে। সেইটি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। সঙ্গে চারজন শিষ্য। জিজ্ঞেস করলাম, এ রকম বেশ কেন? বললেন, 'এরকম শরীর নইলে কাজ ক'রব কি ক'রে? তোদের বাংলার ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে জানলি?—আমি বসে নেই, আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদার ভাব ছড়াচ্ছি। তাই এদের ফকীর সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' জিজ্ঞেস করলুম —ওরা কারা? এক এক ক'রে চারজনকে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'ইরান, তুরান, খোরাসান, আফগান।' 'ওদের দিয়ে তোমার কি হবে?' উত্তরে বললেন, 'এই রকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।' আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন তুমি কি করতে চাও?' বললেন, 'যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয়, তাই দেখতে চাই। বেদ, মহাভারত পড়ে দ্যাখ্ এরা তোদেরই জাতভাই!'..." (স্বামী অখণ্ডানন্দঃ স্বামী অন্নদানন্দঃ পৃ ১৮৫)

প্রিয়তম এই গুরুভ্রাতার অন্তরে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের ধ্যানধারণা কতো গভীর-ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, ওই দিব্যস্বপ্নে তারই প্রমাণ।

'শিক্ষা'-র শারীরিক আদর্শের আলোচনা আপাততঃ শেষ করে আমরা এই অনুবাদ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় ফিরে আসি। What knowledge is of Most Worth? (সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?)—শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্পেন্সার তাঁর সমসাময়িক শিক্ষাচিন্তার পটভূমিতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অনুসন্ধানী।

সাধারণভাবে মানুষ যে বসনের চেয়ে ভূষণের প্রতিই বেশী যত্নশীল সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে সে-যুগের বিদ্যালয়গুলিতে যে ব্যবহারিক বিদ্যার চেয়ে আলঙ্কারিক

বিদ্যার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হ'ত, সে কথা স্পেন্সার তাঁর গ্রন্থের গোড়াতেই বলেছেন। সে-যুগে ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যচর্চার (বিশেষতঃ লাটিন ও গ্রীক) প্রাধান্যই বেশী ছিল। অথচ পরবর্তী জীবনে খুব কম ছাত্রই তাদের ব্যবহারিক জীবনে ওই অধীত বিদ্যার দ্বারা উপকৃত হ'ত। সে-কথা মনে রেখে স্পেন্সারের মন্তব্য—"It is not the savage chief only, who is formidable warpaint, with scalps at his belt, aims to strike awe into his inferiors ; it is not only the belle, who, by elaborate toilet, polished manners and numerous accomplishments, strives to 'make conquests' ; but the scholar, the historian, the philosopher use their acquirements to the same end. We are none of us content wtth quietly unfolding our own individualities to the full in all directions ; but have a restless craving to impress our individualities on others and in some way to subordinate them. And this it is which determines the character of our education. Not what knowledge is of most worth, is the consideration ; but what will bring most applause, honour, respect—what will be most imposing. As throughout life, not what we are, but what we shall be thought, is the question ; so in education, the question is, not the intrinsic value of knowledge, so much as its intrinsic effect on others."[১]

স্বামীজীর অনুবাদ—"কেবল যে অসভ্য দলপতি ভীষণ যুদ্ধ-চিত্রণে সর্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া কটিদেশে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহন করিয়া নিম্নস্থ লোকদিগের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চারের চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে ; কেবল যে রূপগর্বিতা সুন্দরী ভূষার পারিপাট্য, সামাজিকতার নৈপুণ্য এবং অসংখ্য শোভন গুণের দ্বারা মনোদুর্গ অধিকারের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা নহে ; কিন্তু পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সকলেই আপনাপন গুণসমূহকে একই দিকে নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা সকলেই আপনাপন ব্যক্তিগত ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত নহি, অবিশ্রান্তভাবে অপর সকলের মনকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করি। এই ইচ্ছাই কোন ব্যক্তি কোন বিষয় শিখিবে, তাহা নির্দেশ করে। এই জন্যই আমরা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা, সম্মান এবং ভক্তি আনয়ন করে, যাহা অধিকতর লোককে বশীভূত করে, তাহাই শিক্ষা করি। যে প্রকার আমরা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকার স্বভাবের লোক, তাহা না ভাবিয়া, লোকে আমাদিগকে কিরূপ ভাবে

১. Education : Spencer : p. 4-5 [1st Edn.]

তাহাই অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই প্রকার শিক্ষাকার্যেও জ্ঞানের আত্মগত গরিমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া পর পরাভব-শক্তিরই সমাদর করি।[১]

অধিকাংশ বিদ্যাভিমানীদের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে স্পেন্সার যে নৈপুণ্যের পরিচয় উপরিউধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টিতে দিয়েছেন, তা স্বদেশ ও বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধারণ মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা যায়। বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য যে আত্মবিকাশ (স্পেন্সারের ভাষায় –unfolding our own individualities), তাকেই স্বামীজী বৈদান্তিক দৃষ্টিতে আরো গভীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।" সেই সঙ্গে "ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"[২] সুতরাং শিক্ষা ও ধর্মের পরম উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। এই আত্মবিকাশের সাধনা কখনো বহিরঙ্গ প্রতিযোগিতার দ্বারা সাধ্য নয়। স্পেন্সার এত উচ্চ আধ্যাত্মিক দিক থেকে না দেখলেও শিক্ষাব্রতীর মূল আদর্শটি ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন।

ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার বিবর্তনে উপনিষদের বিভাগ দুটি স্মরণীয় –'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ' (মুণ্ডক উপনিষদ্) –'পরা ও অপরা' –এই দুই বিদ্যাই মানবজীবনে আবশ্যিক। 'জ্ঞানার্জন'[৩] নিবন্ধে স্বামীজী এই দুই বিদ্যার প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন। বাস্তব জীবন ও পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে মহত্তম আধ্যাত্মিক সত্য অবধি প্রসারিত শিক্ষাচিন্তায় স্বামীজীর যে পূর্ণতা, স্পেন্সারের চিন্তাধারায় আমরা সে পূর্ণতা না পেলেও একটি সামগ্রিক জীবনবোধের ভূমিকা পাই। 'শিক্ষা'র এই সর্বাঙ্গীণ আদর্শকে স্বামীজী পরিণত মননের দ্বারা আরো প্রসারিত এবং গভীর করেছেন।

স্পেন্সারের দৃষ্টিতে—'How to live ?—that is the essential question for us. Not how to live in the mere material sense only, but in the widest sense. The general problem which comprehends every special problem is—the right ruling of conduct in all directions under all circumstances. In what way to treat the body ; in what way to treat the mind ; in what way to manage our affairs ; in what way to bring up a family ; in what way to behave as a citizen ; in what way to utilize those sources of happiness which nature supplies—how

১ শিক্ষা : অনুবাদ : স্বামী বিবেকানন্দ : পৃঃ ৫-৬
[শশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত সংস্করণ]

২. স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য 'কিডি' বা সিঙ্গারভেলু মুদালিয়রকে লেখা ৩রা মার্চ, ১৮৯৫ সালের চিঠি। বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪০০।

৩. জ্ঞানার্জন : ভাববার কথা : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৪১।

to use all our faculties to the greatest advantage of ourselves and others—how to live completely? And this being the great thing needful for us to learn, is by consequence, the great thing which education has to teach. To prepare us for complete living is the function which education has to discharge; and the only rational mode of judging of an educational course is to judge in what degree it discharges such function.'[১]

"কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত? ইহাই সকল প্রশ্নের সার। শুদ্ধ ইহার দ্বারা শরীর-ধারণের উপায় উক্ত হইতেছে না, শারীরিক এবং মানসিক সকল সম্বন্ধ ইহার অন্তর্নিহিত আছে। কি উপায়ে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত হইয়া আমাদের ব্যবহারে সত্যতা এবং সাম্যরক্ষা করিব? জগতের অন্য সকল প্রশ্ন এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত। কি প্রকারে শরীররক্ষা হইবে? মনের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কি প্রকারে সাংসারিক কার্য সুসম্পন্ন হইবে? কি প্রকারে সন্তানদিগকে লালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত? সমাজের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কিরূপে প্রাকৃতিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যব্যবহারোপযোগী হইবে? মানসিক ব্যবহার-সমূহকে কি প্রকারে ব্যবহার করিলে আপনার এবং পরের মঙ্গল সাধিত হইবে? ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষা, ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য; অতএব যে শিক্ষাপ্রণালী যত পরিমাণে সেই দিকে অগ্রসর হইবে, তাহা তত পরিমাণে উৎকৃষ্ট।"[২]

এ ক্ষেত্রে "সর্বোচ্চ শিক্ষা" বলতে স্পেন্সার যা বুঝিয়েছেন, ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলতে ভারতবাসীর কাছে পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ।" উদ্দেশ্য অনুসারেই বিভিন্ন দেশে শিক্ষাদর্শের পার্থক্য ঘটে।

মানবজীবনকে স্পেন্সার যে পাঁচটি কার্যকরী শক্তির দ্বারা ভাগ করেছেন, তার প্রথমটি 'আত্মরক্ষা'মূলক। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা অর্থে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা বোঝালেও ব্যাপক অর্থে জীবনের সর্বপরিস্থিতির উপযুক্ত হওয়াই উদ্দিষ্ট। এ বিষয়টি নিয়ে স্পেন্সার তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে (শারীরিক শিক্ষা) বিশদ আলোচনা করলেও প্রথম অধ্যায়েই কিছু প্রণিধানযোগ্য কথাও বলেছেন।

স্পেন্সারের মতে আত্মরক্ষার আয়োজন স্বয়ং প্রকৃতিই অনেক পরিমাণে করে থাকেন। "......সুখের বিষয় যে, শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গ আত্মরক্ষা প্রকৃতি আমাদের

১. Education : Spencer : p. 8

২. শিক্ষা পৃঃ ৮-৯।

হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করেন নাই।"[১] একটি ছোট্ট শিশুও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মায়ের কোলে মুখ লুকোয় অপরিচিত কোন মানুষ বা প্রাণী থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। "প্রকৃতি এই প্রকারে প্রথম শিক্ষায় আমাদের সহায় হওয়াতে এ বিষয়ে আমাদের যত্নের অল্পই আবশ্যক। আমাদের উচিত কেবল দেখা যে, এই প্রাকৃতিক শিক্ষা কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়। অনেক অল্পদর্শী শিক্ষক এবং পিতামাতা সন্তানকে সকল প্রকার ক্রীড়া হইতে বিরত রাখিয়া প্রাকৃতিক শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলেন যে, ভবিষ্যতে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সেই সকল সন্তান কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে।"[২]

শীতাতপ, ক্ষুধাতৃষ্ণা---এসবই প্রকৃতি আমাদের নানা সংকেতের মাধ্যমে জানান দিয়ে থাকে। তবু অনেকসময়ই এদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার ফলে অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ তো প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। তার কারণ শারীরশিক্ষার প্রতি আমাদের শিক্ষাদাতাদের মনে মনে একটু অবজ্ঞার ভাব রয়ে গেছে। আসলে ব্যাধির প্রতিকার করতে যে উদ্যম দেখা যায়, যাতে ব্যাধি আদৌ না হয়, সে বিষয়ে সে উদ্যমের শতাংশের একাংশও দেখা যায় না। অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়া যত সহজ, অসুস্থতার পরে সেই পূর্বজীবনীশক্তি ফিরে পাওয়া তত সহজ নয়। সুতরাং সব শিক্ষার গোড়ায় রয়েছে দেহগত সমুন্নতি। স্পেন্সার তো স্পষ্ট বলছেন -"যদি প্রচুর স্বাস্থ্য ও তদানুষঙ্গিক উন্নত মানসিক প্রবৃত্তি সুখোৎপাদনের প্রধান সহায় হয়, তাহা হইলে যে শিক্ষা উক্ত বিষয় পরিরক্ষণ করে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, শরীর, বিদ্যা, স্বাস্থ্য এবং মানব-জীবনের দৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেয়, তাহা সকল ন্যায্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অঙ্গ।"[৩]

"We infer that as vigorous health and its accompanying high spirits are larger elements of happiness than any other things whatever, the teaching how to maintain them is a teaching that yields in moment to no other things whatever. And therefore we assert that such a course of physiology is needful for the comprehension of its general truths, and their bearing on daily conduct is an all-essential part of rational education."[৪] স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের এ বক্তব্য সম্বন্ধে আগেই আমরা বিশদ আলোচনা করেছি।

স্বামীজীর অনুবাদের আর একটু অংশ উদ্ধৃত করে আমরা স্পেন্সারের শিক্ষা-

১, ২. শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত : 'বসুমতী' প্রকাশিত শ্রীশশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ : পৃঃ ১৪-১৫

৩. তদেব : পৃঃ ১৮

৪. Education : Spencer : 1st Edn. p. 16-17

বিষয়ক প্রথম সূত্রের আলোচনা শেষ করি —"পুত্র কি প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের লোকদিগের কুসংস্কারের বিষয় শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের (অভিভাবকদের) কত যত্ন! অথচ আপনার শরীর কি প্রকারে চালিত, পুষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে, তাহা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করেন!"[১]

সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্য এখানেও প্রয়োগ করা চলে। স্পেন্সার যে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রাধান্য চেয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসার আমাদের শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়ে কতটা সতর্ক করতে পেরেছে, তা সন্দেহের বিষয়।

স্পেন্সার আমাদের কার্যকরী শক্তিগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করবার সময় দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন —"যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষ-ভাবে আত্মরক্ষা করে।"[২] সমসাময়িককালের বৈজ্ঞানিক উন্নতি অনুযায়ী স্পেন্সার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে কীভাবে সহায়তা করে তার আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূতত্ত্ববিদ্যা, 'বিয়লজি' (Biology) বা জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এ সমস্ত বিষয়ের চর্চা তখনকার ইংল্যান্ডে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে অতি অল্পই দেখা যেত। অথচ জীবিকা ও জীবনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের জ্ঞানেরই প্রয়োজনের দিক থেকে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন্সার ইংল্যান্ডের শিক্ষা-চিন্তায় বিজ্ঞানের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সে প্রাধান্য কিন্তু এখনও সে দেশে দেখা দেয়নি। বিজ্ঞানকে জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ জেনেও সকলেই বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে ঝুঁকতে পারে না। মানবমানসের প্রকৃতিগত তারতম্য এবং জীবনোপলব্ধির বিভিন্ন স্তরকে কেবল উপযোগিতার মানদণ্ডে বিচার করা চলে না। তবু নবযুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্পেন্সারের অনুবাদক স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানশিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিতে চেয়েছিলেন। চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মকে স্বামীজী একই সত্যের বিভিন্ন দিকরূপে নির্দেশ করলেও ভারতবর্ষের বর্তমান প্রয়োজনে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা স্বামীজী নানাভাবেই নানা জনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' ও 'স্বামীজীর কথা' বই দুইটিতে লিপিবদ্ধ মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী শক্তির তৃতীয় সূত্র স্পেন্সারের মতে "যাহার দ্বারা সন্তান-পালন নিষ্পন্ন হয়।"[৪] এক্ষেত্রে স্পেন্সার তাঁর সমকালীন শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে একটু

১. শিক্ষা ঃ পৃঃ ১৯ ২. তদেব ঃ পৃঃ ১০
৩. তদেব ঃ পৃঃ ১১-১৯ ৪. শিক্ষা ঃ পৃঃ ১০

পরিহাসচ্ছলে বলেছেন, We come now to the third great division of human activities—a division for which no preparation whatever is made. If by some strange chance not a vestige of us descended to the remote future save a pile of our school-books or some college examination-papers, we may imagine how puzzled an antiquary of the period would be on finding in them no sign that the learners were ever likely to be parents. I perceive here an elaborate preparation of many things; especially for reading the books of extinct nations and co-existing nations (from which indeed it seems clear that these people had very little worth reading in their own tongue); but I find no reference whatever to the bringing up of children. They could not have been so absurd as to omit all training for this gravest possibilities. Evidently, then, this was the school-course of one of their monastic orders."[১]

স্বামীজীর অনুবাদ –"এক্ষণে মানবীয় কার্যের তৃতীয় বিভাগ দেখা যাউক। মনে করুন, কোন ঘটনাবশতঃ আমাদের আধুনিক অবস্থার সমস্ত চিহ্নই বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল রাশীকৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মনে করুন, সেই সময়ের একজন পুরাতত্ত্ববিদ এই প্রকার কতকগুলি পত্র পাইয়া পত্রের সমসাময়িক লোকদিগের শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রশ্নাবলী দেখিয়া ভাবিবেন যে, "দেখিতেছি, বহুবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা-শিক্ষার বিবিধ প্রকার আয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু সন্তানপালন সম্বন্ধে তো কোন শিক্ষাই দেখিতেছি না—অতএব বোধ হয় যে, এই সকল পত্র ইহাদের কোন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের হইবে।"[২]

স্পেন্সার পরিহাসচ্ছলে যে প্রশ্ন তুলেছেন, সে প্রশ্ন আধুনিক কালের শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে Home Science বা Domestic Hygiene-জাতীয় কিছু ব্যবস্থা থাকলেও পুরুষ-ছাত্রদের ক্ষেত্রে সন্তানপালন সম্বন্ধে কোনো আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব মায়ের চেয়ে বাপের বিন্দুমাত্র কম নয়।

সন্তানের শারীরিক বা মানসিক কোনো স্তরই অবহেলার যোগ্য নয়। স্পেন্সার প্রশ্ন করেছেন, অঙ্কে অনভিজ্ঞ লোক যদি ব্যবসা শুরু করে, তাহলে লোকসমাজে তার আচরণ হাস্যকররূপে দেখা দেয় কি না। অথচ সংসার-সমাজে সন্তানপালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই সন্তানদের লালন-পালনের ভার নিতে বাধ্য হন। ফলে

---

১. Education : Spencer : p 25

২. শিক্ষা : পৃঃ ১৭-২৮

পিতামাতার ভূমিকায় অধিকাংশ অপটু গৃহস্থ সন্তানদের জীবনে অশেষ দুর্গতির কারণ হয়ে থাকেন।

ব্যক্তিগত জীবনে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) পিতা বিশ্বনাথ ও মাতা ভুবনেশ্বরীর কাছে তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা-বিষয়ে নানাভাবে ঋণী। দেহাবসানের আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব লিখে জানিয়েছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দেবে।' অবশ্য সে শিক্ষা সাধারণ অর্থে সন্তান-পালনের শিক্ষা নয়। তবু, শিশুকে যে আশৈশব শ্রেষ্ঠ ভাবের দ্বারা ইতিমূলক (positive) শিক্ষা দিতে হবে -একথা স্বামীজী রাণী মদালসার গল্পের দ্বারা বুঝিয়েছেন। আপন শিশুসন্তানদের দোল দেবার সময় রাণী মদালসা শোনাতেন, তুমি সেই পরম সত্য -'ত্বমসি নিরঞ্জন।'[১] এই ভাবাদর্শগত শিক্ষার বাইরে প্রতিদিনের জীবনচর্যায় শিশুপালন সম্বন্ধে স্বামীজী বিস্তৃতভাবে কিছু লিখে যেতে পারেননি।

সন্তানের শিক্ষা-সম্বন্ধে অসচেতন জনক-জননীর উদ্দেশে স্পেন্সারের ভর্ৎসনার অনুবাদে স্বামীজীর নৈপুণ্য হয়তো অনেকটাই এ বিষয়ে তাঁর ও স্পেন্সারের মতৈক্যের দরুন -"হায়! হায়! জগতে যত দুর্বলতা, যত ভীরুতা, যত দারিদ্র্য, যত পাপ বর্তমান, প্রায় সেই সমস্তেরই কারণ তোমরা মূর্খ পিতামাতা! কি গুরুতর ভার তোমাদের উপর বিন্যস্ত, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না। তোমরাই তো সন্তানের ভাবী জীবন! তোমরাই তো তাহার জীবনের নেতা! চিন্তাবিহীন মূর্খ পশুর ন্যায় বিলাস চরিতার্থ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে সকল মনুষ্য সন্তানোৎপাদন করিতেছে, তাহারা ভবিষ্যৎ কি একবারও ভাবিবে না? আপনাদিগের অজ্ঞতায় মনুষ্য-বংশে পুরুষানুক্রমে কত শত শারীরিক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রবিষ্ট করাইতেছে, একবারও কি তাহা দেখিবে না?"[২]

বর্তমানে যখন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র ও শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে দেশবাসী চিন্তিত তখন ছাত্রদের অভিভাবক -বিশেষতঃ পিতামাতার ভূমিকা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। পিতামাতার যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র শিক্ষকদের উপরে নির্ভরতা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টির অপূর্ণতার ফল। আদর্শ জনক জননীর সন্তানেরাই বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা আশুতোষ হয়েছেন।

কার্লমার্কস, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় কবিতা, বিজ্ঞান ও ধর্ম

ঊনবিংশ শতব্দীর আধুনিকতা যে অনেক পরিমাণে বিজ্ঞান-নির্ভর তার অন্যতম প্রমাণ সেকালের প্রভাবশালী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। বিংশ শতাব্দীতেও

১. ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা : ভারতে বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ১৩৪-১৩৫

২. শিক্ষা : পৃঃ ৩০

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আমাদের আন্দোলিত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি সেই আস্থা আজকের দিনের মানুষ অনেক পরিমাণে হারিয়েছে। বস্তুবিজ্ঞানের তত্ত্ব যে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য নয়, একথা যেমন আমরা জানি, তেমনি দু-দুটি মহাযুদ্ধের পর বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ যে মানবাত্মার ক্রমোন্নতির উপরে নির্ভরশীল, সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়। সুতরাং নিছক বৈজ্ঞানিক উন্নতিই যে সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি নয়—একথা আজকের 'আধুনিক' মানুষ স্বীকার করে।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনা আমাদের কাছে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, নীতি—সব কিছুতেই আমরা বিজ্ঞানের প্রভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'Education' ('শিক্ষা') গ্রন্থে কবিতার সঙ্গে যে স্নায়বিক ক্রিয়ার সম্পর্কের কথা ভেবেছেন, সেকথা তেমন স্বীকার্য না হ'লেও বিজ্ঞানের কবিত্বপূর্ণ দিকটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায় স্পেন্সারের বক্তব্য "……বিজ্ঞান কেবল প্রত্যেক শিল্পের মূলে উপবিষ্ট নহে, বিজ্ঞানও কাব্যবিশেষ। সচরাচর শুনা যায়, কাব্য এবং বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী; একথা অতি ভ্রান্ত। সত্য বটে, অহংজ্ঞান-জড়িত মানসিক আস্থা সম্বন্ধে বোধশক্তি এবং অন্তরের ভাব উভয়েরই বিরোধী। সত্য বটে চিন্তাশক্তির সর্মাধিক পরিচালনায় হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাস ক্রমশই স্বল্প হইয়া উঠে এবং প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস চিন্তাশক্তিকে জড়বৎ করিরা ফেলে। এই অর্থে সমুদয় মনোবৃত্তি পরস্পর-বিরোধী। তাহা হইলেও বিজ্ঞান-প্রণোদিত বিষয়গুলি যে নীরস, কাব্যবিহীন ও বিজ্ঞানচর্চা স্বভাবতই কাব্য-রস আস্বাদন ও কল্পনা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে, এ কথা সত্য নহে। বরং বিজ্ঞান দ্বারা শুষ্কবৎ প্রতীয়মান বিষয়ও কাব্যরসময় হইয়া উঠে। যে-কেহ "হিউগ মিলার" কৃত ভূগর্ভ-বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারই প্রতীতি হইবে যে, বিজ্ঞান কি প্রকারে কাব্য উত্তেজিত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য আলোচনা করিতে করিতে তাহার প্রতি কি প্রেমের হ্রাস হয়? যিনি একবিন্দু জলের উপাদানসকল যে শক্তি দ্বারা সংযুক্ত আছে এবং যাহাকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন করিলে সহসা আভা উৎপাদিত হইবে জানেন, তাঁহা অপেক্ষা অজ্ঞলোকের কাছে কি জলবিন্দুর অধিক আদর? পণ্ডিত কি তুষারকণার অদ্ভুত শিল্প দেখিয়া অজ্ঞ-লোকাপেক্ষা উচ্চতর ভাবে নীত হ'ন না? বাস্তবিকই সাধারণ লোকাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সহস্রগুণে অধিক কবি।

হায়! হায়! মনুষ্য সামান্য বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইতিহাসোক্ত কোন ক্ষুদ্র মনুষ্যরাজার মন্ত্রণা লইয়া কত তর্কবিতর্ক করিতেছে, তথাপি অনন্ত আকাশের অনন্ত রচনাকৌশল দেখিবে না এবং রাজাধিরাজ ঈশ্বরের হস্ত ভূমণ্ডলের স্তরে স্তরে কত মহান কাব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্টিপাতও করিবে না!"[১]

১. 'শিক্ষা': স্বামী বিবেকানন্দ-[অনূদিত]। শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ। পৃঃ ৩৮-৩৯ মূল ইংরেজী গ্রন্থ 'Education' থেকে স্পেন্সারের নিজের

বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই কাব্যস্বরূপ স্পেন্সার যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তরুণ নরেন্দ্রনাথ যেভাবে অনুবাদ করেছেন—তাতে দু'জনেরই কবিদৃষ্টি সুপ্রমাণিত। শিল্প-কলাপ্রসঙ্গে স্পেন্সারের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণতঃ অতিমাত্রায় প্রয়োজনবাদী। কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বময় ঈশ্বরের লীলাসৌন্দর্যের উদ্ভাসনপ্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

প্রসঙ্গতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে আর এক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকার ঈশ্বরের যে ভাবকল্পনা প্রকাশিত, তাও স্মরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক বাংলায় বিজ্ঞান[illegible]

ভাষা—And now let us not overlook the further great fact, that not only does science underlie sculpture, painting, music, poetry, but that science itself is poetic. The current opininion that science and poetry are opposed, is a delusion. It is doubtless true, that as states of consciousness, cognition and emotion tend to exclude each other. And it is doubtless also true that an extreme activity of the reflective powers tends to deaden the feelings ; while an extreme activity of the feelings tends to deaden the reflective powers : in which sense, indeed, all orders of activity are antagonistic to each other. But it is not true that the facts of science are unpoetical ; or that the cultivation of science is necessarily unfriendly to the exercise of imagination and the love of the beautiful. On the contrary science opens up realms of poetry where to the unscientific all is a blank. Those engaged in scientific researches constantly show us that they realize not less vividly, but more vividly, than others, the poetry of their subjects. Whose will dip into Hugh Miller's works on geology, or read Mr. Lewes's "Seaside Studies", will percieve that science excites poetry rather than extinguishes it. And he who contemplates the life of Goethe, must see that the poet and the man of science can co-exist in equal activity. Is it not, indeed, an absurd and almost a sacriligious belief, that the more a man studies Nature, the less he reveres it ? Think you that a drop of water, loses anything in the eye of the physicist who knows that its elements are held together by a force which, if suddenly liberated would produce a flash of lightning ? Think you that what is carelessly looked upon by the uninitiated as a mere snowflake, does not suggest

প্রবন্ধকারদের মধ্যে অগ্রণী অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায়—"এক এক অসীমপ্রায় সৌরজগৎ যে বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থের এক এক পত্রস্বরূপ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষয়-স্বরূপ এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে-কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শব্দরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থপ্রতীতি করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়েন।"[১]

স্পেন্সার ও অক্ষয়কুমার—দু'জনের রচনাতেই দেখি বিশ্বরহস্যের অন্তর্লীন অনন্ত সৌন্দর্যের বিস্ময় তাঁদের কবিচেতনাকে স্পন্দিত করেছে। কিন্তু এরা দু'জনেই বিজ্ঞানের অভ্রান্ত নিয়মাবলীর সম্বন্ধে যতটা উৎসাহী, ঈশ্বরস্বরূপ অনুধাবনে ততটা অনুসন্ধিৎসু ন'ন। তাই জগৎরহস্যরূপ হিরণ্ময়পাত্রে এসেই তাঁদের জিজ্ঞাসা অনেক পরিমাণে পরিতৃপ্ত।

সৌরজগতের নিয়মাবলী আমরা যতই জানি না কেন, ঈশ্বর বা ব্রহ্মসত্তার জ্ঞান যে তার দ্বারা বর্ধিত হয়, একথা মনে করার কোনো হেতু নেই। অপরা বিদ্যার যে-কোনো শাখাতে আমরা উন্নতি করতে পারি। তার দ্বারা পরা বিদ্যা অধিগম্য হয় না। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানচেতনাকে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে সোপানরূপে গ্রহণ করেন, তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞানের সাধনাই ব্রহ্মসাধনায় রূপান্তরিত হ'তে পারে।

higher association to one who has seen through a microscope the wonderously varied and elegant forms of snow-crystals ?...The truth is that those who have never entered upon scientific pursuits are blind in most of the poetry by which they are surrounded......

Sad indeed, is it to see how men occupy themselves with trivialities, and are indifferent to the greatest phenomenon—care not to understand the architecture of the Heavens, but are deeply interested in some contemptible controversy about the intrigues of Mary Queen of Scots !—are learnedly critical over a Greek ode, and pass by without a glance that grand epic written by the finger of God upon the strata of Earth.– Education : Spencer : 1st Edn : pp. 44-46.

সংক্ষিপ্তকরণের প্রয়োজনে স্বামীজী একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী গ্যেটের উদাহরণটি অনুবাদে বর্জন করেছেন। সেকালের গ্যেটের মতো এত প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও একালের রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-কৌতূহলও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়' কবির ভাষায় লেখা একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ।

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ফাল্গুন, ১৭৭৩ শক।

মানুষের সেই অনন্তোপলব্ধির একটি পন্থা কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সংগীতে বিকশিত, আর একটি পন্থা বিজ্ঞানের যুক্তি, তথ্য, আবিষ্কারে নিহিত। বিজ্ঞানও কবিতা হয়ে উঠতে পারে তখনই যখন বস্তু নয়, ভাবগত অনুভূতিলোকে তার বাণী স্পন্দিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' 'সাবিত্রী' 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী' প্রভৃতি কবিতায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব যে কাব্যরূপ লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে কবির বিশ্বোপলব্ধির ভাবজগৎ। বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর পরিবর্তন হ'তে পারে নব নব আবিষ্কারের দ্বারা। কিন্তু ভাবের জগতের সত্য একবার মানুষের উপলব্ধিতে ধরা দিলে তা চিরকালই মানুষকে আন্দোলিত করে। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা এইখানে।

স্বামীজীর একটি কবিতায় বৈজ্ঞানিক তথ্য কীভাবে কাব্যরূপ লাভ করেছে তার উদাহরণ এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে রূপের জগৎ থেকে অরূপের জগতে প্রয়াণের এক অপূর্ব চিত্রকল্প এইভাবে উপস্থাপিত—

"মেরুতটে হিমানীপর্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি-প্রকাশ।
উত্তর অয়নে বিবস্বান্,
একীভূত সহস্র কিরণ,
কোটি বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর,
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর,
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।"[১]

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সাকার ও নিরাকার পরম সত্যের উপমায় বরফ ও জলের উদাহরণই[২] এখানে মেরুপ্রদেশে সূর্যকিরণে বরফ গলে যাওয়ার উপমায় পরিণত।

---

১. বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৭৫

২. "তিনি সাকার ; তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দসমুদ্র। কুলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফে জমাট বাঁধে ; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপে দেখা দেন আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।"

—কথামৃত : ২২শে অক্টোবর ১৮৮৫ : ১ম খণ্ড

কিন্তু বিবেকানন্দের কবিদৃষ্টি এক বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কীভাবে ব্রহ্মোপলব্ধির বেদান্তন্ন-শূন্যে অনির্বচনীয়তায় রূপায়িত করেছে, সেইটিই আমাদের আলোচ্য। এক্ষেত্রে বস্তু-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাধিলব্ধ অতীন্দ্রিয় সত্যের জ্ঞানও প্রয়োজন।

স্পেন্সার বা অক্ষয়দত্ত যে বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের কল্পনা করেছেন, তিনি মানুষের ইন্দ্রিয়-সীমার অতীত ন'ন, বরং বিশেষভাবে বিজ্ঞানের নিয়মাবলীতে আবদ্ধ ঈশ্বর। অপরপক্ষে মানবচৈতন্যের সীমাবদ্ধতা পার হয়ে যে পরমরহস্য, সেইখানেই যথার্থ ঈশ্বর-চেতনার পরিণাম।

ভারতীয় সাহিত্যে উপনিষদের কাব্যমূল্যপ্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য এদিক থেকে প্রণিধানযোগ্য —"…ঔপনিষদিক সাহিত্যে মহান ভাবের যেমন অপূর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কোথাও তেমনটি নাই।…অন্যান্য সকল জাতির ভিতরই এই মহান ভাবের চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমর বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা —বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতির বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব ঋঙ্‌মন্ত্রে বাহ্যপ্রকৃতির মহান্‌ ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব যতদূর উচ্চভাষায় সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যে-সকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ, অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও সেগুলি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন তাহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।

উপনিষদের ভাষা নূতন মূর্তি ধারণ করিল। উপনিষদের ভাষা একরূপে নাস্তি-ভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, উহা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অর্ধপথে গিয়াই ক্ষান্ত হয়, তোমাকে কেবল এক ধারণাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর আভাস দেখাইয়া দেয়, তথাপি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ থাকে না। জগতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শ্লোকের তুলনা হইতে পারে? —

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

—সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারাও নয়, এই বিদ্যুৎ সেইস্থানকে আলোকিত করিতে পারে না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি?"[১]

---

১. "ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' বক্তৃতা : বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড : পৃঃ ১২৩-১২৬

উপনিষদের ভাষা ও ভাবের প্রভাবে স্বামীজীর বিখ্যাত 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি'[১] গানটি রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণসাধনলব্ধ অদ্বৈতানুভব নরেন্দ্রনাথের অন্তরে সঞ্চারিত হওয়ার পরেই এ গানের রচনা। কবিতা ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধি—দু'দিক থেকেই এ গানটি স্বামীজীর ভাবলোকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। ইন্দ্রিয়াতীত লোকের বাণী বলেই এ গানের শেষ কথা—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'।

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম

স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' গ্রন্থে তরুণ নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এই সময় নরেন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ না পাওয়ায়, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্টুয়ার্ট মিল-এর গ্রন্থসমূহ অত্যধিক পাঠ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, স্পেন্সার ও মিলের গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলের সহিত খুব তর্ক করিত। এমন কি, পাদরীদের সহিত সমানভাবে তর্ক করিত।"[২]

হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ নরেন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই পড়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক-মতবাদের তিনি আগ্রহী পাঠক। সমকালীন তরুণ ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্য-দর্শনচর্চা সেকালে বিশেষ রেওয়াজ ছিল। সে তুলনায় ভারতীয় দর্শন খুব কমই পড়া হতো। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতাবলীতে পাশ্চাত্য-দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্যদর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছিলেন তার মূলে তাঁর তরুণবয়সের দর্শনপ্রীতি।

স্পেন্সারের শিক্ষাচিন্তায় বিজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান এবং এই বিজ্ঞানসচেতনতাই স্পেন্সারের ধর্মচেতনার পটভূমি। স্বামী বিবেকানন্দ সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু। তরুণ বয়সে স্পেন্সারের চিন্তাধারায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে সূক্ষ্ম যোগসূত্র তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর ধ্যানধারণায় সে সম্বন্ধে আরো গভীর ও ব্যাপক উপলব্ধি ঘটেছে। প্রধানতঃ ধর্মসাধনাই তাঁর জীবনের অবলম্বন হ'লেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল ও অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গসম্বন্ধ-বিষয়ে প্রতীতি তাঁকে আধুনিক পৃথিবীর মৌলিক চিন্তানায়কদের অন্যতম করে তুলেছে।

'শিক্ষা' গ্রন্থের 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?'—নামে সূচনা অধ্যায়ের সর্বশেষপ্রান্তে বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে স্পেন্সারের বক্তব্য (স্বামীজীর দ্বারা অনূদিত)—"...বিজ্ঞানই যথার্থ ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্য, এস্থলে ধর্মশব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল। সত্য বটে, ধর্মনামের আবরণে যে-সকল কুসংস্কার মনুষ্যসমাজে

১. বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খন্ড : পৃঃ ২৬৭

২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান : মহেন্দ্রনাথ দত্ত : পৃঃ ২০

প্রচলিত আছে, বিজ্ঞান তাহাদিগের বিপক্ষে, কিন্তু একবার বিজ্ঞানের গাম্ভীর্যে উপনীত হও, অমনি দেখিবে, 'যথার্থ বিজ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম যমজ ভগিনী, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট কর, উভয়েই মরিবে। যে পরিমাণে ধর্ম মিশ্রিত হইবে, সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে; যে পরিমাণে বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত হইবে, সেই পরিমাণে ধর্মও অটল হইবে। বিখ্যাত পণ্ডিতেরা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা কেবল বুদ্ধিবলে নহে, কিন্তু সেই বুদ্ধি ধর্মের দ্বারা প্রচালিত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছে। তাঁহাদিগের যুক্তি ও তর্ক অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়, তাঁহাদিগের প্রেম, তাঁহাদিগের নিরপেক্ষতা এবং তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগে বশীভূত হইয়া সত্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে,'—প্রোফেসর হাক্সলি এই কথা বলেন।"[১]

সব ধর্মমতেরই অন্তরালে যুক্তি ও সাধনার একটি স্তরপরম্পরা আছে। আমরা

১. 'শিক্ষা' : স্বামী বিবেকানন্দ-[অনূদিত]। শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ; পৃঃ ৪২-৪৩ হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের ভাষা—Lastly we have to assert—and the assertion will, we doubt not, cause extreme surprise—that the discipline of science is superior to that of our ordinary education because of the religious culture that it gives. Of course we do not here use the words scientific and religious in their ordinary limited acceptations, but in their widest and highest acceptations. Doubtless, to the superstitions that pass under the name of religion, science is antagonistic; but not to the essential religion which these superstitions merely hide. Doubtless, too, in much of the science that is current, there is a prevading spirit of irreligion; but not in that true science which has passed beyond the superficial into the profound.

"True science and true religion", says Professor Huxley at the close of a recent course of lectures, "are twin sisters, and the separation of either from the other is sure to prove the death of both. Science prospers exactly in proportion as it is religious, and religion flourishes in exact proportion to the scientific depth and firmness of its basis. The great deeds of philosophers have been less the fruit of their intellect than of the direction of that intellect by an eminently religious tone of mind. Truth has yielded herself rather to their patience, their love, their single-heartedness, and their self-denial, than to their logical acumen." Education : Spencer : 1st Edn. : p 50 লক্ষণীয়, স্বামীজীর অনুবাদ অনেকটা সংক্ষেপিত।

সেটিকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলতে পারি। কিন্তু বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞানের পন্থা যে বিভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই। এদিক থেকে পরবর্তীকালে লণ্ডনে প্রদত্ত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ স্মরণীয় —"বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না? ইউরোপীয়েরা বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে পৌঁছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছিতেছি —যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপে। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছিতেছি। এই জগৎ-প্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ —তিনি জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ।"[১]

মূলতঃ অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মেলাতে পেরেছেন। স্পেন্সার অবশ্যই সেদিক থেকে চিন্তা করেননি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম যে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদকে স্বীকার করেই গড়ে ওঠে, এ বিষয়ে স্পেন্সারের দূরদৃষ্টি নিশ্চয় প্রশংসনীয়। তরুণ নরেন্দ্রনাথ স্পেন্সারের এই চিন্তাধারার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মূলগত ঐক্য নির্ণয়ে স্পেন্সারের চিন্তার ইঙ্গিতকে আরো পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক আকার দিয়েছেন। অধ্যাপক হাক্সলির মন্তব্য উধৃত করে স্পেন্সার যে শুষ্ক যুক্তিবাদের ঊর্ধ্বে বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধানে ত্যাগ, নিষ্ঠা, অনুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার সঙ্গে ধর্মসাধকের ভাবনাজগতের মিল তো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদিতপ্রাণ অধ্যাত্ম-সাধক, বিজ্ঞানগবেষক বা সমাজসেবী —সকলেরই মধ্যে অন্তর-ধর্মের গভীর মিল নিশ্চয় আছে।

তবু প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞান এবং ধর্মের সাধনায় পার্থক্যও কি অনেকখানি নয়? ধর্ম যে কারণে বিজ্ঞানকেও ধর্মসাধনার অঙ্গ মনে করতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে বিজ্ঞান কি ধর্মকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে? জগদীশচন্দ্র বা আইনস্টাইনের ব্যতিক্রমী উদাহরণ ছাড়া এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজ খুব বেশী অগ্রসর হতে পেরেছেন কি? বস্তুজগতের ঐক্যধারণা এবং অধ্যাত্মজগতের ঐক্যধারণা ঠিক একই ধরনের উপলব্ধিতে এসে মেলা কি সম্ভব?

এ-জাতীয় প্রশ্নের সম্ভাবনা ভেবেই স্পেন্সারের বক্তব্য[২] —"বিজ্ঞান মানবের ধর্মভাব

---

১. বাণী ও রচনা: ২য় খণ্ড: জ্ঞানযোগ: ব্রহ্ম ও জগৎ: পৃঃ ১০৯ Complete Works of S. Vivekananda: Vol. II: Jnanayoga: The Absolute and Manifastation: Centenary Edn. pp 140-151

২. মূল ইংরেজীর কিছু অংশ —"So far from science being irreligious,

হ্রাস করে—এ সকল অতি অযৌক্তিক কথা। মনে করুন, একজন গ্রন্থকারকে সকলে প্রশংসা করিতেছে, শব্দসাগর মন্থন করিয়া, সুমিষ্টতাগন্ধ নিষ্কাশন করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার পুস্তকের এক পঙ্‌ক্তিও পাঠ করে নাই। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে উচ্চতম দৃষ্টান্তে উঠা যাউক। বিশ্বপতির অখণ্ড ঐশ্বর্যের এক কণামাত্রও যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের প্রশংসা অধিক গ্রাহ্য—না, যাঁহারা বিজ্ঞান লইয়া দিবারাত্র তাঁহার মহিমা-অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রশংসা হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগ হইতে উঠে? শুদ্ধ ইহাই নহে; বৈজ্ঞানিকই যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে সমর্থ, তাহা নহে, দিবানিশি নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, তাহাদের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, অসীম দয়াভাব, অথচ অপ্রতিহত অবশ্যম্ভাবী ফল চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক সুকার্য-কুকার্যের ফল অনিবার্য বলিয়া অপেক্ষা করে, অথচ সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিতেছে, তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। বিশেষতঃ এই অনন্ত দুর্ভেদ্য জগতের মধ্যে 'আমরা কে এবং অগণ্য সত্তা-পূর্ণ জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধই বা কি, বিজ্ঞান ইহাও স্থির করে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচেতনায় বিশ্বরহস্যের যে বিস্ময়বোধ পাশ্চাত্য-মানসে দেখা দিয়েছিল, স্পেন্সারের চিন্তাধারায় তার সুন্দর সাক্ষ্য। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত কবিত্ব ও বিশ্বস্রষ্টার উপস্থিতির অনুভবে স্পেন্সার অনেক পরিমাণেই তরুণ নরেন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানই পরম-সত্যলাভের একমাত্র পন্থা নয়—নানা পন্থার অন্যতম পন্থামাত্র। যাঁরা বিজ্ঞানের অত শত খুঁটিনাটি তথ্যের খবর রাখেন না, তাঁরাও সৌন্দর্যবোধ, ভক্তিতন্ময়তা ও শিল্প-দৃষ্টির সহায়তায় অনন্ত সত্যের জগতে উপনীত হ'তে পারেন। যেটুকু বস্তুজ্ঞান মানুষের প্রয়োজন তার জন্য সকলেরই বৈজ্ঞানিক হবার প্রয়োজন নেই, বিজ্ঞানের

as many think, it is the neglect of science that is irreligious—it is the refusal to study the surrounding that is irreligious. Suppose, a writer was daily saluted with praises couched in superlative language. Suppose the wisdom, the grandeur, the beauty of his works, were the constant topics of the eulogies addressed to him. Suppose those who unceasingly uttered those eulogies on his works were content with looking at the outsides of them; and had never opened them, much less tried to understand them. What value should we put upon their praises? What should we think of their sincerity! Yet, comparing small things to great, such is the conduct of mankind in general, in reference to the universe and its cause......

Education : Spencer : 1st Edn. : pp 50-51

সাধারণ সূত্রগুলি জানাই তার পক্ষে যথেষ্ট। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনেক পরিমাণে জেনেও বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ যে সবসময় ঘটে না, তার প্রচুর দৃষ্টান্তই এদেশে ওদেশে মেলে। মানব-অন্তরের গভীরতম উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সামান্য পরিমাণে বহিরঙ্গ দিক নির্দেশ করতে পারলেও, অধ্যাত্মসাধনার যুগযুগান্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার তুলনায় তা কিছুই নয়।

বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন স্পেন্সার যে মূলতঃ ভক্ত, সে কথা বোঝা যায় ঈশ্বরের অসীম দয়া ও সব কিছু যে মঙ্গলের জন্য ঘটছে —এই বিশ্বাস তিনি বিজ্ঞানচর্চা থেকেই লাভ করেছেন। এক্ষেত্রে জ্ঞানের উপরে জয়ী হয়েছে তাঁর ভক্তি।

'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' —এ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে জীবনোপযোগী শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে আদিম নরনারীর মতোই বসনের অপেক্ষা ভূষণের বেশী পক্ষপাতী, সেকথা বোঝাতে গিয়ে স্পেন্সার যা বলেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ —"সমুদ্র-যাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া-অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং কামিজ অথবা কোর্তার তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।"[১]

মূল গ্রন্থের ভাষা—"Voyagers find that coloured beads and trinklets are much more prized by wild tribes, than are calicoes or broadclothes. And the anecdotes we have of the ways in which, when shirts and clothes are given, savages turn them to some ludicrous display, show how completely the idea of ornament predominates over that of use."[২]

'শিক্ষা' সম্বন্ধে এই ব্যবহারিক ও আলঙ্কারিক প্রয়োজনের তুলনামূলক চিন্তার দৃষ্টান্ত অবশ্য আমরা রাজা রামমোহনের চিন্তাধারাতে এর আগেই পাই। রামমোহন এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন বেকনের দ্বারা। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর

১. শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ; বসুমতী সংস্করণ (মুদ্রাকর: শ্রীশশিভূষণ দত্ত) পৃ: ২। এ পর্যন্ত 'শিক্ষা' বইটির যে কটি মুদ্রিতরূপ হাতের কাছে পেয়েছি, তার কোনটিতেই প্রকাশের তারিখ নেই এবং বইটি যে মৌলিক রচনা নয়, অনুবাদ সে কথাও উল্লিখিত নেই। অবশ্য বিবেকানন্দ-জীবনী-পাঠকদের কাছে এ অনুবাদের কথা সুবিদিত। যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, এ গ্রন্থ কখনো অনুবাদরূপে এর আগে পরিচায়িত হয়েছিল কি না।

২. Education : Intellectual, Moral and Physical by Herbert Spencer; 1861, Edition [First Edition]; p. 1.

তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এই বিখ্যাত পত্রটি আধুনিক ভারতের শিক্ষা-চিন্তার ইতিহাসে অন্যতম দিক-নির্দেশক। তদানীন্তন সরকার বহু অর্থ ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ-স্থাপনে উদ্যোগী হলে রামমোহন সংস্কৃত-শিক্ষার উপকারিতার কথা জেনেও আধুনিক কালের সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিচিত করবার জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবী জানিয়েছিলেন লর্ড আমহার্স্টের কাছে। প্রাসঙ্গিকবোধে রামমোহনের এই পত্রটির অংশবিশেষ উধৃত করছি[১] —"দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে সারাদেশে অনুসৃত ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রসারের জন্যই সরকার এখন হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয়-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি (লর্ড বেকনের আগেকার আমলের ইউরোপীয় শিক্ষায়তনগুলির মতো) তরুণদের শুধু কেবল ব্যাকরণ ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চর্চা ও বিচারের দিকেই নিয়ে যাবে যে ধরনের শিক্ষা তাদের নিজেদের বা সমাজের বিশেষ কোনো কাজেই লাগবে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত—দু'হাজার বছর আগেকার লব্ধ বিদ্যা এবং অর্থহীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের টীকাভাষ্যের ধারা—এই জাতীয় বিদ্যাই ছাত্রেরা সেখানে (সংস্কৃত কলেজে) পাবে।"

বলা বাহুল্য, রামমোহন নিজে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বলেই শাস্ত্র-অনুবাদ ও শাস্ত্র-বিচারে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছিলেন। তবু সংস্কৃতে আবদ্ধ প্রাচীন জ্ঞানের ধারা ও পদ্ধতি—এ দুয়ের সম্বন্ধেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। সমকালীন য়ুরোপের তরুণেরা গণিত, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে দক্ষতা অর্জন করতো, রামমোহন তাঁর স্বদেশীয় তরুণদের মধ্যে সেই প্রয়োজনমূলক শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং ইংরেজ সরকার যেন শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্যই প্রধানতঃ অর্থব্যয় করেন—এই ছিল রামমোহনের আকাঙ্ক্ষা।

বেকনের যুগ থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই আধুনিক যুগের সূচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, স্বামীজীর জন্মের প্রায় দু'বছর (মে, ১৮৬১) আগে লণ্ডনে বসে হার্বার্ট স্পেন্সার শিক্ষাপ্রসঙ্গে যে চিন্তারাশি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা বেকনের চিন্তাধারারই পরিণত ফল। এর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। স্পেন্সারের পরিকল্পিত বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার অবশ্য ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাতেও ঠিক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হয়নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রেরণা ইংল্যাণ্ডের মারফত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে অনেক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু কলেজের

১. মূল পত্রটির জন্য The Life and Letters of Raja Rammohan Roy : Sophia Dobson Collet [সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্করণ, ১৯৬২] পৃঃ ৪৫৬ দ্রষ্টব্য। অনুবাদ লেখককৃত।

প্রথম যুগের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্তের কথা আমাদের বিজ্ঞানচিন্তার ইতিহাসে সুবিদিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নলগ্নে বিজ্ঞান-চেতনার প্রসারিত পটভূমিকায় হার্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানকেই জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় ও যথার্থ শিক্ষার বিষয় মনে করেছেন। জীবনধারণ ও জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার দ্বারা স্পেন্সার যে সিদ্ধান্তে উপনীত, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ—"দেখিলাম, আমরা যাহা নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে প্রশ্নের সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর আসিল—বিজ্ঞান। যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি সমাজের একটি প্রকৃত অঙ্গ হইতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি জীবিকানির্বাহরূপে অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি প্রাণ-বিমোহন সঙ্গীত-শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান।"[১]

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থ 'Education'-এর ভাষা—"Thus to the question we set out with—what knowledge is of most worth ?—the uniform reply is—Science. This is the verdict on all the counts. For direct self-preservation, on the maintenence of life and health, the all important knowledge is—Science. For that indirect self-preservation which we call gaining a livelihood, the knowledge of greatest value is—Science. For the due discharge of parental functions, the proper guidance is to be found only in—Science. For that interpretation of national life, past and present, without which the citizen cannot rightly regulate his conduct, the indispensable key is—Science. Alike for the most perfect production and highest enjoyment of art in all its forms, the needful preparation is still—Science. And for the purpose of discipline—intellectual, moral, religious—the most efficient study is, once more—Science."[২]

মূল ইংরাজীর সঙ্গে স্বামীজীর অনুবাদ মেলালেই দেখা যাবে প্রয়োজনবোধে স্বামীজী স্পেন্সারের বক্তব্যকে সংক্ষেপিত করেছেন। আবার স্পেন্সারের ভাষাভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা, উপস্থাপনা ও গতিবেগ—এ সবই স্বামীজীর গদ্যভঙ্গীতে যথাযথভাবে রূপায়িত। দার্শনিক বক্তব্যের অনুবাদে স্বামীজীর এই নৈপুণ্য তাঁর অনুবাদকালীন বয়ঃসীমার কথা মনে রাখলে বিস্ময়কর বৈ কি ! সেই সঙ্গে এও বলা চলে যে, ভাষার

১. 'শিক্ষা' : পৃঃ ৪৫
২. 'Education' : Herbert Spencer : p. 53

সামান্য পরিবর্তনেই আধুনিক পাঠকের কাছে আর এ অনুবাদকে খুব দূরের জিনিস বলে মনে হবে না। স্বামীজীর নিজস্ব ভাষাভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাসে এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। আবার পরবর্তীকালে মননশীল গদ্যরীতির প্রবর্তনায় স্বামীজীর নৈপুণ্য যে স্বাভাবিক, এই অনুবাদের স্বচ্ছতা ও গভীরতা তার ইঙ্গিতবহ।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এই 'শিক্ষা'-গ্রন্থটির যে সংস্করণটি আছে, তা জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসারে ১৯১৭ সালের। বইয়ের সূচনায় বা অন্য কোথাও কোনো তারিখ নেই। যদি প্রথম সংস্করণ হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় প্রথম থেকেই বইটি যে অনুবাদ সেকথা বলা হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর জীবিতকালে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে এমন অনুল্লেখ অসম্ভব। বিশেষতঃ স্বামীজী যখন স্পেন্সারের লিখিত অনুমতি নিয়েই এ অনুবাদ করেন। তাই মনে হয়, জাতীয় গ্রন্থাগারের বইটি পরবর্তী কোনো সংস্করণ। গ্রন্থাগারের তালিকায় উল্লেখিত '১৯১৭' —বইটি গ্রন্থাগারের তালিকাভুক্ত হওয়ার কাল এবং ঐ বৎসরে প্রকাশিত সংস্করণ হতে পারে॥

আধুনিক শিক্ষাচিন্তার জগতে এই বইটির বিশেষ গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেই স্বামীজী অনুবাদব্রতী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামীজীর চিন্তায় নারী-মুক্তি প্রসঙ্গ

"শাক্ত মানে—যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। ······যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

নারীজাতি ও বিবেকানন্দ

আশাপূর্ণা দেবী

'—মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালে পারিবেও না'। নারীজাতি সম্পর্কে এই সশ্রদ্ধ ও সতেজ উক্তি যুগমানব বিবেকানন্দের!

ভাবপ্রবণতার 'মৌখিক পূজো' বা শুধু নারীকে 'দেবী দেবী' বলেই কর্তব্য সমাধা নয়, জাতীয় জীবনে নারীর যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা রক্ষাকেই তিনি পূজো আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, যে দেশে মেয়েদের সম্পর্কে সম্যক মর্যাদাবোধ নেই, সে দেশ যথার্থ বড় বলে গণ্য হতে পারে না।

বিশ্বাস করতেন অথবা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই স্বামীজী অবিরত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশের মেয়েদের অবস্থার তুলনা করেছেন এবং দুই দেশেরই সমাজ-ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনা করে তাদের কোন্‌খানে ত্রুটি, কোন্‌খানে অন্যায়, তা' সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সব সমালোচনায় একদেশদর্শিতার প্রকাশ নেই। একই প্রবন্ধের মধ্যে দেখা যায় স্বামীজী বলছেন, 'এখানে বালবিধবার অশ্রুপাতে ধরিত্রী আর্দ্র হয়, পাশ্চাত্য দেশের বায়ু অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘশ্বাসে বিষাক্ত হয়। ...পাশ্চাত্যের মেয়েরা কেমন স্বাধীন, সকল কার্য ইহারাই করে। স্কুল, কলেজগুলি মেয়েতে ভরা, আর আমাদের পোড়া দেশে? মেয়েদের পথে পর্যন্ত চলিবার জো নাই'। ...আবার তার সঙ্গে এও বলেছেন, 'পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রী-শক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে মাত্র স্ত্রী-শক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ভারতের একটি সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারীশক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। প্রাচ্য পরিবারে মাতা কর্ত্রী, স্ত্রী অবহেলিতা, পাশ্চাত্য পরিবারে স্ত্রী কর্ত্রী, জননী উপেক্ষিতা'।

এই যে তুলনা, এর মধ্যেই রয়েছে মেয়েদের প্রতি তাঁর দরদের একান্ত আকুলতা। কোন ব্যবস্থাটিই তাঁর কাছে 'নির্ভুল' বলে মনঃপূত হয় নি। যেন দু'টি ভাবধারার সংস্কার-সাধন ও সামঞ্জস্য-বিধান করে, তিনি এক নতুন জীবনের দরজা খুলে দিতে চান।

কালক্রমে প্রাচ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানে অবরোধের দুঃখ, অধিকারহীনতার গ্লানি, সমাজব্যবস্থার শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে মেয়েরা, কিন্তু এও অস্বীকার করা যায় না, তার সঙ্গে প্রাচীন প্রাচ্যের ভাবধারার সংমিশ্রণ হচ্ছে না। একটা পরানুকরণের ছাঁচ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কে জানে এই ছাঁচটি এদেশের মেয়েদের যথার্থ কল্যাণসাধন করছে কিনা।

স্বামীজী এই ছাঁচটি চাননি। তিনি সামঞ্জস্যের মধ্যে কল্যাণ অন্বেষণ করেছিলেন।

কী এদেশ, কী ওদেশ, তাঁর কাছে তারতম্য নেই। তাঁর কাছে মেয়েরা মাত্রেই 'মা জগদম্বার জাত'। তাই পাশ্চাত্য মেয়ের কর্মক্ষমতা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, 'ইহারা সাক্ষাৎ জগদম্বা এই রকম মা জগদম্বা যদি আমাদের দেশে এক হাজার তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিত হইয়া মরিব'।

মহাপুরুষের সেই ইচ্ছার অঙ্কুর, সময়ের বাতাসে আর প্রয়োজনের জল সিঞ্চনে লক্ষশাখা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। 'মাত্র একটি হাজার' নয়, আজ ভারতের হাজার হাজার মেয়ে শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মে উদ্দীপনায়, সর্বোপরি সাহসিকতায়, স্বামীজীর ভাষায় 'মা জগদম্বা'র রূপ লাভ করেছেন, আর সন্দেহ নেই কোনও এক ঊর্ধ্বলোক থেকে তাঁদের মাথার উপর দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এ' যাত্রায় প্রথম যাত্রার সেই 'ইচ্ছার ইতিহাসটি' যেন আমরা না ভুলি। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে সমগ্র নারীসমাজের যা' ঋণ তা' যেন স্বীকার করতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি তিনি মেয়েদের কী মহৎ উপকার সাধন করে গেছেন।

আজকের যুগের উচ্চশিক্ষা মেয়েদের জাগতিক ও সামাজিক বহুবিধ উন্নতি এনে দিয়েছে। চিত্তের জড়তা ও চিন্তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে মেয়েরা আজ গৃহগণ্ডী অতিক্রম করে নিজেদেরকে বৃহৎ বিশ্বের পটভূমিকায় দেখতে শিখেছে। কিন্তু নবলব্ধ এই শিক্ষা আর শক্তি যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে মেয়েদেরই।

বিশ্বের কর্মযজ্ঞে নারীর ভূমিকা কিছু কম প্রধান হলেও, জীবনযজ্ঞে তার ভূমিকা পুরুষের চেয়ে বেশী বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় চরিত্রের নিরিখ কসতে গেলে নারীকেই সে-চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলা সঙ্গত। যে দেশে নারীচরিত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়, সে দেশের ক্ষয় অনিবার্য।

হয়তো এই দুর্বলতা সহসা ধরা পড়ে না। পুরানো ব্যবস্থার নৈতিক মানকে 'কুসংস্কার' বলে বোধ হয়, অবনতির লক্ষণগুলিই আধুনিকতা বলে গণ্য হয়, আর সেই অসাবধানতার সুযোগেই জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরে। এ' যুগে অনেক তথাকথিত সভ্যদেশের মধ্যে দেখা দিয়েছে এই ক্ষয়রোগের বীজ। ভেঙে যাচ্ছে গৃহ, ভেঙে যাচ্ছে পরিবার, ভেঙে যাচ্ছে প্রেমের বিশ্বস্ততা। মানুষ শান্তিহীনতার এক তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে লোভের পথে, বাসনার পথে, অধিকতর ভোগের পথে, বৃথা শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ এই ভোগলিপ্সার উন্মত্ততা আর হতাশার যন্ত্রণা। তিক্ততা আর হতাশা, এ' যুগে টি. বি. ক্যানসারের মতই একটা মারাত্মক ব্যাধি। আজকের কাব্য, আজকের সাহিত্য, আজকের শিল্প, এই ব্যাধির যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

আজকের অন্বেষায় সুন্দরের সাধনা হাস্যকর—অসুন্দরের মধ্যে, বিকৃতির মধ্যে, বীভৎসতার মধ্যে, এ' যুগের সত্য-অন্বেষণ।

ভারতবর্ষও কি এ' ব্যাধিকে আদর করে নিজের ঘরে ডেকে আনবে? তথাকথিত এই সভ্যতার পরিণাম দেখে সতর্ক হয়ে নিজের ভাঁড়ারের সম্বলটি কাজে লাগিয়ে বেঁচে ওঠার চেষ্টা করবে না? অপরের গড়া সেই 'ছাঁচে'র হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেবে?

সত্য বটে আধুনিকতার অতিচাকচিক্য আর জড়বিজ্ঞানের সীমাহীন সাফল্য আজ মানুষমাত্রকেই বিভ্রান্ত করে তুলেছে। কিন্তু এই বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার হতে না পারলে 'মানুষ' এর ধ্বংস অনিবার্য, মণীষারও পরিসমাপ্তি। এই উদ্ধার চিন্তায় এগিয়ে আসতে হলে:আসতে হবে আগে মেয়েদেরই।

বিদেশ থেকে আমদানি এক যান্ত্রিক সাম্যবাদের ধুয়োকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে না থেকে তাকিয়ে দেখতে হবে ভারতবর্ষের মাটিতেও সাম্যবাদের বনেদ আছে কিনা। দীর্ঘ অতীতের পরিপ্রেক্ষিতকে যদি নাও ধরা হয়, বর্তমানই কি নিষ্ফলা? মানুষে মানুষে বিভেদহীন এক অখণ্ড সাম্যের বাণী প্রচার করেননি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী? সুদীর্ঘ কালের ভুল শাস্ত্রব্যাখ্যা আর সমাজপতিদের স্বার্থান্ধ মূঢ়তায়, সমাজের স্তরে স্তরে যে গ্লানি জমে উঠেছিল, তাকে সবলে দূর করতে স্বামীজী এসেছেন এগিয়ে। উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন, 'হে ভারত ভুলিও না, ভারতবাসী তোমার ভাই! ···ভুলিও না মুচি মেথর চণ্ডাল শূদ্র······তোমার রক্ত'।

আজকের দিনে সেই শ্রেণী কৌলিন্যের দাঁত হয়তো তেমন আর নেই। কিন্তু সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে আর এক কৌলিন্য। জাতির মর্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনা না এলে, শুভবোধের সৃষ্টি না হলে, কেবলমাত্র যান্ত্রিক নিয়মের সাম্যবাদ কি সে সমস্যা দূর করে স্থায়ী কল্যাণ এনে দিতে পারবে?

কিন্তু সেকথা যাক। আমার আলোচনা বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে।

অস্বীকার করা যায় না, অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের অসন্তোষ, মেয়েদের অসহিষ্ণুতা, মেয়েদের বিলাস-বাসনা, পুরুষকে উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষার পথে ঠেলে নিয়ে যায়। শ্রেয়কে ত্যাগ করে প্রেয়কেই আঁকড়ে ধরে কেবলমাত্র জড়বস্তুর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে গেলে এমনই হয়। এক্ষেত্রে মেয়েদের কল্যাণ বুদ্ধি সজাগ হলে হয়তো দেশের লোভ আর দুর্নীতি কিছু কমতে পারে। কৃত্রিমতা আর পরাণুকরণ স্পৃহা কেবল লোভেরই প্রসার ঘটায়।

অবশ্য স্বামীজী কোনদিনই জাতিকে নিছক ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনের পথ দেখিয়ে দেন নি। তাঁর 'উন্নতি'র ধারণা ছিল সুস্থ। তাই তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ভোগে আনন্দে সৌন্দর্যে বীর্যে পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ এক জাতির। তাঁর মতে তুষ্টির মধ্যে পুষ্টি, শোভার মধ্যেই শুভ, শক্তির মধ্যেই সত্য। কিন্তু প্রতিমার

মধ্যে কাঠামোর মত ভোগের মধ্যেও যেন একটি আদর্শ থাকে। একটি সংযমের রুচি থাকে। সেই আদর্শের জন্য, সেই রুচির জন্য ভারতকে কারো দ্বারস্থ হতে হবে না। সে বস্তু ভারতের ভাঁড়ারে আছে।

একথা ঠিক, নতুন কাল আসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে —নতুন বিচার নিয়ে —নতুন মতবাদ নিয়ে, তবু মানবধর্মের এমন একটি মূলভিত্তি আছে, যেটা সর্বকালের - সর্বদেশের।

দয়া ক্ষমা ত্যাগ সহিষ্ণুতা উদারতা সহমর্মিতা সততা বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানবধর্মের বৃত্তিগুলি কোনও দেশে, কোনও কালে বা কোনও মতবাদেই অবহেলিত নয়। যে দেশের সমাজব্যবস্থা যেমনই হোক বা রীতি-নীতি আচার-আচরণ যেমনই অদ্ভূত হোক, সে' ব্যবস্থা মানবধর্মের এই মূলভিত্তিগুলির উপরেই গঠিত। বিকৃতি যদি দেখা দেয়, সেটা গঠনের দোষ নয়, পরবর্তীকালের মূর্খতার দোষ।

স্বামীজী সেই মূর্খতাকে দূর করতে হাত বাড়িয়েছিলেন। কল্পনা করেছিলেন সেই মানুষকে বিশেষ করে সেই মেয়েকে, যে মেয়ে মানবধর্মের এই মূল গুণগুলির সঙ্গে যুগোপযোগী শিক্ষা, শক্তি, সাহস এবং দৃঢ়তা নিয়ে বৃহৎ বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবে। তাই তাঁর ভিতরে দেখা গিয়েছিল জীবন-জিজ্ঞাসার অত তীব্রতা।

স্বামীজী কল্পনা করেছেন —পশ্চিমের বিজ্ঞান আর প্রাচ্যের ধ্যান, পশ্চিমের কর্মশক্তি আর প্রাচ্যের ধর্মবোধ, এই দুইয়ের একটি সুস্থ মিলন। যেন উভয় ধারার প্রেম-বিবাহ। সেই বিবাহ-জাত সন্তানই হবে ভাবী পৃথিবীর মানুষের মত 'মানুষ'। কিন্তু মানুষগড়ার প্রথম ভিত্তি তো মেয়েদের হাতেই। তাই তিনি যেমন প্রাচ্যের মেয়েকে পাশ্চাত্যের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করতে বলেছেন, তেমনি পাশ্চাত্যের মেয়েকেও অনুধাবন করতে বলেছেন প্রাচ্যের ভাব, ধারণা ও আদর্শকে। এক কথায় এই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী সংসারী মানুষদের চেয়ে অনেক বেশী করে ভেবেছেন মেয়েদের জন্যে। মেয়েদের সর্ববিধ উন্নতি ব্যতীত যে দেশের উন্নতি অসম্ভব, সেকথা উপলব্ধি করেছেন অন্তর দিয়ে।

মহামানবরা এইভাবেই দেখেন, চিন্তানায়করা এমনি দৃষ্টি দিয়েই চিন্তা করেন, কিন্তু, স্বামীজীর মত এমন মেয়েদের 'জ্যান্ত জগদম্বা' রূপে দেখতে ক'জন পেরেছেন ; ক'জন তাঁর মত বলতে পেরেছেন, "নারীদিগের সম্পর্কে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। ···নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে ; তাহাদের হইয়া অপর কাহারও এ' কার্য করিতে যাওয়ার প্রয়োজনও নাই, উচিতও নয়। ···নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে ?"

মেয়েদের উপর এই আস্থা, এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধা, আর কোথায় দেখতে পাওয়া যায় ? এদেশে নারীকে 'দেবী' বলে আসা হয়েছে, নারী 'মাতৃশক্তি' বলে স্বীকৃত

হয়েছে, তথাপি তাদের জন্য বিধিনিষেধের আর অন্ত নেই। তাদের প্রতি 'নাবালক তুল্য' মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। 'স্ত্রী শিশু' সমগোত্র। তাদের জন্য যদি কিছু করতেই হয় তো করুণা কর।

"তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?" এমন উদার বাণী দুর্লভ। নারীর মোহিনীশক্তির পূজক যে দেশগুলি 'শিভ্যালরি'-র মাধ্যমে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাদের চিন্তার মধ্যেও এই আস্থা ও বিশ্বাস সচরাচর দেখা যায় না। অনেকের চিন্তায় নারীকে 'ভোগ্য' ভাবা নিন্দনীয়, কিন্তু 'পোষ্য' ভাবা নিন্দনীয় নয়। স্বামীজীর মতে সেটাও নিন্দনীয়। সেটাও কিছু মেয়েদের মর্যাদাবৃদ্ধিকর নয়। ওটাও একপ্রকার অপমান।

আজকের মেয়েরা যে ক্রমশঃ আত্ম-মোহিনীমায়া-মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে পুরুষের আদরণীয় পোষ্য হিসেবে দেখতে লজ্জা বোধ করছে, 'কটাক্ষ'-এর চেয়ে 'কর্মদক্ষতা'-কেই জয়ের অস্ত্র বলে গণ্য করছে, পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়া হওয়ার থেকে 'শ্রদ্ধেয়া' হওয়াকে অনেক বেশী মূল্য দিতে শিখেছে, তার মূলে স্বামীজীর বাণী, চিন্তা ও চেষ্টার অবদান বড় কম নয়।

হয়তো নারীসমাজের সর্বস্তরে এই ভাবের সঞ্চার হতে এখনো অনেক দেরী আছে, 'আধুনিকতার' ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত অনেক মেয়েই এখনো পুরুষের সঙ্গে সমান বিদ্যা অর্জন করে কর্মক্ষেত্রে নেমেও কর্মদক্ষতার থেকে কটাক্ষতেই অধিক বিশ্বাসী, কাজ করে ওপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করার চাইতে সাজ করে মনোরঞ্জন করার দিকেই ঝোঁক প্রবল, তবু মনে হয়—হয়তো ভারতের মাটিতে এ' ভাব চিরস্থায়ী হতে পারবে না। কোন্‌টি মহৎ, কোন্‌টি শ্রেয়, কোন্‌টি সুন্দর, কোন্‌টি শোভন, সেটি চিনে নেবার 'বোধ' ভারতের আছে। তাই আশা করা যায় শক্তিরূপা নারীর অভ্যুত্থান ভারতে সুদূরে নয়। স্বামীজী যে শক্তিরূপার ভাব সাধক, পরিকল্পনাকার, সেই ভাবটি কোথায় ছিল? কোথায় ছিল তার ভাষা?

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে এক পাগলা ঠাকুরের সহধর্মিণী অবগুণ্ঠনের আড়ালে নিজেকে আবৃত করে আপন মহিমাকে রেখেছেন আড়াল করে, দামাল ছেলে খুলে ধরলেন মায়ের সেই অবগুণ্ঠন, সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন জ্যান্ত জগদম্বা দেখবি তো আয়, বললেন, 'এই ভাব এই ভাষ্য। মন্ত্র দিলেন এক মহিমময়ী, বিদেশিনী ভগিনীকে, দেশকে বললেন, দ্যাখ, ভাব আর কর্মের মিলন। দ্যাখ, শেখ, হ। শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের নারী জাতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী, 'দ্যাখ, শেখ, হ'।

অনন্তকাল ধরে জগতে কোটি কোটি মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে, তার মধ্যে ক'জনের ভিতর থাকে, 'স্মরণীয়' হয়ে থাকবার মত উপাদান?

বেশী থাকে না। কোটিতে এক। শত সহস্র কোটিতে এক।

কিন্তু স্মরণীয়কে স্মরণ করবার শুভবোধটুকু মানুষের মজ্জাগত। তাই কোনও স্মরণীয় চরিত্রকেই সে সহজে হারায় না। আকাশের নক্ষত্রগুলির মতই তার স্মরণাকাশে

জ্বল জ্বল করে স্মরণাতীতকালের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি। কত সহস্র বৎসরের ঝড়ঝাপটা সয়েও সেগুলি অক্ষয় হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের একশো পঁচিশ জন্মশতবার্ষিকী সুরু হয়েছে। হাজার হাজার বছরের উজান ঠেলে সে-উৎসব পেঁছবে দূরকালের পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কাল যেন বলতে না পারে 'তাঁর কাল শুধু তাঁর ঋণ স্বীকারই করেছিল, ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেনি।......তাঁর বলিষ্ঠ মহৎ বাণীগুলি ফ্রেমে বাঁধিয়ে শুধু ঘরের দেয়ালেই টাঙিয়ে রেখেছিল, মনের দেয়ালে খোদাই করে নিতে পারেনি'।

নারীমুক্তির প্রশ্ন ও স্বামী বিবেকানন্দ

চিত্রা দেব

উনিশ শতকে এদেশে নবজাগরণের সূচনা হবার অনেক আগে থেকেই নারীদের সামাজিক মর্যাদা শোচনীয়ভাবে ক্ষুন্ন হয়েছিল। ছোট বড় নানারকম সামাজিক অত্যাচার ও বিধিনিষেধের পাকে পাকে নারীর জীবন-বিকাশের স্বাভাবিক পথটি রুদ্ধ হয়ে আসায় বাঙালী সমাজে, শুধু বাঙালী সমাজে কেন, ভারতের সর্বত্র নারীর অবস্থাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে করুণ। তাই দেখা যাবে, উনিশ শতকীয় সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল কথাই ছিল নারীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, নারী প্রগতি ও সামাজিক বিধিনিষেধের পরিবর্তন—প্রধানত এই তিনটি ধারায় নারী-দরদী সমাজ সংস্কারকেরা কাজ শুরু করেছিলেন। যদিও যথার্থ স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠু ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। একথা বলছি এইজন্যে যে, নারীর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গে নারীমুক্তি বা স্ত্রীস্বাধীনতার ধারণাকে অনেক সময় মিলিয়ে ফেলা হত—বাস্তবে এ দুটি এক নয়।

এদেশের নারীপ্রগতি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে ব্রাহ্ম-সমাজকে। রাজা রামমোহন রায়ের সহানুভূতি ও চেষ্টাও ছিল আন্তরিক। হিন্দু-সমাজও পুরোপুরি নিশ্চেষ্ট ছিল তা নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু নারীহিতৈষী কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সমবেদনায় করুণ হয়ে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, স্ত্রী শিক্ষার জন্যেও তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মদের চেষ্টা ছিল সমবেত চেষ্টা। তাঁরা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও যেমন উৎসাহী ছিলেন, তেমনি উৎসাহী ছিলেন বালবিধবাদের উদ্ধার ও পুনর্বিবাহ দানের ক্ষেত্রে। বহু ব্রাহ্মযুবক শুধুমাত্র কর্তব্যানুরোধে বিধবা বিবাহ করেছিলেন। অপরদিকে অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের বহির্জগতের সঙ্গে আংশিক পরিচিতিলাভের সুযোগও দিয়েছিলেন ব্রাহ্মরাই। শুধু তাই নয়, নারীদের কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত তা নিয়েও তাঁরা বহু চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

প্রশ্ন জাগে, নারীসমাজের এই দুঃসহ পরিস্থিতিকে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন? তিনি কি নারীদের দুরবস্থা লক্ষ্য করে প্রতিকারকল্পে কিছু চিন্তা করেছিলেন? নারীজাগরণ ও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রসঙ্গেই বা তাঁর কি নির্দেশ ছিল?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, স্বামীজী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী,—তাই নারী সমাজের উন্নতি অবনতি তাঁর চিন্তার পরিধির মধ্যে থাকার কথা নয়। তাঁর চিন্তা ও প্রধানত পুরুষ কেন্দ্রিক। কিন্তু ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা নয়, বরং

স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কিত তৎকালীন যাবতীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে তাঁর মতামতই ছিল সবচেয়ে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ। কারণ তিনি, একমাত্র তিনিই, বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা কাকে বলে, সার্বিক নারীজাগরণ কিভাবে সম্ভব। বিষয়টি আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

এদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা বা নবজাগরণ সংক্রান্ত ধারণাটি গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক পরিচয়ের পরে। যদিও নারীদের অবস্থা তখন সব দিক থেকেই অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক, তবু কেউ কেউ এ বিষয়ে কিছু কিছু ভাবতে শুরু করেছিলেন। "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত লিখলেন, 'ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন অর্থাৎ সর্বত্র ভোজন, সর্বত্র গমন, সকলের সহিত কথোপকথন করুন কিন্তু আমরা এইক্ষণে সম্পূর্ণ বিপক্ষে আছি। যেহেতু অগ্রে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজরোপণ হউক এবং তাঁহাদিগের চিত্ত দুষ্কর্মের প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হউক তবে স্বাধীনতার চেষ্টা করিব নতুবা তদ্দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট ঘটনের সম্ভাবনা নাই"।

প্রায় একই ধরনের মত প্রকাশ করেছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ঈশানচন্দ্র বসু। তিনি নারীদের আর একটু স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী। তিনি বলছেন, "আমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া সতীলক্ষ্মীর ন্যায় স্বামীর বামপার্শ্ব শোভান্বিত করেন, তাহাই বা কেন অবাঞ্ছিত হইবে। কিন্তু যথেচ্ছাচারের সহিত আমাদের সম্মুখ সংগ্রাম। তিনি আরও বললেন, "যথেচ্ছাচারিণী" না হইয়া যদি এদেশীয় স্ত্রীগণ যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহারা যাহা চান, তাহা করুন। কাহারও চক্ষে তাহা অসহনীয় হইবে না"।

'সোমপ্রকাশে'ও প্রায় একই কথা ভিন্নসুরে বলা হল অর্থাৎ "স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া কুলকামিনীগণ আপনাদিগের কুলমান রক্ষা করিতে কি সমর্থা? তাঁদের স্বাধীনতা দেবার সময় আজিও উপস্থিত হয় নাই অতএব এখন তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে অবশ্যই তাহাতে বিষময় ফল ফলিবে।"

এসময় 'বামাবোধিনী' পত্রিকাও দাবি করেছিল, সমাজের অগ্রগতি ও নারীজীবনের পূর্ণতার জন্য নারীদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এসব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকদের অনেকেই মনে করতেন, নারীদের প্রকাশ্য স্থানে গমন, পুরুষের সঙ্গে আলাপ ও সাংসারিক প্রয়োজনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়ার আর এক নাম স্ত্রীস্বাধীনতা বা নারীমুক্তি।

সম্ভবত এই জন্যেই নারীশিক্ষার ব্যাপারেও ব্রাহ্মরা সকলে একমত হতে পারেনি। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করে নারীশিক্ষা দিতে চাননি। তাঁদের মতে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 'বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা', হৃদয়প্রধান শিক্ষা নহে। অতএব এ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত নহে।" নারীকে

আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়াও তাঁরা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন? অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার কথাও ভাবেননি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও নারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। নব্যপন্থী শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি বাড়াবার জন্যে জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্স পড়াতে চেয়েছিলেন তখন কেশবচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ সকল পড়াইয়া কি হইবে?' একথা বলার কারণ নারীকে পুরুষের সমকক্ষ বলে এঁরা কেউ ভাবতে পারেননি। ব্যতিক্রম যে কেউ ছিলেন না তা নয়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে নারীদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রায় একটি স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রচনা করতে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে সোচ্চার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁদের মনেও এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। নব্য শিক্ষিতা নারীদের প্রাত্যহিক জীবনের যেসব সমস্যা সেগুলি নিয়েই তাঁরা ঝড় তুলেছিলেন বেশি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামী বিবেকানন্দের মনে এ সম্বন্ধে প্রথম থেকেই একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। একবার নারীজাতির অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, "না, কখনোই নহে। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারী-গণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতালাভে সমর্থ।"

স্বামীজীর অন্যান্য কার্যধারা বিশ্লেষণ না করেও শুধুমাত্র এই কথাটি থেকেই বোঝা যায় স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতখানি স্বচ্ছ ছিল। ভারতীয় নারীকে তিনি যথার্থ স্বাধীন ও জাগ্রত দেখতেই চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মত ছিল শুধু শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে পুরুষেরা নারীদের কিছুটা সাহায্য করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু নারীর মৌল সমস্যার প্রকৃতি নিরূপণ করে তার সমাধানের ভার পুরুষের না নেওয়াই ভাল, মেয়েরা তাদের নিজের ভাগ্য গড়বে। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, "পুরুষ নারীর জন্য যাহা করিয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। পুরুষেরা মেয়েদের ভাগ্যগঠনের ভার গ্রহণ করাতেই নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। একটি প্রারম্ভিক ভুল লইয়া আমি কাজ শুরু করিতে চাই না। একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে এবং শেষ অবধি বৃহৎ আকার ধারণ করিবে যে, উহাকে সংশোধন করা কঠিন হইয়া পড়িবে সুতরাং আমি যদি ভুল করিয়া পুরুষকে নারীর কর্মধারা নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, তাহা হইলে নারীরা কখনও এ নির্ভরতার ভার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। উহাই প্রথা হইয়া দাঁড়াইবে।"

এর পাশাপাশি পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলি স্মরণ করলেই দেখা যাবে, ব্রাহ্ম নেতাদের সাধু উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা থাকলেও তাঁর যথার্থ স্ত্রীস্বাধীনতা চাননি কিংবা বলা যায় তাঁরা এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। হয়তো তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতীয় নারী হবেন তদানীন্তন পাশ্চাত্য দেশীয়া নারীর প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু তাঁদের মনে থাকবে সনাতন হিন্দু নারীর পতিব্রত্যের আদর্শ, কোথাও যেন, না চেহারায় না চরিত্রে উগ্র বিদেশীয়ানা বড় হয়ে ওঠে। তাই যথেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচার, আত্মনির্ভরতা, শিক্ষা, পাঠ্যবিষয় নিয়ে এত সতর্কতা।

কিন্তু একে কি স্বাধীনতা বলে? নারীকে যদি পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয়—তাহলে তার জন্যে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেই বা কি হবে? এ যেন খাঁচার পাখিকে দাঁড়ে এনে বসানোর চেষ্টা। দাঁড়ের পাখির চারপাশটা খোলা কিন্তু নড়লে চড়লে পায়ের শেকলটি বন্দীদশার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

অপরদিকে স্বামীজী চেয়েছিলেন, নারীর সর্বপ্রকার শৃংখলমুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়। পাশ্চাত্য সমাজেও নারীরা এতটা স্বাধীনতা পাননি। স্বামীজীর নিজের ভাষায় "পাশ্চাত্যের নারীর ওপর আইনগত কড়াকড়ির অনেক বোঝা চেপে আছে। যা আমাদেরও চূড়ান্ত অজানা।" তাই নারী জাগরণের নাম করে পশ্চিমের অন্ধ অনুসরণকে যারা সমর্থন করে নারীদের উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিতেন, স্বামীজী তাঁদের কখনও সমর্থন করেননি।

তাহলে কি স্বামীজী রক্ষণশীলতাকেই মেনে নিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ভারতীয় নারীর সনাতন আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্য পালন প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক আচার-বিচারের পুনঃপ্রবর্তন? তা নয়। কারণ উনিশ-শতকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বাধীনতা সর্বাংশে খর্ব হয়েছিল। আসলে স্বামীজী যে ভারতীয় নারীর আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সে আদর্শ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। ভারতীয় নারীর দুরবস্থা শুরু হয়েছিল বৌদ্ধযুগের শেষপর্বে। হয়ত তার কারণও ছিল, কিন্তু বৈদিক হিন্দুধর্মে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। ব্রহ্মবাদিনী নারীরা রাজসভায় আসতেন, তপোবনের শিক্ষায় ছিল ছাত্রছাত্রীদের সমান অধিকার। তাই স্বামীজী ভারতীয় নারীর জন্যে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য রীতিনীতিকেই একমাত্র শিক্ষনীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি কোন নিষেধের বেড়ি পরাতে চাননি; শুধু বলেছিলেন, ভারতীর নারীর সব সমস্যার সমাধান সম্ভব শিক্ষা নামক শব্দের সেই মন্ত্রটির সাহায্যে। এবং প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে আসেনি জেনেও তিনি বলেননি উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় নারীর প্রয়োজন নেই। নারীর নষ্ট আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ ফিরিয়ে আনবার জন্যে ঠিক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা তিনি একজন পুরুষ হয়ে স্থির করতে চাননি বা নির্দিষ্ট কোন ছক বেঁধেও দেননি—সবটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন নারীদের নিজেদের ওপর।

ঠিক এমনই কথা তিনি বলেছিলেন, নারীদের নানাবিধ সমস্যার প্রসঙ্গে। বলেছিলেন, "লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে—আমি বিধবাদের সমস্যা সম্পর্কে কি মনে করি? ইহাতে আমার উত্তর এই—আমি কি বিধবা যে তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছ? আমি কি নারী যে আমাকে বারবার এই এই প্রশ্ন করা হয়? তুমি নারীদিগের সমস্যা সমাধান করিয়া দিবার কে? হাত সরাও। নারীদিগের সমস্যা নারীরা নিজেরাই সমাধান করিয়া লইবে।"

তবে স্বামীজী ভারতীয় নারীদের জন্য একেবারে কিছুই ভাবেননি তা নয়। তাদের হীনাবস্থা তাঁকে পীড়া দিত। শিক্ষার অভাব ও সংস্কারের বেড়ি যে ভারতের নারীসমাজকে কত অসহায় করে রেখেছে সেকথা তিনি আরও অনুভব করেছিলেন আমেরিকায় গিয়ে। শিক্ষিত এবং স্বাধীন মহিলাদের দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে হরিপদ মিত্রকে লিখেছিলেন, "এদের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার, হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ-প্রফেসার—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র।"

এ সময়েই তাঁর মনে সংকল্প জেগেছিল, 'এই রকম জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে, নিশ্চিত হয়ে মরব।'

অপর একটি পত্রে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে কয়েকটি কথা স্মরণে রেখে কাজ করতে বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল,

"জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুত্থান না হইলে সম্ভাবনা নাই; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী গুরুগ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাবপ্রচার।

সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চভাবাপন্ন নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।"

গৌরীমা যোগিনমা প্রমুখ সন্ন্যাসিনীদের নেতৃত্বে নারীদের জন্যে একটি মঠস্থাপনের চেষ্টাও স্বামীজী করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল শুধু অর্থ সাহায্য করা ছাড়া সেই মঠের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ থাকবে না। গুরুভ্রাতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না; তারা আপনারা সমস্ত করিবে; তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হইবে না।" অর্থাৎ মঠের সন্ন্যাসিনীদেরও তিনি কোন আদেশ দিতে চাননি। নিয়মাদি নারীরা নিজেরাই তৈরি করে নেবেন এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

তবে স্ত্রীমঠ নিয়ে স্বামীজী বহু চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। 'তাতে অবিবাহিত কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পারে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংশ্রব থাকবে না।'

মঠে শিক্ষা দেওয়া হবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, অল্পবিস্তর ইংরেজী। এছাড়া সেলাই, রান্না, গৃহকর্ম, শিশুপালন ছাড়াও শেখানো হবে জপ-ধ্যান পূজোপদ্ধতি। তাঁর মতে, 'এখন ধর্মকে সেণ্টার করে রেখে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করতে হবে।' খুব বাঁধাধরা নিয়ম না মেনে মেয়েরা যদি নতুন রূপে দেবতাকে কল্পনা করতে চায়—তাতেও স্বামীজী বাধা দেননি। বরং বলেছিলেন, কালীমূর্তি যে সর্বদা একই রকম থাকবে, তার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে বিভিন্ন নূতন ভাবে যাতে আঁকা যায় এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য মেয়েদের তোমরা উৎসাহিত কর। সরস্বতীর একশ রকম বিভিন্ন ভাব কল্পনা করা হোক্। তাদের ভাবগুলিকে অবলম্বন করে তারা ছবি আঁকুক, ছোট পটু-মূর্তি তৈরি করুক এবং রঙের কাজ করুক। কল্পনার ক্ষেত্রে নারীকে এতটা স্বাধীনতা দেবার কথা স্বামীজীর আগে কি ভেবেছিলেন কেউ ?

একই সঙ্গে স্বামীজী চেয়েছিলেন নারীরা আত্মনির্ভরশীলা হবে। সেজন্যও প্রয়োজন শিক্ষার। সরলাদেবীকে স্বামীজী একবার লিখেছিলেন, 'দরিদ্রের শিক্ষা অধিকাংশ শ্রুতির দ্বারাই হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। কেবল মুশকিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই, কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন।' কঠিন জেনেও স্বামীজী হাল ছেড়ে দেননি। নির্দেশ দিয়েছিলেন 'প্রাচীন শিল্পকলার পুনঃপ্রবর্তন কর। জমানো দুধ দিয়ে ফলের বিভিন্ন খাবার কিভাবে প্রস্তুত করা যায়, মেয়েদের সেসব শেখাও। সৌখিন রান্নাবান্না সেলাই-এর কাজ শেখাও। তাঁরা ছবি আঁকা, কাটার কাজ, কাগজ কেটে বিভিন্ন রকম জিনিস তৈরী করা, সোনা-রূপোর উপর সুন্দর কাজ করা ইত্যাদি শিখুক। লক্ষ্য রাখো—তারা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।'

একই সঙ্গে স্বামীজী নারীর আত্মসম্মান বোধ জাগাবার চেষ্টাতেও যে ব্যাপৃত ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে ইন্দুমতী মিত্রকে লেখা একখানি পত্রে ঃ

'তুমি ইন্দুমতী দাসী কেন লিখিয়াছ ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও দেবী লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে। তাপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস ? সকলেই হরির দাস, অতএব আপনাপন গোত্র নাম অর্থাৎ পতির নামের শেষ ভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা—ইন্দুমতী মিত্র।'

ভারতীয় নারীর শিক্ষা দীক্ষার কথা নানা ভাবে ভাবলেও স্বামীজী তাদের জন্যে একটি আদর্শ স্থানীয়া নারীকে খুঁজছিলেন যিনি অসামান্যা পরিচালনাশক্তি

নিয়ে নারীদের পথ দেখাতে পারবেন। এই ব্যাপারে তিনি যোগ্যতম মনে করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। আলমোড়া থেকে স্বামীজী তাঁকে লিখেছিলেন,

'তোমাকে খোলাখুলি বলছি এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাছে তোমার একটা বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য বিশেষতঃ ভারতের নারী-সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।'

সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সময় স্বামীজীকে বিধবাদের নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে না দেখলেও তিনি বাল্য বিবাহের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে সহসা কোন আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন। যদিও বাল্যবিবাহের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক ঘৃণা, স্বামী সারদানন্দকে একটি পত্রে লিখেছেন, 'বাল্যবিবাহকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।' এবং 'আমি দুঃখিত -অতি দুঃখিত যে ছোট ছোট মেয়ের বর যোগাড়ের ব্যাপারে আমি মোটেই নিজেকে জড়াতে পারব না।' শুধু তাই নয়—স্বামীজী নারীমঠের পরিকল্পনা তাঁর শিষ্যকে জানিয়ে বলেন 'ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না -এ নিয়ম রাখতে হবে।' স্বামীজী যখন এ মন্তব্য করেন অর্থাৎ ১৯০১ সালে শুধু বঙ্গদেশেই ৯৭,৫৬৫টি হিন্দু বালিকার বিবাহ হয়েছিল। এদের কারোরই বয়স পাঁচ বছর পেরোয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত শুনে তাঁর শিষ্য বলে-ছিলেন, 'সমাজে ঐ সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।' বরং তাঁর মতে নারীমঠের ছাত্রীরা আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকলেই সকলের আদর্শ হয়ে উঠতে পারেন। স্বামীজী তাঁর কথা মেনে নিতে পারেন নি। বলেছিলেন শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ভেবেচিন্তে নিজেরাই যা হয় করবে।' অর্থাৎ সেই একই কথা। নেত্রীর অভাবে নারীদের সাময়িকভাবে শিক্ষালাভে সাহায্য করা ছাড়া পুরুষ আর কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। 'কোন পুরুষ নারীর উপর হুকুম চালাইবে না। নারীও পুরুষের উপর কোন হুকুম চালাইবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন। যদি কোন বন্ধন থাকে, তবে তাহা কেবল প্রীতির বন্ধন।'

স্বামীজী নিজে কোথা থেকে নারী স্বাধীনতার উন্নত দৃষ্টান্ত পেয়েছিলেন সেকথাও জানাতে ভোলেননি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের নারী সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল কিন্তু তিনি নারীজাতির আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন সঙ্ঘজননী হয়েও শ্রীমা কখনও তাঁদের ওপর হুকুম চালান না।' তাঁর ত্যাগপূত আদর্শ জীবনচর্চা দেখেই স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যথার্থ স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ কি এবং ভারতীয় নারীকে তার আদর্শ খোঁজবার জন্য অন্য কোনদিকে তাকাতে হবে না। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী বা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেও তিনি

শ্রীমাকে আমাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন নারীর অধিকারবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করতে। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে নারীদেরই, নিজেদের প্রকৃত পথটিও চিনে নিতে হবে নিজেদের চেষ্টায়। অপরের হাত ধরে কখনও স্বাধীনভাবে চলা যায় না, চলার চেষ্টা করলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, নারী ও পুরুষের বাহ্য ভেদ থাকলেও স্বরূপত কোন ভেদ নেই। নারীও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারিনী হতে পারে। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র প্রতিনিধি প্রশ্ন করেছিলেন এদেশের নারীজাতির উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? স্বামীজী বলেছিলেন 'আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি নারীগণকেও ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস সহস্রগুণ বেশি আছে।'

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামীজীর বিজ্ঞান-চিন্তা

"স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন, ওই জড় জগতকে বুঝতে গেলে আমাদের বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেই হবে। আবার তেমনি চৈতন্যকে বুঝতে গেলে আমাদের অধিকতর গবেষণা ও ধ্যানের প্রয়োজন। সমস্যা-গুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না এই ভেবে যে, একদিন বিজ্ঞান এগুলির সমাধান করে দেবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বিজ্ঞান

রাজা রামান্না

আমার জীবনের প্রারম্ভে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা যে কতটা উপকৃত হয়েছি, তা কখনও ভুলতে পারব না। আমি যে প্রেরণা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি, তার খানিকটা যদি এই সম্মেলনের যুবকদের কাছে পেঁছে দিতে পারি, তাহলে এখানে আমার আসা সার্থক হল বলে আমি মনে করব।

'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' এই কথাটা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, এরকম মন্তব্য আমরা প্রায়ই শুনি। বস্তুতঃ এই কথার পিছনে যে চিন্তা তা কিন্তু বহুদিন আগের। এজন্যে যদি কাউকে সাধুবাদ জানাতে হয় তাহলে তা স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রাপ্য; কারণ তিনিই প্রথম জনসাধারণকে শেখালেন যে, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষ কোন কিছু চিন্তা করতেই পারে না, আর বিজ্ঞান দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র ভারতের উপর প্রভাবের কথা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। রবীন্দ্রনাথকেও সবাই শ্রদ্ধা করত ঠিক, তবে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি এত সূক্ষ্ম এবং এত প্রেমরসাত্মক যে, সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করতে পারত না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ এ দুজনের প্রভাবই ভারতের জাগরণকে সম্ভব করেছিল। তাঁদের উভয়ের মধ্যে যেমন আশা ও উদ্দীপনা, তেমনি বীর্যবত্তা ছিল। এ গুণগুলি দেশবাসীর মনে একটা স্থায়ী দাগ রেখে গেছে। তাঁদের প্রভাব যে এখনও বিদ্যমান তার প্রমাণ এই সমাবেশ। এই প্রসঙ্গে এটা বলা চলে, কলকাতা বলেই এই সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনতে সাধারণ মানুষের একটা অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এরকম সমাবেশ দেশের অন্যত্র সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

স্বামীজী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উপর যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি আধ্যাত্মিক বিকাশের উপরেও জোর দিয়েছেন। ঠিক একই সুরে সেদিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও এই কথা বললেন। বললেন, কালপারা কেন্দ্রে ফাস্ট ব্রীডার রি-অ্যাক্টর (Fast Breeder Reactor) যন্ত্রটিকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করার সময়। স্বামীজীকে দুটো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একটি হচ্ছে সেই যুগের দেশবাসীর চিন্তার জড়তা। আমরা দেখি, স্বামীজী দেশবাসীকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন: 'তোমরা তোমাদের উদরকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছ আর রান্নাঘর হচ্ছে সেই ঈশ্বরের পূজোর মন্দির। অপর সমস্যাটা ছিল খ্রীষ্টান মিশনারিদের হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ। তারা হিন্দুধর্মের মধ্যে ভাল কিছু খুঁজে পেত না। যত ভাবে পারে তারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করে আনন্দ পেত। তাই স্বামীজী দুঃখ করে

বলেছিলেন 'আমরা দরিদ্র, আমাদের প্রয়োজন রুটি, তোমরা রুটির পরিবর্তে আমাদের ইঁট দিয়েছ।'

স্বামীজী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান বস্তুবাদ ছাড়া আর কিছু জানত না। আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ান্টাম মেকানিকস (Quantum Mechanics) ইদানীং বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তা কিন্তু তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু স্বামীজী তখনই বুঝেছিলেন যে, এই বস্তুবাদ দিয়ে মানুষের কোন পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন হতে পারে না।

এতদিন পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্বচৈতন্য পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য চৈতন্যের কথা নেই, সেখানে দ্রষ্টার কথা আছে। কিন্তু কেউ যখন কিছু দেখে বা বলে, তা চৈতন্যের সাহায্যেই করে। 'চৈতন্য' শব্দটি কোয়ানটাম্ মেকানিক্স-এ খুব চলে, কিন্তু শব্দটির কি অর্থ তা কেউ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুঝিয়ে বলতে পারে না। এটা একটা মজার ব্যাপার যে, যেখানে সবকিছু গাণিতিক ভাষা দিয়ে বলার কথা সেখানে যেন অসহায় হয়ে চৈতন্য নামে একটা শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে যা পদার্থ-বিজ্ঞানের পরিভাষায় পড়ে না। দর্শনের কথা আলাদা। দর্শন চৈতন্যকে স্বীকার করে, কারণ এটা তো প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতির বিষয়। আশ্চর্যের বিষয়, সবাই আমরা চৈতন্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষায় এর কোন সংজ্ঞা দিতে পারি না।

যা কিছু ঘটে তার গোড়ার কথা যে বলতেই হবে, পদার্থ বিজ্ঞান তা মনে করে না। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—একটা পরমাণুর আকৃতি কিরকম তা বোঝার জন্যে আমাদের পদার্থ-বিজ্ঞানের 'খণ্ডতত্ত্ব' (Particle Physics) আদ্যোপান্ত জানার প্রয়োজন নেই। তেমনি আবার বিশ্বতত্ত্ব বোঝার জন্যে পরমাণুর আকৃতিতত্ত্ব বোঝারও প্রয়োজন নেই। বোধ হয় এই কারণেই দর্শন চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেই তৃপ্ত, কোথা থেকে, কি করে, কি কি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে এর উদ্ভব ঘটেছে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। চৈতন্যের গতি ও প্রকৃতির অবশ্যই কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে। বহুদিন আগে বেদান্ত, বিশেষ করে শঙ্কর, আমাদের মনের যে বিভিন্ন অবস্থা আছে তা বলে গেছেন। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের অনুভূতি ঘটে, আর সেইসব অনুভূতি যে নিজস্ব ক্ষেত্রের মধ্যে সত্য, তাও মেনে নিতে হবে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা সবাই জগৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এটা আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা। এই জড় জগৎকে আমরা দেখি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এর অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকে না। তখন আমাদের যে সব অভিজ্ঞতা হয় তার সঙ্গে বাইরের জগতের কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থা ছাড়াও কিন্তু আমাদের আর একটা অবস্থা আছে। এই অবস্থায় যে কি ঘটে তা অবশ্য অস্পষ্ট। কিছুদিন আগে এই কথাগুলি আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলতে চেষ্টা করেছিলাম। এজন্যে কেউ

কেউ আমাকে এই বলে সমালোচনা করেন যে, আমি বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন মিশিয়ে ফেলছি। আমার বক্তব্য—বিজ্ঞান দর্শনেরই একটা অঙ্গ। দর্শন ছাড়া বিজ্ঞান অর্থহীন। স্বামী বিবেকানন্দও প্রকারান্তরে এইকথা বলেছেন। অনেক বৈজ্ঞানিক দর্শনকে 'মাথা গরম' করা ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চান। অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কিন্তু চৈতন্যের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পান না—যদিও এটা আমার, আপনার, আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার বস্তু। বিজ্ঞানের একটা নিয়ম এই যে, যা সকলের অভিজ্ঞতার বস্তু হবে তার সত্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। একজনের হলে তা কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারা যায়। এ অবস্থায় চৈতন্য কি তা নিয়ে মাথা ঘামাব না ; এটা মেনে নিতে মন সায় দেয় না -বিশেষ করে যুক্তি যদি এই হয় যে, চৈতন্য কি তা না জানলেও এই বস্তুজগৎকে জানতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। কারও কারও ধারণা চৈতন্য মস্তিষ্কের মধ্যে একটা জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আর মস্তিষ্কও একটা কম্পিউটার ছাড়া কিছু নয়। কম্পিউটারকে আবার 'ব্ল্যাক বক্স' বলা হয়ে থাকে। এই 'ব্ল্যাক বক্স'-এর কাজ হচ্ছে যা কিছু ঘটছে বা ঘটতে পারে, তা থেকে যা যা যুক্তিসিদ্ধ তা বাছাই করে নেওয়া। কিন্তু কোন্‌টা যুক্তিসিদ্ধ বা যুক্তি-সিদ্ধ নয়, তা কোন যান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারিত হচ্ছে না, তা নির্ধারিত হচ্ছে স্বতন্ত্র মানুষের দ্বারা। মস্তিষ্ক ও চৈতন্য পৃথক, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। মস্তিষ্ক এক ধরনের কম্পিউটার হতে পারে, চৈতন্য কিন্তু তা নয়। কোন দিন কম্পিউটার চৈতন্যের ভূমিকা নেবে এ বিশ্বাস করা যায় না। চৈতন্যের সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তা গণিত অথবা রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বড় জোর এই কথা আমরা বলতে পারি, মস্তিষ্কের ব্যাপারগুলি এবং চৈতন্যের উৎপত্তি—এ দুটি বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না। জীববিজ্ঞানীরা যদি বলেন তাঁরা জীবনরহস্যের সবকিছু জেনে ফেলেছেন, তাহলে তাঁরা অতিশয়োক্তি করেছেন বলতে হবে। যা আগেই বলেছি, বড় জোর তাঁরা এই কথা বলতে পারেন যে, সব বৈচিত্র্যের উৎপত্তি এক সাম্য অবস্থা থেকে, এটুকু তাঁরা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু একথা বললেই সমস্যার সমাধান হল না। জীববিজ্ঞানীরা বৈচিত্র্যের শ্রেণী-বিভাগ করে থাকেন, তা করলেই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হল না।

এতদিন পরে এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হচ্ছে মূল তত্ত্বকে জানা। এই তত্ত্বের যে বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী, তার ব্যাখ্যাই পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম বলে পরিচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি শঙ্করের পরম ব্রহ্মকে বিশ্বসংসারের উৎপত্তি ও এক পরম সাম্য বলেছি। এই যে সাম্য, তার যখন বিক্ষেপ ঘটে, তখনই আমরা বলি সৃষ্টি হল। কয়েক মাসে আগে আমার এইসব বই যখন ছাপা অক্ষরে বেরুল, তখন কয়েকজন বেশ কৌতুক বোধ করেছিলেন। তা তাঁরা করুন, কিন্তু আমি যা বলেছি তা পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা। যদি সাম্যের বিক্ষেপ, যার ফলে সৃষ্টি ঘটে এই ঘটনাকে যদি 'মায়া' এই দার্শনিক শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়, তাহলে আপত্তি কিসের ?

আমি এতক্ষণ যা বললাম এর দ্বারা স্বামীজী যা চেয়েছিলেন, সেইদিকেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন, এই জড়জগৎকে বুঝতে গেলে আমাদের বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেই হবে। আবার তেমনি চৈতন্যকে বুঝতে গেলে আমাদের অধিকতর গবেষণা ও ধ্যানের প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না এই ভেবে যে, একদিন বিজ্ঞান এগুলির সমাধান করে দেবে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানেরও দৃষ্টান্ত অনেকটা পাল্টানো দরকার।*

বিবর্তনবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদের যুগে সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন ছিল—"কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ১৷১)—'ব্রহ্ম কি জগৎকারণ? আমরা কোথা হ'তে উৎপন্ন হয়েছি, কার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি?' বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও প্রশ্ন—জীবজগতের উৎস কোথায়?

উপনিষদের ঋষিরা জাগতিক নিরীক্ষায় অনেক মতভেদ লক্ষ্য ক'রে ধ্যানযোগের পদ্ধতি অবলম্বনে জানলেন—

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (ঐ, ১৷৩)—প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার জগৎ-কারণত্বের সহায়ক, স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি।

কিন্তু বিজ্ঞান প্রথম পদ্ধতি এখনও ছাড়েনি। বৈজ্ঞানিক তার মতামত সর্বদাই নির্ভুল তথ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করে। মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তথ্যে ভুল থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্বামীজীর জন্মের কিছু পূর্বে জীবজগতের উৎস সম্বন্ধে এই-রকম একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক মতবাদ—যা 'বিবর্তনবাদ' নামে খ্যাত, যার সঙ্গে মনীষী ডারুইনের নাম জড়িত—পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় আলোড়ন এনেছিল। এই চিন্তা-তরঙ্গের আঘাত স্বামীজীর মনেও পড়বে, তা আর বিচিত্র কি? আমার মনে হয়, এর প্রথম উল্লেখ চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতায় কূপমণ্ডূকের আখ্যানে; পরে জ্ঞানযোগ-সংক্রান্ত বহু বক্তৃতায়, 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বক্তৃতামালায়, 'রাজযোগে', 'পত্রাবলীতে', 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদে', স্বামীজী বিবর্তনবাদের অনেক সমালোচনা করেছেন। সেগুলি উপস্থাপিত করবার পূর্বে ঐ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাগুলি একটু অনুধাবন ক'রব।

বিবর্তনবাদ: ডারুইনের চিন্তা

চার্লস রবার্ট ডারুইন (Charles Robert Darwin, 1809—1882) এই বিবর্তনবাদের মূল স্তম্ভ। যুবা বয়সেই তিনি আবিষ্কারের নেশায় এক তথ্যসংগ্রহকারী নৌ-অভিযানে যোগ দিয়ে ৫ বৎসরে সারা পৃথিবী ঘুরে বহু উদ্ভিদ্, জন্তু, জীবাশ্ম প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। পরবর্তী ২০ বৎসরে সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে কতকগুলি তত্ত্বে উপনীত হন। ঠিক সেই সময়েই তিনি জানালেন যে, অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস্ (Alfred Russell Walace, 1823—1913) নামে আর এক বৈজ্ঞানিক মালয় দ্বীপপুঞ্জ (Malay Archipelago)-র কতকগুলি

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর উপর গবেষণা চালিয়ে একই ধরনের মত পোষণ করেন। সেজন্য তাঁরা যুগ্মভাবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একখানি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। ডারুইন পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "On the origin of species by means of natural selection" এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে "The descent of man" নামক বিশ্ববিশ্রুত পুস্তক-দুটি প্রণয়ন করেন।

ডারুইন তাঁর বিরাট সংগ্রহশালা থেকে যে তথ্যরাজি উদ্ঘাটন করলেন, তাতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন যুগের জীবাশ্ম ও ভূপৃষ্ঠের বহুস্থান ও বহুপ্রকার আবহাওয়া অঞ্চল থেকে পাওয়া গৃহে বা প্রাকৃতিক পরিবেশে পালিত জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যে নানাপ্রকার বৈষম্য বর্তমান—কোন দুটি জীব এক নয়। এই বৈষম্যের মধ্যেও তাঁর নজরে পড়ে কিছুটা সাদৃশ্য—এদের শারীরিক গঠনে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি, রক্তনমুনা প্রভৃতিতে। এগুলি বিশ্লেষণের পর শ্রেণীবিভাগ ক'রে সাজান হ'লে ডারুইন এদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এমন কি গর্ভের ভেতর ভ্রূণ থেকে শিশু যে পরিবর্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, তাতেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবের সহিত সাদৃশ্য পান।

এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি ক'রে ডারুইনের ধারণা হ'ল—বর্তমান জগতের উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু যা আমরা দেখি, তা একদিনে সৃষ্ট হয়নি; বহুযুগ পূর্বে সৃষ্ট কোন একপ্রকার মৌল জৈব উপাদানেই প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে তারই বংশ-বৃদ্ধির চেষ্টা ও বংশগত গুণসঞ্চালনের দ্বারা বৈষম্য সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমেই সর্বস্তরে ক্রমোন্নতির ফলে উদ্ভিদ্ ও জীবজগৎ বর্তমান আকারে পৌঁছেছে। কিভাবে প্রাণ-সঞ্চার হয়েছিল—এ-বিষয় অবশ্য তিনি কোন সিদ্ধান্তে আসেননি। সেজন্য তাঁর পুস্তকের নাম, 'Origin of life' না দিয়ে 'Origin of Species' দিলেন।

কিভাবে সম্ভব হ'ল তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধির ফলে পর্যাপ্ত খাদ্যের ও স্থানের অভাবে, একই বা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এবং হিমযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত বহুপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলে। শুধু ক্ষুধার জন্য নয়, যৌনমিলনের সঙ্গীনির্বাচনেও এই সংগ্রাম। আবার বৈষম্যের দরুনই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ব্যবহার-জনিত সুবিধা পেয়ে, কতকগুলি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে বংশবৃদ্ধি করে, আর অযোগ্য প্রাণীগুলি পরাজিত হয়ে কালে ধ্বংস হয়। এই পদ্ধতিকেই তিনি আখ্যা দেন—যোগ্যতমের উর্ধতন (Survival of the fittest) বা উন্নততর শ্রেণীতে রূপান্তর। আর উপায়ের নাম দিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) দ্বারা ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ।

সেই মৌল জৈব উপাদান (Molluse or protoplasm)-ই ক্রমান্বয়ে উন্নততর জীবে পরিণত হ'তে হ'তে মানবাকারে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান মানবের ঠিক পূর্বস্তরেই হ'ল আদিমানব (৩ লক্ষ বৎসর) তার পূর্বেই বনমানুষ জাতীয় প্রাণী।

ডারুইনের পূর্ব ও উত্তর[illegible] চিন্তা

ডারুইনের এই মতবাদের মূল্যায়নের সুবিধার্থে তার পূর্ব ও উত্তর[illegible]দের কথাও কিছু আলোচনা করছি। ডারুইন স্যার সি. লিয়েল (Sir C. Lyell, 1797-1875)-এর জীবাশ্ম ও জীবনসংগ্রাম এবং ম্যালথাস্ (Malthus)-এর জনসংখ্যা-সম্বন্ধীয় মত যেমন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই গ্রহণ করেছিলেন জাঁ ব্যাপটিস্ট লামার্ক (Jean Baptist Lamarck, 1744—1829)-এর মতে—যাতে দেখানো হয়েছিল যে, উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারজনিত গুণের আয়ত্তীকরণ ও বংশানুক্রমিক সঞ্চালন সম্ভব।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur 1822-95) দেখালেন—প্রজনন-ক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে প্রাণের সংক্রমণ সম্ভব নয়। এতে ডারুইনের কিছু চিন্তা সমর্থিত হ'ল।

তবে লামার্ক (Lamarck)-এর কাছে ধার-করা মতটি তদানীন্তন বিজ্ঞানজগৎ গ্রহণ করতে পারেনি। সেজন্য ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধে ডারুইনের নির্দেশিত মতে সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। এদিকে ডারুইন সমশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে যে অত্যধিক বৈষম্যগুলিকে লক্ষ্য করেও, প্রক্ষিপ্ত মনে ক'রে মূল চিন্তাধারা থেকে বাদ দিয়েছিলেন—সেগুলির উপর অধিকতর মনঃসংযোগ ও আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (Gregor Johan Mendel, 1822-84) ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বললেন, বংশগতভাবে গুণসঞ্চালন করে এক জোড়া জিন (Gene), যার একটি বাপের ও অপরটি মায়ের দেওয়া। এক শ্রেণীর প্রাণীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি জিন শৃংখলের আকারে থাকে, তাকে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম (Homologus Chromosome) বলে; এইগুলিই গুণের রক্ষক ও বাহক। হঠাৎ, যথা তেজষ্ক্রিয় রশ্মিপাতে এই নির্দিষ্ট সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কেবল যখন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে হিউগো ডি ব্রিস (Hugo De Vries) নতুনভাবে ঐ তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তখন মেণ্ডেল (Mendel)-এর মত বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থান লাভ ক'রল। এইরূপ পরিবর্তন-জনিত নতুন প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন শ্রেণী সৃষ্টি হয়, ফলে ডারুইনের প্রদর্শিত বৈষম্য-সংগ্রাম-ক্রমোন্নতির ধারা চলতে থাকে।

এখনও ডারুইনের মতবাদ দোষত্রুটি বর্জিত হয়ে পরিবর্তিতাকারে সমর্থিত হচ্ছে। এর পেছনে টমাস হেনরি হাক্সলি (Thomas Henry Huxley, 1825—95) ও অগস্ট ভাইসম্যান (August Wiesmann) এর অবদান চির স্মরণীয়। বর্তমানে এটি 'Synthetic Theory of Evolution' নামে পরিচিত, সঙ্গে হ্যাল্‌ডেন (Halden), ফোর্ড (Ford), ফিশার (Fisher), মুলার (Muller) প্রভৃতি [illegible] নাম জড়িত।

এইভাবে মনীষী ডারুইন একটি মূল চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ও এই ধারায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চলছে।

বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মত

জগৎ-সৃষ্টি আর সৃষ্টির বৈচিত্র্য বুঝাতে ডারুইনের বিবর্তনবাদকে স্বামীজী একেবারে অস্বীকার করেননি ; বরং বৈজ্ঞানিক তথ্যাভিত্তিক ও যুক্তিবাদী এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর ত্রুটিগুলির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। তার মধ্যে প্রধানতঃ ক্রমবিকাশের সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচনের কোন ব্যবস্থা না থাকা, একের ধ্বংসে অপরের উন্নতি, মূল চিন্তায় শুধু শরীরগত গুণের কথাই স্থান পেয়েছে—মনোগত গুণ বা সংস্কারের কথা নয়। মনুষ্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি স্বীকার ক'রে, অদ্বৈতবেদান্ত মতে বিবর্তনবাদকে কিভাবে ত্রুটিহীন করে বুঝাতে পারা যায়, স্বামীজী তা দেখিয়েছেন।

অভিনন্দন : বিবর্তনবাদকে স্বাগত জানাতে স্বামীজী জোর দিয়ে বলেছেন, "ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য ; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি ; বিচারশক্তি সম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই 'ক্রমবিকাশ'বাদীদের সহিত বিবাদ করিবেন না। কিন্তু···জানিতে হইবে···প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান।" (২।১১৪)।*

অন্য স্থানে এই সত্যটিকে নিষ্কাশন ক'রে স্বামীজী বলেছেন, "মানুষ যতই জ্ঞান লাভ করিতেছে, ততই তাহার এই ধারণা বাড়িতেছে যে, কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে, আর আধুনিক সর্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্যই এই যে, কার্য কারণের রূপান্তর-মাত্র। এই কারণও আবার এক পুরাতন কারণের কার্য।" (২।২৬২)।

বিবর্তনবাদের মূলতত্ত্বটি খুঁজতে গিয়ে তিনি আরও বললেন, "বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তুর ব্যাখ্যা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে ; বিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টানিয়া আনার প্রয়োজন হয় না।" যেমন, "শূন্যে উৎক্ষিপ্ত পাথরকে একজন দৈত্য টানিয়া নামায়, এই ব্যাখ্যাটি পাথর-বস্তুটির ভিতর হইতে আসিত না, আসিত বাহির হইতে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য পাথরটি পড়িয়া যায়, এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু পাথরের স্বভাবগত গুণবিশেষ ; এই ব্যাখ্যাটি বস্তুর অভ্যন্তর হইতে আসিতেছে।" (৩।১৩৬)।

"এই ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল আধুনিক বিবর্তনবাদ ; দুইটি ধারণাই একই মূলতত্ত্বের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সরল অর্থ—বস্তুর স্বভাব, পুনঃপ্রকাশিত হয় ; কারণের অবস্থান্তর ছাড়া কার্য আর কিছুই নয়, কার্যের সম্ভাবনা কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে ; সমগ্র বিশ্বই তাহার মূল সত্তার অভিব্যক্তি

* সর্বক্ষেত্রে এইরূপ দুটি সংখ্যা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার (১ম সং) খণ্ড ও পৃষ্ঠার সূচক।

মাত্র শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়।...কারণ খুঁজিতে আমাদের বিশ্বের বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন নাই।" (৩।১৩৭)।

বিশেষ ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হলেও বিজ্ঞানের যুক্তিবাদের স্বপক্ষেই যেন স্বামীজী মনোভাব ব্যক্ত ক'রে বলেছেন, "যে-সব ধর্ম বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আঁকড়াইয়া ছিল,...(তাহাদের) এই ধারণা এখন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যেন...সেই ধারণাকে ভূপাতিত করা হইতেছে; ধর্মকে ভূমিসাৎ করা হইতেছে বলিয়াই আমি ইহা বলিতেছি।" "ঈশ্বর ৫ মিনিটে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ঘুমাইতে গেলেন এবং সেই সময় হইতে ঘুমাইয়াই আছেন।" "'শূন্য হইতে সৃষ্টি'—আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইহা উপহাসের বিষয়।" (৩।১৩৭)।

আপত্তি (১)ঃ এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর অপর শ্রেণীর জীবের ক্রমোন্নতির চিন্তার বিরুদ্ধে স্বামীজী বলেছিলেন, "হাজার জীবনকে ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে—তা হ'লে বলতে হয়, এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না।" সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার ক'রে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, এ-কথা স্বীকার করতেই হয়।...হাজার পাপীর প্রাণ সংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়।" (৯।১১৯)।

"এরূপ শোনা যায়, দোষাংশ ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটি বিশেষত্ব; সংসার হইতে ক্রমাগত দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাহাদের প্রাচুর্য আছে, যাহাতে প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, যাহাদিগকে তথাকথিত ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের দাম্ভিকতা বাড়াইতে পারে। সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকেরা যন্ত্রণা ভোগ করুক তাহাদের ক্ষতি কি? সাধারণ লোক মারা যাক—সেজন্য তাহাদের কি? বেশ কথা, কিন্তু এ-যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ (সমষ্টিগতভাবে) নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা (আরও) দোষাবহ এ-কথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, এবং অমঙ্গলের পরিমাণ কমিতেছে।......কিন্তু অমঙ্গলের ভাগ যে ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়?" (২।১১)।

আপত্তি (২)ঃ ডারুইনের বিবর্তনবাদ শরীরগত গুণাবলীর বংশানুক্রমিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তথ্যসংগ্রহকালে তিনি মনোগত গুণাবলীর কথা ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। তাই স্বামীজী বলেছেন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে': "Animal kingdom (নিম্ন প্রাণিজগৎ)-এ আমরা সত্য-সত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human

kingdom (মনুষ্য-জগৎ)-এ, যেখানে rationality (জ্ঞান-বুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উলটোই দেখা যায়। মনে কর, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) ব'লে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ)-এ instinct (স্বাভাবিক জ্ঞান)-এর প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচারবুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য Animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন ক'রে progress (উন্নতি) হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণ বিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হ'তে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ)-বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মনুষ্যেতর প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।" (৯।১২১।১২২)।

আপত্তি (৩) : বিবর্তনবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, এতে ক্রমান্বয়ে উন্নতির কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু বিপরীত গতির কথা আলোচনা করাই হয়নি। কোন কোন বৈজ্ঞানিকও এ-প্রসঙ্গ তুলেছেন। স্বামীজী বহুস্থানে যুক্তি সহকারে বিবর্তনবাদের এই অসম্পূর্ণতা দেখিয়ে প্রত্যেক ক্রমবিকাশের ঠিক পূর্বে একটি ক্রমসঙ্কোচনের অস্তিত্বের অবতারণা করেছেন। স্বামীজীর উক্তির যে কয়টি উধৃতি পূর্বে দেওয়া হয়েছে তাতেও এ-কথার উল্লেখ আছে। এখন এ-বিষয়ে স্বামীজীর আরও কয়েকটি আলোচনা তুলে ধ'রব।

স্বামীজী বলেছেন, "আমরা যদি পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থামাত্র। ক্রমবিকাশের প্রমাণ কেবল এই : নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জন্মিয়াছে এবং উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর জন্মে নাই? দুদিকেই যুক্তি সমান—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে

যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হইতে পারে।…মানুষের ক্রমাগত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বেশ বুঝা গেল।" (২।২০১)।

"…আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ-কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।…সরলরেখার কোন গতি হইতে পারে না। যদি তোমার সম্মুখ দিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে, যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে?" (২।২০১)। "তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য অবনতি হইতে পারে না।" (২।১৪১)।

স্বামীজী অন্য আর এক জায়গায় বলেছেন, "বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রমসংকুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না;… …বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল ঐ বীজমাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। সমুদয় মানুষটাই একটি জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—(প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায়, কারণে) সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে ছিল।"(২।১১৪)। "এখন বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করিবে", "এইভাবে তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে।" "শূন্য হইতে কিছুরই উৎপত্তি হয় না।" (২।১১৫)।

ক্রমসঙ্কোচ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী আবার বলছেন, "কিসের ক্রমসঙ্কোচ? ইহাই প্রশ্ন।…(আমরা দেখিয়াছি) বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব, আবার বীজ উহার পরিণাম—সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম একই। পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা—আদি অন্ত উভয়ই সমান।…অন্ত জানিলে আদি জানিতে পারিব। সমুদয় 'ক্রমবিকাশশীল' জীবপ্রবাহকে—যাহার একপ্রান্তে জীবাণু, অপর প্রান্তে পূর্ণমানব (পূর্ণচৈতন্য)—একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রম-সঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পারো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। Law of conservation of Energy

('শক্তির নিত্যতা' নিয়ম) যদি সত্য হয়···এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা একটুকুও শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য যদি জীবাণুতে বর্তমান না থাকে, তবে উহা অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতে পারে না।···অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন অন্য অন্য বিষয়ে দেখা যায়, (তেমন এ ক্ষেত্রেও) যেখানে আরম্ভ সেইখানেই (চৈতন্যেই) শেষ; তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত।···সেই পূর্ণমানব এই প্রাণপ্রবাহ শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত।" (২।১১৫-১৭)।

"যদি তাঁহারা (বিবর্তনবাদীরা) ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশক না হইয়া সহায়কই হইবেন।" (২।১১৫)।

সমাধানঃ বিজ্ঞান জড় তথ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে প্রখর যুক্তির সাহায্যে যে-সব তত্ত্বে উপনীত হচ্ছে, তাতে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ ক্রমেই জড়বাদী ও ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে—সেজন্য স্বামীজী খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আবার এই বিজ্ঞানের স্বীকৃতির ফলে যখন অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাসগুলি ধূলিসাৎ হচ্ছিল, তখন স্বামীজী স্বস্তিবোধ করেছিলেন। ধর্ম যে শুধু কতকগুলি অযৌক্তিক বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, তা যে সুদৃঢ় যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সূত্রগুলি যে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি ও জাগতিক সকল ব্যাপারকে সহজে বোঝাতে সক্ষম—তা দেখাতে অদ্বৈতবেদান্তের অবতারণা ক'রে বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

যদিও স্বামীজীর এই চিন্তা পূর্বপৃষ্ঠাগুলিতে কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে, বিষয়টিকে পরিষ্কার করবার জন্য তাঁর বাণী আরও কিছু আলোচনা করব।

স্বামীজী বলেছেন, "(বিজ্ঞানের) দুইটি মূলতত্ত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে—এমন কোন ধর্ম থাকিতে পারে কি? আমার মনে হয়, পারে। আমরা দেখিয়াছি, প্রথমতঃ সামান্যীকরণের মূলতত্ত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে।···(দ্বিতীয়তঃ) বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে এমন একটি চরম সামান্যীকরণে আসিতে হইবে, যাহা শুধু সামান্যীকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যাপকই হইবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভবও তাহা হইতে হওয়া চাই। উহাকে নিম্নতম কার্যের সহিত সমপ্রকৃতির হইতে হইবে; যাহা কারণ, যাহা সর্বোচ্চ, যাহা চরম—যাহা আদি কারণ, তাহাকে পরম্পরাগত কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দূরতম, নিম্নতম কার্যের সহিতও অভেদ হইতে হইবে। (অদ্বৈত) বেদান্তের ব্রহ্মই এই শর্ত পূরণ করেন; কারণ সামান্যীকরণ করিতে করিতে সর্বশেষে আমরা গিয়া যেখানে পৌঁছিতে পারি, এই ব্রহ্ম তাহাই। এই ব্রহ্ম নির্গুণ,—অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থা (সচ্চিদানন্দস্বরূপ)।" (৩।১৩৭-৩৮)। "উহা সর্বব্যাপী চৈতন্য, (অসীম), সর্বদাই পূর্ণভাবে বর্তমান" (২।১৩৯), অপরিণামী, অমর, একমেবাদ্বিতীয়ম্। "সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তের আবরণের ভিতর দিয়া নানারূপে (ব্যষ্টিরূপে—সঙ্কুচিত অবস্থায়) প্রকাশ পাইতেছেন (বা প্রতিভাত হইতেছেন)।" (২।৯৮)। "ব্যষ্টি হইয়া

আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি—(আমাদের কাছে জগৎ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে)…আর এই পরিবর্তন সমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশ মাত্র।…(সব ব্যাষ্টির ভিতরেই) অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ রহিয়াছে……প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।" (২।২৭০-৭১)। এইভাবে সামান্যীকরণ গ্রহণ করা হইল।

এই ব্যষ্টির প্রকাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, পণ্ডিতেরা ক্রমবিকাশ কাহাকে বলেন ? উহার ভিতর দুইটি ব্যাপার আছে। (ব্যষ্টির) অন্তর্নিহিত (অনন্ত) শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বাহিরের অনেক ঘটনা উহাকে বাধা দিতেছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থাগুলির সহিত সংগ্রামের জন্য ঐ শক্তি নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটি শরীর ধারণ করে কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণের পর মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। এখন যদি এই তত্ত্বটিকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন সময় আসিবে, যখন যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না।" (২।১০০)। ওটা আবার পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

কি উপায়ে এটি সম্ভব হয়, তা বোঝাতে স্বামীজী বলেছেন, "যখন জীবাত্মা (অর্থাৎ ব্যষ্টি) এ-কথা বুঝিতে পারে, (তার মধ্যেই অনন্ত শক্তি নিহিত) তখনই সে এই জগৎ-কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশই বেশী ক'রে নিজের অন্তরাত্মার (পূর্ণ-চৈতন্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ—এতে যেমন শারীর বিবর্তন ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে। (৭।২৯৮)।

এইরূপে বিকাশের সংগ্রাম ধ্বংসের পথে নয়, নিবৃত্তির বা ত্যাগের পথে তা দেখিয়ে স্বামীজী আরও বললেন, "ধর্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশকেই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ।" (৭।২৯৮)।

যেমন অজ্ঞানাবরণে পূর্ণচৈতন্যের জীবাণুতে ক্রমসঙ্কোচন আবার পরেই বিভিন্ন প্রাণপ্রবাহক্রমে পূর্ণতার বিকাশ, তেমনই প্রাণপ্রবাহের প্রতি স্তরেও আবর্তন সূচিত হয়ে বৈষম্য বৃদ্ধি করে। এইভাবে বিবর্তনবাদ গৃহীত হ'ল। তাই স্বামীজী বলেছেন, "অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই, শুধু মেলে তাহা নয়, বরং ঐ-সকল সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যেই ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্তর এতখানি স্পর্শ করিয়াছে।" (২।১০১)।

চতুর্থ অধ্যায়

নান্দনিক চিন্তা-ভাবনার আলোকে বিবেকানন্দ

"শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে, সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু প্রকৃতিকেও অতিক্রম করতে হবে শিল্পকে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জাতীয় শিল্পজাগরণে বিবেকানন্দ অধ্যায়

"নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পাদি অবলম্বন করে যে সব বহুমূল্য প্রবন্ধ লিখেছেন তার বিষয়বস্তু নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছিল ১৮৯৮ সালে কাশ্মীর ও অমরনাথ ভ্রমণের সময়। আরো বছর দুই আগে ১৮৯৬ খৃঃ ডিসেম্বরে দেখি স্বামীজীকে পাশ্চাত্য ভক্ত ও বন্ধুরা এক বিদায়-সভায় সংবর্ধনা করেছেন লণ্ডনের Royal Society of Painters পরিষদে। সুতরাং শিল্পীমহলে যে স্বামীজীর অনেক অনুরাগী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। পর বৎসর স্বামীজী দেশে ফিরেছেন ; প্যারিস, মিলান, পীসা, ফ্লরেন্স, রোম, নেপলস্ প্রভৃতি শহরের জগদ্বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহগুলি শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়ে।

"১৮৯৯ খৃঃ জুন মাসে স্বামীজীর প্রেরণায় নিবেদিতা দুটি অধুনাপ্রসিদ্ধ অভিভাষণ দেন—(১) ভারতীয় নারী, (২) প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা ; ১৯০০ খৃঃ অক্টোবর মাসে প্যারিসে পৃথিবীর ধর্মেতিহাস কংগ্রেসে (Congress of the History of Religions) ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বামীজী অন্যান্য আলোচনার মধ্যে একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন ; সেটি "ভারতীয় শিল্পের উপর তথাকথিত গ্রীক প্রভাব" নিয়ে। ঐতিহাসিক সংযোগের ভিতর দিয়ে আদান-প্রদান হওয়া স্বাভাবিক এবং গ্রীকরাও যেমন অনেক কিছু ভারতের কাছ থেকে নিয়েছে, তেমনি ভারতীয় শিল্পীরাও গ্রীক-শিল্পীর কাছ থেকে নিয়েছে, কিন্তু একথা সত্য নয় যে ভারতীয় শিল্পের প্রাণ গ্রীক-প্রভাবে কোনো সময়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্বামীজীর একথা ইন্দো-গ্রীক শিল্পবাদী ফরাসী অধ্যাপক Foucher শুনেছিলেন কিনা জানি না। এসব কথা ভারত-শিল্পী-বন্ধু হ্যাভেল তখন স্পষ্ট করে লেখেননি এবং আনন্দকুমারস্বামী তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী করছেন। অথচ এত বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের গবেষণার পূর্বাভাস দিয়ে গেলেন—তাঁর সাক্ষী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও Prof. Patric Geddes, স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস থেকে মিস্ ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন শিল্পতীর্থ-পরিক্রমা (Oct-Dec—1900) ; এবার তিনি চিত্র ভাস্কর্যাদি শুধু দেখাচ্ছেন না, তুলনামূলক আলোচনা ও মন্তব্য করছেন। চোখের সামনে ভেসে আসছে পাশ্চাত্ত্য শিল্পধারা—Austria, Hungery, Servia, Rumania Bulgeria-র বড় বড় চিত্রশালা তন্ন তন্ন করে দেখে স্বামীজী ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য-শিল্প-নিদর্শনগুলিও পরীক্ষা করেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব কত ভাবে গিয়েছে, কী আগ্রহ সেটি বুঝবার ও বোঝাবার। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত

পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্তু নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে উদার, প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ভারতের তথা এশিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগেনি, কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয়, শিল্পও যেন অস্পৃশ্য (untouchable)। স্বামীজী এক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ (pioneer); অথচ তাঁকে আমরা মনে রাখি না যখন ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ বিষয়ে আলোচনা করি।

"১৯০১ সালের গোড়ায় দেখি স্বামীজী বেলুড়ে ফিরেছেন। ১৮৯৮ সালে ঠিক তিন বছর আগে গঙ্গাতীরে জমি কিনে যখন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন স্বামীজী নিজেই এক বিরাট মন্দিরের পরিকল্পনা শুধু ধ্যানে নয়, নকসায় তুলেছিলেন।

"এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে, তাঁর অধিকার পুঁথিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পায়ে হেঁটে ভারতের প্রধান প্রধান সব মঠ মন্দির স্বামীজী যেমন তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন—তেমনভাবে কম প্রত্নতাত্ত্বিক বা শিল্পের ঐতিহাসিকরা দেখেছেন।

১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগ দিতে যাবার পথে তিনি কলম্বো, সিঙ্গাপুর, ক্যান্টন হয়ে জাপানে আসেন এবং চীন ও জাপানী মঠ ও মন্দিরে, শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে ভারতের প্রভাব ও প্রাচ্য চিত্রকলার নব-জাগরণের সম্ভাবনা দেখেন। প্রায় আট বছর পরে (ডিসেম্বর ১৯০১) জাপানী কলাবিৎ ওকাকুরা কাকুজো (Okakura Kakuzo) যখন বাঙলাদেশে প্রথম পদার্পণ করেন তখন তাঁকে দেখি রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর অতিথি ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে। স্বামীজীর শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে এবং তিনি তখন বেলুড় মঠের গঠনমূলক কাজে তন্ময়। তবু শিল্পরসিক ওকাকুরাকে পেয়ে তিনি আনন্দে ও প্রেরণায় ভরপুর হয়ে তরুণ যুবকের মতে উৎসাহে ওকাকুরাকে বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও শিল্পনিদর্শনগুলিকে দেখিয়ে আনতে বেরিয়ে পড়েন। ১৩ই জানুয়ারি ১৯০২ সালে তাঁর ৩৯ বছরের জন্মদিন কাটে বুদ্ধগয়ায়। সঙ্গে ছিলেন মহাবোধি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল, ওকাকুরা ও ভগ্নী নিবেদিতা। একদিকে ভগবান বুদ্ধের সাধনা ও অন্যদিকে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের শিল্পধারা অনুসরণ করে স্বামীজী বুদ্ধগয়া, নালন্দা হয়ে সারনাথ পর্যন্ত ওকাকুরাকে সব দেখান ও অনেক বিষয়ে আলোচনা করেন।

"কালের ধর্মে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা ভিন্ন খাতে বইবে সেটা স্বাভাবিক এবং আধুনিক ভারতের শিল্প তার নূতন ভাষা ও ছন্দ খুঁজে নেবে। কিন্তু বিবেকানন্দ-নিবেদিতার যুগকে অস্বীকার করে কোনো শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারবে না।" [উদ্বোধন সুবর্ণ জয়ন্তী পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ কালিদাস নাগের প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।]

"আমার ধারণা স্বমী বিবেকানন্দ হইতেই এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি (পাশ্চাত্ত্য আদর্শ-বর্জিত অবনীন্দ্রনাথের নূতন পদ্ধতি) সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল। সুতরাং

ওকাকুরার সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই ভগিনী নিবেদিতা সম্ভবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতেই এই চিত্র-শিল্প সম্পর্কেও প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি খুব গভীর।... বর্তমান যুগে চিত্রশিল্পে ইউরোপের অনুকরণ যে ব্যর্থ ও লজ্জাকর,—ইহা তিনি প্রথম হইতেই স্বামীজী সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং চিত্রশিল্পে দেশের প্রাণ কোথায় ফুটিয়াছিল এবং কোথা হইতে তাহাকে পুনরায় অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে তাহাও সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

'ওদের নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রী করা পোটো ভাল। তাদের কাছে তবু ঝাক্‌ঝাকে রঙ্‌ আছে। ওসব রবিবর্মা ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরে সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।'

[গিরিজাশঙ্কর রায়ের 'শ্রীঅরবিন্দ' প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত]

নিজের উক্তির আলোকে বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা

"কলিকাতা জুবিলি আর্ট কলেজের অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছে। রণদাবাবু শিল্পকলা নিপুণ, সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আলাপ পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম ; কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাহের সময়েও ঐ বিদ্যার বিকাশ হয়েছিল ; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা-মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রণদাবাবু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভিতর তফাৎ কি দেখলেন ?

স্বামীজী। প্রায় সবই সমান ; Originality প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না।···
···ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না।

Kali the Mother কবিতার বাস্তব শিল্পরূপ সম্বন্ধে আলোচনার পর স্বামীজী রামকৃষ্ণ-মিশনের শীলমোহরের জন্য কমলদল-বিকশিত হ্রদমধ্যে হংসরাজিত সর্প-

পরিবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে বুঝাইয়া দিলেন। রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখিতে পারিলে আমার উন্নতি হইতে পারিত।"

অতঃপর স্বামীজী ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও মঠ যেভাবে নির্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, তাহারই একখানি চিত্র (drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামীজীর পরামর্শমত অঙ্কন করিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন—এই ভাবী মন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহ-শিল্প সম্বন্ধে যত সব idea নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির-নির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব।

স্বামীজী। শিল্প সম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু। আপনাকে নূতন কথা কি শুনাব। আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি।

—স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (উত্তর কান্ড)

সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল ছেলেবেলা থেকেই, তবে তিনি সঙ্গীতানুরাগের সংস্কার পেয়েছিলেন তাঁর মাতাপিতার কাছ থেকে। কণ্ঠ ছিল তাঁর সুমিষ্ট ও গন্ধর্ব-নিন্দিত, স্মরণশক্তি অসাধারণ, যে-গান তিনি একবার শুনতেন তা গাইতে পারতেন হুবহুরূপে। বিশ্বনাথ দত্তের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি পুত্রকে তাই সঙ্গীত-শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন, ব্যবস্থাও তার হল সুচারুরূপে।

স্বামীজী উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন বেণী ওস্তাদের কাছে। শুধু গান নয়, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্য এবং এস্‌রাজ, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সম্ভবত কণ্ঠসঙ্গীতের মতন যন্ত্রসঙ্গীতও বেণী ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। তবলার প্রাথমিক শিক্ষাও তাই ; তবে শোনা যায়, তিনি রীতিমত তবলা শিক্ষা করেছিলেন নাকি একজন তবল্‌চির কাছে।

স্বামীজীর কনিষ্ঠভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, স্বামীজী বোলসহ একখানি তবলার বইও প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর তবলার বই প্রকাশিত হয়েছিল নাকি বটতলা থেকে, যেমন তাঁর লেখা 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' ছেপে-ছিলেন একজন সঙ্গীত-পুস্তক-প্রকাশক বটতলার ছাপাখানা থেকে। এ ছাড়া তাঁর রচিত 'গানের বই'ও একখানি নাকি ছাপা হয়েছিল, যার দু'চারখানি গান মাত্র আমরা ভিন্ন ভিন্ন গানের সংগ্রহ পুস্তকে এখন ছাপা দেখি।

স্বামী বিবেকানন্দ বেণী ওস্তাদের কাছেই বেশীর ভাগ সময় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। অনেকে বলেন, কয়েকজন মুসলমান ওস্তাদের কাছ থেকেও সঙ্গীতের অনেক জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গান তিনি বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণ ও রাগরূপসহ শিক্ষা করেছিলেন। এছাড়া ব্রাহ্মসমাজের ধ্রুপদাঙ্গ ভজন, বাঙলা টপ্পা ও টপ্-খেয়ালও তিনি অসংখ্য শিক্ষা করেছিলেন। প্রশংসাবাদ ও স্তাবকতার কথা ছেড়ে দিলে আমরা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতার মুখে শুনেছি, গলার স্বর তাঁর এতই সুমিষ্ট, সতেজ, সরল ও সুন্দর ছিল যে, যে-কোনো রাগের আলাপই ভাব ও রসের পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে প্রকাশ পেত তাঁর কণ্ঠে, পরিবেশ সৃষ্টি করত আনন্দঘন-লোকের।

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ' (মাসিক বসুমতী) থেকে সঙ্কলিত।]

●

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম পরিচয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের (ঠাকুর বলতেন সুরেশ) বাড়িতে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, গান শুনতে চান। সুরেন্দ্রনাথ আনলেন পাড়ার ছেলে নরেন্দ্রকে। শুভমুহূর্তে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের অপূর্ব মিলন ঘটে গেল। মন প্রাণ ঢেলে নরেন্দ্র আরম্ভ করলেন ব্রহ্মসঙ্গীত।

মন চল নিজ নিকেতনে।

সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥ ইত্যাদি।

গান শুনে মুগ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, পরিচয় জেনে নিলেন নরেন্দ্রের আর দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন—ডাক দিয়ে গেলেন বহু-প্রতীক্ষিত ভাবী শিষ্যকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে। শরীরের দিকে লক্ষ্য ছিল না নরেন্দ্রের, মাথার চুল ও বেশভূষা ছিল পারিপাট্যবিহীন, সবই যেন ছিল আলগা, দৃষ্টি অন্তর্মুখী। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দেখে আনন্দে আত্মহারা। একান্ত পরিচিতের মত নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন—'কিরে, এসেছিস ? এতদিন পরে ? বস্।' কিছুক্ষণ বসার পরই নরেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন একটি গান করতে। নরেন্দ্রনাথ আরম্ভ করলেন প্রিয় ব্রহ্মসঙ্গীত—'মন চল নিজ নিকেতনে।' গানটি গাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন।

●

২২শে অগস্ট, ১৮৮৫ খৃঃ। দক্ষিণেশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব দিবস। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটিয়াটিতে বসিয়া শুনিতেছেন।

১. অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তর যামিনী,

২. নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।

আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় পদচারণ

করিতেছেন। মাষ্টারও সেইখানে দণ্ডায়মান আছেন ও ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। নরেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'আহা, নরেন্দ্রের কি গান!'

মাষ্টার—আজ্ঞা, 'নিবিড় আঁধারে' ঐ গানটি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ও গানের গভীর মানে। আমার মনটা এখনও যেন টেনে রেখেছে।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

স্বামীজী-রচিত কয়েকটি সঙ্গীতের সুর তালের নাম ও প্রথম দুই তিন লাইন দেওয়া হল:

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন

মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥ ইত্যাদি।

শিব সঙ্গীত

(১) কর্ণাটি—একতালা

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বম্ বম্ বাজে গাল
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল॥ ইত্যাদি।

(২) তাল—সুর ফাঁকতাল

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত

মুলতান ঢিমা ত্রিতালী

মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া, যানেকো দে।
যানেকো দে রে সেঁইযা, যানেকো দে (আজু ভালা)॥ ইত্যাদি।

সৃষ্টি

খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়॥ ইত্যাদি।

প্রলয় বা গভীর সমাধি

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥ ইত্যাদি।

সঙ্গীতের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ

প্রশান্তকুমার পাল

স্বামী বিবেকানন্দ [নরেন্দ্রনাথ দত্ত] উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন, তাঁর জীবনবৃত্তান্তে এর পরিচয় সুপ্রচুর। এইরূপ সংগীত-পরিবেশনের সূত্রে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান বেছে নিয়েছেন, 'শ্রীম'-[মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 1854-1932] কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের পাঁচটি ভাগে তার অনেকগুলি বিবরণ আছে, অন্যদের বর্ণনাতেও কয়েকটি উল্লেখ দেখা যায়। স্বামীজীর সম্পাদিত সঙ্গীত-কল্পতরু [১২৯৪] গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান সংকলিত হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে যে, এই গানগুলি তিনি কোথা থেকে শিখেছিলেন? প্রশ্নটি বর্তমান অধ্যায়েই তোলার কারণ এই যে, তিনি যে-গানগুলি গাইতেন তার অধিকাংশই এই বছরে মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, তিনি উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং অসামান্য সুরজ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির জন্য একবার শুনেই গানগুলির সুর আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি—গানের কথার জন্য অসুবিধা হবার কথা নয়, শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণের জন্য 'গানের কাগজ' তো ছাপা হত-ই, তত্ত্ববোধিনীতেও সেগুলি মুদ্রিত হত।[১]

কথিত আছে, নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুলে দ্বিপেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। এই তথ্য যদি যথার্থ হয় তাহলে June 1876 [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩]-এর পূর্বেই তাঁদের সহপাঠী থাকা সম্ভব, কারণ 16 June [৩ আষাঢ়] দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথকে উক্ত স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়—নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সাড়ে বারো বছর। দ্বিপেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হন Jan 1875-এ [নরেন্দ্রনাথ তখন ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ছেন] সুতরাং তাঁরা প্রায় দেড় বছর একসঙ্গে পড়েছিলেন। এর পরে 1877-এ নরেন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে রায়পুরে চলে যান এবং 1879-এ কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সুতরাং সহপাঠী দ্বিপেন্দ্রনাথের সূত্রে 1875-76-এ তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া-আসা করে থাকতে পারেন, রায়পুর থেকে ফিরে আসার পরও এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা। দ্বিপেন্দ্রনাথই হয়তো তাঁকে

---

১. অবশ্য এই অনুমান একেবারে নিশ্ছিদ্র নয়। নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অন্য গীতি-রচয়িতাদের—দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি—গানও বিভিন্ন সময়ে গেয়েছেন। অন্তত এই গানগুলির কথা ও সুর তাঁকে অন্য সূত্রে সংগ্রহ করে নিতে হয়েছে। সেই ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানও আয়ত্ত করা অসম্ভব ছিল না।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশ [১২৮৬] ও একপঞ্চাশ [১২৮৭] সাংবাৎসরিক উৎসবে আমন্ত্রণ করেছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গেয়ে শুনিয়েছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের বিভিন্ন ভাগে[২] সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। কালানুক্রমিক ভাবে গানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল :

১. ২৫ চৈত্র ১২৮৯ [শনি 7 Apr 1883] 'গগনের থালে রবি চন্দ্রদীপক জ্বলে' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ১৪]। উল্লেখযোগ্য যে, গানটি ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল ; তাছাড়া সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থে নানকের মূল রচনা সহ [পৃ ১৩৫-৩৬] সংকলিত হয়। ২৭ বৈশাখ ১২৯২ [শনি 9 May 1885] তারিখে নরেন্দ্রনাথ গানটি পুনরায় পরিবেশন করেন [দ্র ৩য় ভাগ, ১৫শ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ। ১৬৭]

২. ৩০ ভাদ্র ১২৯১ [রবি 14 Sep 1884] 'দিবানিশি করিয়া যতন' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ১৯শ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ১৫০] ; গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

৩. ২৯ ফাল্গুন ১২৮১ [বুধ 11 Mar 1885] 'দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে' [দ্র ১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ। ২০৪] ; গানটি ৫ বৈশাখ ১২৯৩ [শনি 17 Apr 1886] তারিখেও গাওয়া হয়েছিল [দ্র ৪র্থ ভাগ, ৩৩শ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ। ২৯১]। উল্লেখযোগ্য যে, কথামৃত গ্রন্থে দু-জায়গাতেই 'সব দুঃখ দূরে করিলে দরশন দিয়ে' পাঠ দেখা যায় এবং এই কারণেই অনেক গবেষক এটিকে রবীন্দ্রসংগীত বলে চিনতে পারেন নি। গানটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। ১১ মাঘে গাওয়া গান ২৯ ফাল্গুনে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে উঠে এসেছে—রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তার সচেতনতা ও আগ্রহের এই দৃষ্টান্তটি অবশ্যই লক্ষ্য করবার মতো।

১. শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমথনাথ বসুর 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখেছেন, "মহর্ষির কথায় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানগোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, মহর্ষি তাঁদের 'প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণের জন্য ধ্যানাভ্যাস-প্রণালী' শিক্ষা দিতেন। ধ্যানান্তে কে কেমন উপলব্ধি করেছে, তার পরিচয় নেবার সময়ে মহর্ষি নরেন্দ্রনাথের উপলব্ধির গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।" —বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৪[১৩৮৭]। ১৬৯-৭০ ; মহর্ষি কলকাতায় খুব কম সময়ই থাকতেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যোগাযোগের যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। মনে হয়, ফাল্গুন ১২৮৬ [Feb 1880]। দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথের ব্রহ্মদীক্ষা উপলক্ষে মহর্ষি যখন প্রায় এক মাস কলকাতায় ছিলেন, সেই সময়েই এই ধ্যানাভ্যাস-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছিল।

২. পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি নির্দেশ করার জন্য আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত সংস্করণগুলি ব্যবহার করেছি।

৪. ৩১ আষাঢ় ১২৯২ [মঙ্গল 14 Jul 1885] 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ২৩ খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ২২৫]; গানটি দ্বিতীয়বার গাওয়া হয় ৯ কার্তিক ১২৯২ [শনি 24 Oct 1885] তারিখে [দ্র ৪র্থ ভাগ, ২৮শ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ২৬৮]। এটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। শ্রীম ২৯ ফাল্গুন ১২৯১ তারিখের বিবরণে [দ্র ১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ। ২০৫] অন্য প্রসঙ্গে গানটির প্রথম দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ এই দিন বা এর আগে কোনো দিন হয়তো এটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন [অবশ্য অন্য সূত্রেও শ্রীম গানটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকতে পারেন]।

৫. ৯ কার্তিক [শনি 24 Oct 1885] 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ২৮ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেব। ২৬৮]। এটিও বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার প্রমথনাথ বসু উল্লেখ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পরীক্ষার প্রথম দিন [31 Dec 1883 সোম ১৭ পৌষ ১২৯০] প্রত্যুষে চোরবাগানে বন্ধু হরিদাস ও দাশরথির বাসার সামনে গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।[১]

৬. ১২ কার্তিক ১২৯২ [মঙ্গল 27 Oct 1885] 'এ কি সুন্দর শোভা' [দ্র ১ম ভাগ, ১৮ শ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ২৪৬], গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে সায়ংকালীন অধিবেশনে গাওয়া হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, তিনি এই গানটি কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দকে গাইতে শুনেছিলেন।[২]

৭. ২৫ বৈশাখ ১২৯৪ [শনি 7 May 1887] 'আমরা যে শিশু অতি, ক্ষুদ্র মন' [দ্র ২য় ভাগ, পরিশিষ্ট ২য় পরিচ্ছেদ। ২৫৮-৫৯]। এই গানটি দিয়েই বর্তমান বৎসরে মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনা শুরু হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ গানটি গেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় ন-মাস পরে বরাহনগর মঠে, এর পূর্বেই [Jan 1887, ? মাঘ ১২৯৩] তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

কথিত আছে, ১৫ শ্রাবণ ১২৮৮ [29 Jul 1881] তারিখে রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহানুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ 'দুই হৃদয়ের নদী' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ-রচিত বিবাহ-সংগীত গেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গানটি সঙ্গীত-কল্পতরু-তে সংকলিত হয়।

ক্ষিতিমোহন সেন সাক্ষ্য দিয়েছেন, পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ কাশীতে [? 1988, ১২৯৫] যজ্ঞেশ্বর তেলীর বাড়িতে উপরোক্ত 'এ কি এ সুন্দর শোভা, গানটির সঙ্গে 'মরি লো মরি, আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে' এবং 'সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে যোগী ভিখারি' গান দুটিও গেয়েছিালন।[২] 'মরি লো মরি'

---

১. প্রমথনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ [১৩২৬]। ৯০-৯১

২. দ্র 'বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত', শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৬৫

গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধ [১২৯১] নাট্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত, রবিচ্ছায়া [১২৯২]-তেও সংকলিত হয়েছিল ; কিন্তু পরবর্তী গানটি প্রথম মুদ্রিত হয় গানের বহি [বৈশাখ ১৩০০ [-তে, রচনাকাল অজ্ঞাত।[২] আচার্য সেনশাস্ত্রীর স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে থাকে তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গানটি ১২৯৫-এর পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ স্বামীজীর গানের খাতার ৫৭ পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃত করেছেন উদ্বোধন পত্রিকার অগ্র° সংখ্যায়। গানটি হল তত্ত্ববোধিনী, কার্তিক ১৮০৬ শক [১২৯১] সংখ্যায় প্রকাশিত 'তাঁহারে আরতি করে' চন্দ্রতপন' [রবিচ্ছায়া। ১০৩-০৪] —বিবেকানন্দ এটি নানাভাবে চিহ্নিত করে লিখে রেখেছিলেন। সুতরাং এটির সুর তিনি জানতেন এবং মাঝে মাঝে গেয়েও থাকতে পারেন।

তাছাড়া সঙ্গীত-কল্পতরু-র ভূমিকায় 'সঙ্গীত ও বাদ্য' প্রবন্ধে 'স্বর সাধনা' অনুচ্ছেদে তিনি ভৈরব রাগের সরগম দিয়ে ভৈরব কাওয়ালিতে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানটির প্রথম দু-কলির স্বরলিপি দিয়েছেন। এই গানটিও বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, কয়েকটি গান গেয়ে শোনানোর বিবরণও পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল উপরে উল্লিখিত বারোটি গানের মধ্যে ছ'টিই বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল, যা তাঁর উক্ত উৎসবে উপস্থিতির সম্ভাবনাটিকে স্পষ্ট করে তোলে।

সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থের 'সঙ্গীত সংগ্রহ [পৃ ৯১-৪৭৯] অংশে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত সঙ্গীতগুলি সংকলিত হয়েছিল :

জাতীয় সঙ্গীত

১. পৃ ১০০-০১ রাগিণী-বাহার। অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখি দ্র গীতবিতান ৩।৮১৬

২. ১০৩ রাগিণী জয়জয়ন্তী। তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ দ্র " ৩।৮১৯

৩. ১১০-১১ অহং-একতালা। দ্যাখরে জগৎ মেলিয়া নয়ন [সরোজিনী নাটকের 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ' গানটির শেষ ১৬টি ছত্র, স্বভাবতই 'জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর' নামাঙ্কিত]

৪. ১১১-১৩ রাগিণী-ভৈরবী। ভারতরে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি দ্র গীতবিতান ৩।৮১৫

৫. ১৩০-৩১ ঝিঁঝিট-একতালা। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক দ্র ঐ ৩।৮২০

ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত। / ব্রহ্মসঙ্গীত

৬. ১৩৬ জয়জয়ন্তি-ঝাঁপতাল। গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে দ্র ঐ ৩।৮২৭
[১৩৫ পৃষ্ঠায় নানকের মূল গানটি সংকলিত হয়েছে]

৭. ১৪৮-৪৯ সাহানা ঝাঁপতাল। দুই হৃদয়ের নদী, একত্রে মিলিল যদি
দ্র. গীতবিতান ৩।৬০৯

৮. ১৭৮-৭৯ রাগিণী জঙ্গলা ভূপালী। কালী কালী বলোরে আজ
দ্র. গীতবিতান ৩।৬৩৮

প্রণয়-সঙ্গীত

৯. ৩৭৯-৮০ ঝিঁঝিট-একতালা। গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে দ্র. গীতবিতান
৩।৭৫৬-৫৭

[গানটি 'ভানুসিংহ ঠাকুর' নামাঙ্কিত]

বিবিধ সঙ্গীত

১০. ৪০০ পিলু-খেমটা। বল, গোলাপ মোরে বল্ দ্র ঐ ২।৪২২-২৩

এই গানগুলির মধ্যে 'দিবানিশি করিয়া যতন', 'দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে', 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', প্রভৃতি যে গানগুলি স্বামীজী এক বা একাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন, সেগুলির অনুপস্থিতি খুবই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এমন নয় যে, এই গানগুলির ভাব, ভাষা বা সুর সংকলিত অন্যান্য গানের তুলনায় নিকৃষ্টতর—তবু যে গানগুলি সংগীত সংগ্রহে স্থান পেল না তার কারণটি একটু ভেবে দেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান 'জাতীয় সঙ্গীত' [২য় সং, 1878], নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত 'সংগীত সংগ্রহ' [1383], 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' প্রথম [1884] ও দ্বিতীয় ভাগ [Apr 1886]. আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের পঞ্চম থেকে অষ্টম ভাগ ও রবিচ্ছায়া [১২৯২] গ্রন্থে সঙ্গীত-কল্পতরু-র পূর্বেই যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছিল। সুতরাং সঙ্গীত-কল্পতরু-তে তাঁর তাঁর মাত্র দশটি গানের সংকলন তাঁর সংগীতের বহুল প্রচারের পক্ষে যে যথেষ্ট ছিল না একথা মানতেই হবে। কিন্তু দুই মনীষীর পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য—রবীন্দ্রজীবন-রচনায় এই গ্রন্থটির বিস্তারিত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এইখানেই।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি ভাবনা

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

"Art must be in touch with nature—and wherever that touch is gone, Art degenerates—yet it must be above nature."[১]

'শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।'

এগুলি সাধারণ কথামাত্র নয়, যেন অক্ষয় অমোঘ সঞ্জীবনী মন্ত্র। এই মন্ত্রের সিদ্ধিই সত্যশিল্পের প্রাণ। বস্তুতঃ, স্বামী বিবেকানন্দের যে-কোন ভাবনাই প্রায়শই শিল্প চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁর সকল চিন্তাভাবনাই গড়ে ওঠার, তৈরি হওয়ার সৃজনীসত্তায় পূর্ণ। মানুষের দুর্দশায় স্বামীজী কাতর হয়ে কাঁদছেন, মানুষকে আপন শক্তির উদ্বোধনে ডাক দিয়েছেন, বিত্তশালী মানুষকে যথেচ্ছ আচরণে ধ্বংসের দিকে ধেয়ে যাওয়া থেকে বিরত হতে বলছেন, সাবধান করছেন—এ সবই কিন্তু চলমান চিত্রেরই মৌলিক সাকার বর্ণময় পট। তাঁর 'হে ভারত' কিংবা 'হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' সম্বোধনও সেই একই চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

আমরা তাঁর বর্ণিত মানুষের প্রতি ভালবাসার, অধীরতায় ভাবনায় একনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি এবং তাঁর আরও নানা অনুভূতি ও চিন্তা বা ভাবনায় নিবিষ্ট হতে পারছি না। এর কারণ অনেক হতে পারে। সূর্যের চারিপাশের বৃত্তে ঘুরলে তার বিচ্ছুরিত প্রভার কোন তারতম্য ঘটে না। উদিত বা অস্তমিত সূর্যের আংশিক দেখতে পাওয়ার অর্থ এই নয় যে—বাকি অংশটি নেই। এই শাশ্বত পূর্ণতার মন ও আরাধনা নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে হবে। মনোলোকের গভীরতম মানবিক ভালবাসায় তা পূর্ণ। তিনি এমন কিছু বলেননি ; যা মানুষের নাগালের বাইরে। বর্তমানে মানবিকতার আলোচনায় "Human touch" শব্দ দুটির বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে তার বহমান অনুভূতির মূলে মন্ত্রই ছিল ঐ মানুষের প্রতি ভালবাসার স্পর্শ।

আমরা স্বামীজীর শিল্পভাবনার আলোচনা করতে চাই। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর পারঙ্গমতার প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং তাকে আরও বাঁধনে বেঁধে ফেলার বাসনায় অধিকতর ভিন্ন উপমার সংযোজনে তাকে বিশেষ ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলার বাসনা আমাদের নেই। যে-কোন ভাবনা ও বিষয়ে তাঁর যে অনায়াস যাতায়াত ঘটত অবলীলায় এবং গভীরতম অনুভূতিতে, সেই সত্যের উপলব্ধিটুকুই আমাদের চর্চার

বিষয়। প্রবন্ধের সূচনায় উল্লেখিত উদ্ধৃতিটি একটি বিশেষ বোধের উন্মেষই ঘটায় না, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির একটি নতুন অথচ মৌলিক ধ্যান ও তার সিদ্ধির যথাযথ পথের ইঙ্গিতও দেয়। উক্তির আরম্ভেই দেখতে পাব শিল্পতত্ত্বের কত গভীর অনুপ্রবেশের অভিব্যক্তি এবং শিল্পকলার তাত্ত্বিক অথচ নিখুঁত করণ-কৌশল সাধনার অতি সূক্ষ্মতম অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশও।

শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে যে শিল্প-সৃষ্টির আরাধনায় নিরত মগ্ন, তার মূল কথাটি কত সহজেই তিনি বলেছেন। কিন্তু বিস্ময় যেখানে, সেটি হল এই ভাবনা-স্তবকের ভিতর দিয়ে এলে একবারও মনে হয় না যে, তিনি নিজে শিল্পী নন। এবং সে-কারণেই আমি সবসময় তাঁকে একজন শিল্পী হিসাবেই বার বার দেখতে ভালবাসি। ভালবাসি তাঁর ঐ মৌলিক বিরাটত্বের উন্মেষকে। নিজের বৃত্তি দিয়ে ঐ অনুভবের অসামান্যতাকে অনুভব করার চেষ্টা করি—হৃদয়-বোধের অনুভব ছাড়া হঠাৎই শিল্পের এমন গূঢ় কথা উচ্চারণ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। কেবল তাই নয়, শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা এক জিনিস, আর তার মধ্যে নিহিত সত্যসাধনার মূলমন্ত্র প্রকাশের ধ্যান আর এক। স্বামীজী এক জায়গায় কেমন চমৎকার ভাবে বলেছেন: "বোঝে প্রাণ বোঝে যার"।

আমরা সাধারণভাবে যা দেখি তাকেই যদি হুবহু পটে উপস্থাপিত হতে দেখি তখনই তাকে চিত্র বলে মেনে নিতে একবারও দ্বিধা করি না। কিন্তু হুবহুও পরি-চর্চার মধ্যেই যে সত্য-প্রকাশের পথটি বন্ধ হয়ে যায়, সেকথা আমরা কজন বুঝতে পারি? কেবল তাই নয়, শিল্পসৃষ্টির জগৎ যে-ভাবকে প্রকাশ করবে তার সঙ্গে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের সঙ্গী হিসাবে প্রত্যক্ষ ও সঞ্চয়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন এবং এই অবলোকন ও আহরণের ব্যবহারের মধ্যেই শিল্পের উত্তরণ ঘটবে। একজন শিল্পী কেবলই প্রকৃতির প্রতিকৃতি রচনা করেন না। শিল্পী অসীম প্রকৃতির অনন্ত লীলার আর এক জগৎকে দেখতে পান এবং তাকেই রসস্বরূপে পটে প্রতিষ্ঠার সাধনা চালিয়ে যান। যেখানে এই চলায় তিনি সিদ্ধকাম হন, সেখানেই তাঁর চিত্রিত পট তার সত্য-কারের পরিচয় ও প্রাণ নিয়ে চিরদিনের বলে অক্ষয় হয়ে যায়।

পশ্চিমী শিল্পচর্চার অধ্যায়ে অধ্যায়ে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা এবিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি। তাঁদের শিল্পকলাকে সময়ের ব্যবধানে স্বামীজীর দেখা সত্যচিত্রের আভাসেই স্পষ্ট করে দেখতে পাই আমরা। এবং এই দেখার জন্য দীর্ঘ বছর দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে। পূর্বোল্লেখিত স্বামীজীর উদ্ধৃতির সবচেয়ে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি হল: "প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।" এই অতিক্রম করাই হল শিল্পীর সবচেয়ে দুরূহ সাধনা। এর আগের অংশটি—অর্থাৎ "শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে"—এটি প্রতি-

পালন করার চর্চা চলতে পারে, কিন্তু সমস্তকিছুকে অধিগত করে তার বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে নতুনভাবে পটে উপস্থিত করার সাধনাটি যে কত গভীর তা কেবলমাত্র একান্ত অনুভবের ও মননের বিষয়।

এই 'অতিক্রম' করার দুরূহ সাধনার বিষয়েও সে দেশের শিল্পীরাও বলছেনঃ যা দেখছি তাই সব নয়। দেখছি আর দেখার পর মনকে নাড়া দিয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাল-লাগার ছাপ রেখে তাকে নিজের মতো করে পটে ফুটিয়ে তুলছি। তা-ই হল শিল্প-সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। এর উপমায় তাঁরাই বলছেনঃ গভীর অন্ধকারের পর ঊষালগ্নে বাইরের জানালা খুলে প্রথম আলো দেখার যে অনুভূতি এবং ভাবের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে হয় তাকেই বর্ণে রূপে আকারে প্রাণ দেওয়া এবং যার সঙ্গে দেখা জায়গার সংযোগও থাকবে। তাতে কেবলই যা দেখলাম তাকে প্রতিফলিত করার একমাত্র প্রচেষ্টা থাকবে না। পাশ্চাত্য শিল্পকলার জীবনে এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের নিরন্তর সাধনা লক্ষণীয়। এই হুবহু দেখায় কি আকারে কি বর্ণে উভয় ক্ষেত্রেই মনের ভাল লাগার অগ্রাধিকার স্বীকৃত, কিন্তু কোন কারণেই তা বাহ্য জগতের সঠিক রূপ থেকে আহরিত নয়, এমনও নয়। এখন সৃষ্টিতে শিল্পী তাঁর মনের ভাব-ভাবনাকে আশ্রয় দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে সচেষ্ট হচ্ছেন পটে। এই সচেষ্টতাই পাশ্চাত্য শিল্প-সম্ভারে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে —যা দেখে কেবলই প্রকৃতির নকল না মনে হয়ে চিত্রকরের আঁকা ছবি বলে প্রত্যয় জন্মায়।

স্বামীজী শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকার যে কথা বলেছেন তা শিল্পীদের একান্ত সাধন-পথের নির্দেশ। সত্যকারের তীক্ষ্ন দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ ও চর্চার ভিতর দিয়ে প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সংযোগ না থাকলে পটে চাক্ষুষ দেখাশোনা প্রকৃতির রূপের উত্তরণও ঘটানো যাবে না চিত্রপটে।

ভাব প্রকাশের আকারগুলির সম্যক্ নিখুঁত ধারণা ও চর্চা না থাকলে তাঁকে নিজের দেখার মতো করে গড়ে দেওয়া কখনই সম্ভব হয় না। এর একটি উজ্জ্বল সত্যচিত্র রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবহৃত যে প্রতীক তার মধ্যে দেখি। ছন্দে বন্ধে আকারে জগতের নিত্য বস্তুগুলির সঙ্গে সংযোজিত থেকেও এখানে এক ভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। তরঙ্গময় জলরাশি, পদ্ম, সর্প, হংস, উদিত সূর্য সবই নিত্য দেখার আকার, কিন্তু ভাগত ও চরিত্রগত বিন্যাসগুণে সেগুলির সম্মেলনে একটি বিশেষ আদর্শ ও ভাবকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও তাকে অতিক্রম করার এটি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু এই নিদর্শন কোন কারণেই কখনই প্রকৃতির সত্যকে অস্বীকার করে নয়।

আমাদের দেশের শিল্পীদের হৃদয়ে সেই সত্য দর্শনের বোধ ছিল বলেই আজও আমরা নাম-গোত্রহীন শিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পশৈলীর গুণে আর ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হচ্ছি। আজও মানুষ অজন্তা, ইলোরার লৌকিক শিল্পকলার অনুপম রূপে আকৃষ্ট হচ্ছে।

সাশ্চাত্য শিল্পশৈলীর চর্চায়ও আরম্ভ হয়েছে ঐ দৃশ্টির সচেতনতা। ঐ সত্যেই আমরা বর্তমানকালের পশ্চিমের বিখ্যাত শিল্পীদের কাজের সামনে দাঁড়াতে পারছি এবং তাদের এই পরিবর্তনের আশ্চর্য প্রকাশের বাতাবরণের ছায়াতলে দেখার সুযোগ ঘটছে।

শরীর-সর্বস্ব শিল্পসৃষ্টিকে আমরা এখন ফটোগ্রাফির পর্যায়ভুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করি না। ফটোগ্রাফির সঙ্গে সৃষ্ট-চিত্রের এই তফাতই শিল্প আর স্থিরচিত্রের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

"অতিক্রমও করতে হবে" --এই কথাটি বার বার উল্লেখ করার একটিই কারণ প্রকৃতিকে যথার্থভাবে দেদখা-জানার ভিতর দিয়েই বস্তুর সত্যরসের সন্ধানে পেঁছিতে হবে, যেখানে সৃষ্টিতে শিল্পীর মনের ভাব-ভাবনার স্বাক্ষর থাকবে। শিল্প যেখানে কেবলই প্রকৃতির বাইরের রূপ-বন্ধের নিছক প্রতিফলনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে সেখানে শিল্প পূর্ণতার স্বাদ থেকে বঞ্চিতও হয়। হুবহু নকল যে ছবি নয় একথা আমাদের বলতে চেয়েছেন স্বামীজী। কেবলমাত্র নকল করার মুন্সিয়ানায় মন কাজ করে না। নকলের প্রয়াস কেবল যান্ত্রিকভাবে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্মাণের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মন ব্যস্ত হয়ে পড়ে এই ভাবনায় তাড়নায় যে সত্যিকারের যথাযথ প্রকাশ করতে পারছি। কিন্তু মনোলোকের ভাবরাজ্যের কপাটর চাবি তার হাতে থাকে না যা দিয়ে সে সেই জগতের দুয়ার খুলে সত্য ছবির মুখোমুখি হবার প্রয়াসী হতে পারে। এও শিল্পীর জীবনে আর এক বিপর্যয়। তবু এখনও আমরা সেই নকলনবিসির ক্ষমতাকেই সৃষ্টির ক্ষমতার সঙ্গে এক আসনে বিচার করতে দ্বিধা করি না। যথাযথ রূপ আর রূপকে যে ভিন্নতা তা দেখতে সমর্থ হই না, বুঝতে চাই না রূপকের মধ্যে রূপের বাসা বাঁধা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের এই নিরীক্ষণ কিন্তু কেবলমাত্র স্বপ্নবিলাসই ছিল না। এমনও ছিল না যে সুখাসনে বসে তিনি সমস্ত শ্রমজীবী, খেটে-খাওয়া মানুষের কথা ভেবেছেন. আর সে সুখাসনের ভাবনার পরিবশেই তাদের জন্য কথা বলেছেন। তিনি যথার্থ শিল্পীর মতো নিত্য চর্চার মধ্য দিয়েই এছবির বিষয়ের কুশীলবদের উপস্থিত করে তবে চিত্র রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এদের নিখুঁতভাবে তীক্ষ্ম অথচ সঞ্চয়ী দৃষ্টি দিয়ে না দেখলে এমনভাবে কি ডাক দেওয়া যায় ?"

"বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"[১]

এ সবই কিন্তু বিলাসের স্বপ্নিল দেখা নয়, আর ছবিও নয়। মুচি, মেথর আপামর

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২

শ্রমজীবী জীবনের আঁচ অনুভব ও তাদের নিত্যদিনের বসবাসের পরিবেশের পাশে বসে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে একান্ত মমতায় তাদের সঙ্গী হয়েই চিত্রপটে তাদের হৃদয়ের কথা ব্যথা-বেদনা ও সেই সঙ্গে উত্তরণের ইঙ্গিত পটে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

"একা আমি হই বহু"—

এই স্বপরিচয় এক অনাহত সত্যের গভীরতম অভিব্যক্তি। এই ভাবনার প্রকাশ নিজের মধ্যেই নিজের লীন হয়ে যাওয়ার এক বিস্ময়কর চেতনার ছবি। এক আমির বহু পরিচয়ের পরিচিতিতে আরও কয়েকটি বিভিন্ন অনুভবের দরজায় পেঁছিলে কেবলই মনে হবে এই কি সেই শিল্পী যিনি মানুষের কল্যাণে মানুষের বেদনায় অস্থির হচ্ছেন? এই কি দেই মন যা সমাজের উচিত কর্তব্য-করণের প্রতি সচেতকের আসনে সমাসীন থেকে উচিত করণ-কর্তব্যের সাবধান করছে? হ্যাঁ, সেই একই শিল্পী— জীবনশিল্পী বিবেকানন্দ—প্রকৃতির অসীমতার সামনে দাঁড়িয়ে যাঁর চোখে প্রকৃতির ঐশ্বর্যের আর তাঁর দেখা মানুষের রূপের পার্থক্যই থাকছে না। দুটি আকারের ভিন্নতার মাঝে একই সত্তাকে অবলোকন করছেন তিনি। আমরা অনেকেই তাঁর এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ভাব-ভাবনার চিত্রগুলির কথা ভাবতেই পারি না। কারণ, প্রথমেই বলেছি; আমরা তাঁকে কেবলই এক ভাবনায় দেখার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এবং মানুষকে ঐভাবে দেখার ও মানুষই আমার প্রথম 'উপাস্য দেবতা' বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিমাকে সাষ্টাঙ্গ করা আর প্রকৃতির অসীমতাকে সাষ্টাঙ্গ করা একই নয় কি? ঠিক ঐ একই প্রত্যয়ে অনুভব করতে পারব তাঁর এই পঙ্ক্তিগুলি ঃ

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল,
শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ—
তাহে তারতম্য তারল্যের,
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়
বহে বায়ু আপনার মনে।[১]

পঙ্ক্তিগুলিতে নিরীক্ষণের তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা লক্ষণীয়। "তাহে তারতম্য তারলের"। সামান্য পরিবর্তনের ছায়াটিও তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি আরও ভিন্নতর প্রকাশে দেখবার ঃ[৩]

ঐ আসে তুলারাশি সম,
পরক্ষণে হের মহানাগ,

---

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৭৭
২. ঐ, পৃঃ ২৭৮
৩. ঐ, পৃঃ ২৭৭

দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম।

এই অবলোকনই শিল্পীর অন্তরপৃষ্ট শিল্পবোধের অসাধারণ অভিব্যক্তি।

এই অবলোকনই তাঁকে যথাযথ আকারের সঙ্গে সাদৃশ্যের পথের ভিতর দিয়ে ভিন্ন এক অনুভবে উপস্থিত করে দিচ্ছে। শিল্পশাস্ত্রে সাদৃশ্যের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উত্তাল জলরাশির উদ্দামতা ও উন্মত্তভাবে এগিয়ে আসার সঙ্গে উন্নতফণা নাগের ক্রোধের সংযোগ এবং সেই সঙ্গে সাগরের গর্জনের সঙ্গে সিংহের বিক্রম প্রকাশের এক সমন্বয় সন্ধানে পৌঁছে যাওয়া। দেখছি এক, আর সেই দেখার ভিতর দিয়েই আর এক দেখার দৃশ্য উন্মোচিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে একটি বিশেষ ভাবের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ঘটে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে।

এমন দেখার চরম ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হল "মৃত্যুরূপা মাতা"-র চিত্রপটটি। ঐ পটে স্বামীজী শিল্পীর দেখার পারঙ্গমতার ঐশ্বর্যের সঙ্গে ভাবের এক অসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ সম্মেলন ঘটিয়েছেন। যেখানে চিত্রকর নিজেই এই রচনার সময়েই মর্ত্যজগতের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এইসব ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করলে কখনই মনে হবে না পারিপার্শ্বিক লীলা-জগতের সঙ্গে বিচ্যুত হয়ে ঐগুলি রূপ পেয়েছে। আসলে সমস্ত শিল্পজগতের কর্মযজ্ঞের মধ্যে এই একই পূর্ণতা বর্তমান। স্বামীজী সবসময়ই সেই পূর্ণতাকে লক্ষ্য করেই অগ্রসর হবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কেবল স্মরণ নয়, তার নির্দেশটিও সঙ্গে দিয়ে সচেষ্ট হতে বলেছেন। এমন সব ভাবনার ভিতর নিজে যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন তখনও শিল্পের জন্য ভাবনার কথা কোন কারণেই ভুলে যাননি। একথা আমরা যেন ভুলে না যাই। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্ম-লগ্নেই শিল্পের স্বীকৃতিই নয়, তার বিকাশের জন্য উৎসাহদান করার কথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন।[১]

শিল্পের সৌকুমার্য ও সৌন্দর্যের বাতাবরণকে শিক্ষায়তনের পরিবেশ স্থাপনের ইচ্ছাও বারবার প্রকাশ করেছেন তিনি। কজন শিক্ষাবিদ ঐ ভাবনা করেছেন? সমস্ত শিক্ষায়তনটি জুড়ে শিল্পের আবহাওয়া গড়ে তোলার পিছনে স্বামীজীর যে ইচ্ছা কাজ করেছে তাকে মানসনেত্রে অনভব নয়, স্পষ্ট করে দেখতে পারলে বোঝা যাবে কি স্বচ্ছ যৌন্দর্য-পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন তিনি। পাঠ্যপুস্তকের পাতার গভীরে নিমগ্নতাই পাঠের বা জ্ঞানের শেষ কথা নয়, শিক্ষায়তনের পরিবেশের মধ্যে যেন থাকে শিল্পের বাতাবরণ, প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে সংযোগ। বেলুড় মঠের মন্দির নির্মাণ-শৈলীর কুশলতার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর দিয়ে যে ভাবকে সাকাররূপ দিতে চেয়েছেন স্বামীজী, সেইটিই আমাদের আগে ধারণা হওয়া প্রয়োজন।

তিনি কখনই পুরাতনকেই বার বার প্রকাশের ইচ্ছা ও প্রতিষ্ঠাকে প্রশ্রয় দেননি। রামকৃষ্ণদেবকে আশ্রয় করে দিকে দিকে নব নব ভাবনার প্রকাশের এক সূর্যোদয় ঘটুক

এই ছিল তাঁর সকল চেতনার মূলে। মন্দিরের স্থাপত্য-শৈলীর নতুনত্বের সঙ্গে অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও এক বিশেষ শৈলী ও ভাবের রূপ সংযোজনের কথা ভেবেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, মন্দিরে মূর্তি বা চিত্রকল্পের কথায় বলেছেন: "জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত কার যাব।" কিন্তু এখানেই শেষ করে দেননি। আমরা যাঁরা তাঁর ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁদের জন্যও দায়িত্ব রেখে গেছেন: "নতুবা ভাবী generation এগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করনে পারে তো করবে।"[১]

আমাদের প্রতি যাঁর এই গভীর ভালবাসা, যাঁর সমগ্র জীবন-অঞ্জলি, সেই হৃদয়ের ইচ্ছার পূর্ণে দায়িত্বের কথাটি যেন আমরা স্মরণ রাখি। এ-প্রসঙ্গে সেই উদাত্ত অঙ্গীকার আমরা স্মরণ করছি:

"We have taken up the Cross Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen."

সত্যি কি আমরা তাঁর আপ্রব্ধ কর্মকে, তাঁর স্বপ্নকে সার্থকতায় উত্তরণের কাজে নিজেদের সামিল করতে পারি না? বিবেকানন্দ কি কেবল এক বিস্ময়কর মহামানব হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবেন—লেখায়, পড়ায়, সভায়, সমিতিতে, মন্দিরে আর আলোচনায়?

আমাদের কাজ হবে, স্বামীজীর কথাতেই বলি: "উষাকালীন শিশিরসম্পাতের ন্যায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করা।"[২]

এই প্রস্ফুটিত করার, ফুটিয়ে তোলার নিরন্তর নীরব সাধনার ভিতর দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার নবযুগের পূর্ণতা আসবে।

বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

স্বামী বলদেবানন্দ

এক

"ভারতে কখন হইতে যে মন্দির গঠন প্রথা প্রচলিত হইল তাহার কোন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। মোহেন্-জো-দড়োর প্রাচীন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলমোহরের উপর দেব-দেউলের চিত্র ক্ষোদিত আছে দেখা যায়। বৌদ্ধযুগেই মন্দিরের কথা প্রথম শোনা যায়। ভিলসার বাসুদের মন্দিরের হিলিয়োডরাসের গরুড়স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দেও হিন্দুমন্দির নির্মিত হইত।

বৌদ্ধদের মধ্যে মন্দিরে পূজা করিবার কোন বিধি বা পদ্ধতি না থাকিলেও বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই মন্দিরের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেব যখন সারনাথে ধর্মপ্রচার করবার জন্য অবস্থিতি করতেন, তখন বহু ভক্ত তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য সুগন্ধ পুষ্প ও অর্ঘ্য লইয়া আসিতেন। যখন বুদ্ধ আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করিতেন তখন ভক্তেরা একটি কুঠরির মধ্যে পুষ্প ও অর্ঘ্য রাখিয়া দিতেন, সেই কুঠরিটি "গন্ধকুটী" নামে আখ্যাত হয়, পরে সেই সৌধটি "মূলগন্ধকুটী" আখ্যা পায়।

"ইহাই বৌদ্ধ দেবদেউলের সূচনা ও প্রথম সৃষ্টির নিদর্শন।"[১]

ভারতে কিভাবে দেবদেউলের প্রচলন শুরু হয়—তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানলাম—প্রাগুক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে। এবারে আলোচ্য শ্রীমন্দির প্রসঙ্গে আসা যাক।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমর্থনেই স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল শ্রীপ্রভুর পূত-দেহাবশেষ গঙ্গারই তীরে কোথাও প্রোথিত হয় এবং তদুপরি সমগ্র উদার ভাবের পরিপোষক, ভাব-গম্ভীর সৌন্দর্যপুষ্ট একটি বৃহদায়তন মন্দির স্থাপিত হয়—যেখানে যেকোন ভাবের সাধক তার অনুকূল পরিবেশ বোধ করতে পারে।[২]

১. ভারতের দেবদেউল—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (১৯৪১) পৃষ্ঠা ২৩২

২. "It was Swami Vivekananda's desire that this temple for Sri Ramakrishna Paramahamsa should embody features of the temple architecture of different creeds and religions so that everyone who came here to pray could feel at home and realize the great principle of universal brotherhood."

—Prabuddha Bharata—January 1953.

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কতই না বৃহৎ এবং কারুকার্যময় প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরাদি দেখা যায়! তার প্রত্যেকটিতেই উচ্চ উচ্চ ভাবের পরিবেশ (প্রভাব) দেখা গেলেও অনেক সুষমার অভাবও মনে জাগে। বাংলাদেশের নরমমৃত্তিকাতে বিশেষতঃ গঙ্গার আসপাশে কোনো বৃহৎ আকার দীর্ঘস্থায়ী মজবুজ প্রস্তর-নির্মিত মন্দির সম্ভব হয়নি। বাংলার স্থানে স্থানে কিছু পোড়ামাটির (Terra-cotta) অতিসূক্ষ্ম সুন্দর শিল্পশৈলীর নিদর্শন দেখা গেলেও তার স্থায়িত্ব কয়েক শ' বছর মাত্র বলে অনুমেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহান ভাব অন্ততঃ এক হাজার বছর বিশ্বাসীকে সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত করে চলবে—এই দৃঢ়বিশ্বাসে স্বামীজী গঙ্গারই তীরে যে বৃহৎ মন্দিরের পরিকল্পনা ক'রে স্বীয় গুরুভ্রাতা, স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাহায্যে নক্সা তৈরী করিয়েছিলেন সেই নক্সা অদ্যাপি বেলুড়মঠে সংরক্ষিত আছে।[১]

স্বামীজী এই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পরিকল্পনা করবার সময়ে কেবল ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নক্সা নিয়ে স্বামীজীর কথাবার্তার বিবরণ দিয়েছেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর "স্বামী শিষ্য সংবাদে"। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প-সম্বন্ধে মত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির নির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা ক'রব"। কিভাবে "বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর" স্থাপিত প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে, যার "দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে," "মন্দিরের মধ্যে একটি রাজহংসের উপরে ঠাকুরের মূর্তি" রাখা হবে, এবং প্রবেশদ্বারের কাছে সিংহ ও মেষের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে মহাশক্তি ও মহানম্রতার মিলন দেখানো হবে—তা তিনি ব্যাখ্যা করে বলে দিলেন। মন্দিরের বহিরবয়ব সম্বন্ধই তিনি তাঁর দুঃসাহসী কল্পনায় আনন্দবোধ করেছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ

১। "১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত বিজ্ঞানানন্দ যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা ভারতের স্থাপত্য-শিল্প পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিতেন। যথাকালে বেলুড়ে ফিরিবার পর স্বামীজী নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে একদিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে ডাকিয়া মন্দিরটি কোথায় কিভাবে হইবে সেইসব কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করিয়া স্বামীজী তাঁহাকে একটি নক্সা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন এবং কহিলেন, "এ দেহটা ততদিন থাকবে না; তবে আমি উপর থেকে দেখব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পঞ্চম সংস্করণ; ২/১১১-১১২

মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূরে থেকে দেখলে ঠিক ও'কার বলে মনে হবে"।[১]

এও আশ্চর্য যে যখন পরিকল্পনা করা হ'ল তখনও বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য দোতলার উপরে অতিসাধারণ মাল-মসলা দিয়ে একটি হলঘরের মতো 'ঠাকুর-ঘর' করার বেশী কল্পনাতীত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের সকলেরই একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই বৃহৎ সৌধ একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরেয় ইচ্ছাতেই অভাবনীয়রূপে পূর্ণ না হ'লে তাঁদের মতো বিষয়-সম্পত্তি-নিস্পৃহ সন্ন্যাসীদের দ্বারা অভিলষিত শ্রীমন্দির সম্পূর্ণ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু যাঁর সংঘ, যাঁর ভাবের প্রচার-প্রসার প্রয়োজন তা উপযুক্ত সময় না হ'লে সাধারণে কি করে উঠতে পারে ?

৯ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১৬ই জুলাই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অতি-বাহিত হ'ল। দিকে দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণী কত ভক্তকে নতুন জীবন দান করেছে। যার ফলে তঁর জন্মের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে স্বামীজীর ইচ্ছা পূরণের জন্য ভক্তমানসে নানা আন্দোলন দেখা গেল। তখনই রিক্ত হস্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল, এই বেলুড়মঠ প্রাঙ্গনেই অবিলম্বে অভিলষিত শ্রীমন্দিরের কাজ শুরু করার। ঠিক সেই সময়ে বিদেশিনী কুমারী হেলেন এফ রুবেল (ভক্তি) এবং শ্রীমতী অ্যানা উরষ্টার (অন্নপূর্ণা) এক বৃহৎ দান নিয়ে এগিয়ে আসেন। মুখ্যতঃ একজন, ভক্তির দান সবচেয়ে বেশী। সেজন্যে বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা শুধুমাত্র ভক্তির নাম করে থাকেন। যদিও পরিকল্পিত বিরাট সৌধ এই টাকায় পূর্ণ করা সম্ভব নয়, তথাপি প্রধান পদ-ক্ষেপের উপর নির্ভর করেই কাজ শুরু হ'ল।[২]

১৩ই মার্চ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ ঃ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শুভজন্মতিথিদিনে শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করেন—পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ—'মহাপুরুষ' মহারাজ। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরাপর শিষ্যগণ এতে যোগদান করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী শিবস্বরূপানন্দজীর নিকট শুনেছি ঃ মঠ-প্রাঙ্গণের পশ্চিম পাশে গোলাপ ফুলের বাগান। বর্তমানে সেই গোলাপ বাগানের পূর্ব-সীমায় একটি কাঁঠাল গাছ আছে। তারই পাশে একটি কুয়া ছিল। পরবর্তীকালে এটি বুজিয়ে দেওয়া হয়। এই গোলাপ বাগানেই প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ। বর্তমানে এই গোলাপ বাগানটি নেই।

---

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ ; পৃষ্ঠা ১৯১

স্বামীজী চাইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠকে কেন্দ্র করে ভারতীয় শিল্পকলাবিদ্যার নবজাগরণ ঘটুক। তাঁর বিশ্বাস ছিল ঃ "ঠাকুর [শ্রীরামকৃষ্ণ [এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।"

—বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড ১ম সংস্কারণ ; পৃষ্ঠা ১৯১

২. অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৩৬৬) ; পৃষ্ঠা ২৭০

এই উপলক্ষে লিখিত একটি চিঠিতে পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাবকল্পনার কিছু বিবরণ দিয়েছিলেন। মঠ তখনও বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতে। বর্তমান মঠের জমি সবেমাত্র কেনা হয়েছে। স্বামীজীর আদেশে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রস্তাবিত মন্দিরের নক্সা (Plan) প্রস্তুত করেন অনেক দিনের চেষ্টায়। ঐ নক্সা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে ; এমনি এক সময়ে স্বামীজী সদ্য-কেনা মঠের জমিতে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পায়চারি করছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছিলেন : "আমি তাঁহার কাছে ভাবী মঠের নক্সার কথা পাড়িলাম। তাহা শুনিয়া স্বামীজী…কোথায় তাঁহার সেই 'অর্দ্ধচন্দ্রাকার' মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মন্দিরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গিতে যেরূপে যত দেবদেবী ও পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষ ও মহাজনগণের বিগ্রহ স্থাপিত হইবে এবং যেরূপে মন্দিরের মধ্যস্থলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর উপরে হীরা, চুনী, পান্নাখচিত সদাসমুজ্জ্বল একটি ওঁকার থাকিবে—তাহাই তিনি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।"

হীরা-চুনীর কথা শুনেই দীনবন্ধু স্বামী অখণ্ডানন্দ আপত্তি তুলেছিলেন।—"উত্তরে, তিনি (স্বামীজী) সেই সময়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথায় এই নবযুগের ক্রমাভিব্যক্তির অবতারণা করেছিলেন তার মধ্যে একটি কথাই আমার বেশ মনে আছে। প্রথমেই বলিলেন, এই Renaissance এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতকালে যেমন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি অভ্যুদয়ের সঙ্গে Art এর (শিল্পের) বিকাশ হয়েছিল, তেমনি এই নবযুগেরও উপযোগী শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।"

(উদ্বোধন—৩১শ বর্ষ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)

প্রাগুক্ত ভিত্তিপ্রস্তরটি পরে ১০০ ফুট দক্ষিণে সরিয়ে পুনঃ ভিত্তিস্থাপন করেন—পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ, ১৬ই জুলাই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের গুরুপূর্ণিমা তিথিতে। কিন্তু ঐ বছরের ১০ই মার্চ থেকে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়। কলকাতার মার্টিন কোম্পানি এ ব্যাপারে চুক্তি (contract) নিয়েছিলেন।[১]

---

১. (ক) "So on July 16, 1935, the auspicious day of Snana-yatra, the stone was ceremonially moved to its proper position by Swami Vijnanananda, the preliminary work having been commenced with his blessings on March 10, by Messrs Martin and Company, Calcutta, who had received the Contract."

Ref: History of the Ramkrishna Math and Mission—Swami Gambhirananda (1957) page. 347

(খ) আবার স্বামী দিব্যাত্মানন্দ লিখেছেন, "মঠে স্বামীজীর পরিকল্পিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের শুভ কার্যারম্ভ উপলক্ষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি-দিনে সাধুব্রহ্মচারিগণ শ্রীমন্দিরের ভিতরের মাটি কাটেয়াছিলেন।

Ref: দিব্যপ্রসঙ্গে—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ—পৃষ্ঠা ১১৫-১১৯

স্বামী দিব্যাত্মানন্দজীর লেখা থেকে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন ঃ "১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরের জন্মতিথিদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার পুনঃ স্থাপন করিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ১৩৪২ সালের ৩১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি, গুরুপূর্ণিমা তিথি, ১৬ই জুলাই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। শুভ মুহূর্তে কার্য সমাধান হইল।···ঐদিন ভিত্তিশিলার উপর স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপূজা করেন। গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ্ ও কথামৃত চারকোণে চারজন পাঠ করেন।"

নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভমন্দিরের ঈশানকোণে ভিত্তিস্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ রৌপ্য-কর্ণিক দ্বারা মশলা দিলেন। এই কর্ণিকেই মহাপুরুষ মহারাজ প্রথম ভিত্তি স্থাপনের কাজ করেছিলেন। তার উপর পাথরের বাক্স বসানো হয়। ইহার ভিতর তাম্রলিপি রাখা হইল। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিন, মহাসমাধির দিন ও মন্দির-স্থাপনের দিন এবং কে স্থাপন করেছেন—দিন তারিখ সব সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দিতে লেখা আছে। আর একটি তামার চোঙার ভিতর কাগজে হাতের লেখায় সব দিন তারিখ লেখা আছে। পঞ্চমুদ্রা ও ঐ বৎসরের একটি টাকাসহ উহাও ঐ বাক্সের ভিতর রাখা হয়।

বেলা চারটার সময় ঐ ভিত্তির উপর শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের প্রতিকৃতি সাজানো হয়। মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণ রামনাম ও কালীকীর্তন করেন।[১]

ভিত্তিস্থাপনের সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে—"বেলা নয়টায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সেই স্থানে আসিলেন।···ভিত্তিস্থাপনের জায়গায় প্রথমে গঙ্গাজল ঢালিয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ঐ স্থানে কিছু ফুল দিবার উদ্দেশ্যে পুষ্পপাত্র হইতে হাত বাড়াইয়া ফুল লইবার পূর্বেই হঠাৎ দমকা হাওয়ায় পুষ্পপাত্র হইতে একটি শ্বেতপদ্ম ও একটি বেলপাতা ভিত্তি স্থাপনের জায়গায় পড়িয়া যায়।

"পরে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কিছু কংক্রীট ঐস্থানে ফেলিলেন। তারপর অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারিগণ পুষ্পাঞ্জলি ও কংক্রীট ফেলিয়া শুভকার্য সমাপন করেন।

"কার্যসমাপনান্তে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিলেন, 'স্বামীজী আমাকে এই মন্দিরের নক্সা করতে বলেন। আমিও একটি কাগজে পেন্সিলের সাহায্যে নক্সা করে স্বামীজীকে দেখাই। তা দেখে তিনি খুবই খুশী হন এবং এই জায়গায় মন্দির হবে তাও আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করলেন। আমি বললাম, 'স্বামীজী! আপনি থাকতে ঠাকুরের মন্দিরটি হয়, তাহলে খুবই ভাল হয়।' তখন স্বামীজী বললেন, 'আমি উপর হ'তে দেখব,

১. দিব্যপ্রসঙ্গে—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ ; পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯

পেসন'। তাই আজ স্বামীজী এই শুভকার্যে নিজেই হাওয়ারূপে এসে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেলেন।"[১]

এই কাজ কম খরচে এবং অল্প সময়ে সমাধানের জন্য মার্টিন কোম্পানিকে ভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হ'ল। তার আগে স্বামীজীর অনুমোদিত মূল নক্সার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য ভারতের বিভিন্নস্থানে মন্দির-স্থাপত্য বিশ্লেষণ ক'রে একটি নতুন নক্সা উপস্থাপন করার জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হল। তাদের প্রতি মঠ-কর্তৃপক্ষের সাধারণ নির্দেশ ছিল যে, স্বামীজী চান গম্বুজাকৃতি ছাদওয়ালা গর্ভমন্দির, চার্চ-এর মতো নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির একসঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং সমগ্র মন্দিরটির আভরণ ভারতীয় রীতিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল কোম্পানির অফিসে। তাঁরা একটি স্থপতিদল নিয়ে দিকে দিকে পরিভ্রমণ করে অনেক কিছু নতুন অলঙ্করণ সন্নিবেশিত করলেন। তাদের মধ্যে দু'টি দল দু'টি পৃথক্ নক্সা তৈরীতে হাত দিলেন। একটি করেন স্বয়ং মেজর হ্যারল্ড ব্রাউন সাহেব ও তাঁর ইউরোপীয় সহকারী ড্রাফট্স্ম্যান্, আর একটি করেন ঐ কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার ও স্থপতি বিভাগের ড্রাফট্স্ম্যান শ্রীসুশীলবাবু। মঠ-কর্তৃপক্ষের কাছে দ্বিতীয়টি অধিক ভারতীয় রুচিসম্মত মনে হওয়ায় ঐ নক্সা অনুসারে কাজে অগ্রসর হতে আদেশ দেন। সেই নক্সা অনুযায়ী তাঁরা একটি প্যারী প্লাস্টার আদরা (Plaster of Paris model) তৈরী করে অনুমোদন করে নেন। এটি অদ্যাপি মঠে সংরক্ষিত আছে। এই আদরাটিতে অবশ্য পূর্ব এবং পশ্চিমে দু টি সিঁড়ি, চওড়া দরজা ছিল না; পরে এগুলি সংযোজন করা হয়েছে।

শ্রীমন্দিরের সাধারণ রূপ

শ্রীমন্দির গঙ্গার পশ্চিমকূলে—তীরভূমি হ'তে প্রায় তিনশ' ফুট দূরে অবস্থিত। সমগ্র মন্দিরটি একটি উঁচু বনিয়াদের উপর নির্মিত হয়েছে; যার কিছুটা অংশ মাটির নীচেও আছে। সমগ্র মন্দিরটির দৈর্ঘ্য—২৩৫ ফুট, প্রস্থে—১৪০ ফুট (গর্ভমন্দিরের সোজাসুজি পূর্ব-পশ্চিমে) এবং ভূমি হ'তে মন্দিরশীর্ষ—১০৮ ফুট উঁচু। সমগ্র

১. দিব্যপ্রসঙ্গে—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃষ্ঠা ১১৭

'পেসন'—পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম 'হরিপ্রসন্ন'। স্বামীজী আদর করে ডাকতেন—'পেসন'।

বনিয়াদটি উপর থেকে দেখলে একটি খ্রীষ্টধর্মের প্রতীকের মতো দেখায়।[১] স্থপতি-বিদেরা হয়তো সর্ব ধর্মের পরিপোষক ভাবোদ্দীপক শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে খ্রীষ্টীয় ভাব সমর্থনযোগ্য এ-রূপটি সংযুক্ত করে থাকবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ সংঘভুক্ত হয়ে প্রচারক সন্ন্যাসীরূপে জীবনযাপন করবেন এই প্রতিজ্ঞাও ভগবান যীশুর আবির্ভাব-দিবসের প্রাক্‌সন্ধ্যাতে কাকতালিয়বৎ একই দিনে ঘটেছিল। সেই স্মৃতি সংঘের সর্বত্র এখনও স্মরণ করা হয়। এ-অবশ্য একটি মতমাত্র।

বনিয়াদ নাটমন্দিরের সমান একটি সুবৃহৎ কক্ষ এবং বিভিন্ন পরিক্রমা অংশগুলির নীচে অনেকগুলি ঘর, চারদিকের উন্মুক্ত পরিক্রমা অংশেও লম্বা লম্বা ঘর আছে। এগুলি যাতে ভবিষ্যতে প্রদর্শকীর কাজে ব্যবহার হতে পারে—সেজন্য প্রভূত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যাতায়াতের সুবিধার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে দুটি প্রবেশ পথও আছে।

গঙ্গার জল বাড়া-কমার জন্য মাটিতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা শ্রীমন্দিরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেজন্য বনিয়াদে জলপ্রবেশ করার ব্যবস্থা আছে। আবার Level ঠিক করে, জল যাতে এক জায়গায় গিয়ে জমায়েত হয় এবং সেখান থেকে pump করে বার করারও ব্যবস্থা আছে। শ্রীমন্দির হ'তে কিছু দূরে পশ্চিমদিকে একটি পুকুর রয়েছে যা, গঙ্গার সঙ্গে অপর দিক থেকে সমচাপ সৃষ্টি করে সমতা বজায় রাখতে পারে।

বনিয়াদ হ'তে দোতলা, তিনতলা পর্যন্ত দুটি কিঞ্চিৎ spiral ধরণের সিঁড়ি। একটি গর্ভমন্দির সংলগ্ন, অপরটি প্রধান প্রবেশদ্বারের পূর্বপাশে অবস্থিত।

গর্ভমন্দিরের পেছনে ভাণ্ডারঘর, তার উপর স্মৃতিকক্ষ, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন-কক্ষখানি স্মৃতিকক্ষের উপর তিনতলায় করা হয়েছে। অন্নভোগ রান্নার ঘর দূরে আছে। এইজন্য ভোগ প্রভৃতি আসা-যাওয়া যাতে নির্বিঘ্নে হয়, বনিয়াদে সুড়ঙ্গপথের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য

ললিতকলা সমালোচক ইংরেজ পণ্ডিত রাস্কিন স্থাপত্যের পাঁচটী শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যেমন—

(১) ধর্মমূলক—পুরীর ৺জগন্নাথ মন্দির।

(২) স্মৃতি বা স্মারকমূলক—সারনাথের স্তূপ, তাজমহল ইত্যাদি।

---

১. "The ground plan of the prayer hall, with the vestibule and shrine placed one behind the other, gives the impression of a christian cross."

Ref: History of the Ramkrishna Math and Mission.
—Swami Gambhirananda (1957) p. 348

(৩) রাষ্ট্রমূলক—দেওয়ানি খাস, দেওয়ানি আম ইত্যাদি।

(৪) সমরমূলক—ভরতপুরের দুর্গ, দিল্লীর দুর্গ, চুনার দুর্গ ইত্যাদি।

(৫) সাধারণ—অট্টালিকা প্রভৃতি।[১]

আলোচ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নিঃসন্দেহে ধর্মমূলক। এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য স্থাপত্যেরও নিদর্শন দেখা যায়।

গঠন-বৈচিত্র্যের স্থাপত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেবদেউল চার প্রকারের হয়। যেমন—

(১) রেখ বা শিখর দেউল—ভুবনেশ্বর, লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিসান।[১]

(২) ভদ্র বা পীড় দেউল—ভুবনেশ্বর, লিঙ্গরাজ মন্দিরের জগমোহন।

(৩) কাখর দেউল—ভুবনেশ্বর, বিন্দুসরোবরের পশ্চিম পারে অবস্থিত শক্তি মন্দির—বৈতাল দেউল।

(৪) গৌড়ীয় দেউল—গ্রাম বাংলার চারচালা কুটীরের মতো।[২]

মঠ মন্দিরটি প্রাগুক্ত দেবদেউলের কোন একটির অনুকরণে নির্মিত হয় নি। এটি এক বিশেষ ধরণের দেবদেউল, যার মধ্যে আমরা বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন দেখতে পাই। এটিকে ভারতীয় স্থাপত্যের একটি মধুর নিদর্শন বলা যেতে পারে।

শ্রীমন্দিরের অঙ্গ বিভাগ

উড়িষ্যার দেবদেউলে (পুরীর ৺জগন্নাথ মন্দির) চারটি অঙ্গ বিভাগ দৃষ্ট হয়।

(১) বিমান (মূলমন্দির, গর্ভগৃহ, বড়দেউল, গম্ভীরা প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়।)—শ্রীমন্দিরের প্রাণকেন্দ্র যেখানে দেববিগ্রহ রক্ষিত থাকেন।

(২) জগমোহন (Audience chamber)—এখান হ'তে দেববিগ্রহ দর্শন করতে হয়।

(৩) নাটমন্দির (Prayer Hall or Theatre Hall)—দেবতার তৃপ্তির জন্য নৃত্য-গীত ও বাদ্যাদি হয়ে থাকে।

(৪) ভোগ মন্দির—দেববিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ রক্ষিত থাকে।

বিমান বা গর্ভমন্দির

গর্ভগৃহ সমচতুষ্কোণ এবং সুবৃহৎ। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ—২৬ ফুট × ২৬ ফুট এবং এর চারপাশে ১০ ফুট করে পরিক্রমার জায়গা আছে। গর্ভগৃহের চারকোণের দেওয়াল যতই উপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কোণগুলি ক্রমে গোলাকৃতিরূপ নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েকটি বিশেষ ধরণের খিলান ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্মাণ কৌশলটা হচ্ছে

১. উড়িষ্যার দেব-দেউল—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৌষ, ১৩৬৯ ; পৃষ্ঠা ১১।

২. কলিঙ্গের দেব-দেউল—নারায়ণ সান্যাল দ্বিঃ সং ; পৃঃ ৭৭।

ধাপে ধাপে একটু একটু করে ভিতরের আয়তনকে হ্রাস করিয়ে দেওয়ার কায়দায়—আধুনিক স্থপতিবিদ্যায় যাকে বলে কর্বেলিঙ্ (Corbelling)। ভিতরের প্রত্যেক খাঁচে অর্ধ প্রস্ফুটিত কমল, পেখমধারী ময়ূর এবং চাঁদমালা প্রভৃতির অলঙ্করণে হিন্দু-প্রভাব এনে দিনেছে। তার পাশে পাশে মুসলিম স্থাপত্যের জালি এবং খ্রীষ্টীয় স্থাপত্যের খাঁচগুলিও অশোভন হয় নি। গর্ভগৃহের ভিতরের দেওয়ালে উচ্চতর অংশে কিছু বৃহৎ আকৃতি, অল্প গভীর কুলুঙ্গির (Niche) মতো অলঙ্করণ আধুনিক পাশ্চাত্য সৌধে দেখা যায়।

গর্ভগৃহের চারপাশে পরিক্রমার বহিরাংশে কিছু স্তম্ভ, যার উপরাংশ এবং গোড়ার অংশ ভারতীয় অলঙ্করণ কিন্তু লম্বা অংশ করিন্থিয়ান পিলারের ধাঁচ নিয়েছে। করিন্থিয়ান—গ্রীক স্থাপত্য।[১]

"Royal Institute of British Architect"-এর প্রেসিডেণ্ট স্যার উইলিয়াম ইমারসন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্ল্যান করেন এবং তাহা ইণ্ডো-ইউরোপীয় (Indo-European) স্থাপত্যের একটি দর্শনীয় নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে মন্দিরের কিছুটা ছাপ পড়ায় খানিকটা মন্দিরের ভাব আসে। যাহাহোক, পরিক্রমার সামনে বাঁকানো অংশ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাঁকানো বারান্দার ভাব আনে, কিন্তু পরিক্রমার পথের অঙ্গ হিসাবে এইখানে তাহা শ্রীমন্দিরের শোভা বাড়াইয়াছে। ইহা ভারতীয় স্থাপত্যের একটি মধুর নিদর্শন বলা যাইতে পারে।"[২]

আবার কার্নিশে ছোট জোট সেরাসেনিক স্থাপত্যের ডুম বা গম্বুজ; তেমনি হিন্দু-খাঁচে পদ্ম, দোদুল্যমান মালা শোভিত হওয়ায় ভারতীয়রূপ নিয়েছে। করিন্থিয়াম পিলারের মাথায় পদ্মের পাপড়ি এক অদ্ভুত সমন্বয়। খুব প্রাচীনকালে না হলেও মধ্যযুগীয় হিন্দুমন্দিরগুলিতে এই জাতীয় স্তম্ভের প্রচলন দেখা যায়। উত্তর ভারতের প্রাচীন প্রাসাদ প্রভৃতিতে এই জাতীয় স্তম্ভের ব্যবহার আছে। যদিও দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন স্তম্ভগুলির উপর-নীচ প্রায় সমান পরিধির।

পিলার থেকে কার্নিশ পর্যন্ত সুপ্রশস্ত দেওয়ালের মধ্যে কয়েকটি ফোকর কেটে প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু পরিকল্পিত নবগ্রহের প্রাচীন কল্পিতরূপকে আধুনিকতার শৈলীতে সুষমামণ্ডিত করেছে। প্রতিটি মূর্তির ভাব-ভঙ্গিমা, গঠন, প্রকাশ-শক্তি এমনই সুস্পষ্ট হয়েছে যেন সেগুলি সরস ও প্রাণবান। শিল্পী কত সাধনা বলে একখণ্ড পাথর হ'তে বাটালির ঘায়ে এক অপূর্ব সুন্দর মূর্তি খোদিত করেছেন! এই নবগহাদি মূর্তিসকলের প্রচলন উড়িষ্যার দেবদেউল দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এটি উড়িষ্যাদেশের স্থাপত্য-রীতি বলতে পারি।

শ্রীমন্দির সঙ্গে যুক্ত পরিক্রমা অংশগুলি সত্যিই খুব দর্শনীয়। সি. শিবরামমূর্তির ভাষায়ঃ "The pradaksinavithi or the Circumanubalatory passage

around the central shrine is equally attractive. The central shrine is 112 feet high and surmounted by a beautiful dome, and all the pavilions and domes surrounding it give a picturesque effect to the whole edifice. The small ardhamandapa that connects the main shrine and the long hall brfngs in a flood of light from both sides and reminds us of similar structures in early chola monuments, with the entrance from the sides leading to the central shrine."[১]

গর্ভগৃহের উপর একটি প্রধান গম্বুজ। চারকোণে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ এবং তার ফাঁকে ফাঁকে ছত্রী দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। ছত্রীগুলি দেখতে অনেকটা গ্রামবাংলার চালাঘরের মত। বিশেষত্ব এই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্বাশ্রম কামারপুকুর গ্রামে। তাই এটি ভারতীয় গ্রামবাংলার শিল্পকলার নিদর্শন বলতে পারি। আরও চারটি ছোট গম্বুজ, চারটি Tower-এর উপর অবস্থিত। গম্বুজগুলির নীচে কার্নিশ ও তার নীচে ব্র্যাকেট (Bracket) বসানো হয়েছে। এগুলি বারাণসী, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের স্থাপত্যে, দেখা যায়।

গোটা শিখরটি মধ্যযুগের বাংলার মন্দিরগুলির অনুরূপ বলে মনে হয়। ও. সি. গাঙ্গুলীর মতে শিখরগুলি পারসীক গম্বুজ।[২]

বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, গম্বুজ কিঞ্চিৎ লম্বাকৃতি, উড়িষ্যা এবং উত্তর-ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের লম্বাকৃতির কিঞ্চিৎ অভাস রেখে তদুপরি কয়েকটি ঢেউ-খেলানো খাঁচ সৃষ্টি করে তার মধ্যে গুটিকা (Bead) এবং রোল সন্নিবেশিত করে সম্পূর্ণ এক নতুন স্থাপত্যের নিদর্শন করা হ'ল—যার প্রভাব অচিরেই সারা ভারতে নবরূপায়ণ সৃষ্টি করেছে।

"গম্বুজ বা ডুম-এর আধুনিক নির্মাণরীতি প্রথমে সেরাসেনিক স্থাপত্যে দেখা যায়। তখন ডুম একটি গোলক বা স্ফিয়ারের অংশ ছিল; ক্রমশঃ ইহার সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য নানা দেশে এবং নানাভাবে ইহা পরিমার্জিত হইতে থাকে। ইতালীর নবজাগরণের সময়ে ইহার আকৃতি রমণীয় নয়। আমাদের দেশে যেটি রাজপুতানার স্থাপত্যরীতি, সেটি কতকটা ইহার এক শাখা বলা যাইতে পারে। রাজপুতনার রীতিতে গম্বুজ বেশ সুন্দর। গোলাকৃতি গম্বুজের গুরুভার তাহাতে নাই। কমনীয়তায় (Grace and delicacy) ইহার তুলনা বোধ হয় কম আছে, অন্ততঃ আমাদের ভারতীয়দের চক্ষে। এই স্থাপত্যরীতিতে শ্রীমন্দিরের গম্বুজের আকৃতি দিবার চেষ্টা হইয়াছে।"[৩]

প্রধান গম্বুজের উপরিভাগে বৃহদাকার 'আমলক'। এতে উড়িষ্যার দেবদেউলের প্রভাব পড়েছে। পুরীর ৺জগন্নাথমন্দিরে এক বিশাল আমলকের নিদর্শন রয়েছে। সর্বোপরি কলসের নীচে আর আর কয়েকটি ধাপ সৃষ্টি করাতে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়েছে।

গম্বুজের গোড়ার দিকে বড় পদ্মের পাপড়ি ঊর্ধ্বমুখে বেষ্টন করা আছে। সব ক'টি গম্বুজেই একই ধরণের। "কাশী হইতে আনীত সোনার পাত দিয়া তাম্রকলস মোড়ার অভিজ্ঞ মিস্ত্রী আনাইয়া বড় ডুমের (Dome) সর্বোচ্চ কলসটি তৈরী করা হইয়াছে ও অন্যান্য কলসও ঐভাবে তৈরী করা হয়।"[১]

কলস এবং আমলকের মাঝে বৃহদাকার একটি কাঁচের গামলার মধ্যে নীলাভ বৈদ্যুতিক আলো। বহুদূরে থেকে বিশেষ বিশেষ দিনে প্রজ্জ্বলিত থাকতে দেখা যায়। গান মেটাল-এর (Gun metal) চূড়া তৈরী করে তার ভিতর ডুমের আকারে কাঁচের প্যানেল দেওয়া হয়েছে। এটি হাওড়ার এক বিশিষ্ট ঢালাই-এর কারখানায় স্থপতিবিদ্‌দের নির্দেশানুসারে বানানো হয়েছিল।

ছত্রীগুলি গ্রামবাংলার নিজস্ব স্থাপত্য কৌশল। এ ধরণের স্থাপত্যরীতি আজ সর্বত্র অনুকৃত্য হচ্ছে। যদিও এগুলি রাজস্থানের বিভিন্ন প্রাসাদে ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া মাদ্রাজ প্রদেশের মহাবলিপুরমে দ্রৌপদীর রথাকৃতি মন্দির এবং গৌড়ের 'সোনা মসজিদ্'-এর খিলানযুক্ত ছাদও বাংলার চালাঘরের অনুকরণে নির্মিত। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরে তিনটি ছত্রীও গ্রামবাংলার অনুরূপ। তার দু'পাশে (পূর্ব-পশ্চিম) দু'টি গম্বুজের মাঝখানে দু'টি অলিন্দ—যা, সম্পূর্ণ রাজস্থানীয় স্থাপত্য। তার ঠিক নীচে দু'টি বড় আর্চ এবং যুগ্মস্তম্ভ—ইউরোপীয় ও ভারতীয় স্থাপত্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ নিদর্শন।

করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয়দ্যোতক নূতন যে স্থাপত্যকলা প্রচলিত করিয়াছেন এবং যাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার ফতেপুর সিক্রী—সেই নূতন ধারা অনুসারে গোবিন্দজীর মন্দির (বৃন্দাবন) নির্মিত হইয়াছিল। গম্বুজাদি নির্মাণে মুসলমানেরাই অধিকতর দক্ষ ছিল।"

Ref : ভারতের দেব-দেউল—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (১৯৪১), পৃষ্ঠা ১১৯।

১. ঐ।

(ক) যদিও আমলকী (ধাত্রী) ফলের মতো দেখতে বলে 'আমলক' বলা হয়। এর অন্য ব্যাখ্যা—যেন দু'টি সমস্রদলপদ্ম মুখোমুখি একটির উপর একটি, যার মধ্যে শিব-শক্তির মঙ্গলময় সৃজনীবীজ নিহিত আছে।

(খ) "প্রধান শিখরের শিরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো থালার উপর 'আমলক', তার (কিঞ্চিৎ) উপর কলস স্থাপিত। মনে হয়, যেন পর্বত পরম আরাধ্যদেবের বারিপূর্ণ কলসী শীর্ষোপরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান।"

Ref : ভারতের দেব-দেউল—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (১৯৪১), পৃষ্ঠা ৪১।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরটি, বোধকরি 'রত্ন'-মন্দির হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত নিদর্শন।[১] আলোচ্য শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে ন'টি চূড়া আছে—একেও 'নবরত্ন' বলে। বিমানের ভাবটি এই, অত্যুচ্চ ন'টি গম্বুজই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঊর্ধ্বে, থাকে থাকে উঠে যেন পরম পিতার চরণে অর্ঘ্য দিতে যাচ্ছে।[১]

বনিয়াদ এবং শ্রীমন্দির এতদুভয়ের মাঝখানে সামান্য একটু উঁচু ধাপ। সমগ্র শ্রীমন্দির একটি বেষ্টনীর মতো অসংখ্য পদ্মের পাপড়িতে এবং টানা দড়ির মতো যেন একটি মনিবন্ধ। ভারতীয় মন্দিরে বনিয়াদের উপর দেবতা সংস্থানের ঠিক নীচে এটি একটি আবশ্যকীয় অলঙ্করণ। তারপর সমগ্র মন্দিরের মেঝে; এর থেকে প্রায় একফুট উঁচুতে গর্ভমন্দিরের মেঝে। গর্ভমন্দিরের মেঝে শ্বেতপাথর এবং নাটমন্দিরের মেঝে ঘন কালো ভারতীয় পাথরে আবৃত।

গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে উত্তর দেওয়ালের কাছ ঘেঁসে ঠিক মাঝখানে ডমরু আকৃতি শ্বেতপাথরের উঁচু বেদী এবং প্রস্ফুটিত সহস্রদলপদ্মের উপর সমাধিস্থ অবস্থায় সুখাসনে উপবিষ্ট—ইতালিয় শ্বেতপাথরের শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি। শ্রীমূর্তি খোদাই করেছেন কলকাতার প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল। পূজনীয় স্বামী হিতানন্দ মহারাজের নিকট শুনেছি—বর্তমান শ্রীমূর্তিটি দ্বিতীয়; প্রথম শ্রীমূর্তিটি এখন শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী শ্রীমন্দিরে স্থাপিত হয়েছে। প্রথম শ্রীমূর্তির বিভিন্ন অংশে দাগ থাকায় এবং আকৃতিতে দোষ হওয়ায় বেলুড়মঠের শ্রীমন্দিরে বসানো হয়নি।[২]

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, "মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে"। সেইজন্যই বোধ হয়, বেদীতে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যে শোভিত ব্রাহ্মী-হংসের নমুনায় তিনদিকে তিনটি হাঁস। এ যেন পরমহংসের প্রতিচ্ছবি। অনুরূপ ব্রাহ্মীহংস দাক্ষিণাত্যের পট্টদকলে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের বিরূপাক্ষমন্দিরে দেখা যায়।

"উপরে চাঁদোয়ার ফ্রেম বর্মা হইতে আনীত সেগুনকাষ্ঠে নির্মিত এবং সালকিয়ার বিশেষ নক্সা জানা সূত্রধর মিস্ত্রী দ্বারা মকরের মুখ দিয়া সজ্জিত। গর্ভমন্দিরের এবং নাটমন্দিরের সমস্ত জানালা দরজা বাছাই মৌলমেন সেগুনকাষ্ঠে চীনা মিস্ত্রী দ্বারা তৈরী। অর্থাভাবে সমস্ত জানালা-দরজা প্যানেল নক্সা-কাজ করানো সম্ভব হয় নাই। জানালা-দরজার সাজসরঞ্জাম বম্বের বিশেষজ্ঞ একমি কোম্পানি (Acme Company) দ্বারা তৈরী।"[১]

চাঁদোয়ার ফ্রেমে মকরের মুখ ছাড়াও ময়ূর, পদ্ম এবং ওঁকার (প্রণব) প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

গর্ভমন্দির অভ্যন্তরে দেওয়ালে ছয়টি কুলঙ্গি আছে। পূর্বদিকে একটি কুলুঙ্গিতে শ্রীশ্রীমা সারদার পদধূলি এবং পশ্চিমদিকে আর একটি কুলুঙ্গিতে বাণেশ্বর শিব রাখা আছে। বাকী চারটিতে পূজার সরঞ্জাম রাখা হয়। গর্ভগৃহে অনেকগুলি বড় জালি (Ventilation) এবং অনেকগুলি বড় দরজা থাকায় আলো-বাতাসের বেশ সুবিধা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরগুলিতে সাধারণতঃ এত বেশী আলো-বাতাসের ব্যবস্থা দেখা যায় না। সেজন্য সেগুলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব থাকে।[২]

নাটমন্দির

শ্রীমন্দিরের প্রাণকেন্দ্রটি হচ্ছে—গর্ভগৃহ বা বিমান, যেখানে দেববিগ্রহ থাকেন। পূজার্চনায় নানান অনুষ্ঠানের জন্য শুধুমাত্র ঐ গর্ভগৃহ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে চলে না। ফলে তৈরী করতে হয় আরও কয়েকটি সংলগ্ন অংশ। যেমন একটি বাড়ীর শুধুমাত্র শয়নকক্ষ থাকলেই চলবে না—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি জনের জন্য চাই—জগমোহন (Audienee chamber), নাটমন্দির (Prayer Hall) ইত্যাদি। নাটমন্দির—যেখানে ভক্তবৃন্দ নৃত্য-বাদ্য এবং সংগীতাদি পরিবেশন করবেন—দেবতার তুষ্টি সাধনের জন্য। উড়িষ্যায় দেব-দেউলে সাধারণতঃ চারটি অঙ্গ-বিভাগ দেখা যায়।

(১) গর্ভগৃহ, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (৪) ভোগমণ্ডপ প্রভৃতি যা পূর্বে একবার আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য মন্দিরে কিন্তু জগমোহন এবং ভোগমণ্ডপ আলাদাভাবে নেই।[১]

প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরে গর্ভমন্দির ও নাটমন্দির আলাদা। কিন্তু এই মঠ-মন্দিরে খ্রীষ্টীয় গীর্জাসমূহের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেজন্য গর্ভমন্দির ও নাটমন্দির একত্র সন্নিবিষ্ট আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে সর্বধর্মের সমন্বয় হয়েছে। স্বামীজী-পরিকল্পিত মন্দিরেও সেই ভাবটি স্পষ্ট দেখা যায়। মন্দিরটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য ও সেরাসেনিক রীতির সার্থক সমন্বয় এবং অন্তরে ভারতীয় মনের গভীরতা ও কমনীয়তা নিয়ে ফুটে উঠেছে।

খ্রীষ্টীয় চার্চে Alter—বেদী; Nave—গর্ভমন্দির; Sanctuary—উপাসনায় স্থান অর্থাৎ নাটমন্দির; Aisle—পরিক্রমার স্থান। এসব দেখা যায় একত্রে। আর এই শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বেদী (বেদীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি), গর্ভমন্দির, পরিক্রমা ও নাটমন্দির একত্রে বিরাজ করছে। যেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমন্বয়।[২]

নাটমন্দিরের ভিতরে এককোণে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে যেন একটা গুহা। বিখ্যাত কার্লা (কার্লে) গুহা জগতে স্থাপত্যের এক অভিনব নিদর্শন। এই কার্লা গুহার ভাব খানিকটা দেওয়া হয়েছে। উপরের Arch-টি (ছাদটি) অবিকল গরুর গাড়ীর ছইয়ের মতো দেখতে। তার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় সৌধে ব্যবহৃত Gothic Style-এ করা হয়েছে।[৩]

১. হিন্দুদের দেব-দেউলে জনসমাগম হইবার পর একসঙ্গে পূজা বা প্রার্থনা করিবার প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল না। প্রথম যুগের মন্দির কেবল দেবতার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া নির্মিত হইত। তৎপরে নৃত্যগীত, ভোগ-আরতির জন্য মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডপ নির্মাণের প্রচলন হয়। মধ্যযুগে মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে বৃহাদয়তনের দালান নির্মিত হইত। বোধহয়, বৌদ্ধদের বিহার বা চৈত্য হলের অনুকরণে পার্বণ ও উৎসবের সময়ে যাগ-যজ্ঞ ও আরতি দর্শনের এবং স্তবস্তুতি পাঠের জন্য বহু জনসমাগমের উপযোগী বড় বড় দালান প্রস্তুত হইত। কিন্তু বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা এক-স্থানে একসময়ে বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া প্রার্থনা করেন; সেই নিমিত্ত তাঁহারা বড় বড় দালানযুক্ত বিহার, গীর্জা ও মসজিদ নির্মাণ করেন।"

ভারতের দেব-দেউল - শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (১৯৪১) পৃষ্ঠা ১৯৩।

২. "বৈদিকযুগে দেবপূজার স্থান ছিল 'বেদী', সকল ধর্মেই বিশেষতঃ খৃষ্টধর্মে এই 'বেদী'র (Altar) সম্মান পরিলক্ষিত হয়।" ভারতের দেব-দেউলে—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। (১৯৪১) পৃষ্ঠা ৪।

৩. কার্লা বোম্বায়ের ৮০ কিমি পূর্বে এবং জুনারের ৬৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে

নাটমন্দিরের প্রবেশ পথে তিনটি ফোকর এবং নাটমন্দিরের শেষেও (গর্ভমন্দিরের সামনে) তিনটি ফোকর—এই বৃত্তচাপগুলি Gothic স্থাপত্যের ধাঁচে গড়া। ভাবটি যেন দু'হাত তুলে পরমিতার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। অবশ্য তারই সামনে গর্ভ-মন্দিরে তিণটি ফোকর এবং অনুরূপ চারপাশের ফোকরগুলিতে সম্পূর্ণ হিন্দুধাঁচের আর্চ।

গর্ভমন্দির এবং নাটমন্দির সংযোগস্থলে উপরের দিকে একটি ফাটা অংশ দেখা যায়। কিন্তু বাইরের দিক থেকে দেখলে তা বোঝা যায় না। আসলে ওটা ফাটা নয়; সেটি হচ্ছে - Expansion-Joint। গর্ভমন্দির এবং নাটমন্দির বনিয়াদ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তৈরী হয়েছে।

শ্রীমন্দিরের চারদিকে নানান অলঙ্করণের জালি। জানালাগুলির উপরে যে জালি এবং বাইরের অংশে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির সঙ্গে কোথাও কোথাও মন্দিরাকৃতি, কোথাও পদ্মাকৃতি অলঙ্করণে হিন্দু, মুসলিম এবং খ্রীষ্টীয়রূপ সমন্বিত। এবং সেই সঙ্গে প্রস্তর শিল্পকৌশলও প্রদর্শিত হয়েছে। "গ্রীক ভাস্করেরা যেমন Acanthus লতা খোদিত করিতে আপনাদের শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি উড়িষ্যার শিল্পীরা শিল্পীরা পদ্মপুষ্পে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।" সর্বাধুনিক বেলুড়মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও প্রাগুক্ত শিল্পনৈপুণ্য থাকাতে সত্যিই শ্রীমন্দিরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীমন্দির-গাত্রে জালিতে কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol) দেখা যায়। যেমন—ইস্‌লামধর্মের প্রতীক তারকা (Star-Islam); খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক ক্রস্‌ (Cross-Christinity); বৌদ্ধধর্মের প্রতীক চক্র (Wheel-Buddhism) এবং সর্ব-ভারতীয় ধর্মের প্রতীক প্রণব (Om-Hinduism)—এটি আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তির উপর চাঁদোয়াতে—কাঠের তৈরী।

শ্রীমন্দিরের জানালাগুলি বাইরের দিকে ছোট দু'টি স্তম্ভ এবং সামান্য ছাদযুক্ত -প্রায় অনেকটা অলিন্দের আকার দেওয়া হয়েছে। এর কারুকার্যগুলির মুসলমান আমল এবং হিন্দু আমলের বিভিন্ন দুর্গে ব্যবহার দেখা যায়। রাজপুত-মুঘল রাজপ্রাসাদের শোভাময় গাম্ভীর্য এবং এতে Indo-Saracenic প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের জানালাগুলিকে Kirti Stambho of Chitra in Mewar বলে। রাজস্থানে এর প্রভাব খুব বেশী।[১]

নাটমন্দিরের সারিবদ্ধ স্তম্ভগুলি—আধুনিক আটকোণযুক্ত স্তম্ভ - যার পাদদেশ

এবং মাথা কিঞ্চিৎ হিন্দুস্থাপত্যযুক্ত। স্তম্ভগুলির মাথার অংশে শিকলসমেত বহু ঘন্টা খোদিত আছে। খাজুরাহো ঘন্টাই মন্দিরে এইরূপ অতুলনীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। আবার নীচের অংশ সম্পূর্ণ বাংলার আলপনা-জাতীয় অলঙ্করণে পুষ্ট হয়েছে। স্তম্ভগুলি কংক্রীটে তৈরী। তার উপর চারদিকে চার্চের নমুনার ঘোরানো ব্যালকনি (Balcony) কিন্তু তার নীচে ব্র্যাকেটগুলি সম্পূর্ণ উত্তর ভারতীয় রীতিতে তৈরী।

ভিতরের দেওয়ালে দু'টি জানালার মাঝখানে এক একটি বড় বেদী বা কুলুঙ্গি (Niche)—যার উপরের অংশ বৌদ্ধধাঁচের এক একটি আর্চ এবং নীচের অংশ বৌদ্ধ-ধাঁচের মতো হলেও আধুনিক সুরুচিসম্মত।

দু'টি স্তম্ভের মাঝে, উপরে বিজলিবাতি এবং কুলুঙ্গির মধ্যেও বিজলিবাতির ব্যবস্থা আছে। হয়তো তার মধ্যে কখনও কোন মূর্তি বা শ্রীরামকৃ-পার্ষদের প্রতিকৃতি স্থাপনা হতে পারে। এই কুলুঙ্গির ঠিক উপরে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত দেওয়ালে সম্ভাব্য Fresco-Painting (প্রাচীর চিত্র)-এর জায়গা রাখা আছে। শ্রীমন্দিরের নীরবতা বিঘ্নিত হতে পারে--এই আশঙ্কায় কোন রকম painting এবং মূর্তির ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অনুমান। প্রবেশদ্বারের ভিতরের দিকে দু'পাশে দু'টি বেদী—মূর্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করে রাখা আছে। আবার গর্ভমন্দিরের চারপাশে কর্ণার টাওয়ারের নীচে খালি জায়গা আছে—যাতে ছয় ঋতুর মূর্তি বসানো যাবে। কালে আশা করা যায় শাস্ত্রীয় রূপে মত ছয় ঋতুর মূর্তি বসানো হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজীর শতবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে (Birth Centenary of Swami Vivekananda) তাঁর বিভিন্ন ভঙ্গিমার প্রতিকৃতি ঐ সকল বেদী এবং কুলুঙ্গিতে বসানো হয়েছিল। বর্তমানে এই প্রতিকৃতিগুলি সাধুনিবাসে সংরক্ষিত আছে।

নাটমন্দিরের মাঝখানে (পূর্ব-পশ্চিম) দু'টি প্রবেশপথ এবং দু'পাশে দু'টি বড় আকারের স্তম্ভ যা, অনেকটা দাক্ষিণাত্যের বিজয়স্তম্ভের মতো দেখতে। আসপাশে উপরে নীচে অতিসূক্ষ্ম ভারতীয় কারুকার্যময় অলঙ্করণ এবং পাশে দেওয়ালে প্রস্ফুটিত পদ্ম, রিলিফ আকারে (চাঁদমালার ন্যায়) সন্নিবেশিত আছে। আর তার পাশে পাশে সন্নিবেশিত হয়েছে বৌদ্ধদের জ্ঞানবৃক্ষ এবং প্রদীপদানের মতো কুলুঙ্গি।

পূর্বদিকে দরজার উপর উপবিষ্ট ভঙ্গীতে সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশজী ; আর পশ্চিমদিকে দরজার উপর বীরাসনে বিক্রমভঙ্গীতে রামভক্ত মহাবীর হনুমানজীর মূর্তি। মূর্তিদ্বয়ের নক্সা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা।

নাটমন্দির—১৫২ ফুট লম্বা, ৭২ ফুট চওড়া এবং ৪৮ ফুট উচ্চতা। এর ছাদটি বাইরে থেকে দেখতে সমচতুষ্কোণ কিন্তু ভিতরের দিক থেকে দেখতে Parabolic।

প্রধান প্রবেশপথ

দক্ষিণ দেশের মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন —গোপুরম্। গোপুরম্, সাধারণতঃ মূল মন্দির হ'তে দূরে থাকে। কিন্তু এখানে একসঙ্গে যুক্ত করে সেই ভাব আনা হয়েছে। গোপুরম্ শব্দের অর্থ—পৃথিবীপুর এবং স্বর্গপুর দু'টিই হতে পারে। পৃথিবীপুরের ভিতর দিয়ে স্বর্গপুরে যেতে হয়; সেজন্যই মন্দিরের সম্মুখে একটু দূরে, কিন্তু এখানে নাটমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত প্রধান প্রবেশপথটি গোপুরম্ নামে খ্যাত। এর উচ্চতা—৭৮ ফুট।[১]

এখানে যুগ্মস্তম্ভের উপর অজন্তাগুহার প্রবেশপথের মতো গোখুরাকৃতি একটি আর্চ এবং দু'ধারে দু'টি হাতি; এটি সারনাথ স্তূপের মনোনীত অংশ। আর হাতির পায়ের নীচে সর্পিলাকার (চক্রাকারে গোটান) দু'টি চক্র (Scroll) বিদ্যমান। আয়তক্ষেত্রাকার দরজার উপর বড় আর্চ এবং খোলা জানালাগুলি নাসিকচৈত্য হলের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। চক্র দু'টি এক নজরে দেখলে মনে হয় বিরাট একটি নথি গুটিয়ে রাখা হয়েছে—যা দু'টি হাতি হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে ক্রমে উন্মোচিত করছে। সেই নথি অর্থাৎ সর্পিলাকার অংশটির তাৎপর্য হচ্ছে—শ্রীরামকৃষ্ণ-উপনিষদ্ সত্তা। যেন তা দিন দিন চারদিকে বর্ধিতলাভ করছে। সেভাব গোখুরাকৃতি আর্চের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব-সমন্বয় স্বামীজী-পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের বিস্তৃত-ফণা-ভুজঙ্গবেষ্টিত, উদীয়মান সূর্য, অর্ধপ্রস্ফুটিত কমল, তরঙ্গায়িত জলরাশি এবং রাজহংস নিয়ে শোভিত প্রতীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকটির অর্থ স্বামীজীর ভাষায়—"চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আবার চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মারে সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।"[২] এই প্রতীকটি (Emblem-সীলমোহর) জালির দ্বারা বেষ্টিত করাতে প্রবেশপথের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং এতে অজন্তা গুহার ছাপ পড়েছে। অজন্তাগুহার প্রধানচৈত্যে ভগবান পূজার্চনা হয়।

মিশন প্রতীকটির ঠিক একটু উপরে একটি শিবলিঙ্গ। এখানে এটি দু'টি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি Keystone (Point); অপরটি মঙ্গলসূচক—এইভাবে। মিশন প্রতীকটি অলঙ্করণ হিসেবেও শ্রীমন্দিরের নানা অংশে ব্যবহার করা হয়েছে।

১. "গোপুরম্গুলি দ্রাবিড় স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন, দক্ষিণ ভারতের শিল্পের চরম বিকাশ, তামিল সভ্যতার চরম পরিণতি এবং প্রাচীন ভারতের কৃষ্টির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।"

Ref. : ভারতের দেবদেউল—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ২১৬।

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ; পৃঃ ১৯০।

উপসংহার

শ্রীমন্দিরের সামগ্রিকরূপে একটি অতি গম্ভীর এবং দৃঢ়, বিরাট ভাবমণ্ডিত অপূর্ব স্থাপত্যের নিদর্শন হয়েছে—যা কোন একটি মন্দির, মসজিদ, গীর্জা বা কোন ভারতীয় দেবস্থান দর্শনে যুগপৎ (Simultaneously) আধ্যাত্মিক ভাব সৃষ্টি করে না। সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলে এরকম ভাবোদ্দীপক আধুনিক অথচ সর্বপ্রকার প্রাচীন ভাবের দ্যোতক মন্দির আর দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে এবং ভাবে যেমন অদ্ভুত নবপ্রাণ-সঞ্চার সনাতন রত্নসম্ভারকে নতুন মূল্য দিয়েছে; তার ঠিক পরিপূরক হিসাবে এরকম মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা ছিল যার প্রভাব কোন দিনই প্রাচীনকে অস্বীকার করবে না, আবার কোন এক যুগে এর প্রভাব শেষ হয়েও যাবে না। অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, এমন মন্দির গঙ্গাতীরে না হ'তে পারলে এর প্রভাব কিছুটা ম্লান হ'ত। সুতরাং এই অত্যুজ্জ্বল মহিমান্বিত শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির—ঊনবিংশ শতাব্দীর—নবজাগরণ।

পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মার্টিন কোম্পানির সাহায্যে শীঘ্র ও সুচারুরূপে এবং কম খরচে মন্দির নির্মাণ করেন। নব-নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়—১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।[১]

প্রতিষ্ঠার দিন শিখর থেকে পাদদেশ পর্যন্ত একখানি সাদা বস্ত্রখণ্ডে সম্পূর্ণ মন্দিরটি এককভাবে গ্রহণ করে, বিধিপূর্বক পূজা, হোম, বাস্তুযোগ, রুদ্রযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হ'ল। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ 'আত্মারামের কৌটা' সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য বেদীতে চিরপ্রতিষ্ঠিত করে পুষ্পাঞ্জলি, আরতি ভোগাদি নিবেদন করেন এবং গভীর অনুরাগের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীমন্দিরে অবস্থান করতে প্রার্থনা জানান। ঘরে ফিরে গিয়ে বললেন, "স্বামীজীকে বললাম, 'স্বামীজী, আপনি উপর হ'তে দেখবেন বলেছিলেন, আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নূতন মন্দিরে বসেছেন'। তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাঁড়িয়ে আছেন।"[২]

যদিও প্রতিষ্ঠার কাজ ঐদিনে সম্পন্ন হ'ল—তথাপি তার পরেও নাটমন্দিরের কাজ

১. "On January 14, 1938, the temple was dedicated wtth elaborate religious rites, and the ashes of the Master laid in it by Swami Vijnanananda."

History of the Ramkrishna Math and Mission

—Swami Gambhirananda, p. 347 .

২. শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা –স্বামী গম্ভীরানন্দ ; ৫ম সংস্করণ, পৃ 2/১১৩।

আরও কিছুদিন চলেছিল। প্রায় চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং মোট প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রামকৃষ্ণমন্দির তৈরী হয়।[১]

ললিতকলা সমালোচক শ্রীযুক্ত সি. শিবরামমূর্তি এই শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করে বলেছিলেন : "It is a Hindu temple, in the main, as we see it. As we stand at the gate and as we enter the hall we have at once a feeling of ancient Buddhist cave temples. The windows and balconies, with several arches, recall the Rajput and Moghul style of architecture. The large hall, for congregational purpose, is, to a great extent, suggestive of a Church. The domes and pavilions of the main shrine suggest the usual Hindu temple in Bengal."[২]

---

১. "The actual cost of the temple and its allied constructions has exceeded the estimated cost of Seven lakhs of rupees by another lakh, and although some part of it has been subscribed by the Indian devotees, there is still a deficit of Rs. 84,000. These were figures of of the pre-war days, and some of the materials had been obtained at concession rates; the present figures would be at least four times as much."

History of The Ramkrishna Math and Mission

—Swami Gambhirananda, p. 347-348.

২. Prabuddha-Bharata—January, 1953.

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য-ভাবনার নানাদিক ও বিবেকানন্দ

"বিবেকানন্দ উনিশ শতকের একবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দু' চারটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা অরম্ভ করেন। অবশ্য তখন বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক ও শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে।...কিন্তু সাহিত্যরচনা, শিল্পসৃষ্টি বা নিজের মনোমুকুরতলে প্রতিফলিত নিজেরই মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কোন বাসনাই স্বামীজীর ছিল না। নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক, সুকঠোর কর্মযোগী, ভাবোন্মাদ আদর্শবাদী অকৃপণ মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মৃত্তিকার মানুষকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভাল বেসেছিলেন। পুঁথিবন্দী আগুবাক্য নয়, জীবন্ত মানুষের কথা এত গভীরভাবে ক'জন মানবপ্রেমী ভেবেছেন জানি না। বিবেকানন্দের গদ্যরচনার সবটুকু এই নর দেবতাকে উৎসর্গীকৃত। এদেশে মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর বাংলারচনায় তাই নানা জ্ঞানবিজ্ঞান ইতিহাসের সমারোহ যেমন আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসা, জীবনের প্রতি একটা সরল নিঃস্পৃহ কৌতূহল।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বাংলাসাহিত্য

আশুতোষ ভট্টাচার্য

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আলোকে বাংলা-সাহিত্য বুঝতে হলে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, তাঁদের সাধন-ভোজনের আলোকে বাংলা-সাহিত্য বুঝতে হবে। এখানে প্রথমেই একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাধন-ভজনের সঙ্গে সাহিত্যের কি সম্পর্ক? একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, আধ্যাত্মিক সাধন-ভজন অলৌকিকতায় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাহিত্য প্রত্যক্ষ জীবনের বিচিত্র রূপে-রসে পরিপূর্ণ; লেখকের অনুভূতিতে তার সরস প্রকাশ হয়ে থাকে। সাহিত্য শুধুমাত্র অলৌকিকতার উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। সহজ কথায় জীবনই সাহিত্য, যে জীবন সহজ, যে জীবন প্রত্যক্ষ, তাতে সৌন্দর্য থাকতে পারে, ক্লেদ থাকতে পারে, তার কোন অংশই পরিত্যাজ্য হতে পারে না। মানুষের দুর্বলতা, মানুষের জীবনের ভুল-ভ্রান্তি অর্থাৎ জীবনব্যাপী নরনারীর যা কৃতি তাও সাহিত্যের সামগ্রী। তবে তা শিল্পরূপ দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব জনপ্রিয় সাহিত্যের বিষয় নয়, তা দর্শনের বিষয়। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সাধন-ভজনের মূল কথাই হচ্ছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভক্তি। এই বিশ্বাস এবং ভক্তির কোন নৈয়ায়িক যুক্তি নেই। ঈশ্বর সব কিছুরই অতীত। কোন যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার সীমানার মধ্যেই তাঁকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসা যায় না, এক কথায় ঈশ্বরের অনুভূতি অলৌকিক এক অনুভূতি। সুতরাং যে সাহিত্য প্রত্যক্ষ জীবনকে একান্তভাবে আশ্রয় করেই বিকাশ লাভ করে, তাতে কেবলমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসের সম্পর্কই থাকে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসী কোন চরিত্রে উপন্যাসে থাকলেও একমাত্র তার এই বিশ্বাস দিয়ে কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় না কিংবা কাহিনীর পরিণতিও নির্দিষ্ট হতে পারে না। কাহিনীর অলঙ্কার রূপে তা বর্তমান থাকতে পারে,—কাহিনীকে প্রভাবিতও করতে পারে। তবে আমাদের দেশে এককালে ভক্তিমূলক নাটক ও যাত্রা রচিত হত, বর্তমানে তার প্রবণতা লুপ্ত হয়েছে। ভক্তিমূলক সাহিত্য অলৌকিকতার উপর বিশ্বাসী, তাতে অলৌকিক সাধন-ভজনের পথে ঈশ্বরপ্রাপ্তিও স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু তাদের সাহিত্যিক মূল্য প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু এখানেও একটি কথা আছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনভজনে একটি বিশেষত্ব ছিল, যার ফলে তাঁদের কিংবা তাঁদের অবলম্বন করে রচিত গ্রন্থাদি সাহিত্যগুণ-বর্জিত হতে পারেনি। রামকৃষ্ণ যে বলতেন, 'খালিপেটে ধর্ম হয় না', কিংবা 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা', 'আমাকে শুষ্ক সন্ন্যাসী করিসনে, মা'। এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণার মধ্যে জীবসেবাকেই ঈশ্বরসেবা বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাতেই তাঁর ধর্মচিন্তায় সাহিত্য-গুণ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, দরিদ্র-নারায়ণই তাঁদের আকর্ষণ করেছিল। দরিদ্র, মূর্খ বিপন্ন মানুষই তাঁদের সাধন-ভজনের লক্ষ্য ছিল।

রামকৃষ্ণদেব যখন দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বাংলাসাহিত্যের অবস্থা কি ছিল, তা প্রথমেই আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। এক কথায় বলতে পারা যায় যে, তখন বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমযুগ। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাত্র দু বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তাঁর তিরোধানের পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্কিম-চন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' রচিত হওয়ার সময় অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স ২৯ বছর। সুতরাং তার পূর্বেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারামে'র পূর্ববর্তী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী' শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজনীয় মাস্টার মশায় পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন, সে সম্পর্কে ঠাকুর কিছু কিছু মূল্যবান মন্তব্য ও করেছিলেন। এই উপন্যাসখানি তাঁকে পড়ে শোনানোর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাতে শ্রীগীতার অনুশীলনতত্ত্বের কথা, নিষ্কাম কর্মের কথা ছিল, ঠাকুরের তা মনঃ-পূত হতে পারে বিবেচনায় তা তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোন উপন্যাস শ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনানো হয়েছিল কিনা জানা যায়নি, কারণ, সে সব সম্পর্কে ঠাকুরের কোন মন্তব্যও শুনতে পাওয়া যায় না।

'দেবী চৌধুরানী' বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ নয়, তা উপন্যাস; তাতে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের কথা নেই, সাংসারিক জীবনে পতিসেবায় আত্মসমর্পণের কথা আছে। তার কথা—'প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরের আরোহণের প্রথম সোপান।' তাতে পতিসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসেবা, অর্থাৎ পতিসেবাকে মুখ্য করা হয়েছে।

বঙ্কিমযুগে বাংলাসাহিত্যের ভাষা তিনভাগে বিভক্ত ছিল—প্রথমতঃ পণ্ডিতী বাংলা, দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী যে ভাষা গ্রহণ করিছিলেন, যাকে এই দুয়ের মধ্যগা ভাষা বলা হয়েছে, সেই ভাষা, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁর 'কথামৃত' একটি চতুর্থ বিভাগ রচনা করলেন, তা এই তিনেরই ব্যতিক্রম।

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য বাংলা ঔপন্যাসিক সাধারণতঃ বঙ্কিমচন্দ্রেরই অক্ষম অনু-করণকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক রোমান্সগুলো বঙ্কিম আদর্শেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু কিন্তু ধর্মতত্ত্ব কিংবা সমাজের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরও কোন কৌতূহল ছিল না।

তখনকার কাব্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন, তাঁর 'পরমেশ্বর বন্দনা' ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন আধ্যাত্মিক চেতনাতে সঞ্জাত। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রভাববশতঃই 'ঈশ্বর' কথাটি সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রথম ব্যবহার করেছেন। তারপর থেকে তাঁর শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র,—এঁদের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাব সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করেছিল। তাপরর সব চাইতে যা বড় কথা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর এক সম্পূর্ণ নূতন যুগ সূচনা করলেন। তাঁর কাব্যদেহের গঠন

এবং ভাবনায় নূতন সৌষ্ঠব এবং শক্তি দেখা দিল। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গল-কাব্যের প্রাচীন রীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে প্রাচীন এবং নূতনের মধ্যে তখনও একটি বোঝাপড়ার ভাব চলছিল, কিন্তু মধুসূদন তার জন্য যে নূতন ধারা সৃষ্টি করলেন, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ধারার কোন সম্পর্ক রইল না, তবে একথা সত্য ঐতিহ্যের ধারাকে তিনি এই বিষয়ে পরিত্যাগ করলেন না। দেশের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ তাঁর রচনায় ভিত্তিরূপে তিনি তখনও রক্ষা করে চললেন। তবে একথাও সত্য, ভারতীয় মহাকাব্য কিংবা পুরাণের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক পুরাণ কাহিনীরও কোন কোন ক্ষেত্রে সংমিশ্রণ করে তাঁর রচনার প্রাণশক্তি এবং বৈচিত্র্যকে বাড়িয়ে তুললেন। দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কাব্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে মধুসূদনের একবার সাক্ষাৎও হয়েছিল, কিন্তু সেই সাক্ষাৎকার কোন দিক থেকেই ফলপ্রসূ হতে পারেনি। কারণ, তাঁর 'পেটের দায়ে' ধর্মান্তর গ্রহণের কথা রামকৃষ্ণদেব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। কেউ কেউ একথা মনে করেছেন, মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ বিরহের আর্তি কিংবা দিব্য ভক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে তাঁর বৈষ্ণবপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব মহাজন কবি ব্যতীত শ্রীরাধার দিব্য বিরহের প্রেরণা কেউ অনুভব করতে পারে না, মধুসূদনও পারেননি। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দিব্য ভক্তির ভাব মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে ফিরে আসতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে 'ব্রজাঙ্গনা, কাব্যে যে রাধার অন্তর্বেদনা মধুসূদন ব্যক্ত করেছেন, তা বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার পার্থিব বিচ্ছেদ-বেদনার কাতরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মধুসূদনের কাব্যে কিংবা নাটকে কোনপ্রকার ধর্ম-চেতনা প্রকাশ পেতে পারেনি, তবে একথা সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব বাঙালীত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেই বাঙালীত্বের সঙ্গে কোন আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নেই।

তাই মধুসূদন যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর রচনায় যুগের আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্চারিত করতে পারেননি, তা যদি পারতেন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রতি বিমুখ হতেন না।

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনে ধর্মবোধ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়নি। তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমি যে পাপের পাহাড় গড়ে তুলেছি। তবু গিরিশের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাস ছিল, কারণ, গিরিশচন্দ্রের রচিত 'চৈতন্যলীলা' নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের সুগভীর ভক্তির ফল্গুধারার পরিচয় পেয়েছিলেন।

তারপর সমসাময়িক বাংলা নাটকের বিষয় যদি আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক কাল থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত হতে আরম্ভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শৈশবকাল থেকেই তাঁর

নিজ গ্রামে যাত্রা দেখতে ভালবাসতেন, পৌরাণিক যাত্রার ভক্তিভাব তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। তিনি নিজেও যাত্রার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলো গ্রাম্য পৌরাণিক আখ্যানমূলক যাত্রার সামান্য উন্নত সংস্করণ মাত্র। বাঙালীর হৃদয় যে ভক্তিরসে প্লাবিত, তা গিরিশচন্দ্র যেমন জানতেন, সে-যুগের যাত্রা-ওয়ালারাও তেমনই জানতেন, সেজন্য বাঙালীর মনে সেই রসই জাগ্রত করে দিয়ে তাঁরা তাঁদের যাত্রার কাহিনীকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বাঙালী হৃদয়ের সেই অনুভূতির ক্ষেত্রটির সন্ধান করে তাঁর চৈতন্যলীলা' নাটক রচনা করলেন। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবেও তখন তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। যাই হোক, শ্রীশ্রীঠাকুর 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখবার পর থেকেই গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। এই আকর্ষণের শ্রীঠাকুর নিজেই কারণ, তিনি তাঁকে আশ্বাস দিলেন, তাঁর নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে লোকশিক্ষা হচ্ছে, তাই সমাজের কল্যাণকর হচ্ছে। শ্রীঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে তাঁকে সমাজের কল্যাণের জন্যই তাঁর নিজের পথে অগ্রসর হয়ে যেতে বললেন। যে গিরিশচন্দ্র অনাচারের গভীর পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে থেকে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তিনিও নূতন জীবনের আশায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করলেন এবং নূতন উৎসাহে ঠাকুরের চরিত্র সামনে রেখে তাঁর নূতন নূতন নাটক রচনা করে চললেন। কেবলমাত্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে যে ভক্তিভাব সঞ্চারিত করতে লাগলেন তাই নয়, তিনি ঠাকুরের অলোকসামান্য চরিত্রকেও নাটকের মুখ্য চরিত্ররূপে গ্রহণ করে নূতন নাটক রচনা করতে লাগলেন। তাঁর 'নসীরাম' নাটকের নায়ক চরিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত হল, তাঁর 'জনা' নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্র বিদূষকের মুখেও 'রামকৃষ্ণকথামৃতে'র বাণী আরোপিত হল। ক্রমে চৈতন্য চরিত্র থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁর সকল ভক্তি এবং শ্রদ্ধা স্থানান্তরিত হল।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভ করবার পর গিরিশচন্দ্র তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে নাটকগুলো রচনা করেছিলেন ক্রমে সেগুলোর মধ্যে থেকে ভক্তিরস শুষ্ক হয়ে গিয়ে তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে একাও সত্য যে, গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের নাটকগুলোতে যে তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছিল, তাও মানুষকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

সুতরাং যাঁরা সাধন-ভজনের পথের পথিক, তাঁদের স্বর্গীয় প্রভাব সৃজনশীল সাহিত্যিকের অনেক সময় স্বাধীন সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পার্থিব জীবনের কর্দমাক্ত পথ থেকে তাকে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে গিয়ে যে পথে নিয়ে যায়, সে পথে জীবনের ক্লেদ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। সেখানে তার সহিত্যের অপূর্ণতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাও হয়নি, কারণ, শ্রীঠাকুরের প্রভাববশতঃ মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেম তাঁর চিরদিনই লক্ষ্য ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'তত্ত্বমূলক' তিনখানি উপন্যাস

রচনা করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ১৮৮২, 'দেবী চৌধুরানী' ১৮৮৪ এবং 'সীতারাম' ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বছর রামকৃষ্ণদেব দেহরক্ষা করেছিলেন, তার পরের বছর প্রকাশিত হয়। তাঁর এই তিনখানির একখানি উপন্যাসও শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাঠ করেননি, তবে তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসখানির কিছু অংশ মাস্টার মশায় শ্রীঠাকুরকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু যতটুকু শুনিয়েছিলেন, তাতে তাঁর মন সায় দিতে পারেনি। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীঠাকুরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ভক্তির কোন স্থান ছিল না, তিনি প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন এবং পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য দর্শনের সংমিশ্রণে তাঁর নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন।' রামকৃষ্ণদেব 'দেবী চৌধুরানী'র যতদূর অংশ শুনেছিলেন, ততটুকুও তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

মাস্টার মশায় যখন রামকৃষ্ণদেবকে বুঝিয়ে বললেন যে, ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে বলেছে, তিনি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও ত রাজার কর্তব্য।' অর্থাৎ ভবানীর পক্ষে তা অনধিকার চর্চা।

কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে ভাবুক ব্যক্তি হলেও তিনি একথা বলামাত্র ভবানী পঠেকের চরিত্রের ত্রুটি ধরতে পেরেছিলেন, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রাজারই দায়িত্ব, তা না হলে প্রত্যেকেই যদি নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে দুষ্টের দমনে প্রবৃত্ত হয়, তবে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং তা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ হতে পারে না। যাঁর জীবন কিংবা সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এই উক্তি তিনিই করতে পারেন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবানী পাঠকের এ কাজ সমর্থন করতে পারেননি, বাস্তব সমাজজীবনে কার কি কর্তব্য সে বিষয়ে তাঁর প্রখর জ্ঞান ছিল। ভবানী পাঠক যে এ কার্যে পাপ সঞ্চয় করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছিলেন। আর ভবানী পাঠকই কি তা জানতেন না ? সেজন্যই তো ভবানী পাঠকও ইংরেজ-প্রদত্ত দ্বীপান্তরের দণ্ড হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ইংরেজ বিচারক যখন ভবানী পাঠককে দ্বীপান্তরের দন্ডাদেশ দিলেন, তখন ভবানী পাঠক 'প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।' কারণ, তিনি যে অপরাধী তা তিনি নিজে অবশ্যই জানতেন।

তারপর মাস্টারমশায় যখন 'দেবী চৌধুরানী'তে যে গীতার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার প্রশংসা করলেন, তারপর যখন প্রফুল্লকে 'সর্ব কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ' করবার কথা বলা হল, তখনও রামকৃষ্ণদেব তার সমালোচনা করে বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই।'

মাস্টার মশায়ও স্বীকার করলেন, 'এখানে এ-কথাটি বিশেষ করে বলা নাই।' তারপর ভবানী পাঠক যখন প্রফুল্লকে বললেন, কখনও কখনও কিছু দোকানদারী চাই। শ্রীঠাকুর 'দোকানদারী' কথাটাতে বিরক্তি এবং আপত্তি করলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হননি, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাও কোন দিক থেকেই শ্রীঠাকুরকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত সন্ন্যাসিচরিত্রগুলো আলোচনা করে দেখলেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হবে। রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সম্পর্কে তদানীন্তন বাঙালীর একটা অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল। বঙ্কিম তো সেই যুগেরই মানুষ, সেজন্য তাঁর মনেও সেই ভাবের কিছু ব্যতিক্রম ছিল না। সন্ন্যাসিচরিত্রের সেই বিভ্রান্তিকর যুগে রামকৃষ্ণদেব এক স্বার্থ-ত্যাগী চরিত্রবান্ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠন করলেন, ক্রমে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার যুগ শেষ হয়ে যাবার পর দেশের এই নূতন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। তাই তিনি তাঁদের তাঁর উপন্যাসে রূপ দিতে পারেননি।

এ সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, খাঁটি আদর্শবাদী কোন সন্ন্যাসী কি উপন্যাসের নায়ক কিংবা এমন কি আদৌ উপন্যাসের কোন চরিত্রও হতে পারে? যে জীবন অতি বাস্তব, অত্যন্ত লৌকিক, যে জীবন প্রত্যক্ষ, তাই তো উপন্যাসের মধ্যে উচ্চ আদর্শবাদী সন্ন্যাসী স্থান কি করে হতে পারে? সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো ইচ্ছা করেই কেবলমাত্র গেরুয়বধারী মানুষকেই তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে মানুষের দুর্বলতা, মনুষ্য চরিত্রের সকল দোষ-ত্রুটিই বর্তমান আছে কেবল এমন চরিত্রগুলোকেই সন্ন্যাসীর নামে তাঁর উপন্যাসগুলোতে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ, তারা সাধারণ মানুষেরই আচরণ করে উপন্যাসের সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে। নয়তো প্রকৃত আদর্শবাদী সন্ন্যাসীতে উপন্যাসের কাজ হয় না।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পর থেকেই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিচরিত্র বাংলা-সাহিত্যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে, কারণ, ততদিনে এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগ ও আর্তসেবা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরে সমাজের সামনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং তাঁর কবিত্বের মধ্যে কিছুমাত্র ফাঁকি নেই। মনেপ্রাণে চিন্তায় ধ্যানে সর্বভাবেই তিনি কবি, সেজন্য পার্থিব জীবনের ব্যাথা-বেদনা আনন্দ-উল্লাসই তাঁর অনুভূতির বিষয় হয়েছে। তিনিও রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের কোন সন্ন্যাসীকেই যে আনুপূর্বিক তাঁর কোন উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রূপায়িত করেছেন তা নয়, তথাপি একথা মনে হবে, তিনি তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে গোরার চরিত্রটির যে পরিকল্পনা করেছেন, তার মধ্যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পেয়েছে। হাবভাবে, চালচলনে, কথা বলবার ভঙ্গিতে আত্ম-

বিশ্বাসের দৃঢ়তায় গোরা-চরিত্রটি বার বার স্বামী বিবেকানন্দের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গোরা বলে, 'সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, যাঁকে অপমান করেছে, আমি তাঁরই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই -আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ।' গোরার এই বক্তব্যের মধ্যে যেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই শুনতে পাওয়া যায়। তাঁরই মুখে দরিদ্র ভারতবর্ষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সহানুভূতির বাণী একদিন বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, তাই যেন গোরার মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক, তাই উপন্যাসের পথেই তার জীবনকাহিনী শেষ হয়েছে, তথাপি সমস্ত জীবনব্যাপী যে সে দরিদ্র ভারতবর্ষের সেবাব্রত গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে স্বামীজীর প্রভাবই কার্যকর হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে আর একটি কথা এই যে, তার আনন্দময়ীর চরিত্রটি শ্রীশ্রীমার চরিত্রের প্রভাবজাত। শ্রীমার চরিত্র শ্রীঠাকুরের চরিত্রের পরিপূরক বা complement, অর্থাৎ এ দুয়ে মিলে যেন একটি অখণ্ড চরিত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শই সমস্ত জীবনব্যাপী শ্রীমার উপর প্রতিফলিত হয়েছে। 'গোরা আনন্দময়ীর পা দুখানি মাথার উপরে রেখে বললে, মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা।'

রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীমার মধ্যে এই প্রতিমার রূপ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। তাই রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ী নিঃসন্তান হলেও শ্রীমায়েরই আদর্শে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকলকেই নিজের সন্তান রূপে পরিচর্যা করে নিজের মাতৃত্বকে বিশ্বজনীনরূপে দিতে প্রয়াসী।

রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রও তাঁর সাহিত্যে সন্ন্যাসীচরিত্রের একটু হলেও শ্রদ্ধার স্থান দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি চরিত্র রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীচরিত্র নিয়ে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত তা অস্বীকার করতে পারা যায় না। তাঁর নাম ব্রজানন্দ। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। সেবাধর্মে তিনি দীক্ষিত এবং সেই সেবাকর্মে তিনি আনন্দে পরিহাসে এমন একটি পরিমণ্ডল সহজেই সৃষ্টি করে তোলেন, যাতে তাঁর কর্ম সহজ হয়ে ওঠে। তাঁর চরিত্রেও স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্রের সুস্পষ্ট আভাস অনুভব করা যায়!

যে কোন কারণেই হোক ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের যুগে আমাদের দেশ থেকে সন্ন্যাসীচরিত্রের প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাভক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিম সাহিত্যই তার প্রমাণ। রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সেই বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে এনেছে এবং ত্যাগী ও দরিদ্রসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন

কালে দু শ্রেণীর সন্ন্যাসীই দেখিতে পাওয়া যায়—একশ্রেণী পূর্ববর্তী ধারার সন্ন্যাসী এবং আর এক শ্রেণী পরবর্তী ধারার ত্যাগী সন্ন্যাসী—সেবাধর্মে উৎসর্গীকৃত জীবন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে মধ্যযুগে একদিকে যেমন জীবনীসাহিত্যের প্রথম উদ্ভব এবং বিকাশ হয়েছিল, তেমনই বৈষ্ণব গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তা ছাড়াও সংস্কৃত ও বাংলায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নানা সরস ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়েছিল। তার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নামেও একটি নূতন দর্শন শাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়ে তা নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলায় বহু গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের অবলম্বন করে সেই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয়ে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে কিনা, তাও আমাদের দেখা প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ কর্তৃক রচিত চিরকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রচয়িতা রামকৃষ্ণ স্বয়ং, তা তাঁর 'কথামৃত'। তার মধ্যে রামকৃষ্ণের কবিত্ব পরিহাস-রসিকতা, মানব-জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা. এ সকল সাহিত্যের উচ্চ গুণগুলো এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যা আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যেও সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে ঐহিক জীবনের কথা বহুল প্রত্যক্ষ হয়েছে, তাই 'কথামৃত' উৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপে গৃহীত হবার যোগ্য। বিশেষতঃ তার উপস্থাপনার মধ্যে একটি বিস্ময়কর সাহিত্যিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে। তাই 'কথামৃত' বহু নূতন নূতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দিতে পারে। তবে মধ্যযুগে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুণে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে এক বিপুল সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছিল, আজ আর তা রচিত হতে পারে না। কিন্তু তাহলেও তেমনিভাবে সমাজের মনে তা তার নিজস্ব ক্রিয়া ঠিক করে চলেছে। সাহিত্যে তার রূপ নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। রামকৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করেও বহু সার্থক জীবনী রচিত হয়েছে, অগণিত প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে। কাব্য কবিতার যুগের অবসান হয়ে গেলেও পূর্ববর্তী সংস্কার অনুসরণ করে তাও রচিত হচ্ছে, তারপর নাটক, চলচ্চিত্র, যাত্রা, সঙ্গীত, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, আলোচনা ইত্যাদি কত রচিত হচ্ছে, তা হিসাব করে বলা যাবে না। চৈতন্যের সমসাময়িক কালে যা হিসাবের মধ্যে ছিল, আজ আর তা হিসাবের মধ্যে নেই। আগে চৈতন্যজীবনী রচনার যে ধারা ছিল, আজ আর সে ধারাও নেই, আজ তা আরও স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

কবি বিবেকানন্দ

শৈলেনকুমার দত্ত

বিবেকানন্দ বাঙলা সাহিত্যের সচেতন শিল্পী ছিলেন না। শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, উপদেশাবলী, চিঠিপত্র এবং অধ্যাত্ম-চেতনার নানান অভিব্যক্তিতে তিনি বিভিন্ন সময়ে যা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলিই তাঁর সহজাত প্রতিভার স্পর্শে সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

বাঙলা গদ্যের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় স্রষ্টা হিসাবে চিহ্নিত হলেও, বিবেকানন্দ মূলতঃ কবি ছিলেন। তাঁর চরিত্রে এবং আচরণে বীর্যভাব বিদ্যমান থাকলেও, তাঁর অন্তরে, অবয়বে এবং স্বপ্নাচ্ছাদিত উজ্জ্বল চোখ দুটিতে কোথায় যেন কবিত্ব বিচ্ছুরিত হত! এই আপাত-বিরোধী সত্তার বিস্ময়কর সহাবস্থান তাঁর জীবনের অন্যত্রও ছিল। বিচার-বিশ্লেষণের অন্তরালে তাঁর যুক্তিতে যেমন ছিল বিজ্ঞান-সম্মত অকাট্যতা, তেমনি ছিল কবিত্বের এক বর্ণাঢ্য স্পর্শ।

কবিতার প্রতি বিবেকানন্দের অনুরাগ ছিল আশৈশব। তাঁর জীবনীকার প্রমথনাথ বসু লিখেছেন: 'নরেন্দ্রনাথ পাঠদশায় কবিতার অতিশয় ভক্ত ছিলেন।' ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থকে তিনি ক্যাব্যগগনের ধ্রুবতারা মনে করতেন। জীবনীকার আরও লিখেছেন: "তাঁহার ধারণা ছিল প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায় একখানি মনোরম শব্দময় চিত্র বিশেষ। ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প···।"

বিবেকানন্দের এই উপলব্ধির অন্তরালে তাঁর কবি মনের পরিচয় আছে। তিনি আজীবন কাব্য-সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' বিবেকানন্দ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যে-অংশটিকে শ্রেষ্ঠ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন, সেটিও তাঁর কাব্যোপলব্ধির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাঙলা সাহিত্যে তাঁর যেটুকু অবদানের আমরা উত্তরাধিকারী হয়েছি, তার মধ্যে অল্প হলেও, কিছু কবিতা আছে। তিনি ইংরেজী-বাঙলা দুটি ভাষাতেই কবিতা রচনা করেছেন, তবে ইংরেজী কবিতার সংখ্যাই সর্বাধিক। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্র এবং হিন্দী ভাষায় রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত' আছে। কিন্তু এহো বাহ্য। একজন কবির মূল্যায়নে তাঁর রচনার পরিমাণ নিতান্তই গৌণ ব্যাপার।

বিবেকানন্দের উৎকৃষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে মা কালীর ভীমামূর্তির কিছু idea নিয়ে রচিত 'Kali the Mother' কবিতাটি অন্যতম কাশ্মীরে ক্ষীর ভবানী দর্শনের কয়েক দিন আগে এক অলৌকিক চৈতন্য যখন তাঁর প্রাণমন আবিষ্কার করে রেখেছিল, সেই বিহ্বল:অবস্থায় এই কবিতাটি রচনা করার পর স্বামীজী অবসন্ন হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। কবি এবং সাধকসত্তার এমন দুর্লভ যোগাযোগ একটি কবিতার

ক্ষেত্রে হলে তা মহৎ সৃষ্টি হতে বাধ্য। কবিতাটি শুনে মহাশক্তির অতলস্পর্শ গভীরতায় এবং গাম্ভীর্যে অলৌকিক সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি, কবিতা হিসাবে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। অরবিন্দ এই কবিতাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বহু সাহিত্য-সমালোচকও কবিতাটির কল্পনা, বর্ণনা ও ওর্জস্বিতার ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। কবি হিসাবে বিবকানন্দ শুধুমাত্র এই কবিতাটি রচনা করেই কাব্যজগতে অমর হয়ে থাকতে পারতেন। শক্তিসাধনার গভীরতার আস্বাদন করতে পারলেও, পাঠক মাত্রেই কবিতাটির অনবদ্যতা মুগ্ধ হবেন ঃ

Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.

সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন ঃ

(সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।)

এই কবিতাটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়বে বিবেকানন্দের আর একটি অনবদ্য কবিতা 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। সুদীর্ঘ এই কবিতাটিতে প্রকৃতির রুদ্র এবং শান্তরূপের এক অনন্য-সাধারণ বর্ণনা আছে। কবিতাটি সুভাষচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। সম্ভবতঃ এই কবিতা থেকেই তিনি মহত্তর জীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝেই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন। এই কবিতার মধ্য যেন সাধক. দেশ-প্রেমিক এবং কবি বিবেকানন্দের একত্র প্রকাশ ঘটেছে ঃ

(জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা ।)

'নাচুক তাহাতে শ্যামা'র মতো তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতাটিও বিলম্বিত পয়ারে রচিত একটি অনবদ্য কবিতা। 'মাতৃভাবের আগমন' বর্ণিত হলেও, এই কবিতাটিতেই

প্রকাশিত হয়েছে স্বামীজীর জীবনদর্শন। ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এই কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ " 'সখার প্রতি' বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা, সংগ্রাম, বেদনা ও অভিজ্ঞতার অন্তরতম পরিচয় এ কবিতার প্রতিটি চরণে নিবিড় সংহতি নিয়ে ফুটে উঠেছে।"

এ কবিতার শেষ দুটি ছত্রে যেন মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী ঝঙ্কৃত হয়েছে ঃ

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' বিবেকানন্দের আর একটি সুদীর্ঘ কবিতা। এই কবিতার একটি ছত্রে অন্তর্নিহিত ভাবটি যেন প্রকারান্তরে কবি বিবেকানন্দেরই যথার্থ স্বীকারোক্তি ঃ

আমি আদি কবি
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়াসনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।

এবার একবার চোখ ফেরানো যাক তাঁর গদ্য রচনার দিকে যার মধ্যে আমরা কবি বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পাই।

বিবেকানন্দ লিখেছেন ঃ "নূতন ভারত বেরুক ! বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" পরিব্রাজক হয়ে বিবেকানন্দ সারা ভারত ঘুরেছেন। দেখেছেন তাঁর ঋষির দৃষ্টি নিয়ে, ইতিহাসের সন্ধানী ছাত্রের দৃষ্টি নিয়ে, সর্বোপরি কবির দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দেশকে, দেশের অতীতকে, তার বর্তমানকে, তার ভবিষ্যৎকে। কবির দৃষ্টি স্বচ্ছ দৃষ্টি। অনাগত ঘটনার ছবি ধরা পড়ে সেই দৃষ্টিতে। সাধারণভাবে যা আমাদের ধারণায় আসে না, দৃষ্টির সীমার নধ্যে পড়ে না। কবি তা দেখতে পান। বহু কাল আগে থেকেই তিনি আগামী দিনের ঘটনার উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন। স্বামীজী যে যথার্থই কবি তা তাঁর উপরের কথাগুলি বিচার করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির ভিতর থেকে, মুদির দোকান পেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের

অনুধ্যান! তিনি যখন শূদ্রের গলায় ব্রাহ্মণের পৈতে ঝুলিয়ে দিয়ে, ভাঙ্গী-মুসলমানের হাতে অন্ন গ্রহণ করে জাতিহীন, বর্ণহীন, শ্রেণীহীন, সম্প্রদায়হীন এক মহান, বৃহৎ এবং সম্মিলিত ভারতবর্ষের আদর্শ তুলে ধরেন—তখন বিস্ময়-বিমূঢ় আমরা তাকিয়ে দেখি—সেখানে দণ্ডায়মান মহাকবি বিবেকানন্দ!

নিবেদিতা তাঁর সুবিখ্যাত 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে বিবেকানন্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—Had I lived in Palestine in the days of Jesus of Nazareth, I would have washed His feet not with tears, but with my heart's blood."—যীশুখ্রীষ্টের সময় জীবিত থাকলে, আমি চোখের জলে নয়, বুকের রক্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।

এ কি শুধু একজন সাধকের আত্মনিবেদন—কবির আত্মিক উপলব্ধি নয়?

বিবেকানন্দের সমগ্র গদ্য-রচনার অন্তরালে তাঁর কবি-সত্তার একটি ছদ্ম-আবরণ আছে। তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের 'স্বদেশমন্ত্র' যখন আমরা পড়ি তখন মনে হয় এটি কোনভাবেই একটি গদ-রচনা নয়; সর্ব অর্থেই মহৎ কবিতার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত ঃ

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।'"

বস্তুতঃ স্বামীজীর 'স্বদেশ মন্ত্র'টি গদ্যে-গ্রথিত একটি অনবদ্য কবিতা। তাঁর পত্রাবলীর বহু অংশকেও সার্থক কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে গদ্য-পদ্যের যে আঙ্গিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে অদূরে ভবিষ্যতে কাব্যধর্মী গদ্য এবং গদ্যধর্মী কাব্যের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াবে খুবই সূক্ষ্ম। তখন সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে শুধুমাত্র কবি হিসাবে। সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়!

স্বামীজীর ইংরেজী কবিতা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজীর বাংলা কবিতার মতো স্বামীজীর ইংরেজী কবিতাও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এগুলির সাহিত্যমূল্যও যথেষ্ট। আধ্যাত্মিক ও ধর্মমূলক কবিতা উৎকৃষ্ট কবিতা হতে পারে না বলে কেউ কেউ মনে করেন। ডক্টর জন্‌সন্ এই ধরনের কবিতা খুব একটা পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে, 'religion clips the wings of the poet's imagination'.[১] তিনি আরও বলেছেন, 'poetical devotion cannot often please'.[২] এই সব কথা একটু অদ্ভুত শোনালেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বেশ-কিছু ধর্মমূলক কবিতা কাব্যের দিক থেকে খুব নিম্নমানের। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য এগুলিকে কবিতা-রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ওয়র্ডসোয়র্থ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে, যাঁরা নীতিবাদী তাঁরা যখন তাঁদের অভিপ্রেত সত্যের সন্ধান কোন কবির রচনায় পান তখন তাঁদের কাছে সেই কবি 'মহান্ কবি'র মর্যাদা পেয়ে থাকেন। পাঠকদের মতো কবিরাও অভীপ্সা এবং প্রাপ্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন না, এ-কথা বলেছেন টি. এস্. এলিঅট। তাঁর ভাষা উদ্ধৃত করছি ঃ

'Why, I would ask, is most religious verse so bad ; and why does so little religious verse reach the highest levels of poetry ? Largely, I think, because of a pious insincerity...People who write devotional verse are usually writing as they want to feel, rather than as they do feel.'[৩]

এলিঅটের সিদ্ধান্ত, অনেক ধর্মমূলক কবিতা ভাল কবিতা হয় না শুধুমাত্র আন্তরিকতার অভাবে। স্বামীজীর কবিতাতে তাঁর আন্তরিকতা প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে পরিস্ফুট।

১. ধর্ম কবির কল্পনার ডানা কেটে দেয়।

২. কাব্যিক ভক্তি অনেক সময় খুশি করতে পারে না।

৩. আমি প্রশ্ন করতে চাই, বেশির ভাগ ধর্মমূলক কবিতা এত খারাপ হয় কেন ? আর কেন এত স্বল্প-সংখ্যক ধর্মমূলক কবিতা কাব্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয় ? আমার মনে হয়, প্রধানত এক ধরনের সততার অভাবের জন্য যেটা আপাতদৃষ্টিতে সাধু···
···যাঁরা ভক্তিরসের কবিতা লেখেন তাঁরা সাধারণত যা অনুভব করতে চান সেই অনুসারে লেখেন, যা সত্যি অনুভব করছেন সেভাবে নয়।

আধ্যাত্মিক বা ধর্মমূলক বা নীতিমূলক কবিতাকে প্রথমে কবিতা হতে হবে, পরে আসবে অধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম বা নীতির কথা। তবেই এর প্রকৃত উৎকর্ষ। এ সম্বন্ধেও স্বামীজী সচেতন ছিলেন। আদর্শ, মতবাদ, নীতি -এ-সবই তাঁর কবিতায় আছে, কিন্তু তা কখনও কবিতার কাব্যত্বকে নষ্ট করেনি। তাঁর বক্তব্য শুধু বক্তব্য থাকেনি, তিনি তাঁর বক্তব্যকে কবিতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। এই রূপান্তরের জন্যই তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ। এই রূপান্তরের কথা C. Day Lewis তাঁর 'The Poet's Task'-এ আলোচনা করেছেন ঃ

'I see no valid reason for debarring dogma from poetry, if dogma is the best grist for your parricular mill. One asks nothing of a mill except that what comes out at the other end should be, not grist, but flour. Doctrinal verse, didactic verse are very well ; but they are not poetry, unless the moral truths have been translated into poetic truth.'[১]

স্বামীজীর আমাদের 'অভীঃ'-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। তাঁর সঞ্জীবনী বাণী ঃ 'হে বীর, সাহস অবলম্বন করো।' এই মন্ত্র, এই বাণী স্বামীজীর কাব্যেরও মূল সুর। 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের' যে-বাণীর কথা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন সে-বাণী অভয়বাণী। সে-বাণী স্বামীজীর গদ্য রচনায় যেমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কবিতাতেও তেমনি উদাত্ত সুরে ঝংকৃত। তাই তাঁর কাব্যসংকলনের 'বীরবাণী' নাম সার্থক।

স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Hold on yet a while, brave heart' বীররসে পূর্ণ। যে 'বীর হৃদয়'কে তিনি কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন, সে যেমন তাঁর নিজের হৃদয় তেমনি আবার পাঠকেরও হৃদয়। যে-বীররসে তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সেই রস তিনি পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। কবি এখানে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, সম্পূর্ণভাবে মিলতে পেরেছেন, এটাই এ-কবিতার সার্থকতা। স্বামীজীর এই কবিতা পড়তে পড়তে আর্থার হিউ ক্লাফ্-রচিত 'Say not, the struggle naught availeth' কবিতাটির কথা আমাদের স্মরণে আসে। স্বামীজীও ক্লাফের মতো আশাবন্ধে হৃদয়কে বাঁধার সংকল্পের কথা বলেছেন।

---

১. মতবাদকে কবিতা থেকে বাদ দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ আমি দেখি না যদি মতবাদই কোন লেখকের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক হয়। তাঁর কাছ থেকে শুধু এইটাই চাওয়া হবে যে, তিনি যেটা সৃষ্টি মরবেন সেটা যেন পরিচ্ছন্ন বা পরিণত কিছু হয় (গোটা গম নয়, চূর্ণিত ময়দা)। মতবাদের কবিতা, উপদেশের কবিতা, সবই ঠিক আছে ; কিন্তু যতক্ষণ না নৈতিক সত্যগুলি কাব্যের সত্যে রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ সেগুলি কাব্য হচ্ছে না।

ক্লাফের 'Qua Cursum Ventus' কবিতাটিও স্বামীজীর কবিতার প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বিশেষত নিম্নোক্ত স্তবকটি :

To veer, how vain ; On, onward strain,
Brave barks ! In light, in darkness too,
Through winds and tides one compass guides —
To that, and your own selves, be true.[১]

মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ছবি দিয়ে স্বামীজী তাঁর কবিতা আরম্ভ করেছেন ; ক্লাফ্ তাঁর 'Say not' কবিতাটি সূর্যের ছবিতে শেষ করেছেন :

And not by eastern windows only,
When daylight comes, comes in the light,
In front, the sun climbs slow, how slowly,
But westward, look, the land is bright.[২]

শেলি এই আশার সুরই শুনিয়েছিলেন তাঁর 'Ode to the West Wind' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিতে—'If winter comes, can spring be far behind ?'[৩]—এর প্রতিধ্বনি স্বামীজীর কবিতায় শোনা গেছে :

'No winter was but summer came behind.'[৪]

এ-প্রতিধ্বনির সুর-মাধুর্য ধ্বনির চেয়ে কিছু কম নয়। স্বামীজীর 'Not a work will be lost, no struggle vain'[৫] কিংবা 'No good is e'er undone'[৬] পঙ্‌ক্তিতে যে মহৎ ও সুন্দর ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা রবার্ট ব্রাউনিঙের একটি প্রিয়

---

১. সাহসী ছোট ছোট তরী,
মোড় ঘোরানো বিফল হবে, টেনে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে।
ঝড়ের হাওয়ায়, জোয়ারের প্লাবনে, দিশারী এক,
তার প্রতি ও নিজেদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

২. শুধু পূবের জানালা দিয়েই দিনের আলোর সঙ্গে আলো আসে না ;
সামনের দিকে সূর্য উঠতে কত সময় লাগছে, দেরি হচ্ছে,
কিন্তু পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো,
জমিতে আলো এসে পড়েছে।

৩. শীত এসে গেলে কি বসন্তের আগমন বেশি বিলম্বিত হয় ?

৪. শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে তার পাছে পাছে। [বাণী ও রচনা ৭।৪৬৭]

৫. কর্ম নষ্ট নাহি হবে কোন চেষ্টা হবে না বিফল। [ঐ]

৬. কল্যাণের নাহিক বিলয়। [ঐ]

ধারণা এবং তা তাঁর কবিতায় বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। এ ভাবধারণার সর্বোচ্চ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রটিতে রয়েছে —

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে।

জীবনের রণক্ষেত্রে আমাদের সাহসী সৈনিকের মতো যুদ্ধ করে যেতে হবে, কাপুরুষের মতো রণে ভঙ্গ দিলে চলবে না। কুরুক্ষেত্রে তো আমরা জীবনের রণক্ষেত্রেরই একটা রূপক পাই। অর্জুনের ভয় তো আমাদের সকলের ভয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভুল ভেঙে দিয়েছেন, তাঁকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। স্বামীজী আধুনিক ভারতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ; ভারতবর্ষের অর্জুনরূপী জনগণকে তিনি জীবন-সংগ্রামে সাহসী যোদ্ধা হতে প্রেরণা দিয়েছেন ঃ

If the sun by the cloud is hidden a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.[১]

'Song of the Free' কবিতাটিতেও স্বামীজী সাহসের জয়গান গেয়েছেন এবং সৈনিকের আদর্শেই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন ঃ

March on and on,
Nor right, nor left, but to the goal !

পার্থিব সুখ বা আকর্ষণের মোহ যে আমাদের বিপর্যয়ের কারণ হয়, সে-কথা স্বামীজী আমাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। সংসারের শাড়ি-গাড়ি-বাড়ির ফাঁসে আমরা জড়িয়ে পড়ি, যে-ফাঁস অনেক সময় আমাদের শ্বাস রোধ করে। কামিনীকাঞ্চনের শৃঙ্খল আমাদের পায়ে জড়ায়। সন্ন্যাসীকে এই সব ভেঙে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে হবে ঃ

For fetters, though of gold, are not less strong to bind. সন্ন্যাসীর মন্ত্র তাই ! 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ'। জীবনের তৃষ্ণা ভোগে মেটে না, আরও বেড়ে যায়, আগুনে ঘৃতাহুতির মতো ; কামনার উপভোগে কামনার উপশম হয় না। শুধু মাত্র

১. সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ।
যদি বা আকাশ হের বিষণ্ণ গম্ভীর,
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়,
জয় তব জেনো সুনিশ্চয়। [ঐ]

জ্ঞানের বারিই জীবনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে, যেমন শুধু জ্ঞানের আলোই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করতে পারে। তাই স্বামীজীর উপদেশ, 'Song of the Sannyasin' কবিতায় ঃ

> This thirst for life, for ever quench ; it drags
> From birth to death and death to birth, the soul.
> He conquers all who conquers self.[১]

জীবনের অসার অন্তহীন দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়া মানুষকে ক্লান্ত করে। পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য সে তখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতা বাণীরূপ পেয়েছে 'My Play is Done' কবিতায় ঃ

> Oh ! I am sick of this unending farce* ;
> these shows they please no more.
> This ever running, never reaching,
> nor even a distant glimse of shore ![২]

স্বামীজী যখন খেলাভাঙার খেলা খেলবার জন্য ব্যাকুল, তখন তাঁর স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে –'Who knows how Mother plays'। দেবীর লীলা বোঝার সাধ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের নেই। তাই মৃত্যুরূপা মাতা, 'Kali the Mother', যখন ধ্বংস-লীলায় মেতে ওঠেন, তখন তাঁর তাণ্ডবের তাৎপর্য খুঁজে না পেয়েও সে যদি সেই প্রলয়নৃত্য উপভোগ করতে পারে, তবেই বীর-হৃদয় মানুষের প্রতি মহাকালী প্রসন্না হবেন ঃ

---

১. জীবনের এই তৃষ্ণা চিরতরে / মিটাও জ্ঞানের বারি পান ক'রে।
এই তম-রজ্জু জীবাত্মা-পশুরে / জন্ম-মৃত্যু মাঝে আকর্ষণ করে।
সে-ই সব জি—···জেনে তত্ত্ব এই। [ঐ, ৭।৪৫২]

* প্রচলিত পাঠ 'force', কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে এবং পরের পঙ্‌ক্তির 'shows' থেকে মনে হয় শুদ্ধ পাঠ 'farce' হওয়া সম্ভব। কবিতাটির শীর্ষকও এখানে স্মর্তব্য।

২. অন্তহীন এই প্রহসনে তিক্ত আজি প্রাণ মোর ;
আর ইহা নাহি লাগে ভালো,
মিছে ছোটা, পাব নাতো কভু, দেখা নাহি যায় দূরে,
সাগরের পারে তীর কালো ! (ঐ, পৃঃ ৪৬১)

Who dares misery love,
And hugs* the form of Death,
Dances* in Destruction's dance,
To him the Mother comes.[১]

স্বামীজী ইংরেজী কবিতা রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দের উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে 'The Song of the Sannyasin'-এর মতো দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির কবিতা লেখা যায় না। শেলির কিছু কিছু কবিতায় যে ওজস্বিতার পরিচয় আছে, স্বামীজীর কোন কোন কবিতায় তা ঝংকৃত। কখন আবার মার্কিন কবি এমার্সনের 'Brahma' কবিতার কথা আমাদের মনে পড়ে। স্বামীজীর মরমিয়াবাদের সুর এমিলি ব্রন্টির কবিতায় আমরা শুনেছি। অর্থগৌরবের মহিমা এবং সার্থক শব্দ ও সুরের সমাবেশ স্বামীজীর ইংরেজী কবিতাকে এক বিশেষ মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য দিয়েছে।

* প্রচলিত কয়েকটি সংস্করণের পাঠ 'hug' ও 'dance', কিন্তু সম্ভবত এগুলি মুদ্রণপ্রমাদ। 'dares' এর মতো 'hugs' এবং 'dances' পাঠ হওয়া উচিত মনে হয়।

১. সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, / মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, / মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।
[বাণী ও রচনা, ৭।৪৬০]

বিবেকানন্দের গদ্যশিল্প

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

১

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখে একই সঙ্গে চিন্তানায়ক ও কর্মযোগী। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি, চিন্তার সঙ্গে কর্মকে মেলানো কত দুঃসাধ্য। আর বুঝতে পারি বলেই অবাক্ হই যখন কোনো মানুষের জীবনে চিন্তা-কর্মের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখি। লেখক, শিল্পীদের দায়িত্ব চিন্তাকে ভাষায়, ছবিতে, মূর্তিতে রূপ দেওয়া। আর যিনি চিন্তানায়ক ও কর্মী তাঁর কাছে চিন্তাই হলো সৃষ্টির আবেগ আর কর্ম হলো একাধারে ভাষা, ছবি ও মূর্তি। অর্থাৎ, কর্মই তাঁর শিল্প। বিবেকানন্দ এমন একজন চিন্তানায়ক—কর্মই যাঁর কাছে শিল্প—বুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য, রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি একাধারে চিন্তা ও কর্মের পরিচালক। হয়তো শিল্পী ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর খানিকটা তুলনা চলে। কাজেই আমাদের দেশে বিবেকানন্দ অদ্বিতীয় না হতে পারেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট।

এই বিশিষ্টতা তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যের ধ্যানে ও ব্যাখ্যায় এবং সমকালীন লোক-জীবন-জাগরণের প্রেরণাদানে ও সংগঠনক্ষমতায়। তাঁর গদ্যশিল্পেও দেখি তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার দুটি রূপ। একদিকে 'বর্তমান ভারতে'র বিবেকানন্দ—অন্যদিকে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'পত্রাবলীর' বিবেকানন্দ। 'বর্তমান ভারতে'র গদ্যরীতি সাধু, গম্ভীর নির্ঘোষে ছুটে চলেছে, কখনো ছোট ছোট বাক্যের নুড়িপাথর ঠেলে, কখনো বিরাট অধিত্যকায় কিংবা অববাহিকার ব্যাপ্তি নিয়ে। অন্যদিকে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'পত্রাবলীর' বিবেকানন্দের গদ্যরীতি বিশুদ্ধ মুখের বুলিতে কখনো তীব্র ও ক্ষুরধার, কখনো হাস্যোচ্ছল। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' ছাড়া সমকালীন কোনো লেখকের চলতিরীতি 'স্ট্যাণ্ডার্ড কলোকিয়লে'র এতটা কাছাকাছি আসতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। কিন্তু একটা লক্ষণীয় ব্যাপারের কথা এখানে বলে নিই 'গদ্যশিল্প' কথাটা তাঁর রচনার সম্পর্কে ব্যবহার করছি বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি সাহিত্যচর্চা করতে আসেন নি, অন্যান্য বাঙালী লেখকের মতো অপরিণত গদ্যে রচনা শুরু করে ধীরে ধীরে গদ্যচর্চায় পরিণতি আনবার চেষ্টাও করেন নি। উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিতে মাত্র কয়েকটি বছর নিজের মনের চিন্তা-ভাবনা অভিজ্ঞতাকে শিষ্য ও সতীর্থদের কাছে জানাবার জন্যে বা বুঝিয়ে দেবার জন্যে চারটি মাত্র বই তিনি লিখেছেন, কিংবা চিঠিপত্রেও সে-সব ভাবনা-চিন্তার কথা বলে গেছেন। উদ্বোধন পত্রিকার ১৩০৫ সালের প্রথম সংখ্যা থেকে তিন বছরের মধ্যে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ 'বর্তমান ভারতে'র লেখা-গুলির সাধুরীতি এবং অন্য তিনটি বই-এর দ্রুতগতির চলতিরীতি একই সঙ্গে ধারাবাহিক চলেছে। সমকালীন আর একজন লেখক, অবনীন্দ্রনাথ—তিনি চিত্র-শিল্পী ছাড়াও গদ্যশিল্পী—তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলিতে—বিশেষ করে 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুলে' কথকতার ভঙ্গিকেই এক আশ্চর্য চলতি রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'ভূতপত্রীর দেশ' ইত্যাদি বইগুলিতে চলতিরীতিকে রীতিমতো নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠা দেবার আগে মাঝে মাঝে 'দেবী প্রতিমা' কিংবা 'পথে বিপথে'র অন্তর্ভুক্ত 'গমনাগমন'-এর মতো রচনায় সাধুরীতি প্রয়োগ করেছেন। বিবেকানন্দের এই সব রচনার প্রায় তেরো-চৌদ্দ বছর বাদে যে প্রমথ চৌধুরী চলতি-রীতিকে সাহিত্যের বাহন করে 'সবুজপত্রে'র যৌবনিশান ওড়ালেন, তিনিও স্বামীজীর বাঙলাচর্চার কালে সাধুভাষাতেই লেখা শুরু করেন! অর্থাৎ, এই সময়টিতে—গত শতকের শেষ দশক থেকে এই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত—প্রায় কুড়ি বছর বাঙলা গদ্যচর্চায় সাধু ও চলতির সমান্তরাল ধারা চলেছে। অবনীন্দ্রনাথের মতো কেউ কেউ চলতিতে শুরু করে মাঝে মাঝে সাধুরূপে সরে এসে আবার চলতিতে ফিরে গেছেন, প্রমথ চৌধুরীর মতো লেখক সাধু থেকে চলতিতে বিবর্তিত হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বিবেকানন্দ সাধু ও চলতি দুটি রূপেই সমান্তরালভাবে একই পত্রিকায় লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলীতে স্ট্যাণ্ডার্ড চলতি ভাষাকে পেয়ে গেলেও (প্রমথ চৌধুরীও এই মান স্পর্শ করেছেন—সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত স্ত্রী ইন্দিরাদেবীকে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছই তার প্রমাণ) 'জীবনস্মৃতি' ও 'চতুরঙ্গ'—এই দুটিতে তিনি সাধুরীতির আলখাল্লায় চলতিরীতির তাপ্পি দিয়েছেন অসাধারণ শিল্পকৌশলে—সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ যুগের কবিদের চলতি প্রাকৃত ভাবভঙ্গি নেবার মতো তাঁর সাধুগদ্য সাধুচাল ছেড়ে চলতির সমস্ত প্রাণশক্তিকে আত্মসাৎ করে বাঁচতে চাইছে শেষবারের মতো। অন্যদিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আমাদের দেশের মৌখিক লোককথা রূপকথাকে অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে ধরে রাখতে শুরু করেছেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে (১৩১৪)। মুখের কথায় চলতিভঙ্গিতেই তিনি এইসব 'চিরকালের গল্প'কে লিখে রেখেছেন, কিন্তু লিখতে গিয়ে চলতিরীতির দ্রুত চাল এনেও ক্রিয়ার সাধুরূপকে বর্জন করতে পারেন নি। কাজেই বুঝতেই পারা যায়, চলতির অবধারিত আক্রমণে সাধুও দ্রুত চলতে শুরু করেছে, কিন্তু লেখক ও পাঠক দুপক্ষই তখন বলছেন চলতিরীতি চিঠিপত্র, ডায়ারি, ভ্রমণকাহিনী কিংবা বড়জোর গল্প-উপন্যাসে যতটা স্বাভাবিকভাবে মানিয়ে যায়, গুরুগম্ভীর চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ততটাই বেখাপ্পা লাগে। চলতিভাষার সম্পর্কে এ অভিযোগ সাম্প্রতিক কালেও শুনতে পাই, আধুনিক চলতিরীতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধুগদ্যের দক্ষশিল্পীদের সম্পর্কে একটু প্রাচীন পাঠক ও সমালোচকদের এখনও আপসোস শুনি, ও জিনিস সাধুভাষাতেই সম্ভব ছিল, চলতিরীতিতে সম্ভব নয়।

কিন্তু আমার মনে হয়, দক্ষশিল্পীর হাতে ভাষা ও ভাব একাত্ম হয়ে যায় বলেই এমন ভ্রম ঘটে যে বিশেষ প্রকাশরীতি অনিবার্য মনে হতে থাকে। সাধুভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্যের যদি কোনো নমুনা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তুলে আনি তখন যেমন মনে হবে সে নমুনা সাধুভাষাতেই সম্ভব, তেমনি অবনীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বিনয়কুমার সরকার কিংবা সৈয়দ মুজতবা আলির চলতিভাষার রচনা-রীতি থেকেও অনুরূপ নমুনা তুলে প্রমাণ করে দেওয়া যায় চলতিরীতির দ্রুতগামিতা, বিচিত্রগামিতা কিংবা অন্তরঙ্গতা সাধুভাষায় আনা যায় না। আসলে দক্ষশিল্পী প্রকাশের মাধ্যমকে অনিবার্য কিংবা অপরিহার্য করে তোলেন তাঁদের শব্দনির্বাচন, বাক্যগঠন কিংবা অনুভূতিপ্রকাশের তাড়নায়। উদাহরণস্বরূপ বিবেকানন্দের দু-রীতির গদ্য থেকেই কিছুটা উদ্ধার করছি।

প্রথমে 'বর্তমান ভারত' বইটির শেষ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ—যা সকলেরই পরিচিত :

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলিপ্রদত্ত;

এই সাধুগদ্যের পাশাপাশি রাখছি 'পরিব্রাজক' বইটির 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' পরিচ্ছেদের কিছু অংশ :

তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্ত-বীজের প্রাণসম্পন্ন।'

এই দুটি গদ্যাংশের রূপ সাধু না চলতি—কে মনে রাখে? আসলে গণ-আহ্বানের এই তীব্রতা, এই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আপামর-সহানুভূতি, আদর্শজনিত আবেগ ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি তীক্ষ্ম দরদ কোনো সমাজতান্ত্রিক দর্শন পড়ে আসে নি, পড়া, শোনা এবং প্রত্যক্ষ দেখা এই তিনে মিলে এক প্রচণ্ড আবেগ টেনে

এনেছে ভাষাকে।—কেউ যদি প্রথম উদাহরণটি পড়ে বলে সাধুভাষাতেই এমন সম্ভব, তা তৎক্ষণাৎ মিথ্যা প্রমাণ করে দেবে দ্বিতীয় উদাহরণটি। দ্বিতীয় উদাহরণটি পড়ে যদি কেউ বলে চলতিরীতিতেই এমন প্রচণ্ড আহ্বান সম্ভব সে ধারণাও নস্যাৎ করে দেবে প্রথম উদাহরণটি। সাধুভাষার পাশাপাশি চলতিরীতি সে সময়ে চিঠিপত্র ডায়ারি ও লিখিত সংলাপে আসতে শুরু করেছে এবং সাধুভাষা সেই মৌখিক রীতির সংক্ষিপ্ত স্বাভাবিক রূপটি অগ্রাহ্য করতে পারছে না। কাজেই যে বিষয়ের আবেগ গদ্যের সাধুরীতিকে টেনে আনছে তা সাধুরূপেই লেখা হচ্ছে, চলতিরীতিকে টেনে আনলে চলতিরূপেই লেখা হচ্ছে। আবার সাধুই হোক বা চলতিই হোক—প্রয়োজনমতো দু-রীতিরই মিশ্রণ ঘটিয়ে ভাষায় প্রাণের স্পর্শ আনা হচ্ছে। এই মিশ্র প্রাণিত ভাষার উদাহরণ হিসেবে বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজকে'র একটি অংশ উদ্ধার করছি ঃ

অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।

কঙ্কালচয়, রত্নপেটিকা, কোটিজীমূতস্যন্দী, ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সামনে, মানিকের আংটি, হাওয়া, ফেলে দাও, হয়ে যাও, কান খাড়া রেখো ইত্যাদি চলতিশব্দ ও ক্রিয়া এবং অন্য প্রাদেশিক বাক্যবন্ধ মিলে মিশে একাধারে ত্যাগ ও সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল আহ্বানের আবেগটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সঞ্চার করা হয়েছে।

২

'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দের সাধুগদ্য দু-রকম গতিতে চলেছে। এক, সংস্কৃত-শব্দবহুল দীর্ঘসমাসবদ্ধ বিলম্বিত গড়ানো গদ্য। দুই, ছোট ছোট সংস্কৃতশব্দপ্রধান বাক্য। প্রথম ভঙ্গিটি পরিবেশ-বর্ণনা বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ভঙ্গিটি বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এসেছে। প্রথম ভঙ্গিটির উদাহরণ দিচ্ছি 'বৌদ্ধবিপ্লব ও তাহার ফল' নামের পরিচ্ছেদ থেকে ঃ

পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্যে ক্ষয়িতবীর্য এ নূতন শক্তিসঙ্গম নানাভাবে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল, শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া, পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাতমাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি-চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্-জাল-জড়িত হইয়া পশ্চিম-দেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।

দ্বিতীয় ভঙ্গিটির উদাহরণ দিচ্ছি 'শূদ্রের জাগরণ' পরিচ্ছেদ থেকে ;

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান-শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের

দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব।

এই রকম সামান্য অংশ তুলে সাধারণ মন্তব্য করা বিপদ্‌জনক। তবু বলছি, সাধারণভাবে একথাই সত্য যে, যেখানে পটভূমি, পরিবেশ ও অতীতের দিকে পাদপ্রদীপের মতো আলো ফেলছেন বিবেকানন্দ কিংবা তুলির একটানে কোনো বড় ছবিকে—সে ছবি অতীতের হোক বা বর্তমানের দুরবস্থার বৈষম্যজনিত যন্ত্রণাদায়ক প্রকাশই হোক—বিবেকানন্দ সংহত করছেন, সেখানেই কমা-সেমিকোলনের ধাপে এক একটা গোটা বাক্য অসম্ভব দীর্ঘ হলেও সমান ঋজুতায় বেরিয়ে এসেছে। এ সাধুরূপ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র মতো আঞ্চলিক স্ল্যাং-এ ভরা দ্রুত ধাবমান চলতিরীতির মধ্যেও মাঝে মাঝে এসেছে। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদটাই চলতিরূপের, কিংবা ক্রিয়াপদ নেই। গোটা অংশটাকেই সাধুগদ্যের নমুনা হিসেবে ধরা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইএর সূচনার পাঁচটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা চলে। সেখানে বর্তমান ভারত, আমাদের জন্মভূমি, ইউরোপী পর্যটক, ইংরেজ রাজপুরুষ, এবং ভারতবাসীর চোখে ভারতবর্ষকে তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র মাতৃরূপের ত্রিমাত্রিক বর্ণনার পর তুলির এক-এক আঁচড়ে এমন পাঁচটি ছবির পঞ্চমাত্রিক বর্ণনা আমরা বাঙলাসাহিত্যে পাই নি। যতদূর মনে পড়ে, স্বদেশীযুগের লেখা রবীন্দ্রনাথের উজ্জীবিত গদ্যের মধ্যেও তুলির এক-এক টানে এমন সমন্বিত বহুমাত্রিক ছবি আমরা পাই নি।

তেমনি ছোট ছোট বাক্যের সিদ্ধান্ত—বা পর্যবেক্ষণমূলক সাধুগদ্যের এমন আত্মরূপও খুঁজতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সংকটকালীন সংলাপে কিংবা প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মধ্যেই খুঁজতে হয়। কিন্তু কী দীর্ঘ বাক্য কী ছোট বাক্য—সর্বত্রই পরিচ্ছন্ন শ্বাসপর্বে এমন স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতা আছে যা আবার বিদ্যাসাগরের common style-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ, বিদ্যাসাগরের পরিচ্ছন্ন ঋজু গদ্যরীতির ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্কিমী ছোট-বড়ো বাক্যভঙ্গিকে বিবেকানন্দ অসাধারণ আত্মবিশ্বাসে আয়ত্ত করেছেন। যাকে আমরা বাঙলায় আদর্শ গদ্য বলি, যে গদ্যের লেখক ছন্দস্পন্দনে সজাগ শ্রুতিক্ষমতার পরিচয় দেন, নির্দিষ্ট ভাবপ্রকাশক শব্দগুচ্ছে বা phrasing-এর ক্ষেত্রে সাধারণ অমনস্ক লেখকের তুলনায় যে লেখক অনেক বেশি মনোযোগ ও উদ্ভাবন-শক্তির পরিচয় দেন, শব্দনির্বাচনে যিনি সতর্ক ও বৈজ্ঞানিক যথার্থতার পরিচয় দেন এবং বাক্যগঠনে যিনি ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে ছন্দ-স্পন্দের ও শব্দবিন্যাসের বদল ঘটিয়ে বৈচিত্র্য ঘটাতে পারেন সেই লেখকই common style-এর লেখক। 'বর্তমান ভারতে'র বিবেকানন্দ এই রকম সতর্ক, মনোযোগী শব্দবিন্যাসদক্ষ, স্পন্দমান আকর্ষণীয় গদ্যের লেখক, বিদ্যাসাগর যে গদ্যের জনক, বঙ্কিমচন্দ্র যে গদ্যে নানা স্পন্দন-বৈচিত্র্য ঘটিয়ে প্রয়োজনমতো ছোট-বড়ো বাক্যব্যবহারে

অত্যন্ত পারদর্শী। কেবল নিজস্ব আত্মবিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যটুকু ছাড়া 'বর্তমান ভারতে'র গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ মোটামুটি এই 'কমন স্টাইলেরই' অনুসারী। একমাত্র 'স্বদেশমন্ত্র' অনুচ্ছেদের স্বকীয় উদ্দীপনটুকু ছাড়া এ গদ্যে বিবেকানন্দ ততটা indivi-dual নন।

৩

চলতিরীতিতে লেখা বিবেকানন্দের তিনটি বই আছেঃ 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'ভাববার কথা'র কিছু রচনা। এ ছাড়া আছে বেশ কিছু চিঠিপত্র। উনিশ শতকের কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার ভাবের আদান-প্রদানে কলকাতা-অঞ্চলের এই বিশেষ কথ্যরূপ প্রাধান্য পায়। এই 'কলকাতাই বুলি' সমকালীন সাময়িক পত্রে, সমাজচিত্রে, প্রহসনে, নাটকে প্রথমে প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রহসন-নাটকে এই কলকাতার বুলি প্রায় crude ভাবেই প্রকাশ পেতে থাকে; উপন্যাস-গল্পে বোধহয় একটু মার্জিত রূপেই প্রকাশ পেতে থাকে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' এই মার্জনা-অমার্জনার মিশ্ররূপের পরিচয় পাই। সমাজ-চিত্রমূলক কাহিনী বলেই হালকা ভঙ্গি আনতে গিয়ে কলকাতার আশেপাশের চলতি-বুলিকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কলকাতাই সর্বনাম-ক্রিয়াপদ এসেছে, কিন্তু সাধু-চলতি ক্রিয়াপদের মিশ্রণ ঘটেছে। সংলাপে সাধারণ লোকের মৌখিক রীতি এসে গেছে। অর্থাৎ, আদর্শ ব্যবহারযোগ্য চলতি-ভাষা তখনও সাহিত্যপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে নি। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম পঁ্যাচার নকশা'তে নকশার জন্যেই কলকাতাই বুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু মননশীল রচনায় তিনি গম্ভীর রীতির সাধুভাষারই আশ্রয় নিয়েছেন। নকশার মধ্যে কলকাতার পথচলতি মানুষের অমার্জিত কথা এমনকি বহু অশ্লীল শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু হুতোমের ভাষা সাহিত্যের বিশেষ রূপের ভাষারীতি, আদর্শ বাহন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মত পোষণ করতেন। অতিরিক্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা কিংবা অমার্জিত টেকচাঁদি বা হুতোমি কোনোটাই তিনি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চান নি। তিনি কেবল প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ভাষার সরলতা, স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য এই তিনটি গুণের কথা বলেছেন। এবং প্রয়োজন হলে যে 'অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না' এ কথাও বলেছেন। ভাবপ্রকাশে ইংরেজি, ফার্সী আরবি, সংস্কৃত গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাকেই নিতে হবে। একেই তিনি উৎকৃষ্ট রীতি বলেছেন অর্থাৎ, ভাবপ্রকাশে ভাষার আত্মসাৎ-ক্ষমতার ওপরেই জোর দিয়েছেন, কোনো সংস্কারকেই তিনি স্থান দিতে চান নি। ক্রিয়াপদে চলতিরূপ তিনি আনেন নি বটে কিন্তু চলতিরীতিতে লভ্য সবরকম গ্রহণক্ষমতার পক্ষেই তিনি রায় দিয়ে বলেছেন 'ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গত শতকের সত্তরের দশকের শেষদিকে (১২৮৫ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৭৮-৭৯ সাল নাগাদ) বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের পর প্রায় বাইশ বছর

কেটেছে যখন বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ১৯০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখে 'বাঙ্গালা ভাষা'র সম্ভাব্য রূপ নিয়ে চিন্তা করছেন।* চিন্তার রূপটা পালটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কার বর্জন করেছিলেন; কিন্তু কী ভিত্তিতে আদর্শ লিখিত ভাষা গড়ে উঠবে তার কোনো ইশারা দেন নি। বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেই যেন ভাষার গ্রহণক্ষমতার ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত হতে বললেন: 'ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-ব্যবহারের কোন্ রূপটিকে ভিত্তি করতে হবে তাও বলে দিলেন যা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিতে পাই না। বললেন, 'চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? ...ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ...বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।' যতদূর মনে হয়, বিবেকানন্দ যখন এই কথা বলছেন তখন চিঠিপত্র, ডায়েরী ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে চলতিরীতির ব্যবহার রীতিমতো চালু হয়ে গেলেও সব বিষয়ে চলতিরীতির প্রয়োগকে আর কোনো লেখক এমন প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করেন নি। ঐ লেখাটির মধ্যেই বিবেকানন্দ বলছেন: 'যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?......স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে।' পরে, প্রায় চোদ্দ বছর বাদে প্রমথ চৌধুরী বিবেকানন্দের সেই 'কলকেতা'র ভাষাকে একটু বেশি মার্জিত করে লেখার মান হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে সহযোগী হিসেবে পেয়ে গেলেন। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র'কেই(১৩২১) চলতিভাষা ব্যবহারের বাহন করলেও এর অন্ততঃ দশ বছর আগে থেকেই তিনি চলতিভাষায় প্রবন্ধ লিখছেন এবং তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের দু-একটি 'কথার কথা' এবং 'আমরা ও তোমরা' ভারতী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ, ১৩০৯ সংখ্যায়

* এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৬ সালের বৈশাখমাসের সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে চলতি-ভাষার সমর্থন করে যে মন্তব্য করেন সেই ভাষণের সমর্থনসূচক মন্তব্য পাওয়া যায়, উদ্বোধন পত্রিকার ১৩০৬ সালের পৌষ সংখ্যায়। বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি খুব সম্ভব এই সূত্রেই লেখা। দ্রষ্টব্য: বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য। প্রণবরঞ্জন ঘোষ। তৃতীয় সং। পৃষ্ঠা ২৮৪; ৪১৪-৪১৫।

প্রকাশিত হয়েছে। এবং 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটিও সবুজপত্র প্রকাশের আগেই ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে (চৈত্র, ১৩১৯)। আর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবুবাংলা ওরফে সাধুভাষা' নামের প্রবন্ধটিও একটু আগে (পৌষ মাসে) বেরিয়েছে। এই প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে প্রমথ চৌধুরী বলছেন, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে। অর্থাৎ ১৩০৭ সালে বিবেকানন্দ সাহিত্যের ভাষা হিসেবে 'কলকেতার ভাষা'র হয়ে যে ওকালতি করেছিলেন এ তারই পুনরাবৃত্তি। এমন কি ওই লেখাটিতে সাধুভাষার বিরুদ্ধে তাঁর যে আক্রমণ : 'আমাদের ভাষা —সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।'—সেই একই আক্রমণাত্মক ভাষাও বারো বছর বাদে প্রমথ চৌধুরী ব্যবহার করেছেন। তিনি বলছেন, 'বাংলা সাহিত্যের সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লস্করি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড়-পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে।' কিন্তু বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ একবারও তোলেন নি। এই কারণেই মনে হয়, বাঙলাগদ্যের চলতিরীতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনাগুলি একটু উপেক্ষিতই রয়েছে যেহেতু তিনি পেশাদারী লেখক ছিলেন না এবং চিঠিপত্র বাদ দিলে ১৩০৫ থেকে ১৩০৮ –এই চার বছর তিনি বাঙলাভাষায় চর্চা করতে পেরেছেন। তাও 'বর্তমান ভারত' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বই দুটিই প্রবন্ধাকারে বেরিয়েছিল। কিন্তু 'ভাববার কথা' ও পরিব্রাজক'—প্রথমটি চিন্তা বা গল্পকণিকার সংকলন ; দ্বিতীয়টি ভ্রমণকাহিনী। মনে হয় আরও বেশ কিছুদিন ধরে বাঙলায় মননশীলতার চর্চা করলে বিবেকানন্দের ছড়ানো কিন্তু পাইওনীয়ারিং বা প্রবর্তনী চিন্তাগুলি অনেক আগেই মূল্য পেতো। তবু আক্ষেপ, প্রমথ চৌধুরীর মতো বিবেকানন্দের সমকালীন সাময়িক পত্রিকার লেখক উদ্বোধন পত্রিকাকে উপেক্ষা করেছেন।

এখন বিবেকানন্দের চলতিরীতির স্বভাব-ধর্মের কথায় ফিরে আসা যাক। সব-রকম ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে চলতিরীতির পক্ষপাতী বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বই দুটিতে বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন এবং, কলকাতা অঞ্চলে সংলাপী ধরন-ধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাদোষগুলি তিনি ছাড়েন নি। 'পরি-ব্রাজকে'র যে কোনো পাতা খুললেই এই ধরন-ধারণ চোখে পড়বে। যেমন : 'পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে —আজন্ম। ফল ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ –খেতেই পায় না।' (জাহাজের কথা, পরিব্রাজক)

কিংবা 'আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে ?'

কিংবা সেই আলাসিঙ্গা-র বিচিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গ।

মাথা-কামানো, ঝুঁটি বাঁধা, শুধু-পায়, ধুতি-পরা মান্দ্রাজী ফার্স্টক্লাসে উঠল ;

বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, খিদে পেলে মুড়ি-মটর চিবুচ্চে !...তবে আমাদের সঙ্গে পড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্চে—চাকররা বলছে। বাস্তবিক কথা—তোমাদের পাল্লায় পড়ে মান্দ্রাজীদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন, থক্‌থকিয়ে এসেছে ! (দক্ষিণী সভ্যতা, পরিব্রাজক) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র থেকেও এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে ভাপ্রকাশে স্বামীজী সব-সংস্কারমুক্ত। যেমন,

অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মতো সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বে'র পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে ; বে-থা মায়ে বাপে দেয় আমাদের মতো।

লক্ষ্য করবার মতো, একেবারেই মুখের ভাষা কলকাতাই বুলি শুধু নয়, মৌখিক টানটা পর্যন্ত বরাবর এই দুটি বইতে বজায় রাখবার চেষ্টা করে গেছেন। আর তার মধ্যে আবার রঙ্গ-রসিকতা, আর চলতি লৌকিক গল্পে এই দুটি বই-ই ঠাসা। 'পরিব্রাজক' চলতিরীতিতে লেখা, চিঠির ভাষা বলে বোধহয় একটু বেশি ঘরোয়া কিন্তু রঙ্গ-রসিকতা ও কলকাতার মৌখিক শব্দপ্রয়োগও বেশি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র চলতিরীতিকে কেউ কেউ আদর্শ চলিতভাষা বলছেন। আদর্শ মানে অনুসরণযোগ্য পরিচ্ছন্ন ঋজু স্পন্দমান সতর্ক রীতি। হতে পারে পরিব্রাজকের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক, কিন্তু এখানেও individualityর প্রকাশ কিছু কম নয়। যেমন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র 'উভয় সভ্যতার তুলনা' নামক পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধার করছি ঃ

হ'তে পারে দু-এক জায়গায় আর্য বা বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হ'তে পারে দু-একটা ধূর্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসেরা ঢিলঢেলা হাড়গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকিকান্না ধ'রে রাজাদের কাছে গমন। রাজারা লোহার জামাপরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন ; বুনো হাড়পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে ? রাজারা মেরে ধ'রে চ'লে গেল।

কিংবা পরিশিষ্টের কিছু অংশ ঃ

নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা ব'লে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি ? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি !!

তবে এটা ঠিক 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র অধিকাংশ অংশই অনুসরণযোগ্য ঋজুভঙ্গিতে লেখা ; common style-এর নমুনা হিসেবে নেওয়া যায়। কিন্তু 'পরিব্রাজক' ভীষণ-ভাবে individual, গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের যুগের মানুষকে যাঁরা দেখেছেন বা যাঁদের কথা শুনে তাঁদের মুখের বুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁরাই 'পরিব্রাজকে'র লেখকের ভাষার কলকাত্তাই রসটিকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করবেন। তাই বলে কিন্তু সর্বত্রই এই কলকাত্তাই বুলি নেই—প্রয়োজন মতো সংস্কৃত, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দকেও বসিয়ে দিয়েছেন একেবারেই চলতি ক্রিয়া বা অসমাপিকা ক্রিয়ার পাশে, কখনো মুগ্ধদৃষ্টিতে

ছোট ছোট বাক্যে, কমা, সেমিকোলন দিয়ে একেবারেই খাঁটি শিল্পীর মতো ছবি এ'কে যান :

সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো —ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না. আশে পাশে ঝাড়ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানী তুর্কিস্তানি গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও, সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে ;…।

একজন সমালোচক বলেছেন, চলতিগদ্যে এমন সার্থক বর্ণ-ধ্বনিময় বর্ণনা কোথায় আছে? আছে কিন্তু বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে—সেই তুলির লেখার প্রথম নমুনা বিবেকানন্দেরই 'পরিব্রাজকে'। আর আছে সৈয়দ মুজতবা আলির রচনায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠিক একই তুলির দক্ষটানে প্রকৃতির রস থেকে পুরাণ রূপ-কথার বা উপকথার রস নিয়ে আসেন—কিংবা নেহাতই শুধু ছবি—তাতে একটু মানবিক বেদনার রঙ লেগে থাকে—

তারপর মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রি শেষের সঙ্গে রুপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে ক'রে ভোরের একটি ছোট্ট পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গেই ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল ; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলায় ফুটন্ত কাঁচ আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ। (চণ্ড, রাজকাহিনী) ঠিক এমনি চলতিভাষার তুলিতে মুজতবা আলি প্রাকৃতিক রূপের ছদ্মবেশ থামিয়ে দেন—রঙ আলো আর ধ্বনির সঙ্গমে প্রকৃতি যেন গানের মাইফেল বসিয়ে দেয়—

এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগলো, ওদিকে গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরীষ রঙের আমেজ দিতে আরম্ভ করলো। মাঝখানের আকাশেতে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিনস্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুতলয়ে রঙ বদলান, তবে পূর্বও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জন যেন তানপুরোর আমেজ। অবিশ্বাস্য)

এই দুটি রচনাংশ তুলছি এই কারণে যে গৈরিকের অন্তরাল থেকে বিবেকানন্দ যেমন সত্যিকারের রঙের শিল্পী হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই রঙের তুলি পরবর্তীকালে অন্তত আরো দুটি শিল্পী সমান দক্ষতায় ধরে বিবেকানন্দের প্রাথমিক প্রবর্তনাকে সম্মান জানিয়ে গেছেন। কিন্তু কেউ কারুর নকল নয়, প্রত্যেকেই individual আর্টিস্ট। বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্র্য এই দুই শিল্পীকে স্বতন্ত্র হবার সাহস দিয়েছে।

আর দুটি কথা। বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেই বলা হয়, চলতি রীতি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বিদ্রূপ-শ্লেষ তাঁর চলতি রীতিকে একটু ঘোরালোও করেছে। স্বামীজীর চলতিগদ্যে তার আগেই কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রসন্ন কৌতুক যথেষ্ট পরিমাণে নাড়া দেয়। 'পরিব্রাজকে'র 'ইওরোপী সভ্যতা' নামের পরিচ্ছেদ থেকে একটুখানি অংশ তুলে দিই ঃ

পণ্ডিতরা তো এই সব বলছেন, তবে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে -যেমন সাঁ করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে তা বললে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম 'হায়ার ক্রিটিসিজম্'।

তেমনি প্রসন্ন কৌতুক যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে—চলতি সাধু সব রকম ইডিয়ম মিলে মিশেও আছে। নইলে প্রাণবন্ত চলতিরূপ গড়ে উঠবে কী করে? 'ভাববার কথা'র গল্প চিঠিপত্র, এবং প্রবন্ধ—সর্বত্রই তাঁর পর্যবেক্ষণের মৌলিক জাদু। আর্যামির নিন্দা করে 'পরিব্রাজকে'র এক জায়গায় বলেছেন ঃ "একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্!' "

শেষ কথা হলো, বিবেকানন্দ গদ্যে—সাধুগদ্যেও বটে চলতিগদ্যেও বটে সংলাপের ভঙ্গীটিকেই প্রায়শঃই আনতে চেয়েছেন। চিঠিপত্র বা পত্রাকারে লেখা চিন্তাবলির মধ্যে তো থাকা স্বাভাবিক, অন্য প্রবন্ধের মধ্যেও এসে পড়েছে। কখনো প্রশ্নের আকারে, আত্মকথনে, কখনো অনুপস্থিত অল্প কয়েকজন শ্রোতাকে সামনে রেখে, কখনো বা কোটি কোটি মানুষকে সামনে রেখে। মার্টিন বুবার বলেছিলেন যে-কোনো আকর্ষণীয় চিন্তাশীল রচনাই মূলতঃ thou and I-এর সংলাপ। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এই thou কখনো নিজেরই আর এক সত্তা, কখনো একজন শ্রোতা বা পাঠক, কখনো জনতা। এই ভঙ্গিই তাঁর সাধু ও চলতি—দুরূপের রচনাকেই আকর্ষণীয় করে রাখে। মানুষের পাপ ও তার প্রাকৃতিক অভ্যাসাদি থেকে শুরু করে ঈশ্বরকে নিয়ে তার ছলনা পর্যন্ত—আপাদ-মস্তক সমস্ত মানুষটাকেই তাঁর লেখায় তিনি ধরে রাখতে চান। তাই তাঁর উচ্চাশা, বিষণ্ণতা এবং কৌতুক। একই দেহে জুডাস ও জিসাস। এমন মানুষের গদ্য কখনো নিছক সাধু কিংবা নিছক বুলি হতে পারে না। তাঁর ভাষা আমাদেরই চরম যন্ত্রণা ও পরম আনন্দের ভাষা।

সন্ন্যাসী-সাংবাদিক

শিশির কর

স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার অন্ত নেই। আধুনিককালে যা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারবাহন, সেখানেও আমরা স্বামীজীকে অগ্রণী-পুরুষ হিসাবে দেখতে পাই। সে-ক্ষেত্রটি হচ্ছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্র। এ-কথা ঠিক, বাঙলা সাংবাদিকতা বহু বছর আগেই শুরু হয়েছিল। ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও পত্রিকা বের হচ্ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পক্ষে পত্রিকা স্বামীজীই প্রথম বের করলেন। আর তার অনুসৃতি দেখা গেল পরবর্তী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলির নানা পত্র-পত্রিকায়। অন্ততঃ বাঙলা ভাষার প্রথম সন্ন্যাসী-সাংবাদিক স্বামী বিবেকানন্দই। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি এদেশে সন্ন্যাসী-সাংবাদিকদের একটি ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। এইসব সন্ন্যাসী-সাংবাদিক এখনও দেশ-বিদেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করে চলেছেন। প্রচার করেছেন ভারতের বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা। শংকরীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে এসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। নিয়মিত প্রকাশিত সবচেয়ে পুরাতন বাঙলা পত্রিকাটির প্রবর্তক তো স্বামীজীই। তিনি জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের জন্য যে 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রবর্তন করেছিলেন প্রায় এক শতাব্দী আগে, সেটিই এখন আমাদের দেশের ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় সেরা পত্রিকা। ইংরেজী মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রবর্তকও স্বামীজী। পাক্ষিক 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার সূচনাও তিনিই করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বাইরেও অসংখ্য পত্র-পত্রিকা বিশ্বজুড়ে আছে, যে-সবের পিছনে আছে অসংখ্য সন্ন্যাসী-সাংবাদিক। শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী ও অনুগামীরাও নানা ভাষায় ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক অসংখ্য পত্র-পত্রিকা বের করেন। দেশেবিদেশে ভারতের অন্যান্য ধর্মসঙ্ঘের সন্ন্যাসী-সাংবাদিকরাও অনেক পত্র-পত্রিকা বের করে আসছেন। নানা মত ও পথের সন্ন্যাসী-সাংবাদিকদের প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় এদেশে এবং বিশ্বের অন্যত্র কত পত্র-পত্রিকা যে প্রতিদিন বের হচ্ছে তার হিসাব নেই। কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্মরণীয় যে, এদের মূল প্রেরণা কিন্তু স্বামীজীই।

বিবেকানন্দ নিজে যে পত্রিকাগুলি বের করেছেন, তার কথায় আসা যাক। প্রথমটি হচ্ছে পাক্ষিক 'ব্রহ্মবাদিন' (১৮৯৫)। পরে মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' (১৮৯৬/১৮৯৮) তারপর বাঙলা মাসিক 'উদ্বোধন'। (উদ্বোধন পত্রিকা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথমে অবশ্য কয়েক বছর এটি পাক্ষিক পত্রিকা ছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারত' এখনও নিয়মিত বের হচ্ছে। তবে 'ব্রহ্মবাদিন' পরে বন্ধ হয়ে যায়। এটি বের হতো মাদ্রাজ থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল, যিনি ছিলেন স্বামীজীর বিদেশ গমনের প্রধান উদ্যোক্তা। বিদেশে ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য এবং মিশনারিদের মিথ্যা প্রচারের উত্তর দেবার জন্য স্বামীজীর

আরও পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। সে-খবর তাঁর একটি চিঠিতে পাই। ১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লেখেন ঃ

"আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার করব, মনে করছি। সুতরাং কাগজের জন্য যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর কর, তাহলে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস দেখবার আছে।"

আলাসিঙ্গা প্রমুখকে লেখা বহু চিঠিতেই স্বামীজী 'ব্রহ্মবাদিন' সম্পর্কে লিখেছেন। এথেকে সাংবাদিকতা, বিশেষ করে পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে, স্বামীজী কত সজাগ ও স্বচ্ছদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন, তা বোঝা যায়। ২৪ অক্টোবর (১৮৯৫) তিনি লেখেন ঃ "ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে। এইরূপ করে চল। কাগজের কভারটা আরও একটু ভাল করার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হাল্কা, অথচ ভাবগুলি আর একটু উজ্জ্বল করার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও।" ১৮ নভেম্বর তিনি ফের লিখলেন, "ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ লেখার ধাঁচটা ভারী কটমটে হচ্ছে। একটু যাতে স্বচ্ছ, সরল ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর।"

ব্রহ্মবাদিনের রচনারীতির কাঠিন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করেও স্বামীজী লিখেছেন (২৩ মার্চ, ১৮৯৬) ঃ "ব্রহ্মবাদিনে লম্বা লম্ব সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ওটা চলার সম্ভাবনা বড়ই অল্প।...তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত করে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পার, তবেই ব্রহ্মবাদিন জনপ্রিয় হবে নতুবা নয়।

এই সব চিঠি থেকে আমরা সাংবাদিক-স্বামীজীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। পত্রিকার আর্থিক ও প্রচারের দিকটিতেও ছিল স্বামীজীর বিশেষ লক্ষ্য।

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক বি. আর. রাজম আয়ারের অকাল মৃত্যুতে পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটে প্রকাশিত হবার দুবছর পরেই (জুন, ১৮৯৮)। এর পর শুরু হয় প্রবুদ্ধ ভারত বা The Awakened India-র দ্বিতীয় পর্যায় (আগস্ট ১৮৯৮)। এবার নতুন কর্মকেন্দ্র—আলমোড়া। কয়েক মাস পর প্রবুদ্ধ ভারতের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হল আলমোড়া থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে মায়াবতীতে, সম্পাদক—স্বামী স্বরূপানন্দ। তিনি এই পত্রিকাটিকে উচ্চমানে তুলেছিলেন। স্বামীজীও খুব খুশি হয়েছিলেন তাঁর সম্পাদনার কৃতিত্বে। কিন্তু তাঁরও অকাল মৃত্যু হয় মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর ভগিনী নিবেদিতাও প্রবুদ্ধ ভারতে সম্পাদকীয় লিখেছেন। পরে স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ প্রমুখের লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি আজও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা স্বামীজীর দীর্ঘদিনের।

শেষপর্যন্ত বহু বাধা, অসুবিধা কাটিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' বের হল ১৪ জানুয়ারি, ১৮৯৯।

উচ্চমান অক্ষুণ্ণ রেখে প্রায় শতাব্দীকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' বাঙলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। কেউ কেউ মনে করেন ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে উদ্বোধন অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ঐ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ। বাঙলা সাহিত্যের বিকাশেও উদ্বোধনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধন শুধু স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা রচনার প্রকাশক্ষেত্র নয়, এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখও। তবে নিঃসন্দেহে উদ্বোধনের বিশেষ গৌরব স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বহন। শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু লিখেছেন: "উদ্বোধন বিবেকানন্দকে বাঙলা লেখক করেছিল, এ গৌরব তার চিরদিনের। পত্রিকাটির প্রতি স্বামীজীর অসীম মমত্ব ছিল, সদ্য-প্রবর্তিত সঙ্ঘ-মুখপত্রের প্রতি দায়িত্বও ছিল অশেষ। অন্তরের তাগিদে যদি নাও হয়, পত্রিকার প্রয়োজনে তাঁকে লিখতে হয়েছে। না, অন্তরের তাগিদ অল্প ছিল না। পরম প্রিয় বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যে যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনঃস্থাপনের ইচ্ছাও তাঁর মনে জেগেছিল। স্বামীজীর প্রায় সকল মৌলিক বাঙলা লেখাই উদ্বোধনে বেরিয়েছে, উদ্বোধনের পক্ষে তা সম্পদ, সাধন-চিন্তার ক্ষেত্রেও সে রচনাগুলির গুরুত্ব এমনই ছিল যে, ইংরেজীতে অনুবাদ করে অন্যান্য পত্রিকা তা প্রকাশ করত। স্বামীজী কেবল চিন্তাবস্তুতে উদ্বোধনকে গরীয়ান করেননি রীতির ক্ষেত্রেও বাঙলা গদ্যে নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন।"

এমন চলিত বাঙলায় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের যে প্রসার ঘটেছে, তার পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দই এবং মাধ্যম এই 'উদ্বোধন'। কুমুদবন্ধু সেন উদ্বোধন-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫৪) লেখেন: "আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে,—তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামীজীর বাঙলা রচনা। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়বার জন্য সেধেছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়েছেন তা পড়ে দেখুন

বলে বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়তে চাননি—আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হল?' দীনেশচন্দ্র বলিলেন: 'আমি এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি বইটি পড়িনি শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাঙলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি, আর পূর্ব-পশ্চিমের আদর্শ। দেখে অবাক হতে হয়। এছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।'

পরবর্তী কালে 'উদ্বোধন' সম্পর্কে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছি গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে। স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় দিনগুলি তুলে ধরার জন্য উদ্বোধনে লিখতেন। তাঁর সেইসব লেখার প্রতিও যে গোয়েন্দাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল কে জানত? গোয়েন্দা রিপোর্টে (যদিও স্বামীজীর মৃত্যুর পর লেখা) সেসব তথ্য পাই। জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের জন্য এই যে 'উদ্বোধন' পত্রিকা, তার একাধিক নিবন্ধ নিয়ে বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগে বহু ফাইল চালাচালি হয়। সেই সব রিপোর্টে আছে বিরূপ মন্তব্যও। গোয়েন্দাদের, আমলাদেরও। গোপন সরকারি ফাইল থেকে জানা যায়, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর নিবন্ধও রাজরোষে পড়েছিল তাঁর অন্য লেখার সঙ্গে (পত্রাবলী, ভাববার কথা প্রভৃতি)। গোপন ফাইল থেকে গোয়েন্দার নোটটি হুবহু তুলে দিচ্ছি:

"During his lifetime Swamiji published a fortnightly journal from Belur head-quarters of Ramkrishna Mission called 'Udbodhan,' In one of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December, 1907, Swamiji wrote, 'You have all been hypnotised, your ruler tell you that you are low, subjugated and weak, and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think of myself like that. So those people who used to look down upon us, by God's will, are respecting me like God. What is wanted is keen-edged sword and war to death." [Bengal Govt. Home (Pol.) Conf-Fl. Sl. 100, 1912]

(জীবৎকালেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বেলুড় থেকে 'উদ্বোধন' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটির একটি সংখ্যায় —যা পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের একটি রিপোর্টে খুবই আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হয়েছে—স্বামীজী লিখেছিলেন: (তোমরা সকলে মোহাবিষ্ট হয়ে আছ। তোমাদের শাসকরা তোমাদের বলে, তোমরা হীন, পরাধীন, শক্তিহীন এবং তোমরাও তাই সত্যি বলে ভাব। আমার দেহটাও এই দেশের মাটিতেই তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমি নিজেকে ভাবতে শিখিনি। তাই যারা আমাদের অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত, ঈশ্বরের

ইচ্ছায়, তারাই আজ আমাকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করছে। এখন চাই শাণিত কৃপাণ আর মরণপণ সংগ্রাম।)

জীবিতকালেও স্বামীজীর প্রতি শ্যেনদৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা হতো তাঁর গতিবিধির উপর। নিয়মিত খোলা হতো তাঁর চিঠিপত্রও। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা নিয়ে গোয়েন্দারা কত চিন্তিত ছিলেন, গোপন সরকারী ফাইলে তার কিছু কিছু তথ্য আছে। পরবর্তীকালে যখন বিপ্লবীরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে ওঠে আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রেস বা গোপন সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার। স্বাধীন মত প্রকাশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সেন্সরের লালফিতার বাঁধন যতই কঠিন হয়েছে, জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন গোপন পত্র-পত্রিকা। এককালে এইসব গোপন পত্র-পত্রিকা প্রেরণা পেয়েছে স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতা থেকে। গোপন সরকারি ফাইলে আমলা, গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্তাদের নোটে, রিপোর্টে সে-তথ্য পাই।

শিকাগোয় বিশ্বজয়ের পর স্বামীজী দেশে ফিরলে কলকাতায় তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা (২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীঃ) জানানো হয়, তার উত্তরে কলকাতাবাসী যুবকদের উদ্দেশে তিনি এগিয়ে চলার যে উদাত্ত আহ্বান জানান, তা পরে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে গোপন পত্র-পত্রিকার উদ্যোক্তাদের। জবরদস্ত পুলিশ কর্তা টেগার্টের রিপোর্টে তা আছে। তিনি লিখেছেন ঃ

"In reply to an address of welcome presented to him at his arrival in Calcutta ···Swami Vivekananda urged hearers to wake up. Awake' he cried, 'arise and stop not till the desired end is reached."

(কলকাতায় আসার পর তাঁকে যে স্বাগত অভিভাষণ জানানো হয় তার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের জাগ্রত হবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'ওঠ জাগ, এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থেম না।')

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল স্বামীজীর ঐ ভাষণে। বিপ্লবীদের গোপন পত্র-পত্রিকার শীর্ষে থাকত স্বামীজীর ঐ ভাষণের উধৃতি। এ-সম্পর্কে টেগার্টের মন্তব্য ঃ

"If might be noted that the highly revolutionary 'Liberty' leaflets which have been circulated, broadcast over the greater part of India during the last year, commence with the watch-word of Vivekananda —'Arise, awake and stop not till the goal is reached'; (Tegart Report. 22.4.1914)

(প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের বৃহত্তর অঞ্চলে গত বছর বহুল প্রচারিত বিপ্লবী প্রচারপুস্তিকা 'লিবার্টি'র শুরুতে থাকত বিবেকানন্দের মন্ত্রবাণী ঃ 'ওঠ, জাগ এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থেম না।')

ভারতের সেই প্রথম সন্ন্যাসী-সাংবাদিক স্বামী বিবেকানন্দ আজও আমাদের প্রেরণা দিচ্ছেন। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও দেশে-বিদেশে বের হচ্ছে কত পত্র-পত্রিকা।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

এক

আজকের অপরাহ্ণকালীন অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য'। বিষয়টি যদি শুধু স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' হত তাহলে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার সহজ বস্তুমুখী একটি পথ বেছে নেওয়া যেত। কিন্তু উপরি-উক্ত শীর্ষনামে আলোচকের স্কন্ধে দুটি দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করা হয়েছে। (১) স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য ধারণা ; (২) তাঁর পত্রাবলীর পর্যালোচনা ও পত্রাবলীর ভাবধারার অনুভাবনা।

প্রথমে আমরা পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। এ-কাজটি বস্তুতঃ খুবই দুষ্কর। কারণ প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বামী বিবেকানন্দের অন্যান্য রচনার মতো পত্রাবলীও সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রবর্তনায় ধরা হয়নি। সাহিত্য-রচনার দুর্লভ প্রতিভা যে ছিল, এ-বিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। কিন্তু তাঁর কর্ম ও সাধনায় যেমন, রচনায়ও তেমনি একটি গভীরসঞ্চারী জীবন-বোধ বা মহৎ আদর্শ চেতনার রূপায়ণ-প্রয়াস প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীর মঙ্গলচিন্তায় তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের দুর্মর আকাঙ্ক্ষাকে পর্যন্ত আবৃত রাখতে হয়েছে। যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং লিখেছেন, সে-সব কিছুরই অন্তরালে একটিমাত্র প্রেরণা জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী কর্মজীবনে দীর্ঘস্থায়ী জীবন-মহীরুহের বীজ বপন করতে হয়েছে। দুদণ্ড নিভৃতে বসে সচেতন শিল্পশ্রীমণ্ডিত সাহিত্যসৃমিতির অবকাশ তিনি পাননি। অবকাশ হলেও যে, এই কাজে অনেকখানি সময় নিয়োজিত করতেন কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ এক অসামান্য আত্মসংহরণের দৃষ্টান্তস্থল। এ ব্যাপারে তাঁর তুলনা মেলে একমাত্র অগ্রজ মনস্বী অদ্ভুতকর্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলি পড়লে সহজেই বোঝা যায়, কী অপূর্ব নির্মাণক্ষমা সহিত্যপ্রতিভা তাঁর ছিল! কিন্তু এই প্রতিভাকে সংহরণ ক'রে তিনি লেখনী চালিয়েছেন দেশবাসীর কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই এই হৃদয়বত্তার স্পর্শে তাঁর সমস্ত রকম রচনা সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। আজ সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি রীতিসিদ্ধ এবং শিল্পগুণভূষিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের নির্মাতা বলে স্থানলাভ করেছেন।

স্বামীজীর বেলাতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। সাহিত্যরচনার সচেতন তাগিদে কিছু না লিখেও আজ তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের আসনটি দৃঢ় ক'রে নিয়েছেন এবং তা সম্ভব হয়েছে সুতীব্র উপলব্ধি এবং হৃদয়বত্তার গুণে।

স্বামীজীর পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য নির্ধারণের চাবিকাঠিও কিন্তু এইখানেই। যে

পত্র ছিল ব্যক্তিগত, তাতে ব্যক্তিত্বের বিদ্যুদালোক তো উদ্ভাসিত হয়েছেই ; কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ ক'রেও তা ব্যক্তিসীমা লঙ্ঘন করেছে ঐ সর্বব্যাপী হৃদয়ের গ্লানিহর স্পর্শে, ঐ বিশ্বতোমুখী কল্যাণস্পৃহার আদিগন্ত বিস্তারে।

এত কথা বলার পরও আমাদের ইতিহাস-সন্ধানী মন কিন্তু ঐতিহ্য-অন্বেষণ ছাড়তে চায় না। তাই দেখি বাংলা পত্রের প্রাচীনতম নিদর্শনটির সঙ্গে বাংলা ভাষার নাড়ীর যোগ আছে। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ আহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। বাংলা ভাষায় সম্ভবত এটিই পত্ররচনার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু বিস্ময় জাগে ঐ ষোড়শ শতাব্দীরমধ্যভাগে লিখিত বাংলা গদ্যভাষার এ-রকম শক্ত বাঁধুনি দেখে। 'তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিতে হইবেক।' এ-রকম অলংকারসমৃদ্ধ ভাষার সৃষ্টি তো একদিনে হয় না। তাই আমাদের অনুমান, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর পর্তুগীজ, ইংরেজ মিশনারীদের এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যচর্চার বহু আগে থেকেই চিঠিপত্রের অন্তঃস্রোতে বাংলা একটি গদ্যধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। আমাদের এই ভেবে গৌরববোধ হচ্ছে যে, বাংলাগদ্যভাষার অন্তঃস্পন্দন না হলেও বাহ্যরূপের একটা কাঠামো বিদেশী প্রভাব ব্যতিরেকেই চিঠিপত্রকে অবলম্বন ক'রে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এই কাঠামোতেই প্রাণসঞ্চার করেছেন উনিশ শতকের বিচিত্র গদ্য লেখকগণ। পত্রসাহিত্যের বিবর্তনও এই ধারাপথেই এগিয়েছে। স্বামীজীর পত্ররচনায় অনেক সময় যে সহজ দেশজ রীতি লক্ষ্য করা যায়, তাতে দীর্ঘকালাগত দেশীয় সংস্কার যে প্রবলভাবে কাজ করেছে, অন্ততঃ সাহিত্যের ইতিহাস পরিক্রমাকালে এ-কথাটি আমাদের ভুলে যাওয়া সমীচীন নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক জুড়ে যাঁদের পত্র বক্তব্য ও ভাষায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন, কবি মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামীজী স্বয়ং এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজা রামমোহন, মধুসূদন প্রমুখ মনস্বী ও কবিগণের চিঠি প্রায় সবই ইংরেজী লেখা হলেও বাঙালীর ইংরেজী চর্চার দ্বারা বাংলাভাষার চর্চা যে গতিলাভ করেছিল, প্রমাণ বহন করে। উপরি-উক্ত পত্র-লেখকের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীই পত্রাবলীতে প্রকাশিত মনোভঙ্গির দিক থেকে স্বামীজীর সর্বাগ্রে কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পত্রই এখনো অপ্রকাশিত আছে। নরেন্দ্র-পুর কলেজের অধ্যাপক ডক্টর প্রফুল্লকুমার দাস ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিবনাথ শাস্ত্রীর বহু অপ্রকাশিত চিঠি সংগ্রহ করেছেন! ব্যক্তিগত সংগ্রহের সেই খাতাটি আমাদের দেখার সুযোগ দিয়েছেন। সেই পত্রসংগ্রহ পড়েই আমাদের এই কথাটি মনে হয়েছে।

পত্ররচনার ইতিহাস অবতরণা করলে বোঝা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণ

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তেমনি পত্ররচনার ধারাও যে গুরুত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এইদিক থেকে স্বামীজীর পত্রাবলী শুধু কতকগুলি চিঠি সংকলন নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সাহিত্য-বিবেকের তীব্র গতিবিভঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধেবিন্যস্ত। এই পত্রসমূহেরযেমন স্বতন্ত্র সাহিত্যমূল্য আছে, তেমনি রয়েছে সমাজ সাহিত্যভাবনার ক্রম অভিব্যক্তির সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ভাবনার মূলে যে উপলব্ধিটি পরিণতিলাভ করতে চেয়েছে, তা হ'ল ব্যক্তিগত সাধনা সামগ্রিক কল্যাণযজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত ; নরের মধ্যে নরনারায়ণের অধিষ্ঠান—এ-বোধ যেমন ব্যক্তির চেতনা বিশ্বাসের স্বর্ণসৌধ নির্মাণ করে, তেমনি সামাজিক কর্মে ধর্মকে জীবএবং জীবশ্রেষ্ঠ মানবসেবার বলিষ্ঠ উদ্বোধক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে। এই উপলব্ধির কর্মময়, বাঙ্ময় এবং চিন্ময় শিল্পসত্তা গড়ে উঠেছে শতাব্দীর শেষ পর্বে বেদান্তবোধ নিস্নাত, সাহিত্যরসে অনীহ সন্ন্যাসী-সাহিত্য স্রষ্টার বৈরাগ্য-দীপ্ত রচনাবলীতে, প্রেম-প্রোজ্জ্বল পত্র-সম্ভারে।

একটু আগেই স্বামীজীর পত্রে প্রকাশিত মনোভঙ্গির সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্রাবলীর ভাব সাযুজ্যের উল্লেখ করেছি। শিবনাথ স্বামীজীর বিদেশযাত্রার প্রায় পাঁচ বছর আগে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। দেশে ফিরে আসেন ঐ বৎসরেই ডিসেম্বরে। বিদেশে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন এইসব ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সহযাত্রী এক চীনা দম্পতির অযাচিত সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে তিনি কন্যা হেমলতা দেবীকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে, মুজাপুর' স্টীমার থেকে লেখেন—

"দেখেছ জগদীশ্বরের করুণা! দেখিয়া শুনিয়া আমি একটি গান বাঁধিয়াছি, সেটা সর্বদা গুন্ গুন্ করি ও কাঁদি।"

তাই ভগবদ্-উপলব্ধির চাবিকাঠি হাতে নিয়েই স্বামীজীও বিদেশ-বিভুঁইয়ে চরম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সিংহবিক্রমে বিচরণ করেছেন। আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণে অবিচলনির্ভরতা তাঁকে দিয়েছে সক্রিয়তা, চিত্তে দিয়েছে বীর্য, আর দিয়েছে নিজ জীবনের গভীরতর উদ্দেশ্য বা মিশন (misson) সম্বন্ধে অনির্বাণ একাগ্রতা। এই আত্মিক উপলব্ধিতে পরিশুদ্ধ চেতনায় যখনই চিঠি দিয়েছেন, তখন চিঠি শুধু চিঠি থাকেনি, হয়ে উঠেছে সাহিত্য; মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বাণীর মতো তাতে যেমন তেজ, তেমনি আন্তরিকতার স্পর্শ। এজন্য ভাষা নিয়ে তাঁকে আলাদা করে ভাবতে হয়নি, তাঁর পত্রের ভাষা অন্তরের ভাষা। বাংলা গদ্যভাষা যে তাঁর পত্রাবলীর দ্বারা বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেছে—এ-সত্য আজ আর বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। সহজ চলতি ভাষায়, কখনো সাধুভাষার মিশাল দিয়ে, কখনো ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে যে বলবান্ গদ্য তিনি রচনা করেছেন, তাতে কৃত্রিমতার কোন পালিশ নেই. সচেতন ভাষাবিন্যাসের কষ্ট-কল্পনা নেই। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে একটি কথা আছে—ভাবের সঙ্গে ভাষার যে সম্পর্ক তা হচ্ছে অপৃথগ্-যত্ন-নিবর্ত, কিংবা হরগৌরীর মতোই বাগর্থের সম্পর্ক

অবিচ্ছিন্ন। ভাব যেখানে ঐকান্তিক, অভীপ্সা যেখানে আত্মার গভীরতা থেকে উদ্ভূত, সেখানে প্রকাশের ভাষা আপনি এসে যায়। কসরতের অপেক্ষা রাখে না। স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে গুরুভ্রাতাদের কাছে লেখা চিঠিগুলিই সবচেয়ে অকৃত্রিম, সর্বাপেক্ষা সাহিত্যগুণসম্পন্ন। কারণ এ-সব চিঠিতে আপনতম নিকটজনের কাছে হৃদয়ের উন্মোচন ঘটেছে। স্বামীজীর ব্যক্তিমানসের সর্বায়িক অনাবৃত প্রকাশ গুরুভ্রাতাদের কাছে লেখা পত্রাবলীতে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যক্তিগত রচনার জনক ফরাসী লেখক মঁতেইর কথা। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Essais'-এর ভূমিকায় মঁতেই নিজে লিখেছিলেন—'ওহে পাঠকবর্গ, তাকিয়ে দেখ, আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু।' নিজেই নিজের গ্রন্থের বিষয়বস্তু হন ব্যক্তিগত রচনার বা Personal Eassy-র লেখকগণ। যেমন 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মূল বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। পত্রসাহিত্য একদিক থেকে আরো নিবিড় অভিধায় ব্যক্তিগত রচনা। সেই ব্যক্তিগত রচনার অনায়াস অথচ গতিশীল ভাষাসৌকর্যে স্বামীজীর পত্রাবলী চিরায়ত সাহিত্য হিসেবে বাংলার সুধীজনের মনে দিনে দিনে আসন ক'রে নিচ্ছে। শুধু উপদেশের বা নির্দেশের আকার হিসেবে নয়, উন্নত সাহিত্যকর্মের নিদর্শন হিসেবে পত্রাবলীর মর্যাদাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে।

এখন 'পত্রাবলী'র ভাষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এর সাহিত্যিক উৎকর্ষের অবতারণা করতে চেষ্টা করব।

(ক) ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী এলাহাবাদ থেকে গুরুভ্রাতা বলরাম বসুকে লিখছেন—

"ইতিপূর্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing দেখিয়া the devil take it করিয়াছেন? আমি বলি change (বায়ুপরিবর্তন) করিতে হয় তো শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy (ঈশ্বর করুণা করুন) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান তাহারই সহায় হন)। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে চান, Lord (ভগবান) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (বায়ুপরিবর্তন) করাইবেন?"

(খ) এই বৎসরই (১৮৯০, ৩রা মার্চ) গাজীপুর থেকে কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখেছেন—

"বাবাজীর (পওয়ারী বাবা তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ! খালি গ্রহণ!...এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।...

"তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার

লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, 'ভগবান রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ অবতার বা যাই হউন—নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।"

(গ) শিষ্য হরিপদ মিত্রের স্ত্রী শিষ্যা ইন্দুমতী মিত্রকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে, বোম্বাই থেকে আমেরিকা যাত্রার সপ্তাহখানেক আগে লিখেছেন—

"মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না।...আমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্বদা মনে রাখিবে যে প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র। সর্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে।"

ঘ) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে চিকাগো থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ইংরেজীতে যে চিঠি লেখেন, তার বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ—

"বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়—তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর।...জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।"

(ঙ) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে আগস্ট প্যারিস থেকে নিবেদিতাকে ইংরেজীতে যে চিঠি-লেখেন তার কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ 'পত্রাবলী' থেকে উদ্ধৃত করছি—

"আমাদের যা কিছু উদ্যম, সবই হচ্ছে সাময়িকভাবে সেই চরম পরিণতি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা! অহো, মহান্ সর্বদুঃখহর মৃত্যু! তুমি না থাকলে জগতের কী অবস্থাই না হ'ত!

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বর্তমানে প্রতীয়মান এই জগৎ সত্য নয়, নিত্যও নয়।...

"স্বপ্ন অহো! কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্ন—স্বপ্নের ইন্দ্রজালই এ জীবনের হেতু, আবার ওর মধ্যেই এ জীবনের প্রতিবিধানও নিহিত রয়েছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন ভাঙো।"

আর উধৃতি বাড়াবো না। ভাষার তিনটি গুণ রচনাকে সাহিত্যশ্রী দান করে।

প্রসাদগুণ বা সরলতা, ওজোগুণ বা তেজস্বিতা এবং মাধুর্যগুণ বা মনোহারিত্ব। এই তিনটি গুণই উধৃত পত্রাংশগুলিতে বর্তমান। তার সঙ্গে মিশেছে সহজ সুন্দর কৌতুকপ্রবণতা (বলরাম বসুকে লেখা পত্রে যেমন দেখা যায়), স্নেহসিক্ত মমতা শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত পত্রে যেমন দেখি), শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতা (প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা পত্রে যার প্রমাণ পাই), মঙ্গলকর্মে বৈরাগ্যচেতনা (আলাসিঙ্গার কাছে লেখা চিঠিতে তার নিদর্শন আছে), আর জীবনের পথপরিক্রমা শেষে স্বপ্নময় মৃত্যুর উপত্যকার চিরবিশ্রান্তি লাভ করার জন্য নিরাসক্ত-মনে অপেক্ষা করার মতো পরিণত জীবন-বোধ (নিবেদিতাকে লেখা পত্রে তার কাব্যময় প্রকাশ দেখি)।

স্বামীজীর পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য অবধারণা করার খণ্ডিত প্রয়াস এতক্ষণ পর্যন্ত করা গেল। এখানে আর একটি কথা স্মরণ ক'রে প্রসঙ্গান্তরে প্রয়াণ ক'রব। স্বামীজীর পত্রাবলী হচ্ছে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তাঁর 'বাণী ও রচনা' সংগ্রহে ৫৫২টি পত্র সংকলিত হয়েছে। 'পত্রাবলী'র দুইখণ্ডে ৫৭৬টি পত্র সংকলিত আছে। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, এমনকি ফরাসী ভাষাতেও তাঁর পত্র আছে। (দ্রঃ পত্রসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ, উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২)।

স্বামীজীর মৌলিক রচনাবলীতেও তাই পত্রাবলীই সিংহভাগ দখল ক'রে আছে। সুধীজনেরা পত্রাবলীর ভাবসম্পদ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। এর ভাষা ও সাহিত্যমূল্য নিয়ে ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য'গ্রন্থে নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করেছেন। বিবেকানন্দের পত্রাবলীতেই যে তাঁর পত্রসাহিত্য রচনার সূত্রপাত এ-সম্বন্ধেও একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন

আমেরিকা যাত্রাপথে ও আমেরিকা পৌঁছে আলাসিঙ্গা ও তাঁর বন্ধুগণকে উদ্দেশ্য ক'রে ১০ই জুলাই, ১৮৯৩ এবং ২০শে অগস্ট ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে দুটি ইংরেজী চিঠি লেখেন, তাতেই তাঁর ভ্রমণকথার সূত্রপাত।

এমনিভাবে দ্বিতীয়বার বিদেশভ্রমণকালে পত্রাকারে 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্যে 'বিলাত যাত্রীর পত্র' লিখেছিলেন। এটিই পরবর্তী কালে 'পরিব্রাজক' নামে বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের এক অতুলনীয় নিদর্শনরূপে সমাদৃত হয়েছে।

এই সমস্তদিক বিবেচনা ক'রে আমাদের মনে হয়, পত্রাবলীর সাহিত্যগুণ সম্বন্ধে আরো ব্যাপক বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। শুধু তাই নয় বিবেকানন্দ-জীবন ও মানস বিকাশের অন্তরঙ্গ আলেখ্য হিসেবেও পত্রাবলী অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। শুধু পত্রাবলীকে অবলম্বন ক'রে ১৮৮৮ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণের পূর্বাবধি কালসীমায় বিধৃত স্বামীজীর একটি জীবনচরিত রচিত হ'তে পারে। নাম হ'তে পারে 'পরিব্রাজক বিবেকানন্দ', কিংবা 'ভারতপথিক বিবেকানন্দ', অথবা 'শ্রীরামকৃষ্ণোত্তর বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ'। যে নামই দেওয়া যাক না কেন, এ-কথাটি আমাদের অবশ্য স্বীকার্য যে, 'পত্রাবলী' এক অর্থে বিবেকানন্দ-জীবনীরই প্রামাণিকতম আকরগ্রন্থ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' অথবা অন্যান্য পত্রসমূহকে যে গুরুত্বসহকারে সাহিত্যবোদ্ধাগণ বিচার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী অনুরূপ মনোযোগ এবং গুরুত্বসহকারে এখনো পর্যন্ত বিশ্লেষিত হয়নি।

এবার পত্রাবলীকে ভাবের দিক থেকে দেখার চেষ্টা ক'রব। সুগভীর অধ্যাত্ম-চেতনা, ভারতপ্রেম, মানবপ্রেম, নিষ্কাম কর্মৈষণা, শিক্ষাদর্শ প্রভৃতি আপাত বৈচিত্র্যময় ভাব পত্রাবলীর পাতা খুঁজলেই পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত হবে। এ-সমস্ত ভাবের অল্প-বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধকার এ-ধরনের বিষয় অনুসারে পত্রাবলীকে দেখতে যাচ্ছে না। আমাদের মনে হয়েছে -বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে বিভিন্ন ভাব নয়, একটি ভাবই তাঁর সমস্ত সত্তার অঙ্গীভূত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে পরম পরিণতি লাভ করেছে। সেটি আর কিছুই নয়, তাঁর সুগভীর আত্মোপলব্ধিসঞ্জাত বৈদান্তিক অধ্যাত্মভাবনা। উপনিষদের এই মন্ত্রবাক্য যেন তাঁর জীবনে এবং আচারে শরীরী সত্য হয়ে উঠেছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

(ঈশোপনিষদ্, ১)

সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎসংসার যেমন পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান, সেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ তাই ঐশ্বর্যমোহ ভ্রান্তিমাত্র। এ-কথা তো কতবার আমরা শুনেছি। কিন্তু পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসে স্বামীজী এ-সত্য মর্মে মর্মে বুঝেছেন। এই সত্যেরই বাস্তবায়ন অভীপ্সা তাঁর সমস্ত কর্মযোগ পরিকল্পনা, মৃতকল্প ভারতের পুনরুত্থান-প্রয়াস এবং ঐশ্বর্যমগ্ন ঈশ্বরবিদ্ পাশ্চাত্যের আন্তর উদ্‌বোধনের সংগ্রাম। সব কিছুর কেন্দ্রে সংস্থিত রয়েছে উপরি-উক্ত বৈদান্তিক বিশ্বাত্মচেতনা। এই চেতনার প্রসারতা বাস্তবায়নই বিবেকানন্দের জীবনোদ্দেশ্য, মহা সংকল্প বা মিশন (misson), তাঁর জীবনব্রত। এই ব্রতপালনের পথে বাধা বিস্তর। ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দেশবাসী বিশ্ববাসীর নির্দয়তা সাময়িক চিত্তক্ষোভ, উদ্দেশ্যসম্পর্কে মুহূর্তমাত্র সংশয়—এই সব প্রতিবন্ধক পার হয়ে তাঁদের জীবনের পরিণতি লগ্নে উপস্থিত হ'তে হয়েছে। এই দ্বন্দ্বমথিত অথচ ঈশ্বরমন্দ্রিত জীবনভাবনার ক্রমবিকাশ আমরা পত্রাবলী অনুসরণে বিভিন্ন চিত্তে অনুধাবন করি। সন্ন্যাসী ত্যাগী সকল বৈরাগ্যের অনুলেপনে প্রেমের শলাকা হাতে নিয়ে ভারতও বিশ্ব-পরিক্রমায় বার হয়েছেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর এ প্রব্রজ্যা যুগান্তসান্নিধ্য ধর্মভাবনার পরিমণ্ডলে অভিনব, বৈপ্লবিক। তিনি সংসার বিরাগী, কিন্তু সংসারবাসী মানব-সাধারণ অনুরাগী। তাই তিনি অনুরক্ত বৈরাগী। ভাষা অনুভবের ক্রমবিকাশের ধারাটি পত্রাবলীতে চারটি স্তর বা পর্বে বিন্যস্ত করা যায়ঃ

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের বছর দুই পর থেকে চিকাগো মহাসম্মেলনে জয়টীকালাভের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের সূচনা পর্যন্ত।

(১) চিকাগো মহাসভায় যোগদানের পর থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ; অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত।

(৩) দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা পর্যন্ত ; অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুন পর্যন্ত।

(৪) দ্বিতীয়বার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন থেকে মহাসমাধির পূর্ব, পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত।

স্বামীজীর 'পত্রাবলী'র প্রথম চিঠিটির তারিখ ১২ই অগস্ট, ১৮৮৮ ; অন্তিম চিঠিটির তারিখ ১৪ই জুন, ১৯০২। অর্থাৎ মহাসমাধির ২০ দিন আগে পর্যন্ত তাঁর লিপিলিখন ছিল অব্যাহত। এই কালসীমায় যাঁদের কাছে চিঠি লিখেছেন তাঁদের মোট তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় ঃ (১) শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তথা গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ; (২) স্বামীজীর নিজ শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দ ; (৩) স্বদেশ বিদেশে তাঁর অনুরাগিবৃন্দ। (দ্রঃ উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২, পূর্বোক্ত অবস্থা। পত্রাবলীর সাহিত্যগুণ আলোচনা প্রসঙ্গেই বলছি—চিঠির প্রাপক অনুসারে চিঠির ভাষা এবং মনোভঙ্গির একটু হেরফের হয়েছে। গুরুভ্রাতাদের কাছে যেমন ঘটেছে অবাধ আত্মউন্মোচন, তেমনি শিষ্যদের কাছে মঙ্গলবোধ বা গুণপ্রণালী রূপায়ণের বজ্রগর্ভ উদ্দীপনা, শিষ্যমণ্ডলীবহির্ভূত অন্যান্য প্রাপকদের চিঠিতে হয়তো নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা আছে, কিন্তু একটু যেন দূরত্বের ব্যবধান আছে। গুরুভ্রাতাদের লেখা বেশির ভাগ চিটির প্রাপক হচ্ছেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামী অভেদানন্দকে মাত্র একটি চিঠি লিখেছিলেন তাও ইংরেজীতে। স্বামী অখণ্ডানন্দকে কয়েকটি চিঠি লিখেছেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দকে লিখেছেন, বলরাম বসুকে লিখেছেন ছটি। বিদেশ থেকে যদিও বিশেষ নামে গুরুভ্রাতাদের চিঠি পাঠাতেন, ফলতঃ সেগুলি সব গুরুভাইকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল ও মার্গারেট নোব্‌ল্‌ অর্থাৎ নিবেদিতাকে লেখা বেশ কয়েকটি পত্র আছে। এছাড়া মাদ্রাজী শিষ্য 'কিডি' অর্থাৎ সিঙ্গারভেলু মুদাসিয়ারকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি আছে। হরিপদ মিত্র. ইন্দুমতী মিত্র, মৃণালিনী বসু খেতড়িরাজ অজিত সিংহ প্রভৃতি গৃহী শিষ্যগণও তাঁর পত্রের প্রাপক ঃ

দেশ-বিদেশের অনুরাগীবৃন্দের মধ্যে তাঁর চিঠির প্রাপক অনেকেই। এদেশীয়গণের মধ্যে হরিদাস বিহারীদাস দেশাই, প্রমদাদাস মিত্র, লালা গোবিন্দ সহায়, ডক্টর নাঞ্জুণ্ড রাও, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাও বাহাদুর হরসিংহাচারিয়ার, স্যার এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, ভারতী-সম্পাদিকা সরলাদেবী প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

বিদেশীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মিসেস ওলি বুল, হেল-ভগিনীবৃন্দ, ই. টি স্টার্ডি, জন হেনরি রাইট, জোসেফাইন ম্যাকলাউড্‌, মিসেস লেগেট, ইসাবেল ম্যাক্‌-কিণ্ডলি প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রাপক-প্রাপিকাদের কাছে স্বামীজী ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু বা অনুরাগী শুভানুধ্যায়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই আত্মপ্রকাশের

যে স্তর-পরম্পরা ক্ষণপূর্বে নির্দেশ করেছি, তাকে একটু অনুসরণ না করলে পত্রধারার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না।

প্রথম স্তরের পত্রগুলি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা। এই সময় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহানির্বাণ ঘটে গিয়েছে। তাঁর ত্যাগী এবং গৃহী শিষ্যদের মধ্যমণি নরেন্দ্রনাথ এখন যেন কিছুটা অনিশ্চিত, লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুটা শিথিলপ্রযত্ন। এখন তিনি অখ্যাত এক সন্ন্যাসী মাত্র। কিছু কিছু পরিচিত এবং অন্তরঙ্গ জনের আনুগত্য বা অনুরাগ লাভ করেছেন মাত্র। কী তাঁর কর্তব্য, কী তাঁর উদ্দেশ্য —এ-সম্বন্ধে এখনো তিনি কৃতনিশ্চয় হননি। এই সময়েই তাঁর পরিব্রাজক জীবনের শুরু। আর ভারতের উত্তর-দক্ষিণ সর্বপ্রান্ত পরিভ্রমণ ক'রে দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত স্পর্শ করেছেন। রাজা-মহারাজা, উচ্চ বা মধ্যম শ্রেণীর রাজকর্মচারী, পণ্ডিত, অধ্যাপক সাধু-সন্ন্যাসী—সব রকম মানুষের সাহচর্য পেয়েছেন। আর পেয়েছেন ভারতীয় জনজীবনের অপরিসীম গ্লানি ও দুঃখ-ময় অবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ভারত যেন ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগাতে হবে। কিন্তু সে কি তাঁর দায়িত্ব? এরই উত্তর পেয়ে গেলেন কন্যাকুমারিকায় ভারতের শেষ প্রস্তর-খণ্ডটির ওপর বসে ধ্যানস্থ অবস্থায়। স্থির হয়ে গেল বিদেশ যাবার সংকল্প। এ যে জীবনদেবতার নির্দেশ। গোড়ার দিকে প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে এই প্রাথমিক দোলাচল চিত্তের পরিচয় পাই। একটি চিঠি থেকে সামান্য উধৃতি দিচ্ছি। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ গাজীপুর থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন —"কি করি, আমি বড়ই দুর্বল, বড়ই মায়াসমাচ্ছন্ন —আশীর্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব ; মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে —কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল ; কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশযাত্রার মাসাধিক পূর্বে ডি আর. বালাজী রাওকে লিখলেন "...হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি যে আমায় আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিতেছ, হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা তাহা করিতে দিতেছে না।"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মে বোম্বাই 'পেনিনসুলার' জাহাজে স্বামীজী আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে জাপান ইয়োকোহামা থেকে ১০ই জুলাই (১৮৯৩ আলাসিঙ্গা ও অন্যান্য মাদ্রাজী যুবকদের উদ্দেশে লেখেন—"...এসো, মানুষ তোমরা নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তোমরা গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথেচলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য —উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেওনা অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক ; পেছনে চেও না,সামনে এগিয়ে যাও।" [বঙ্গানুবাদ অংশ]

আমেরিকা পৌঁছে দেখলেন ধর্মমহাসম্মেলন তখনও অনেক বিলম্ব। আশ্রয়হীন

নিরন্ন সন্ন্যাসী। মাদ্রাজী যুবকেরা যে অর্থসংগ্রহ করে দিয়েছিল, তা দ্রুত খরচ হয়ে যাচ্ছে, ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট ম্যাসচুসেট্স্ থেকে আবার আলাসিঙ্গাকে ইংরেজীতে যে পত্র লিখেছিলেন তার কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ ঃ

"এখানে আসিবার পূর্বে যে-সব স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে। এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে ফিরে যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি এক টুকরো দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আত্ম সঁপিয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না; কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য রাখিতেছি না।...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অসীম বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু জয় প্রভু। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।" এই অগ্নিময় বিশ্বাস এবং সহানুভূতির দীপবর্তিকা সম্বল ক'রে চিকাগো সম্মেলনে যেমন তিনি বিশ্ববিজয় করলেন, তার পর থেকে তাঁর জীবনের গতিপথ এবং ভাবনার সীমারেখা স্থির হয়ে গেল। এবার তিনি অধিকতর আত্মবলে বলীয়ান্, সংশয়ের দোলোচলবৃত্তি অপসৃত। এবার থেকে শুধু অগ্রগমনের পালা।

কিন্তু এই আত্মবল এবং বিশ্বজয় কুসুমাস্তীর্ণপথে অর্জিত হয়নি। তাঁর অনেক চিঠিতেই এর উল্লেখ রয়েছে। শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক তাঁর মতোই কণ্টকাকীর্ণ সংগ্রামের মর্মস্পর্শী আলেখ্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম ক'রে বিবেকানন্দের রাজমহিমা এবার থেকে প্রাংশুর মতো ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

এর পরের দুটি পর্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। দেশে ফিরে সম্বর্ধনা ও দ্রুতসঞ্চরশীল দিনযাত্রার কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের বিবিধ কল্যাণকর্মে নিজের শিষ্যবর্গ ও ভক্তমণ্ডলীকে নিয়োজিত করার দুষ্কর তপশ্চরণে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু শরীর তো কথা শোনে না, আত্মবিস্মৃত সন্ন্যাসী তাঁর গুরুর মতোই নিজ শরীরের কথা না ভেবে ঝঞ্জার গতিতে ব্রত উদ্‌যাপনে নিযুক্ত হয়েছেন। যখন অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে একটা কর্মচক্র এবং ভাব-স্রোত সক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছেন, এবার এর ধাক্কায় বহুকাল জাতীয় জীবনে একটি গতি বজায় থাকবে, তখনই কর্মমুখর সন্ন্যাসী চিরবিশ্রান্তির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন। এবার শুধু ভেতরে দৃষ্টি, ঘরে ফেরার জন্য প্রতীক্ষা।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীর মন্দিরে অপূর্ব দৈববাণী শোনার পর তাঁর কর্মময় জীবনের যেন এক অচিন্ত্যপূর্ব অথচ অতিপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটে গেল। এখন থেকে 'আর তিনি কর্মী, উপদেষ্টা বা জননায়ক নহেন। এখন তিনি শুধু সন্ন্যাসী—মার নিকট ছোট ছেলেটি।'

স্বাস্থ্যের কারণে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভূখণ্ডে যাত্রা করলেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন। কিন্তু মনে তখন বিদায়বেলার বিষাদ-রাগিণী বেজে চলেছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়াথেকে শ্রীমতী জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর বিখ্যাত পত্রটিতে বিভাসিত অস্তগামী সূর্যের গৈরিক প্রসন্নতা পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। এ-চিঠির ভাষা অন্তরের ভাষা, ইংরেজীতে লেখা চিঠির মনোরম বাঙ্গানুবাদের কিয়দংশ 'পত্রাবলী' থেকে উদ্ধৃত করি —

"যতই যা হোক, জো আমি এখন সেই পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত।···আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে উহা প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র –মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত তার শান্তি ভঙ্গ কচ্ছে না!"

"আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী; এত যে দুঃখে ভুগেছি, তাতেও খুশী; জীবনে কখনো কখনো বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্যে সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছি না।...শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে —পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!···যাই! মা যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই!"

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হঠাৎ স্বামীজী বিদেশ-পর্যটন সমাপ্ত ক'রে বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। এ-পর্বের প্রায় সব চিঠিগুলির মধ্যেই কেমন একটা বিদায়ের সুর, আর পরিণত চেতনার গভীরতম দার্শনিক নির্লিপ্তি। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন বেলুড় মঠ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন —"আজন্ম আমার ভালবাসার পবিত্র পেয়ে কি আজ তোমাদের অবিশ্বাস হল অবশ্য আমার মেজাজ চিরকালই খারাপ, তবে আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই ভাল হয়--কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে, সে ভালবাসা যাবার নয়।'

এই ভালবাসার বন্ধনকেও পেছনে ফেলে যেতে হয়। চিরবিদায়ের কুড়ি দিন পূর্বে (২৭জুন ১৯০২) বেলুড় মঠ থেকে শ্রীমতী বুলকে লিখেছেন —"ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—ইহাই আমার চিরপ্রার্থনা।"

৪ঠা জুলাই ১৯০২ সমস্ত জাগতিক বন্ধন ছিন্ন ক'রে পরমা মুক্তির নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে তাঁর যাত্রা মহাপরিণামের পথে অগ্রসর হ'ল। 'পত্রাবলী' এই মহাপরিণামপথের পূর্বে পথিকের অভিযাত্রার অন্তরঙ্গ ইতিকথা।

স্বামীজীর পত্রাবলী ঃ একটি সংখ্যাভিত্তিক আলোচনা

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সমসাময়িক কালে অগণিত সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের প্রাণে জ্বলন্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছে, আজও করছে এবং অনাগতকালেও করবে। ঈশ্বরজানিত পুরুষদের বার্তা প্রচারের এক একটি নিজস্ব রীতি আছে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে বাণী প্রচারের মূল মাধ্যম ছিল, জনসমাবেশে দৃপ্ত ভাষণ। সেই উদাত্ত কণ্ঠের বাণী প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা শুনেছেন তাঁরা ধন্য, আর যে সব অনুগতপ্রাণ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের বক্তব্য রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় বলা যায় ঃ সঙ্গীতের মত তাঁর কথাগুলি, বীঠোফেনের মত তাঁর রচনা, হেণ্ডেলের ঐকতানের মত তাঁর উদ্দীপ্ত ছন্দ। কথাগুলি বইয়ের পাতায় ছড়িয়ে আছে, আজ এত বছর পরেও যখন তাদের স্পর্শ করছি শরীরে যেন ইলেক্‌ট্রিক শক লাগছে। তাহলে কী সে চমক, কী না উন্মাদনা পেয়েছিল তারা—যারা এই আগুনের মত কথাগুলি বীরের মুখ থেকে শুনেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মূলতঃ লেখক ছিলেন না। বাংলায় 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা' এবং ইংরেজীতে অল্প কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া লেখনী ধরে তিনি বিশেষ কিছু রচনাকৃতি রেখে যাননি। কিন্তু স্বামীজীর যে বজ্রনির্ঘোষ-বাণী মানুষকে অশেষ আত্মত্যাগের পথে আহ্বান করেছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়' সেই বাণী বহুলভাবে ছড়িয়ে রয়েছে স্বামীজীর স্বহস্তে লেখা অসংখ্য পত্রাবলীর মধ্যে। সতীর্থ, শিষ্য ও সুহৃদ-বর্গকে লেখা এই চিঠিগুলি যেন তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের ওজস্বিনী বাণী। পাঠকের দিকে তাকিয়ে ভাষার লালিত্য বজায় রেখে সাহিত্যকীর্তির জন্য এগুলি রচিত হয়নি। স্বামীজীর জীবনের মহান উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করতে সেদিন যাঁরা এগিয়ে এসে-ছিলেন এবং যাঁদের উদ্দীপিত করে এই ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করা যাবে বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের কাছেই তিনি এই অমূল্য বাণীসম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। সমস্ত ভাবীকালের মানুষ আজ তার উত্তরাধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও রেনেসাঁর পথিকৃৎ এবং পথিকেরাও স্বামীজীর পত্রাবলী থেকেই সবচেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছেন। সুতরাং এই পত্রাবলী সম্পর্কে নানা কৌতূহল অনেকেরই থাকা স্বাভাবিক। স্বামীজীর মোট পত্রসংখ্যা কত, অধিকাংশ পত্র কখন এবং কাদের কাছে লেখা, বাংলায় বেশী লিখেছেন না ইংরেজীতে বেশী ইত্যাদি অনেক তথ্য সম্পর্কে জানবার আগ্রহ আমাদের অনেকেরই আছে। তাই তাঁর পত্রাবলী সম্পর্কে একটি সংখ্যাভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন উপেক্ষা করা যায় না।

স্বামীজী তাঁর বহু-পর্যটিত জীবনে বহু ভারতীয় ও বিদেশী মানুষে সংস্পর্শে

এসেছেন এবং অনেক জ্ঞানী ও গুণী মানুষের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। জীবনে পত্রও তিনি নিশ্চয় লিখেছেন অসংখ্য, কিন্তু অন্যান্য ভাষণ ও কথোপকথনের প্রতিলিপির মত (সংকেত-লিপিকার ও শিষ্য গুডউইনের অকালমৃত্যুতে তাঁর কাছে সূত্রাকারে রক্ষিত স্বামীজীর অনেক বাণীসম্পদ যে আমরা হারিয়েছি এ সংবাদ সুবিদিত) পত্রাবলীর একটা বিপুল অংশও নিশ্চয় আমাদের অগোচরে রয়ে গিয়েছে। তবে যা হারিয়ে গেছে তার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা, যেটুকু পেয়েছি তাই নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে দুইখণ্ড বাংলা যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয় তার পত্র-সংখ্যা ৪০৬।[১] ইংরেজী বাণী ও রচনায় (Complete works of Swami Vivekananda) মোট ৫৪০টি পত্র স্থান পেয়েছে। স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশিত হয় এবং তাতে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খণ্ডে মোট ৫৫২টি পত্র সংযোজিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১০ম খণ্ডে অতিরিক্ত ২টি পত্র প্রকাশিত হয়েছে—একটি আমেরিকা থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা এবং অপরটি হরিদাস বিহারীদাস দেশাই-এর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধারীদাস মঙ্গলদাস হরিদাস দেশাইকে নিউইয়র্ক থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এই ৫৫৪টি[২] পত্রের মধ্যে ৪০৩টি ইংরেজীতে, ১৪৬টি বাংলায়, ৩টি সংস্কৃতে এবং ২টি ফরাসী ভাষায় লেখা। স্বামীজীর সংস্কৃতজ্ঞান সুবিদিত, কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, তিনি ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি হিন্দী ভাষাও জানতেন এবং ঐ ভাষায় বক্তৃতাও করেছেন, কিন্তু হিন্দীতে লেখা তাঁর কোন চিঠি প্রকাশিত হয়নি।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি স্বামীজীর জন্ম, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। ১৮৮৬ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিলেন কলকাতার অদূরে আঁটপুর গ্রামে এবং ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে শুরু হল স্বামীজীর পরিব্রজ্যা। পত্রাবলীর প্রথম পত্র ঐ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দেই লিখিত। তার আগে স্বামীজীর যদি কোনো পত্র থেকে থাকে (না থাকা খুবই অস্বাভাবিক), তা আত্মীয় ও বন্ধুদের খুব ব্যক্তিগত চিঠিও হতে পারে, আবার দর্শনবিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু

১. ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালে, পত্র সংখ্যা ১৬৬ এবং ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালে, পত্র সংখ্যা ২৪০। পরবর্তী সংস্করণে কোনো পরিবর্ধন ছিল না।

২. শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক লিখিত Swami Vivekananda, His Second Visit to the West : New Discoveries গ্রন্থে আরো ১৫টি অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।—সঃ

যুবা নরেন্দ্রের সংগ্রামী মনের পরিচয়বাহী চিঠিও হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে তার কোনো তথ্যই নেই।* ভারতবর্ষে পরিব্রাজক জীবন সমাপ্ত করে স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীঃ ৩১শে মে বোম্বে থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ঐ বৎসরই ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করে জগৎ-সমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়েন। ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ত্যাগ তপস্যাও কর্ম-প্রস্তুতিতেই স্বামীজীর জীবন ব্যাপ্ত ছিল, তাই এই কয়েক বছর তাঁর পত্রসংখ্যাও খুব বেশী নয়। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তাঁর প্রচার-অভিযান চালিয়ে যান এবং তাঁর মিশনের একটা স্থায়ী রূপ দেবার পরিকল্পনা করেন। ঐ তিন বৎসরই তিনি অতুলনীয় পরিশ্রম করেছেন এবং সবচেয়ে বেশী পত্রও লিখেছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক পত্র লেখা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। আমেরিকাই ছিল স্বামীজীর মূল কর্মকেন্দ্র, ভারতের চাইতে ঐ দেশ থেকেই তিনি বেশী চিঠি লিখেছেন ! ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই এই কর্মময় ভাস্বর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নিম্নের তালিকা থেকে পরিস্কার বোঝা যাবে তিনি কোন্ সালে কোন্ কোন্ স্থান থেকে কতগুলো চিঠি লিখেছিলেন ঃ

খ্রীষ্টাব্দ	ভারত	আমেরিকা	ইংলণ্ড	অন্যান্য স্থান	মোট
১৮৮৮	৪	—	—	—	৪
১৮৮৯	১৬	—	—	—	১৬
১৮৯০	২৯	-	—	—	২৯
১৮৯১	৪	—	—	—	৪
১৮৯২	৫	—	—	—	৫
১৮৯৩	৮	৯	—	১	১৮
১৮৯৪	—	৭৮	—	—	৭৮
১৮৯৫	—	৭১	২১	৫	৯৭
১৮৯৬	—	২২	৩৬	১৭	৭৫
১৮৯৭	৬৮	—	—	১	৬৯
১৮৯৮	২৭	—	—	—	২৭
১৮৯৯	৬	২৩	৩	১	৩৩
১৯০০	৬	৪৮	—	১৩	৬৭
১৯০১	২১	—	—	১*	২২
১৯০২	১০	—	—	—	১০
সর্বমোট —	২০৩	২৫১	৬০	৩৯	৫৫৪

* হার্বার্ট স্পেন্সারের সহিত নরেন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময় সুবিদিত। —সঃ

* ঢাকা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ থেকে লেখা।

এবারে স্বামীজীর অধিকাংশ পত্র কাদের লেখা এবং কিরূপ ভাবধারা তাতে প্রতিফলিত সে প্রসঙ্গে আসা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে স্বামীজীর অধিকাংশ পত্রই (শতকরা ৭২·৭) ইংরেজীতে লেখা। বাংলা ১৪৬টি পত্র স্বামীজী লিখেছিলেন, এগুলি অধিকাংশই গুরুভ্রাতাদের কিংবা প্রমদাদাস মিত্র, বলরাম বসু প্রমুখ সুহৃদ্-বর্গকে লেখা। গুরুভ্রাতাদের কাছে তিনি বহু ইংরেজী চিঠিও লিখেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি এককভাবে সবচেয়ে বেশী চিঠি লিখেছেন তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে; এঁরই নেতৃত্বে মাদ্রাজী যুবকেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন এবং ভারতে স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচারে এঁদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আলাসিঙ্গাকে লেখা পত্রের মাধ্যমে স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী যুবক শিষ্যদের প্রাণে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন, যেমন ব্রহ্মানন্দ কিংবা রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে সকল গুরুভ্রাতাদের প্রাণে নূতন কর্মোদ্যম ও প্রেরণা সঞ্চারের প্রয়াস ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ খৃীঃ পর্যন্ত স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের কোনো চিঠিই লেখেননি, পরিব্রাজকরূপে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি সাধারণতঃ তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন, হয়তো মায়িক বন্ধনকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করার কামনায়, হয়তো তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের বিবর্তনের পথে কিছুকাল এই দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন মনে করতেন। চিকাগো ধর্মসভায় সাফল্যের বেশ কয়েকমাস পরে ১৮৯৪ খৃীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তিনি রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠির মধ্য দিয়ে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করেন। সে যাই হোক, স্বামীজীর আদর্শ ভাব ও প্রেরণাশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় আলাসিঙ্গা ও গুরুভ্রাতাদের কাছে লেখা এই চিঠিগুলির মধ্যেই। বলা যেতে পারে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনা এই পত্রাবলী।

এঁদের বাদ দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি অধিক পত্র লিখেছেন প্রমদাদাস মিত্রকে ইনি কাশীর জমিদার ছিলেন; পাণ্ডিত্য ও ধর্মানুরাগ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির জন্য স্বামীজী এঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণ এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন অনেক সময়। ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে ১৮৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত অধিকাংশ পত্রই এঁকে লেখা, এ সব পত্রে কুশল সংবাদাদি ও শাস্ত্রালোচনাই স্থান পেয়েছে। কিন্তু ধর্মানুরাগ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সত্ত্বেও তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, তাই স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণ ও ধর্মের নব ব্যাখ্যা তাঁর হয়তো খুব মনঃপূত ছিল না, ৩০শে মে ১৮৯৭ খ্রীঃ লেখা (৩২৯ নং পত্র) স্বামীজীর পত্রে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। তাছাড়া জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা স্বামীজীর ১৩টি পত্র প্রকাশিত। এঁর সঙ্গে স্বামীজী ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং এঁরই সৌজন্যে ভারতের বহু দেশীয় রাজ্যের রাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, যাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে খেতড়ির মহারাজ অজিত সিং-এর নাম অগ্রগণ্য। স্বামীজীর কাজে তিনি প্রভূত অর্থসাহায্য

করেছিলেন এবং তাঁর প্রেরণায় বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁরই অনুরোধে স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামীজীর ৬৯টি পত্র মাত্র একটি পরিবারের লোকদের লেখা, তা হল চিকাগোর হেল পরিবার। চিকাগো ধর্মসভার পূর্বদিন স্বামীজী যখন সহায়সম্বলহীনভাবে চিকাগোর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, একটি সহৃদয়া নারী সেদিন স্বামীজীকে সযত্নে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ইনি মিসেস্ জর্জ ডব্লু. হেল। মিঃ হেলকে ফাদার পোপ ও মিসেস্ হেলকে মাদার চার্চ বলে স্বামীজী সম্বোধন করতেন এবং কন্যাদ্বয় মেরী হেল ও হ্যারিয়েট হেলকে ভগিনীর মতো স্নেহ করতেন। এই পরিবারের আরো দুটি কন্যা মিস্ ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি ও হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলিকেও স্বামীজী খুব স্নেহ করতেন। এই পরিবারের সৌজন্য তিনি কখনও বিস্মৃত হতে পারেননি, চিকাগোতে এঁদের গৃহে তিনি বহুবার পদার্পণ করেছেন। এঁদের মধ্যে মেরী হেলকেই তিনি সবচেয়ে বেশী চিঠি লিখেছেন। এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে স্বামীজীর স্নেহ প্রীতি শুভেচ্ছাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। হেল ভগিনীদের সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা ও অভিপ্রায় মেরী হেলকে ১৮৯৬ খ্রীঃ ১৭ই সেপ্টেবর লেখা (২৯৪ নং পত্র) চিঠিতে অনেকটা পরিস্ফুট। মেরী হেলকে ১৮৯৫ খ্রীঃ ১লা ফেব্রুয়ারি লেখা (১৫৯ নং পত্র (আর একটি পত্রের প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে স্বামীজীর সন্ন্যাসী-সত্তা অগ্নিবৎ জ্বলে উঠেছে এবং এর পরেই মেরী হেলের সঙ্গে স্বামীজীর পদ্যছন্দে অপরূপ কয়েকটি পত্রালাপ ঘটে। পরিহাসে ভরা অথচ একান্ত গভীর এই চিঠিগুলো পত্রাবলীতে সংযোজিত না হয়ে 'বাণী ও রচনা'র ১০ম খণ্ডে 'একটি অপরূপ পত্রালাপ' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রালাপের প্রথম পত্রটি ১৮৯৫ খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি লেখা।

বিদেশী শিষ্য ও সুহৃদদের মধ্যে এককভাবে তিনি মিসেস্ বুলকেই সর্বাধিক পত্র লিখেছিলেন। ইনি নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলিবুলের স্ত্রী। স্বামীজীর শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁর কাজে অশেষ সহায়তা করেছিলেন। আর যাঁদের কাছে স্বামীজী অধিক পত্র লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিস্ ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা ও মিঃ স্টার্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। মিস্ ম্যাকলাউড স্বামীজীর পাশ্চাত্যের অনুরাগী সুহৃদদের মধ্যে অন্যতমা, স্বামীজীর কাজে তিনি বহুভাবে সাহায্য করেছেন এবং আজীবন স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত জীবন যাপন করেছেন। ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এঁকে লেখা (৪৭৩ নং পত্র) পত্রটি স্বামীজীর সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্তার অপূর্ব প্রতিফলন।

স্বামীজীর আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কথা সর্বজনবিদিত। ভারত-কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণা এই মহীয়সী নারী স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, তাই হয়তো খুব বেশী চিঠি তাঁকে লেখার প্রয়োজন হয়নি ; তাঁকে লেখা ৩২টি চিঠি রচনাবলীতে আছে। মিঃ স্টার্ডিকে লেখা ৩১টি চিঠি প্রকাশিত ; এই ইংরেজ

মানুষটি প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে থেকে তপস্যা করেছিলেন এবং পরে ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারকাজে স্বামীজীকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তথাপি মনে হয় স্বামীজীর মত বিরাট পুরুষকে সম্যক্‌ভাবে বোঝবার মত যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল না ; এ প্রসঙ্গে তাঁকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেখা (৪৩০ নং পত্র) পত্রটি কৌতূহলী পাঠকদের পাঠ করতে অনুরোধ করি।

লেগেট পরিবারকেও স্বামীজী অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন নিউইয়র্কের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি মিস্‌ ম্যাকলাউডের বিধবা ভগিনী মিসেস্‌ স্টার্জিসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরা স্বামীজীকে নানা-ভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং স্বামীজীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। মিস্‌ এলবার্টা স্টার্জিস ছিলেন মিসেস্‌ লেগেটের প্রথম বিবাহের কন্যা, স্বামীজী এঁকেও অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী মিসেস্‌ লেগেটকে 'খেয়ালীদের কংগ্রেস'-এর বিবরণ জানিয়ে একটি ভারী মজার চিঠি (৪৯৭ নং পত্র) লিখেছিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক জন হেনরী রাইট স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। একটি পরিচয়পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'ইনি এমন একজন মানুষ যাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার মানায়।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'স্বামীজী! আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া যেন সূর্যকে প্রশ্ন করা, তোমার কিরণ দেবার কি অধিকার ?' এঁর কাছে লেখা কয়েকটি চিঠি বাণী ও রচনায় স্থান পেয়েছে,তার মধ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর লেখা (৭০ নং পত্র) চিঠিখানি অনুরাগী পাঠকদের পাঠ করতে অনুরোধ জানাই, কারণ ঐ চিঠির সঙ্গে স্বামীজী একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের একান্ত আকুতি ও পরম প্রাপ্তির কথা অনুপম ভাষায় রূপ পেয়েছে।

স্বামীজীর কাজে আরো অনেকে একান্তভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সিস্টার ক্রিস্টিন, মিঃ গুডউইন, মিস্‌ মুলার, ক্যাপ্টেন ও মিসেস্‌ সেভিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথম জনের কাছে দুটি ও দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে লেখা একটি মাত্র চিঠি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু মিস্‌ মুলার বা সেভিয়ারদের কাছে লেখা কোনো চিঠিই ছাপা হয়নি, যদিও আমরা চিন্তাই করতে পারি না যে, স্বামীজী এঁদের কাছে মোটেই চিঠি লেখেননি। মিস্‌ মুলার স্বামীজীর ইংলণ্ডের কাজে এবং বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন, আর সেভিয়ারদের জীবন তো বেদান্ত প্রচার-কার্যে উৎসৃষ্ট এবং ভারতবর্ষের মাটিতেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সেভিয়ার দম্পতির প্রতি স্বামীজীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে স্বামীজীর একটি পত্র (৪৩০ নং) থেকে কিঞ্চিৎ উধৃত করছিঃ '...আর অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা মনে পড়ে—শীতের সময় তাঁরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন, আমার নিজের মার চেয়েও যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে

আমার সমব্যথী হয়েছেন ; এবং এঁদের কাছে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু পাইনি। সেই মিসেস্ সেভিয়ার মান মর্যাদার পরোয়া করেননি বলেই আজ হাজার হাজার লোকের পূজনীয়া। তাঁর লোকান্তরের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে মনে রাখবে দরিদ্র ভারতবাসীর একজন অকৃত্রিম শুভার্থিনীরূপে।'

নীচে আমরা কয়েকজন ভারতীয় ও অভারতীয়দের কাছে লেখা স্বামীজীর প্রকাশিত পত্রের সংখ্যা উল্লেখ করছি ঃ

ভারতীয়	পত্রসংখ্যা	অভারতীয়	পত্রসংখ্যা
আলাসিঙ্গা পেরুমল	৪৪	হেল পরিবার	৬৯
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	৩৮	মিসেস্ ওলিবুল	৪৮
প্রমদাদাস মিত্র	৩৩	মিস ম্যাকলাউড	৩৫
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	২৪	ভগিনী নিবেদিতা	৩১
অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ	১৬	মিঃ স্টার্ডি	৩১
হরিদাস বিহারীদাস দেশাই	১৩	লেগেট পরিবার	১৯
স্বামী অখণ্ডানন্দ	১১	অধ্যাপক রাইট	৯
খেতড়ির মহারাজা	৯	অন্যান্য অভারতীয়	২৫
স্বামী তুরীয়ানন্দ	৮		
বলরাম বসু	৭		
সন্ন্যাসী শিষ্যগণ	৭		
অন্যান্য ভারতীয়	৬২		
মোট	২৭২		২৬৮

অবশিষ্ট ১৪টি চিঠির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম অজ্ঞাত।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, স্বামীজীর পত্রাবলীর মত মূল্যবান রচনা সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা ও আলোচনা প্রয়োজন। এটা আশার কথা যে, সম্প্রতি কোনো কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় স্বামীজীর কর্মধারা সম্পর্কে সর্বভারতীয় পত্রপত্রিকা থেকে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে, যার কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকখানি প্রকাশিত করার অপেক্ষায় আছে। স্বামীজীর পত্র সম্পর্কেও তেমনি অনুসন্ধান হলে আজও নূতন পত্রের সংযোজন এবং ঐ দিব্য জীবন সম্পর্কে নূতন আলোকপাত অসম্ভব না-ও হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের হাস্যরস

অজিতকুমার ঘোষ

মহাপুরুষদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লঘু হাস্যপরিহাসের প্রতি একটা প্রবণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা জীবনের গুরু ও গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন বলিয়াই বোধ হয় জীবনের হাল্কা ও তরল ছদ্মরূপ ধারণ করিতে মাঝে মাঝে তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। আকাশের ঘনীভূত মেঘজাল যেমন সূর্যের সুচিক্কণ আলোকস্পর্শে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, মহাপুরুষদের ভাবগম্ভীর সত্তাও তেমনি হাস্যকৌতুকের বহিরাবরণে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের সহজ ও ঘনিষ্ঠ রূপ ধরা পড়ে হাস্যকৌতুকের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে। মহাপুরুষদের অমেয়, রহস্যঘন সত্তা এই হাস্যকৌতুকের প্রত্যক্ষ উপায়টির মধ্য দিয়েই সাধারণ লোকের ধারণা ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। রামপ্রসাদ গভীর ভক্তিভাব একটা লঘু ও পরিচিত পরিবেশের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মের গুহ্য তত্ত্বগুলি হাল্কা ও সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ও কঠিন জীবনসমস্যা নানাপ্রকার সরস টীকা টিপ্পনী ও তরল ঠাট্টা রসিকতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য জীবনে প্রগাঢ় জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ের অদম্য ভাবাবেগের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার অমূল্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই জাতীয়-জীবনের কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের চিন্তায় অথবা কোনো সাংগঠনিক কাজে ব্যাপৃত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহার ভাবনাগভীর ও কর্মবহুল জীবনে অলস অবকাশ ও শিথিল বিশ্রাম সুদুর্লভ ছিল। কিন্তু তবুও যে তাঁহার হৃদয়প্রসন্ন অনুভূতির রসে স্নিগ্ধ এবং তাঁহার গম্ভীর বদনমণ্ডল কৌতুকের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল ছিল, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে জানা যায়, তাঁহার অন্তরসমুদ্র গভীর ভাব ও চিন্তায় আলোড়িত হইলেও হাস্যকৌতুকের হাল্কা ফেনাগুলি তাঁহার কথাবার্তার মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে; স্বামীজীর হাস্যরসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনা ও পত্রাবলীর মধ্যে, শিষ্যদের সঙ্গে বহু কথোপকথনে এবং অনুরাগী ভক্তদের স্মৃতিকথার মধ্যে।

স্বামীজীর কৌতুকপ্রিয়তা ও পরিহাস-রসিকতা সম্বন্ধে আমরা তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের লেখায় অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। 'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে' নামক পুস্তকে নিবেদিতা লিখিয়াছেনঃ 'তারপরে পুনরায় কথাবার্তার ভাব বদলাইয়া গেল, এবং কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্পগুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম।'[১] স্বামীজী কত লঘু বিষয় লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতেন

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ৩১১

তাহা 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ-এর একাধিক স্থানে লিখিত রহিয়াছে। একস্থানে লেখা হইয়াছে ঃ "প্রথম হইতে স্বামীজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টাতামাশা আরম্ভ করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহ-সংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত'।[২] স্বামীজীর আর এক শিষ্যের লেখায় আমরা জানিতে পারিয়াছি, তিনি কিভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যদিয়া শিক্ষা দিতেন। সেই শিষ্য লিখিয়াছেন ঃ 'স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে; বালকের মতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত,—ইহার ভিতর এত শক্তি" ![৩]

স্বামীজীর হাস্যরসসৃষ্টিতে পটুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার কথোপকথন ও রচিত-সাহিত্য উভয়ের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। তাঁহার কথা লেখার মধ্যে তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার অজস্র নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ লোক ব্যতীত তাঁহার আলাপ-আলোচনার রস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। ভক্ত-শিষ্যদের স্মৃতিকথনে তাঁহার হাস্যকৌতুকপ্রিয়তার বহু উল্লেখ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেই হাস্যকৌতুকপ্রিয়তার বিশেষ রূপটি কি ছিল, কিভাবে তিনি শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীটি কিরূপ ছিল, লোকেদের সহিত আলাপ করিবার সময় কি উপায়ে তিনি তাঁহাদের আগ্রহ ও কৌতূহল ঘনীভূত করিয়া অবশেষে কৌতুকের তরল আঘাতে তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেন, তাঁহার টীকা-টিপ্পনী, ঠাট্টা-তামাসা, শ্লেষ-বিদ্রূপে কি বিশিষ্ট রীতিতে প্রকাশ পাইত—সে-সব বিষয়ের বিশদ বিবরণ আমরা পাই নাই। শুধু কেবল 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-এর ন্যায় দুই একখানি গ্রন্থে স্বামীজীর নিজস্ব উক্তিগুলি প্রায় অবিকল উধৃত হইয়াছে। সেজন্য ঐ স্বল্পসংখ্যক রচনায় তাঁহার ব্যক্তিজীবনের হাস্যরসের নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। কিন্তু হাস্যরসসৃষ্টিতে তিনি যে কতখানি দক্ষ ছিলেন তাহার যথার্থ পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাঁহার নিজস্ব রচনার মধ্যে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পত্রাবলী' প্রভৃতির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, গম্ভীর তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনাও তাঁহার হাস্যকৌতুকের বিমল আলোকচ্ছটায় কতখানি সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াছি যে,

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খন্ড), পৃঃ ২১১
৩ ঐ ঐ পৃঃ ৩৬৭-৬৮

তাঁহার রমণীয় রচনাভঙ্গির মধ্যে হাস্যরস কিভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার তির্যক মন্তব্যগুলির উপরে উপরে কৌতুকের কণাগুলি কিভাবে ঝলমল করিতেছে।

স্বামীজী কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। সেজন্য পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের কথা লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতে তিনি বেশ মজা বোধ করিতেন। এই বিষয়ে স্বামীজীকে আর একজন ধর্মাবতারের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি হইলেন নবদ্বীপের নিমাই। নিমাই-এর মতোই স্বামীজী আমোদপ্রিয় ও চঞ্চলচিত্ত ছিলেন এবং নিমাই-এর মতই তিনি তাঁহার ভক্ত-শিষ্যদের পিছনে লাগিয়া তাহাদিগকে রাগাইয়া বিব্রত করিয়া মজা পাইতেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন বলিয়া স্বামীজীর কাছে তাঁহাকে প্রায়ই নাস্তানাবুদ হইতে হইত। একদিন স্বামীজীর জন্য শিষ্য রন্ধন করিতেছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন: "দেখিস মাছের 'জুল' যেন ঠিক বাঙালদিশি ধরনে হয়"।[৪] পূর্ববঙ্গে শব্দের আদিতে যে মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয় এবং ও-কার উ-কারে পরিণত হয়, 'জুল' কথাটির মধ্যে তাহারই আভাস দিয়া স্বামীজী এখানে কৌতুক উদ্রেক করিয়াছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের একস্থানে তিনি পূর্ববঙ্গীয় একটি বহু প্রচলিত উক্তি উল্লেখ করিয়া বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন "ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে?"[৫] ঠাট্টাচ্ছলে এই উক্তিটি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ঠাট্টা দ্বারাই তিনি একটি গুরু সামাজিক তত্ত্ব বিশদভাবে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে লইয়া ঠাট্টা করিবার সুযোগ পাইলে স্বামীজী আর ছাড়িতেন না। একদিন তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিলেন: "আর এক কথা শুনেছেন, 'আজ এই ভটচাজ বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি ক'রে খেলি?'[৬] এই উক্তির মধ্যে হিন্দুধর্মের ছুঁৎমার্গের প্রতি শ্লেষ আছে; কিন্তু কৌতুকসৃষ্টির চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে,মিষ্টান্ন-খাওয়া অপেক্ষাও জলখাওয়ার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার মধ্যে। শরৎচন্দ্রের অবিস্মরণীয় চরিত্র সেই টগর বোষ্টমীর একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া যায়. "বিশ বছর ঘর করেছি বটে, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি কি?"

স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও প্রায়ই হাস্য-পরিহাস করিতেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনব নামকরণের মধ্যেই তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রকে তিনি ডাকিতেন জি. সি. বলিয়া। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার ধর্মবিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইত। স্বামীজী ছিলেন জ্ঞানমার্গীয় বেদান্ত-ধর্মে বিশ্বাসী, আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন নির্বিচার ভক্তিবাদী। গিরিশচন্দ্রের এই অন্ধ

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ২৩
৫ ঐ (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ১৮৫
৬ ঐ (৯ম খণ্ড), পৃঃ ১২৩

ভক্তিবাদ লইয়াও তিনি কম ঠাট্টা-তামাসা করেন নাই। একদিন তিনি ঠাট্টা করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন : "কি জি. সি. এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটলে"।[৭] অবশ্য স্বামীজীর পরিহাসে কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার মত বিসর্জন দেন নাই!

স্বামীজীর কথাবার্তার মধ্যে নানা সরস ও শাণিত মন্তব্যের মধ্য দিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্তব্যগুলি একটু তির্যক ও শ্লেষাত্মক রূপ ধারণ করিত। গোরক্ষিণী সভার জনৈক প্রচারক একদিন স্বামীজীর কাছে আসিয়া বলিলেন : 'গরু আমাদের মাতা'। এই কথার উত্তরে স্বামীজী যাহা বলিলেন তাহা বিশেষ উপভোগ্য। তিনি বলিলেন : 'হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি—তা' না হ'লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?'[৮] ধর্মসাধনার পূর্বে যে ক্ষুধা-নিবারণ প্রয়োজন তাহা বুঝাইতে যাইয়া স্বামীজী একদিন যে সরস উক্তি করিয়া-ছিলেন তাহাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন : 'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পুজো চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম'।[৯] পেটকে কূর্মাবতারের সঙ্গে তুলনা করিয়াই তিনি এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। কথার ঈষৎ বিকৃতির মধ্যে অনেক সময় অর্থের গুরুতর ব্যবধান ঘটিতে পারে। স্বামীজীও প্রায়ই কোনো শব্দকে এমনিভাবে বিকৃত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে লঘু রসের সঞ্চার করিতেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার নাম তিনিই দিয়াছিলেন, অথচ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি শিষ্যকে এই পত্রিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার সময় পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, 'উদ্বন্ধন দেখেছিস'?[১০] ওকাকুরাকে (Okakura) তিনি বলিতেন 'অক্রূর খুড়ো'।[১১]

স্বামীজীর লিখিত রচনার মধ্যে যে হাস্যরসের উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ভাষার মধ্যে তাঁহার রৌদ্রকরদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। সেই ভাষা তাঁহার সত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম হইয়া রহিয়াছে। উহাতে তাঁহার এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গতা ও সহজ অকৃত্রিমতা রহিয়াছে যে তাহা পড়ামাত্রই আমরা লেখকের প্রতি এক অনিবার্য আকর্ষণ বোধ করি এবং তাঁহার বিষয়বস্তু ও রসসৃষ্টির সহিত একাত্ম হইয়া পড়ি। সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত যিনি ছিলেন তিনি চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে তদ্ভবশব্দ ও বাগ্‌রীতি আশ্রয় করিয়া তাঁহার ভাষার মধ্যে এক অপূর্ব স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতা সঞ্চার করিলেন। তাঁহার এক-

---

৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ৪৩
৮. ঐ ঐ পৃঃ ৯
৯. ঐ ঐ পৃঃ ১৩৩
১০. ঐ ঐ পৃঃ ১৭৩
১১. ঐ (৮ম খণ্ড), পৃঃ ২০০

খানি পত্র হইতে এই ভাষার নিদর্শন দেওয়া হইল ঃ "তোমার ঠ্যাঙ জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ ক'রছ তাও শুনছি। ···আমার শরীর ঠিক চলছে না। মোদ্দা কথা, আমারও আতুপুতু করলেই রোগ হয়। রাঁধছি, যা-তা খাচ্ছি, দিনরাত খাটছি, বেশ আছি, খুব ঘুমুচ্ছি" !![১২]

উপরি-উধৃত ভাষার মধ্যে বোধ হয় 'শরীর'-শব্দটি ছাড়া আর কোনো তৎসম শব্দই নাই। এই ধরনের ভাষায় পত্রের দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা সরস ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চিঠিপত্রের অনেকস্থলে তিনি তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ উপরি-উক্ত পত্রখানার মধ্যেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। যথা ঃ "Awakened ('প্রবুদ্ধ ভারত')-ও ঘুমিয়েছে বুঝি? আমায় তো আর পাঠায় না। যাক, দেশে তো 'পিলগ্ হইছন্তি'—কে আছে, কে নেই রে রাম!!" Awakened কথাটির শব্দগত অর্থ ধরিয়া তাহার বিপরীত শব্দ 'ঘুমিয়েছে'-র ব্যবহার এবং পরিহাসচ্ছলে 'পিলগ হইছন্তি'-এরূপ উৎকলী বাক্যপ্রয়োগের মধ্য দিয়া স্বামীজী এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থখানিকে ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যায়। গ্রন্থখানির মধ্যে জায়গার বর্ণনার সহিত বিভিন্নপ্রকার নর-নারীর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিকজীবন সম্বন্ধে বহু বিচিত্র ও সরস মতামত প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। এই হাস্যরস উদ্ভূত হইয়াছে লেখকের তির্যক সমালোচনার দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত জগৎ ও মানবচিত্রের মধ্যে এবং তাঁহার শাণিত বাগ্‌চাতুর্যের মধ্যে। সিংহলীদের চেহারার বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি তাঁহার শ্লেষাত্মক, সূচীমুখ বর্ণনাকে কিভাবে সরস করিয়া তুলিয়াছেন তাহার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ "ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা! আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে বাঙলা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হ'য়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্ছে গা?"[১৩]

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে সিংহলী কথা বলিতে যাইয়া লেখক অলস, বিলাসী, মেয়েলিভাবাপন্ন বাঙালী যুবকদের প্রতি তীক্ষ্ম শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

১২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৮ম খণ্ড), পৃঃ ৮৯
১৩. ঐ (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৮৮

নেটিভদের প্রতি সাহেবদের ঘৃণা এবং সাহেবদের খোসামোদ ও অনুকরণ করিবার দাস-মনোবৃত্তিও স্বামীজীর হাতে বহুস্থানে তীব্র কশাঘাত লাভ করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: "দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় ক'রে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা। 'সাধ ক'রে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত'। ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখ্‌ৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক"।[১৪]

স্বামীজী তাঁহার কথা ও লেখার বহুস্থানে অনেক সরস গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। এই গল্পগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচিত্র সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক আচারব্যবহার ও রীতিনীতির আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি এ-ধরনের গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত গঙ্গাকে পাঁঠা মানা প্রসঙ্গে স্বামীজী এমনি একটি গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই: 'কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুর বাড়ী যায়; সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও'। জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শ্বাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে। এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা, শ্বশুর গঙ্গা পেলেন'।

স্বামীজী তাঁহার লেখায় শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের চাতুর্য দেখাইয়া অনেক স্থানে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। তদ্ভব শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ করিয়া যে কিরূপ হাস্যরসাত্মক করা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: 'কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিকবিচিত্রিত দ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জেবলে—আঁবকাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগলি—চিত্রিত ক'রে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা'।[১৫]

সাধারণ বস্তু লেখকের উদ্ভট কল্পনাস্পর্শে এবং নানা অতিশয়িত ভাষার আড়ম্বর ও অলঙ্কার প্রয়োগে কিরূপ কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত স্বামীজীর লেখায় অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের গোড়াতেই জাহাজে সমুদ্র

১৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৭৬
১৪. ঐ ঐ পৃঃ ৬০

উত্তীর্ণ হওয়ার বর্ণনার কথাই ধরা যাকঃ "আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হ'য়ে, ওছল পাছল ক'রে খোঁটাখুঁটি ধ'রে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্ছি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পোঁছে রাক্ষস-রাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষীর দলের সঙ্গে যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ ক'রে ছুরি-খানা তাঁরই গায়ে বা বসায় —ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা'।[১৬]

স্বামীজী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কতখানি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সামাজিক মতামত বোধ হয় সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক প্রকাশ লাভ করিয়াছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থখানির মধ্যে আমাদের সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের বহু দোষত্রুটি, বহু ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়া তিনি সে-সমাজের ভালো ও মন্দ উভয় দিক সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-ভাববিলাসী দেশী সমাজের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে তিনি সেই জন্যই তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। লেখক প্রাচীন ও সনাতন ভাবাদর্শ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মত এত তীব্র ও জোরালো যে, বিপক্ষবাদীদের প্রতি তাঁহার ধিক্কার অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একস্থানে তিনি বলিয়াছেনঃ "ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেনিনি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন, -এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?'[১৭]

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৫৯-৬০
২ ঐ ঐ পৃঃ ১৫৯

বিবেক-সাহিত্য ও গণজাগরণ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে বহু-প্রচলিত সিংহ ও মেষশাবকের গল্পটি দিয়েই শুরু করা যাক। আসন্নপ্রসবা এক সিংহী শিকারের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক ভেড়ার পালে এবং সেখানেই তার ভূমিষ্ঠ হল একটি শাবক। রাখালদের সমবেত আক্রমণে নিহত হল সেই সিংহী। এদিকে সেই সিংহ-শাবক ভেড়ার পালের সঙ্গেই বড় হয়ে উঠতে লাগল। ভেড়ার পালের সঙ্গে থেকে থেকে ভেড়ার আচার-আচরণ সে শিখল। এমনকি ভেড়ার মতোই ঘাসপাতা খায়, তাদের মত ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকে। কিছুদিন পরে আবার এক রক্তলোলুপ সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ভেড়ার পালে শিকারের লুব্ধ প্রত্যাশায়। সিংহের গর্জনে ভেড়ার পালের সঙ্গে শিশু-সিংহও লেজ গুটিয়ে পালাতে গেল। আক্রমণকারী সিংহ ভেড়ার পালে নিজেদের জাতভাইকে দেখে আশ্চর্য হল। ঘাড় ধরে তাকে টেনে নিয়ে এল জলাশয়ের কাছে। সে তখন বড় সিংহের থাবার নীচে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বড় সিংহ বলল : "দ্যাখ্, ভালো করে নিজের মুখে চেয়ে দ্যাখ্ দেখি! কে তুই জানিস্? চিনতে পারছিস নিজেকে? আমিও যা, তুইও তা। ডাক দেখি।" বড় সিংহ গর্জন করল। আত্মমুখ দেখে ভেড়ার পালের সিংহেরও আত্মবিশ্বাস ফিরে এল মনে। চিনল নিজেকে। সেও গর্জন করে উঠল। অর্ধমৃত শিকার ফেলে দিল তার মুখের কাছে। নে, খা। ছোট সিংহ প্রথম রক্তস্বাদ গ্রহণ করল এবং বীরবিক্রমে শিকার মুখে বড় সিংহের সঙ্গে ঊর্ধ্বে লাঙুল তুলে উদ্দাম অরণ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল।—বস্তুতঃ ভেড়ার পালের সঙ্গে মিশে যাওয়া—আত্মবিস্মৃত সিংহশাবকের মতোই অবক্ষয়ের অতল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত পরানুকরণপ্রিয় ভীরু দুর্বল পরমুখাপেক্ষী অসহায় আত্মভ্রষ্ট আত্মসম্ভ্রমহীন আমাদের এই জাতিকে তার হারানো আত্মমুখ দেখানোই বিবেক-সাহিত্যের একক কৃত্য। ক্লীবতা, হীনমন্যতা দূর করে হৃদয়ে আবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া। সমগ্র বিবেক-সাহিত্যই এই আত্মবিশ্বাস-উদ্বোধনের মহাকাব্য। আর শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়েই নয়,—বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনসাধনাই ছিল আর্ত দুঃখী দুঃস্থ অসহায় মানুষকে সর্ববন্ধন মুক্তির এক সচ্ছল সাম্যে স্থিত জগতে সমুত্তীর্ণ করে দেওয়া। পরাধীন জাতির বিরাট অংশই যেহেতু নির্যাতিত নিপীড়িতের দলে, তাই সেই অসহায় দুর্বল মানুষের মুক্তির জন্যই তিনি তাঁর "জীবন যৌবন ধন মান" সহ নিবেদন করে গেছেন। বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একজন সমালোচক বলেছিলেন যে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মই নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার উদ্দেশ্যে এক আত্মনিবেদিত প্রণতির মতো : "I bow down to thee thou suffering Humanity"—ডস্টয়েভস্কির সমগ্র সাহিত্য যেন এই

একটি কথাই নিবেদন করে চলেছে বিশ্বমানুষের কাছে। বিবেকানন্দের সাহিত্য ও তাঁর জীবন সম্পর্কেও কথাক'টি সমভাবে প্রযোজ্য। নবজাগরণের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসাবে সকল মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই যদিও তাঁর একক অন্বিষ্ট, তথাপি মানবজাতির একটি বিশাল অংশই যেহেতু নির্যাতিত নিপীড়িত সর্বহারার দলে, তাই তাদের প্রসঙ্গই সবচেয়ে আগে বিবেচ্য। তাদের দুঃখদুর্দশার কথাই তাঁকে, তাঁর বিশাল হৃদয়কে ব্যাকুল করে তুলেছিল সব চেয়ে আগে। এবং মানুষের সবচেয়ে কঠিন ও নিষ্ঠুর বন্ধন যেহেতু ক্ষুধার বন্ধন, অশিক্ষার বন্ধন ও জাতপাতের বন্ধন, তাই এই ভূখণ্ডের মানুষের সেই সব বন্ধন মোচনে প্রথম অগ্রণী হলেন স্বামীজী। কবির ভাষায় বলা যায় "এমন মানবকণ্ঠ কৈ আমরা শুনিনি এখানে / কোনোদিন, এত বড় নির্মম ধিক্কার, / এত তীব্র ভালোবাসা, এত শুদ্ধ বিবেকী চেতনা, / এত বড় অহংকার !··· এত বড় দৃঢ় ঐক্যে কেউ কৈ দেখিনি তো চেয়ে / মৃন্ময়ী মায়ের দিকে। অশ্রুমগ্ন এমন যন্ত্রণা, / এত বড় হৃদয়ের এমন মর্মের হাহাকার, / এত স্নিগ্ধ শুভ ইচ্ছা, এত শান্তি বৃহৎ হৃদয়ে !"—দেশকে, দেশের মানুষকে এমন করে কেউ দেখেন নি, চেনেন নি -। দুঃখী আর্ত দুঃস্থ মানুষের মর্মের বেদনাকে এমন করে অনুভব করেন নি। তাই হৃদয়ের রক্তক্ষরা যন্ত্রণায় আবেগে ভালোবাসায় বার বার ছুটে গেছেন তাদের কাছে। তাদের সঙ্গে থেকেছেন, খেয়েছেন, বসবাস করেছেন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে—তাদেরই একজন হয়ে। তাই সর্বাগ্রে তাদের দুঃখমোচনের কথাই বার বার ভাবতে হয়েছে তাঁকে। চিরন্তন ক্লীবতা, জড়তা থেকে তাদের জাগাবার জন্য কণ্ঠে তুলতে হয়েছে মহাজাগরণের সঙ্গীত।

নরের মধ্যে যিনি ইন্দ্র, তিনি নরেন্দ্র। সত্যিই তিনি নরেন্দ্র, সম্রাটের ভূমিকা নিয়েই তিনি এই মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন। অথচ সম্রাট হয়েও তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর দুঃখে দৈন্যে আঘাতে বেদনায়—তাদেরই একজন হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুঃস্থ দুঃখী মৌন মূক অসহায় ভারতবাসীর আত্মার আত্মীয় তিনি। তাই কবি যথার্থই লিখেছেন ঃ "একজন সম্রাটকে আমরা আমাদের ভাঙা কুঁড়ে এঁদো নোংরা গলি-পথে পথে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। অথচ তিনি দেশে দেশান্তরে দৃপ্ত বিজয়ী রাজ-রথে দিগ্বিজয় ক'রে ফিরে এসেছিলেন ঃ অনন্য তাঁহার সেই রাজকীয়তায় সবাই মুগ্ধ। *আজন্ম সম্রাট তিনি এমনি তাঁর চলা ফেরা, আচারে চর্যায় রাজকীয় আভিজাত্য, মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে জীবনের যৌবনের গান। আগ্নেয় প্রতিভা-দীপ্তি বিচ্ছুরিত সর্ব অঙ্গে। রাজকর, রাজার সম্মান না দিয়ে পারত না কেউ। আশ্চর্য* উজ্জ্বল সেই পদ্মায়ত দুচোখের দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রমে তাঁর পদপ্রান্তে নতজানু না হয়ে কোনো ছিল না উপায়।···

···অথচ অনন্য সেই রাজাকেই আমাদের বিধ্বস্ত বিদীর্ণ এই দরিদ্র সহর 'একান্ত স্বজনেরমতো ক'রে একদিন পেয়েছিল। অবিরল শান্ত শুশ্রূষায় জীবনের সবক্ষত নিরাময় ক'রে দিয়ে, পুঞ্জীভূত আবর্জনা, আঙিনা চত্বর পরিচ্ছন্ন ক'রে গেলেন। মহামারী

মন্বন্তরে সমর্পিত সকলের পাশে মুগ্ধা জননীর মতো আমাদের দুঃখে দৈন্যে পরাজয়ে সহযাত্রী সমব্যথী হয়ে কাঁদতে দেখেছি আমরা সম্রাটকে—মানুষের জন্য রুদ্ধ উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়তে বার বার ঃ দেখেছি উন্মাদ হয়ে আসমুদ্র-হিমাচল বিপন্ন বিস্ময়ে তোলপাড় ক'রে ফিরছেন—কোথায় কোথায় আছে ত্রিশ কোটী মানুষের উজ্জ্বল উদ্ধার।

শিকাগো ধর্ম মহাসভায় দ্বিগ্বিজয়ের মুহূর্তেও তাদের কথাই মনে পড়েছে স্বামীজীর। এবং অন্তহীন বেদনায় পরিপ্লাবী হয়েছে তাঁর সমগ্র সত্তা। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুতে পারলেন না। দুঃস্থ দুঃখী হতভাগ্য নিরন্ন দেশবাসীর কথা ভেবে সারারাত পদচারণা করে কাটিয়ে দিলেন।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বিশ্ব-দিগ্বিজয়ের পর থেকেই শুরু হয়েছিল নানা দিক থেকে নানাভাবে অজস্রধারায় অভিনন্দন-অভ্যর্থনা-প্রশস্তির পুষ্পবর্ষণ। চারিদিক থেকে আসতে আরম্ভ হল প্রভূত সম্বর্ধনা ও স্বাগত সম্ভাষণ অভিনন্দন। সেই সব অভ্যর্থনা সম্মেলনে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়—নানারকম অজস্র সর্ব ভোজ্য বস্তুর ও সুদৃশ্য দুর্মূল্য সব উপঢৌকন-উপহারের বিচিত্র সমারোহ। তারই মধ্যে পূর্ব-উল্লিখিত একটি বিশেষ সম্বর্ধনার কথা পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ মহাসভায় একটা জনদ্বরেণ্য জাতির মুখপাত্রদের দ্বারা মুক্তকণ্ঠে বিজয়ী বীরদর্পে সম্বর্ধিত হইয়াও এবং সে রাত্রে শিকাগোর এক ধনকুবেরের সুসজ্জিত গৃহে রাজোচিত যন্ত্রাদির অধিকারীহইয়াও তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। সেই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ মধ্যে তাঁহার মন আনন্দ লাভ না করিয়া বিষাদে মগ্ন হইল। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ভারতের দারিদ্র্য এবং এই অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে ভয়াবহ বিরোধ যেন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুলিল; পালকের শয্যা তাঁহার নিকট কণ্ঠকাকীর্ণ বোধ হইল। বালিশ তাঁহার চক্ষে জলে আর্দ্র হইল। [দুগ্ধফেননিভ] শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্ধকারাছন্ন সুদূরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন দুঃখে তিনি তখন যেন মুহ্যমান। অবশেষে ভাবাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূশয্যা গ্রহণ পূর্বক কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, আমার স্বদেশ যেকালে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য নিপীড়িত, সেকালে মান যশের আকাঙ্খা কে করে? গরীব ভারতবাসী আমরা কি দুঃখময় অবস্থায়ই না পৌঁছিয়াছি যে লক্ষ লক্ষ আমরা একমুষ্টি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করি' আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ভারতের জনতাকে কে উঠাইবে? কে তাহাদের খাইতে দিবে? মা দেখিয়ে দও, আমি কি করিয়া তাহাদের সেবা করিতে পারি।"—আমাদের বিশ্বাস, এই ঘটনা লায়ণ-পরিবারের গৃহেই ঘটিয়াছিল এবং প্রথম দিন মহাসভার কার্য শেষে সেই সন্ধ্যায় যে অভ্যর্থনা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার পরে স্বামীজী অধিক রাত্রে ঐ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। যুগনায়ক বিবেকানন্দ / ২য় খণ্ড / ৩২ পৃ / ১ম সংস্করণ, ভাদ্র,

১৩৭৩। দুঃস্থ দুঃখী নিরন্ন ভারতবর্ষের জন্য এই প্রেম চেতনা জন্ম লাভ করেছিল জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। যথার্থ ভারতবর্ষের বিকৃত চেহারাটা তিনি নিজের চক্ষে দেখেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষেই একথা বলা সম্ভব ঃ "ওরে ভাই দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চ জাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম। যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ" খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি। যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দুহাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে?···

যে দেশে কোটী কোটী মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাই আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনো চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক। সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখছি। এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি? সর্বশাস্ত্র পুরানেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্। পরোপকার ঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্' ॥ (সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বাক্য—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।) সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা চারযুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দুপা দিয়ে দলেছে।······পত্রাবলী ১২১-১২২ পৃ।

স্বামীজী আবার লিখছেন ঃ এই নির্যাতিত ও অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরানারীর কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগিধারী ব্যক্তিদ্বারা একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীও একটি জাতি নহে। আমাদের সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী নাই একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহা ত্রিশকোটী নর-নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে এমন কি বিলাসিতার পক্ষেও যথেষ্ট।

আমাদের দেশের শতকরা নব্বইজনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে?—এ-সকল বাবুর দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি?

···এবং যদিও আমি জানি যে, দাসজাতি তাহার স্বভাবদোষে যথার্থ হিতকারীকেই দংশন করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদেরই জন্য আমি প্রর্থনা করি এবং আমার সহিত আপনিও প্রার্থনা করুন······

লোকে কি বলিল—সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, আমার ভগবানকে, আমার

ধর্মকে, আমার দেশকে সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি ; তাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা প্রভুই জানেন।…

…মুষ্টিমেয় সহকর্মীদের লইয়া এখন আমি কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি, আর উঁহাদের প্রত্যেকে আমার মতো দরিদ্র ভিক্ষুক।…পত্রাবলী ২১৮-২১৯ পৃ।

…এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্য প্রার্থনা করি ; দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা করো। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না—আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি।

এদেশে (আমেরিকায়) যাদের গরীব বলা হয়, তাদের দেখছি ; আমাদের দেশের গরীবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভালো হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে। কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশকোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে ? তাদের উদ্ধারের উপায় কি ? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো। তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো ? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে ? এরাই তোমাদের ঈশ্বর এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোচন হয়, তানাহলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু করে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতসারে মরতে পারি—কেউ হয়তো আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়তো আমাদের জন্য একফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললে না, কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনো নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে-সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরীব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মতো গরীবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করছে।…পত্রাবলী ২৬৮-২৬৯ পৃ। পুনর্বার যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ দেশে কি মানুষ আছে ? ও শ্মশান পুরী। যদি Lower

class দের education (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পারো, তাহলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা শেখাতে পারো ? বড় মানুষেরা কোন্ দেশে কোন্ কালে কার কি উপকার করেছে ? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ ? মানুষ কই ? দেশে কি মানুষ আছে ? বাণী ও রচনাবলী ৭ম খণ্ড/২৪১ পৃ। এই সব কথা এমন তীব্রকণ্ঠে বেদনাবিদ্ধ হয়ে স্বামীজীই বলতে পারেন, যিনি স্বেচ্ছায় দেশজননীর পাদমূলে নিজের অমূল্য জীবন যৌবন ধনমান সব কিছু হাসতে হাসতে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন। দেশে যখন পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে দেখেছেন সারা ভারতবর্ষ, প্যারিয়া, ভাঙ্গী, মেথর-মুচি সকলের গৃহেই সানন্দে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তিনি। মনুষ্য দেহ ধারণ করেও কী অমানবিক দুঃখের জীবন তাদের যাপন করতে হয়, তা তিনি তাদের একজন হয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই আত্মমুক্তির চেয়ে তাদের ক্ষুধার, অশিক্ষার, কুসংস্কারের বন্ধন থেকে দেশের মানুষের মুক্তির কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাছে। এমন কি শিকাগো ধর্মমহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়েও তিনি ঘোষণা করলেন, "হে আমেরিকাবাসীগণ, আমি তোমাদের কাছে ধর্মের কথা শোনাতে আসিনি। ধর্ম ও দর্শন ভারতবর্ষের অনেক আছে। ভারতবর্ষের কোটী কোটী নিরন্ন মানুষের যা আজ প্রয়োজন তাহল একমুঠো ভাত ও একটুকরো রুটি। কোটী কোটী ভারতবাসী দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে। সেই নিরন্ন বুভুক্ষু ভারতীয় ভাই-বোনেদের জন্য তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে আমি এসেছি।"—আবার বললেন,…"আমি ধর্মপ্রচারক নই, আমার সত্যকার স্থান হিমালয়ে, কিন্তু আমি সংগ্রামে বদ্ধ-পরিকর। এবং এই সংগ্রাম আমার দেশব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।"…"যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করতে পারে না, মানুষকে দেবতা করে না তা কি আবার ধর্ম ?…হিন্দুর ধর্ম এখন ভক্তিমার্গে নেই, জ্ঞানমার্গে নেই—আমাদের ছুঁৎমার্গ। খালি আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। কিংবা তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, আমার দেশের একটি কুকুরও যতক্ষণ অনাহারে থাকিবে, ততক্ষণ আমার সমগ্র ধর্মের কর্তব্য হইবে তাহাকে খাইতে দেওয়া।"… "ভারতের কোটী কোটী আর্ত নরনারী শুষ্ককণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদের প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।"

আবার বললেন ঃ এই জাতি ডুবছে। লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ আমাদের মাথায় রয়েছে……লক্ষ লক্ষ লোক—যাদের আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলেছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করেছি, যাদের বিরুদ্ধে আমরা 'লোকাচারের' মতবাদ আবিষ্কার করেছি, যাদের আমরা মুখে বলেছি সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু তা কাজে পরিণত করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি। C. W. voll III. 431. p. "ধর্মের নামে জনসাধারণকে যে শোষণ করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে এই নির্মম সত্য উন্মোচন করে দেখিয়ে বললেন ঃ হিন্দুধর্মের মতো আর কোনো ধর্মই এত উচ্চতালে

মানবতার মহিমা প্রচার করে না। আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়। জগতে আর কোনো ধর্ম এরূপ করে না। C. W. V. v 15p. 'সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ। ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো?

তোমরা তাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' করো। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ঘুরছেন ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' এমন সনাতন ধর্মকে কি ক'রে ফেলেছে। এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। বা ও র / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ৩৮৯ পৃ। পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। নিজের ভাইকে নীচে নামিয়ে কেউ কি নিজে অধঃপতন এড়িয়ে থাকতে পারে? আর [আমাদের] পূর্বপুরুষদের আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য এই যে, বিশ্বজগৎ এক। কোনোমানুষ নিজের কিছুমাত্র অনিষ্ট না করে কি অন্যের অনিষ্ট করতে পারে? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার সমষ্টি অপমানে চক্রবৃদ্ধিহারে তাদের উপরই ফিরে এসেছে, এই হাজার বছরের দাসত্ব ও অপমানে তারা অনিবার্য কর্মফলই ভোগ করছে।—আমার ভারত অমর ভারত / ১২পৃ। শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তার হীনত্ব জ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হয়েছে, তাদেরকে শেখানো হয়েছে—তারা কিছুই নয়। সর্বত্র সাধারণ মানুষকে চিরকাল বলা হয়েছে তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাদেরকে এইভাবে ভয় দেখানো হয়েছে; ক্রমশঃ তারা সত্যি সত্যিই পশুস্তরে নেমে গেছে। তাদেরকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনতে দেওয়া হয় নি। আমার ভারত অমর ভারত / ১৩পৃ। আরো স্পষ্ট প্রত্যয় ঘোষণা করলেন স্বামীজীঃ যে ধর্ম বা যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একটুকরো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। মতবাদ যত বড়ই হোক, যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই তাতে থাকুক, যতক্ষণ তা মত বা বইয়েই আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে আমি ধর্ম নাম দিই না। চোখ আমাদের পিঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সামনে এগিয়ে যাও, আর যে ধর্মকে তোমরা নিজের ধর্ম বলে গৌরব করো, তার উপদেশগুলো কাজে পরিণত করো।—আমার ভারত অমর ভারত / ১৩৬পৃ। ধর্ম ও জীবনের নতুন সংজ্ঞা উপস্থাপিত করলেন স্বামীজী ঐ জনগণের চূড়ান্ত দুর্দশা নিজের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে একান্তভাবে অনুভব করে পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বইজন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যার হৃদয়ে প্রেম নাই সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব

করো, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হোক, মাথা ঘুরতে থাকুক, তোমাদের পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হোক।—আমার ভারত অমর ভারত ১৩৭-১৩৮ পৃঃ। পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা 'আমার মুক্তি, আমার মুক্তি করে দিনরাত মাথা ভাবায় তারা 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়। বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড ৩৯২ পৃ। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম ভেদ-দর্শনই পাপ। বাণী ও রচনা /১০ম খণ্ড ৩৩১ পৃ। গণজাগরণের মাধ্যমেই যেহেতু জাতীয় সংহতি সম্ভব. তাই এই সব প্রাণমন্ত্র স্বামীজী দিয়ে গেছেন জনগণকে ও তাদের সেবকদের।

উচ্চবর্ণের অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা, ধনবান সচ্ছল, বিনা শ্রমে যারা জমিদারী ভোগ করে এসেছে এতকাল অত্যাচারে অপমানে যারা শোষণ করে এসেছে—মুর্খ, দরিদ্র চণ্ডাল ভারতবাসীদের, বিলাসব্যসনে ডুবে থেকে যারা রক্ত শোষণ করে এসেছে অসহায় দরিদ্র নিরন্ন মানুষের, তাদের পুঞ্জীভূত পাপের এবারে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অনিবার্য ভাবে। এই হল মহাকালের নির্মম নির্দেশ। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্ন-বর্ণের মানুষদের ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রেখে এসেছে এতকাল, অবিরাম অপমানে নির্যাতনে হরণ করেছে তাদের মনুষ্যত্ব। আজ তাদেরও নেমে আসতে হবে সেই নিম্নে। নইলে তাদেরও কোনো পরিত্রাণ নেই। একথা বার বার উচ্চারণ করে গেছেন স্বামীজী জাতির কাছে। আমাদের সকল অধঃপতন দুর্দশার জন্য তারাই দায়ী। বিদেশী লুণ্ঠনব্যবসায়ী পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের হাতে ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্যও প্রায় সমভাবেই দায়ী এই তথাকথিত অভিজাত উচ্চবর্ণের মানুষেরা ও ধণিকশ্রেণী—যাদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অত্যাচারে অন্ত্যজ নিম্নবর্ণের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখের ও লাঞ্ছনার শেষ নেই। ধর্মে কর্মে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে সাহিত্যে যে ভারতবর্ষ একদিন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অর্জন করে নিয়েছিল···আজ তার এই অধঃপতন কেন, কেন এই দুশো বছরের পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল? কারণ অপমান করেছি আমরা জনসাধারণকে, অস্বীকার করে এসেছি তাদের সকল মানবিক অধিকারকে, পশুর মতন জীবন ধারণে যাদের বাধ্য করেছি আমরা নানা রকমের অত্যাচারে উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত করে—ইতিহাস তার নির্মম প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এসেছে। যারা জাতির চিরন্তন শক্তির উৎস, তাদের নির্দিষ্ট করে পায়ের নীচে দাবিয়ে রেখে আমরা নিঃশব্দে হত্যা করেছি, রুদ্ধ করে দিয়েছি শক্তির সহজ উৎস। কিছু ডিগ্রিধারী শিক্ষিত লোক কিছু সংখ্যক বড়লোক আর কিছু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নিয়ে একটা দেশ কখনো গড়ে উঠতে পারে না। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে না তুললে, মানুষের মর্যাদায় তাদের সমাজের ভূমিতে পুনর্বাসন না ঘটালে জাতির মুক্তি নেই। তাই

স্বামীজী অকম্প্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা-ই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। আমার ভারত অমর ভারত / ৯ পৃঃ। ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য —বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা পাচ্ছে না। বা. ও র / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ১০৬ পৃঃ। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপীদের সাহায্য করবার কোনো বন্ধু নেই। তারা যতই চেষ্টা করুক, তাদের উঠবার উপায় নেই। তারা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর নৃশংস সমাজ তাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করছে, তার বেদনা তারা বিলক্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু তারা জানে না—কোথা থেকে ঐ আঘাত আসছে। Letters p. 40। পুনর্বার উচ্চারণ করলেনঃ ভারতের সমস্ত দুর্দশার মূলে—জনসাধারণের দারিদ্র্য।…পুরোহিত শক্তি ও পরাধীনতা তাদের শত শত শতাব্দী ধরে নিষ্পেষিত করছে, অবশেষে তারা ভুলে গেছে যে তারাও মানুষ। আমার ভারত অমর ভারত ৯ পৃঃ। আবার বললেনঃ সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল হইবে।…নিপুণ ঐতিহাসিকের নির্ভুল দৃষ্টিতে আমাদের জাতীয় অবনতির যথার্থ কারণ বিশ্লেষণ করে কীভাবে এগোতে হবে সে পথেরও সন্ধান দিলেন স্বামীজীঃ স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনো মতে চলে না, আত্মরক্ষ পর্যন্ত অসম্ভব। বা ও র ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪২-২৪৩ পৃঃ। সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতি যোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। বা ও র / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ২৩৮ পৃ। সমাজ-সংহতির এর চেয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর হতে পারে না। পরবর্তী কথাগুলি স্বামীজীর নিজস্ব ভাষায় এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারেঃ মনে রাখবে-দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। …জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাদের তুলতে পারো? তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে কি তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পারো? আমার ভারত অমর ভারত ১৭ পৃ। আমাদের অধঃপতনের মূল কারণটা কী সে কথাটা স্বামীজী নানাভাবে নানা উপলক্ষে আমাদের বধির কর্ণকুহরে পেঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন যাতে এখনো অন্ততঃ আমরা প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পাই। পুনর্বার ঘোষণা করলেনঃ আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই হল আমাদের অবনতির

অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ ভালভাবে শিক্ষিত হচ্ছে, ভালভাবে খেতে পাচ্ছে, অভিজাত লোকেরা যতদিন না তাদের ভালভাবে যত্ন নিচ্ছে ততদিন যতই না রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক্ না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না। তারা আমাদের শিক্ষার জন্য (রাজকর হিসেবে) পয়সা দিচ্ছে, আমাদের ধর্মলাভের জন্য (শারীরিক পরিশ্রমে) মন্দির তৈরী করে দিচ্ছে। কিন্তু এই সবের বিনিময়ে তারা চিরকাল লাথিই খেয়ে এসেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হয়ে আছে। ভারতকে যদি পুনরুদ্ধার করতে হয়, আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য কাজ করতে হবে। আমার ভারত অমর ভারত ১৮ পৃ। এবং ভারতবর্ষের নিপীড়িত নির্যাতিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের জন্য—স্বামীজীর ভাষায় 'মূর্খ' ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী এবং চণ্ডাল ভারতবাসীর উন্নতির জন্য শুধু কথা নয়, রামকৃষ্ণ মিশনই পরাধীন ভারতে প্রথম দরিদ্র নারায়ণ সেবা প্রবর্তন করেন। বিবেক-সাহিত্যে জন বা গণজাগরণ প্রসঙ্গে একথাটাও অবশ্য স্মরণে রাখতে হবে। তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক দুই দিক থেকেই গণজাগরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—স্বামীজীর আগ্নেয় প্রেরণায় এবং উপদেশে। দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদের মহুল্লা গ্রামে কয়েকটি অনাথ বালককে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেবা কার্য শুরু হয়। এবং স্বামীজীর একান্ত প্রিয় "গাঞ্জেস" গঙ্গাধর মহারাজ বা স্বামী অখণ্ডানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের এই নর-নারায়ণ যজ্ঞের প্রথম ঋত্বিক। ঐতিহাসিকদের মতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ঠাকুরের অন্তরের অন্তরঙ্গ পার্যদ স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে সংঘটিত সেবাকার্য আরম্ভ হয়। কিন্তু আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। বস্তুতঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে বলরাম-বসুর গৃহে রামকৃষ্ণ মিশনের শুভ জন্মলগ্নের বহু আগে থেকে এই সেবাকার্যের পত্তন হয়। শ্রদ্ধেয় গবেষক শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" মহাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে—এই প্রসঙ্গ আনুপূর্বিক বর্ণিত আছে। উৎসাহী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে ১৮৯৪ থেকে—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে লেখা স্বামীজীর কয়েক খানি চিঠির কিছু উধৃতি প্রসঙ্গে এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হলে পূর্বযুগের সেবাকার্য, প্রকল্পের বৈচিত্র্য, পরিধি বিস্তার ও গণ-দেবতার সেবকদের আন্তরিকতার অন্তরঙ্গ চিত্রটি তাহলে কিছুটা অন্ততঃ পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হবে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেনঃ রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে।...খেতড়ি সহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম-উপদেশ করিবে; আর তাদের অন্যান্য বিষয়—ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর হে প্রভু রামকৃষ্ণ বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পারো। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ করো, বিদ্যাশিক্ষা দাও। ধর্ম, উপাসনা, জ্ঞান এই কর্ম করো

তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে,নতুবা সব ভস্মে ঘি ঢালার মতো নিষ্ফল হইবে।···গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় দিতে হইবে। পড়েছো, 'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।"

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (৪র্থ খণ্ড) থেকে জানা যায়—খেতড়িতে গোলা বা দাসজাতীয় চির-নির্যাতিতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করেই স্বামী অখণ্ডানন্দ ক্ষান্ত থাকেন নি, রাজস্থানের অন্যত্রও, যেমন নাথদ্বারা, চিড়ারো, লোহাগাড়, আলসিসর, মালসিসর, ঝুনঝুন, ওলগড়, খাণ্ডেলা, সুরযগড় প্রভৃতিস্থানেও নানা লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠানে যুক্ত থেকে স্বামীজীর প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে গণজাগরণের পথ উন্মুক্ত করে দেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠিত সেবাকার্য শুরু হয় স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবকতায়। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই কলকাতার আশেপাশেও তখনকার বিভিন্ন শহরতলীতে নানাভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবাকার্য শুরু হয়ে যায় অবশ্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। আলমবাজারে ওলাউঠায় আক্রান্ত পথের পাশে পড়ে থাকা মৃতপ্রায় এক বৃদ্ধাকে স্বামী অখণ্ডানন্দজী ঘরে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা করেন। খড়দার এক বনেদী গৃহস্থ বাড়ীতে তখনকার বিখ্যাত কথকঠাকুর গোলোক শিরোমণিকেও দেবতার মর্যাদা দিয়ে অসুস্থরোগীর শিয়রেসেবা করেছিলেন স্বামীজী। হুগলীর গ্রামে গ্রামে তখন ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ! বহু গ্রাম জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছিল। সেখানেও দেখি অসুস্থ রোগীর শিয়রে দরদী সেবকরূপে স্বামী অখণ্ডানন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতি। অন্নাভাবের সঙ্গে প্রবল জলকষ্টেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে তৃষ্ণার্ত নর-নারীকে অঞ্জলিকরে জলদান এবং অন্নদান করার জন্য কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর অবর্ণনীয় দুঃখভোগের স্বর্গীয় আশ্চর্য কাহিনী-কথাও আমাদের মনে পড়ে। আর দুর্ভিক্ষ কবলিত বিপন্ন বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদের পথে পথে সর্বস্বপণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সেবাকাহিনী সে তো ইতিহাস হয়ে আছে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের সূচনাপর্বে। প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রতিটি পদক্ষেপে চলেছিল যে দিনের পর দিন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুঃস্থ নিরন্ন আতুর জনের অন্তরঙ্গ সেবা—তার কোনো তুলনা নেই। স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা স্বামীজীর আর একখানি চিঠির (১৫ই জুন, ১৮৯৭ কিছু অংশ :

ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়।···সাবাস—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদ জানিবে। কর্ম কর্ম কর্ম আওর কুছ নাহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম—even unto death। দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্য ভয় নেই, টাকা উড়ে আসবে।···ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পেঁছাতে যদি নাম-ধাম সব রসাতলে যায়—অহো ভাগ্য মহোভাগ্যম।···It is the heart, the heart that conquers, not

the brain। পুঁথিপাতড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগ-ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলো সমান—প্রেমেই অণিমাদি—সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো —নরনারী শরীর নামধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। এই তো আরম্ভ, ঐরূপ আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবোনা।···লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোক দেবত্ব পায় কি না!···ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা করো।···আমি শীঘ্র plain-এ নাবছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়েমানুষের মতো বসে থাকা আমার সাজে! আর একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন (১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭) সঃ প্রত্যক্ষ এবং সর্বেষাং প্রেমরূপ—তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু। বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তিলাভ করুন—প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া-প্রেমের পুজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি। সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ অভীঃ।" স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে অখণ্ডানন্দ জীর প্রসঙ্গে আর একটি চিঠির অংশবিশেষ—শংকরীপ্রসাদের 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থ থেকে তাঁর নিজস্ব উক্তি সহ এখানে উধৃত করা হচ্ছে: ফিলজফি, যোগ-তপ-ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলামুলো—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম; পরোপকারই সর্বজনীন মহাব্রত—আবালবৃদ্ধবণিতা, আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে।'—এই পরোপকার-ধর্মের কিছু বিকাশেই বহরমপুর কেনা হয়ে গেছে, এই রকম যদি দশটা জেলায় করা যায় দশটাই কেনা হয়ে যাবে—এই সব বলে, স্বামীজী ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মাদ্রাজে রামকৃষ্ণানন্দ যেন ঠাকুর-পুজো-ফুজোতে বেশী টাকাকড়ি ব্যয় না করে শুধু জল-তুলসীর পুজো করে,ভোগের পয়সাটায় দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দেন। স্বামীজী তাঁর পুরোনো কথাটা আবার বললেন—তাঁদের আন্দোলন দারিদ্র্যের জন্যে। "কলিকাতায় মিটিং-এর খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে ঐ famine-এতে পাঠাও বা কলিকাতার ডোমপাড়া হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য করো।"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামীজী পরিকল্পিত দুঃস্থ-দুঃখী-দরিদ্রদের উন্নয়ন প্রযোজনা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-শিখ-জৈন সকল ধর্মের নিপীড়িত-নির্যাতীত বঞ্চিতদের নিয়েই স্বামীজীর জনজাগৃতির পরিকল্পনা ও কর্মসূচী। কারণ নিপীড়ন নিষ্পেষণের শিকার হয়েছে এদেশে সব ধর্মের মানুষই। এবং তাদের নিয়েই বৃহত্তর জনগণ। এবং যেহেতু সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরে পরিপূর্ণ মঙ্গলকলসেই দেশ-জননীর পুণ্যঅভিষেক একমাত্র সম্ভব, তাই ধর্ম-নিরপেক্ষ সকলের কাছে স্বামীজীর আবেদন। গণজাগরণের অঙ্গণে প্রাঙ্গণে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছেই ডাক পাঠিয়েছেন স্বামীজী। তাই জনগণসেবার সকল কর্মোদ্যোগে প্রথম থেকেই সকলের জন্য শুধু দ্বার উন্মুক্ত নয়, সকলকে সমবেত করার জন্যই স্বামীজীর মঙ্গল-শঙ্খের মহান নির্ঘোষ। ১৮৯৭

খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবরের চিঠিতে তাই স্বামীজীর সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ ঃ মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতি পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতব্রত হয়—এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলিয়া রাখো।" অন্য এক চিঠিতে (ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লেখা) এই সব দরিদ্র-নারায়ণ সেবার সকল কর্মোদ্যোগের নীতিগত দিকটা আরো স্পষ্ট করে নির্ধারিত করেদিলেন বহুবিখ্যাত সেই বাণীগুচ্ছের অমোঘ উচ্চারণে ঃ ভাগলপুরে যে-কেন্দ্র স্থাপনের কথা লিখেছ, সে কথা বেশ-স্কুলের ছেলেপুলেকে চেতানো ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের mission হচ্ছে অনাথ দরিদ্র, মূর্খ চাষাভূষোর জন্য। আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভূষোরা ভালোবাসা দেখে ভিজবে ; পরে তারাই দু-এক পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে mission start করবে ও ক্রমে ওদেরই মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে। কতগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে পড়তে শেখাও, ও অনেকগুলি ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের কি একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানাং—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves। ঐ যে চাষারা জল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার ও উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। তাছাড়া পয়সাওয়ালারা দয়া করে গরীবের কিছু উপকার করবে—তা চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভূষো মৃতপ্রায় ; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র। তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক দেখুক এবং করুক।"—অর্থাৎ আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় ও স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের পায়ে মাথা উঁচু দাড়িয়ে থাকার শক্তি অর্জনের মধ্যেই রয়েছে গণজাগরণের মূল মন্ত্রটি। এবং জীবনে জীবন যোগ করার অভিজ্ঞানে এই মহামন্ত্রের সাধন ও সংসিদ্ধি লাভ করলেই সম্ভব হবে জনজাগরণ এবং সম্পন্ন হবে যথার্থ জাতীয় সংহতি। এই কারণেই আমরা সমগ্র বিবেক-সাহিত্যের সর্বত্র বার বার শুনি এই মহামন্ত্রের উদাত্ত বিঘোষণা।

চিরনির্যাতিত ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লেখা পূর্বোক্ত ঐ চিঠিতে আমরা দেখতে পাই স্বামীজী সর্বমানবাধিকার থেকে প্রবঞ্চিত, দুঃস্থদুঃখী, অনাথ মেয়েদেরও মিশন-পরিচালিত আশ্রমে গ্রহণ করার এবং তাদেরও যথোপযুক্ত খাদ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এবং এই সমাজদেহ যদি একটি পাখী হয় তাহলে নারী ও পুরুষ তার দুটি ডানা। ডানা দুটির একটি ভগ্ন বা পঙ্গু হলে সে পাখী কখনো আকাশে উড়তে পারে না। এবং পরিণামে মৃত্যু অনিবার্য। একথা স্বামীজী এবং তাঁর গুরুদেব দুজনেই সম্যকরূপে জানতেন। "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই,

এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকর-স্বরূপ হইবে। বা ও র / ৭ম খণ্ড / ২৪৪ পৃ। ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কিনা! তাই এত করে তোদের ঐরূপ করতে বলি এবং মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততিদ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। বা ও র ৯ম খণ্ড / ২০৪-২০৫ পৃ। তাই তো দেখি গণ-উন্নয়নের প্রতিটি প্রকল্পে এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর স্বজাতি-সংগঠন ও নবনির্মাণের কর্মযোজনায় সব মানবিক অধিকার থেকে প্রবঞ্চিত, চিরনির্যাতিত নিপীড়িত নারী সমাজকে শুধু সম-মর্যাদায় সমান স্থান দিয়েছেন তাই নয়, নারীসমাজের সমুন্নতির পথের নানা অন্তরায় ও সমস্যা নিয়ে স্বামীজী গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে গেছেন। এবং তাঁর সেই সুগভীর চিন্তা-ভাবনার সমৃদ্ধ ফসল ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে আছে বিবেক-সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। স্বামীজী প্রথমে বললেনঃ ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো আর 'জাতি জাতি' করে গরীব লোককে পিষে ফেলা। বা ও র ৭ম খণ্ড / ২৫৩ পৃ। পুনর্বার শাক্ত কথাটির ব্যাখ্যা করে জানলেনঃ শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।···মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা (পাশ্চাত্যের লোকেরা) তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয় অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র। বা ও র / ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৮৮ পৃ। অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করে জাতিকে সতর্ক করে দিলেন স্বামীজী আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির (নারীজাতির) অবমাননা সেখানে বলে। বা ও র ৭ম খণ্ড / ৭৬ পৃ। স্বামীজীর চিঠিপত্র ও রচনাবলী থেকে এখানে আরো কয়েকটি উধৃতি উপস্থাপিত করা যেতে পারেঃ এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্ত শাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি? বা ও র / ৯ম খণ্ড ২০০ পৃ। আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর করো মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা! বা ও র / ৭ম খণ্ড ৯ পৃ। তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না। বা ও র / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ৩৮৯ পৃ। তোমরা কি মনে করো প্রতিটি নারীর অন্তরে যে দেবী রয়েছেন, তাঁকে মুহূর্তের জন্যও ছলনা করা যায়?

কখনই তা হয়নি, হবেও না কখনও। সেই দেবী সবসময় নিজেকে প্রকাশ করছেন। (পুরুষ মানুষের অন্তরের) যে কোনো ছলনা অনিবার্যভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়ে। সত্যের গৌরব, আধ্যাত্মিকতার আলো, পবিত্রতার মহিমা --সব কিছুই সেই দেবী নির্ভুলভাবে অনুভব করেন। আমার ভারত অমর ভারত / ৫৭-৫৮ পৃঃ। মেয়েদের পূজো করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজো নেই, সে-দেশ সে-জাত কখনও বড় হতে পারে নি; কস্মিনকালেও পারবে না। তোদের জাতের এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তি মূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।' যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরাপদে অবস্থান করে না, সে-সংসারের —সে দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে হবে। বা ও র ৯ম খণ্ড ২০০-২০১ পৃঃ। মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ —ভারতের কল্যাণ। বা ও র / ৯ম খণ্ড ২৯ পৃঃ।

বিপন্ন নিরাশ্রয় সমস্ত মানবিক অধিকার-চ্যুত নারীজাতি সহ, অস্পৃশ্য মেথর, চণ্ডাল-মুচি প্রভৃতি হীন জাতীয় 'মানুষ' শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি শ্রম-নির্ভর কোটী কোটী প্রায়-নিরন্ন, সকলের অবহেলিত দেশের বৃহৎ জনসমষ্টি নিয়েই জনগণ। এই সব চির নিষ্পেষিত, নির্যাতিত নিপীড়ত জনগণের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার জন্য শুধু মাত্র বেদনাবোধ ও অশ্রুমোচন নয়, কিংবা এই সব ব্রাত্যজনের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা-বলীর বিবৃতি মাত্র নয় এদের শুধু দিন যাপনের শুধু, প্রাণ ধারণের অসহায় জীবন-চর্চার কারণ বর্ণনা মাত্র নয়, পরন্তু এই সব বিপন্ন বিধ্বস্ত বঞ্চিত মানুষের বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্তিপথেরও সন্ধান দিয়ে গেছেন ব্রাত্যজন সখা স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথমেই ঘোষণা করলেন ঃ ভারতবর্ষের অ ঃপতনের প্রধান কারণ অতি স্বল্প সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর অভিজাত বর্ণের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ আবদ্ধ রাখা। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হয়েছে, তার মূল কারণ ঐটি –রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। বা ও র / ৭মখণ্ড ৩৭৪ পৃ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য এই যে. পাশ্চাত্য দেশে জাতীয়তাবোধ আছে, আর আমাদের তা নেই। অর্থাৎ শিক্ষা ও সভ্যতা এখানে (পাশ্চাত্যে) সর্বজনীন জনসাধারণ্যে অনুপ্রবিষ্ট। ভারতবর্ষে আর আমেরিকায় উচ্চবর্ণের মানুষের অবস্থা একই রকম, কিন্তু দুদেশের নীচুতলার মানুষের মধ্যে বিরাট ফারাক। ইংরেজের পক্ষে ভারত জয় করা এত সহজ হয়েছিল কেন? কারণ তারা সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তা ছিলাম না।...ত্রিশ কোটি অধিবাসীর দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কৃতীপুরুষদের উদ্ভবক্ষেত্র সংকীর্ণ –তুলনায়, পাশ্চাত্যের তিন, চার কিংবা ছয় কোটি মানুষের দেশ-গুলিতে সেই ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। এর কারণ, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।...আমাদের জাতীয় জীবনের এটি একটি বিরাট ত্রুটি এবং এই ত্রুটি দূর করতেই হবে। আমার ভারত অমর ভারত / ১২-১৩ পৃঃ। অন্যত্র

(পত্রাবলী / ৪র্থ সং / ১৯৭৭ / ৫৩৪-৫৩৫ পৃঃ) আবার তিনি লিখছেন যে, একমাত্র শিক্ষার বিস্তার করেই জনজাগরণ সম্ভব। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষে মানুষে সব ভেদাভেদ বৈষম্য দূর করা যায়। লিখলেনঃ কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা –জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonist (আইরিশ ঔপনিবেশিকগণ) আসিতেছে –ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ –সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। অর চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছমাস পরে আর এক দৃশ্য –সে সোজা হয়ে চলেছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নেই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishman-কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, "প্যাট (Pat), তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম! আজন্ম শুনিতে শুনিতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল। নিজেকে প্যাট্ হিপ্নটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবা মাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ। প্যাট্ ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন; স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ইত্যাদি।

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যা শিক্ষা হচ্ছে –তাও একান্ত negative (নেতিভাবপূর্ণ) –স্কুল-বালক কিছুই শেখে না, কেবল সব ভেঙে চুরে যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদ-বেদান্তের মূল মন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে শ্রদ্ধার লোপ। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি –গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায় শিক্ষার প্রচার। পরা ও অপরা দুই বিদ্যাই চাই।"

কীভাবে কোন কোন পদ্ধতিতে আমাদের আমন্ত্রিত জনগণকে শিক্ষিত করতে হবে তাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন স্বামীজীঃ আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য কেবল তাদের শিক্ষা দেওয়া ও তাদের হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলা।… তাদের ভাল ভাব দিতে হবে। তাদের চোখে খুলে দিতে হবে যাতে তারা জানতে পারে জগতে কোথায় কি হচ্ছে; তারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই করবে। প্রতিটি জাতি প্রতিটি নরনারীকে নিজের উদ্ধার নিজেকেই সাধন করতে হয়। বুদ্ধদেব আশীর্বাদ করেছিলেন শিষ্যদের এই বলে "আত্মদীপোভব" (নিজেই নিজের প্রদীপ হও, নিজের ক্ষমতায় জ্বলে ওঠো)। সকলকেই আত্মদীপ হতে হবে। তাদের কয়েকটি উঁচু ভাব দিয়ে দাও

—সেইটুকু সাহায্যই তাদের দরকার। অবশিষ্ট যা কিছু, এর ফল হিসেবে আপনিই আসবে। আমাদের কাজ কেবল রাসায়নিক পদার্থগুলিকে একত্র করে দেওয়া—তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগুলি দানা বাঁধবে। আমাদের কর্তব্য তাদের মাথায় কতকগুলো ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া। বাকি যা কিছু তারা নিজেরাই করে নেবে। ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার। আমার ভারত অমর ভারত / ২৫ পৃঃ। নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে এরকম সুস্থ সবল জনমত তৈরী হতে সময় লাগে—অনেক সময় লাগে। তার আগে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সুতরাং সম্পূর্ণ সমাজ-সংস্কার—সমস্যাটি এই দাঁড়ায়—সংস্কার যারা চায়, তারা কোথায়? আগে তাদের তৈরী করো।……কয়েকটি লোক মনে করল, কোনো একটা জিনিস মন্দ—সেই অনুযায়ী কিন্তু গোটা জাতিটা চলবে না।…প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও; …সমাজ সংস্কারের জন্যও প্রথম কর্তব্য হল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আমার ভারত অমর ভারত / ২৫ পৃঃ। যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাদের মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা॥ যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহাহইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। বা ও র / ৭ম খণ্ড / ৩৭৪ পৃঃ। জনসাধারণের এমন ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এমন সব কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। তাই স্বামীজী লিখলেন: জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হইবে না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান—চরিত্র, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষাবিস্তার। আমার ভারত অমর ভারত / ২৬ পৃঃ। আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন স্বামীজী: চাই ওয়েস্টার্ন সায়েন্সের সঙ্গে বেদান্ত; আর মূলমন্ত্র—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। …(চাই) স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর সায়েন্স পড়ানো; চাই টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইণ্ডাস্ট্রী বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে। বা ও র / ৯ম খণ্ড / ৪০১, ৪০৩ পৃঃ। এবং অতঃপর আমরা সামাজিক শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজীর ধ্যান-ধারণার কথা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নিতে পারি। মানুষের নিজের ভিতরেই যে পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তাও স্বামীজী প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে গেছেন। বললেন মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মন-যন্ত্রটিকে সুষ্ঠু ও সম্যকরূপে গড়ে তোলা এবং সেই যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করাই হল শিক্ষার আদর্শ। To be and to make যাতে character form (চরিত্র তৈরী) হয়। মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই। বা ও র /৯ম খণ্ড/

৪২৬ পৃঃ। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না--সে কি আবার শিক্ষা? যে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। বা ও র / ৯ম খণ্ড / ৩০৭ পৃঃ। স্বামীজী বলেছেন শিক্ষার সঙ্গে অবশ্যই ধর্মের যোগ থাকবে। ধর্মপ্রচারের সাথে সাথেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যা কিছু প্রয়োজন তা আপনিই আসবে। কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে লৌকিক বিদ্যা চিন্তার প্রয়াস ব্যর্থ হবে। ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী একটি আদর্শ পরিকল্পনা জাতির জন্য রেখে গেছেন। আর সব সময়েই একটি বিষয়ের উপর স্বামীজী বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন; তাহল এই যে, শিক্ষা অবশ্যই ইতিমূলক হওয়া চাই --কখনোই নেতি-মূলক কোনো শিক্ষা মানব সমাজের পক্ষে গ্রাহ্য হতে পারে না। আর যে শিক্ষায় মানুষের মন দুর্বল হয়ে পড়ে তেমন শিক্ষা সর্বথা পরিত্যজ্য। কোনো শিক্ষাপ্রণালী যদি মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করে ফেলে, কিংবা কুসংস্কারে আবিষ্ট করে তোলে তবে তা তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে। যদি কোনো উপদেশ দুর্বলতার শিক্ষা দেয় তাতে স্বামীজীর ঘোর আপত্তি। দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ঘটাতে হবে একই সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে। Head, Hart and Hand অর্থাৎ মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বাহুর যুগপৎ কর্ষণা ঘটাতে পারে এমন শিক্ষা চাই। আর সব দিক থেকে যাতে আত্মনির্ভর শীল হয়ে নিজের পায়ে নিজের দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করা যায় সেই শিক্ষাই একমাত্র সত্য শিক্ষা।

এবং অবশেষে বললেন যে, যে শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের দুরবস্থার প্রতিকার সম্ভব তাই হল একমাত্র আদর্শ শিক্ষা। বললেনঃ শিক্ষার বিস্তার জ্ঞানের উন্মেষ --এসব না হলে দেশের উন্নতি কী করে হবে? ...সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা না হলে কিছু হবার জো নেই। ...পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র-গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতি-পরায়ণ করতে হবে। ...যাঁদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। বা ও র / ৯ম খণ্ড / ২৮-২৯ পৃঃ। অতঃপর গণশিক্ষা প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন স্বামীজী তাঁর রচনাবলী—বিশেষ করে চিঠিপত্রের মধ্যে। বললেনঃ জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নতি করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা। ...সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যারা কুঁড়ে ঘরে দিন কাটায়, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান -প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে হয়ে তাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে, ধনীর পায়ের নীচে নিষ্পেষিত হবার জন্যই তাদের জন্ম। তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।...

কিন্তু কেমন করে অন্নহীন বস্ত্রহীন দরিদ্রকে, দুঃস্থকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে?

সেবক-কর্মীদের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাবে পথে অনেক অন্তরায় আছে, আছে অনেক অসুবিধে। এবারে স্বামীজী বয়স্ক ও (Informal) বিধি বহির্ভূত শিক্ষার কথা অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচে শিক্ষার কথা তুলে ধরলেন। বললেনঃ কিন্তু তাতেও অসুবিধা আসে।…যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয়ও খুলে দিতে পারি তবু দেখা যাবে, গরীব-ঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়তে আসছে না ; তারা বরং ঐ সময়টা জীবিকার্জনের জন্য হালচাষ করতে বের হয়ে পড়বে। আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ—না আছে এদের শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করবার ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটা নৈরাশ্যজনক বলে মনে হয়। কিন্তু আমি এরই মধ্যে একটা পথ বের করেছি! তা এই—যদি পর্বত মহম্মদের কাছে নাই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। দরিদ্র মানুষ যদি শিক্ষার কাছে না পৌঁছাতে পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে উৎসাহী না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, কী করে তা সম্ভব হবে? নিঃস্বার্থ সৎ ও শিক্ষিত শত শত ব্যক্তি আমি সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে পাব। এদেরকে গ্রামে গ্রামে প্রতি দ্বারে দ্বারে শুধু ধর্মের নয়, শিক্ষার আলোকও বহন করে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিধবাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগানোর গোড়াপত্তন আমি করেছি।

কোনো একটা গ্রামের অধিবাসীরা হয়তো সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরে এসে কোন একটা গাছের তলায় অথবা অন্য কোন জায়গায় জড়ো হয়ে গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছে। সেই সময় জন-দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাদের মধ্যে গিয়ে প্রাণক্ষেত্র সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোকচিত্র দেখিয়ে কিছু শিক্ষা দিল। এই ভাবে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিষই না শেখানো যেতে পারে।…চোখই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র দরজা তা নয়, কানে শুনে ও শেখার কাজ যথেষ্ট হতে পারে। এইভাবে তারা নতুন চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, নৈতিক শিক্ষালাভ করতে পারে এবং ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত ভাল হবে বলে আশা করতে পারে। ঐটুকু পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য—বাকিটুকু তারা নিজেরাই করবে। আমার ভারত অমর ভারত / ৫২-৫৩ পৃ। আমাদের দেশে হাজার হাজার দৃঢ়চিত্ত, নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তারা এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোককে ধর্ম শেখাচ্ছেন। যদি তাদের মধ্যে কতকগুলিকে সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায় তবে তাঁরা এখন যেমন এক জায়গা হতে অন্য জায়গায়, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধর্মশিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যাও শেখাবেন। মনে করুন, এরূপ দুজন লোক একটা ক্যামেরা, একটা গোলক ও কতকগুলো ম্যাপ ইত্যাদি নিয়ে কোনো গ্রামে গেলেন। এই ক্যামেরা ম্যাপ ইত্যাদির সাহায্যে তাঁরা অজ্ঞ লোকেদের জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শেখাতে পারেন। তারপর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পের মাধ্যমে

তাদের কাছে বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়ে তারা যা না শিখতে পারে তার চাইতে একশ গুণ বেশী এইভাবে মুখে মুখে শিখতে পারে। আমার ভারত অমর ভারত/ ৫৩ পৃ। আবার বললেন ঃ যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে। অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যা-শিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম। বাণী ও রচনা / ৭ম খণ্ড / ১০৮ পৃ।

নিম্নবর্ণের অচ্ছুৎ অশিক্ষিত ব্রাত্য পুরুষকেই শুধু নয়—,সঙ্গে সঙ্গে কথাকথিত হীনজাতীয়া অশিক্ষিতা, বর্ণজ্ঞানহীন নারীসমাজকেও সমানভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যথার্থ গণজাগরণের একটি অবশ্য-পালনীয় শর্ত -নারীকে শিক্ষার অধিকার দান। চৌত্রিশ বর্ণমালার প্রদীপ্ত দরজা নারীসমাজের জন্যও উন্মুক্ত করে দিতে হবে। নারী-জাতীর শিক্ষার জন্যও স্বামীজী তাই একটি সুচিন্তিত শিক্ষা প্রণালী রচনা করে গেছেন। নারীকে যথোপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের জাতীয় সমুন্নতি বা সংহতি কোনটাই করায়ত্ত হবে না। আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নতি ঘটাতে না পারলে আমাদের পুরুষদের পশু জন্ম ঘুচবে না—এ জাতীয় অভিশাপ তিক্ত বাক্যাবলী স্বামীজী বার বার উচ্চারণ করে আমাদের চেতনার অভিসঞ্চার করতে চেয়েছেন। লিখলেন ঃ ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই শরীরপালন এসব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়।...আবার কেবল পূজা-পদ্ধতি শেখালেই চলবে না ; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারী-চরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে। বা ও র / ৯ম খণ্ড / ৩৩ পৃঃ। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের সংযোগ রাখতে হবে অবশ্যই। তাই স্বামীজীর কঠোর নির্দেশ ঃ শিক্ষাই বলিস, আর দীক্ষাই বলিস, ধর্ম হীন হলে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য ব্রত-উদ্‌যাপন—এজন্য শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এপর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকে secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে। বা ও র / ৯ম খণ্ড / ২০৫ পৃঃ। প্রসঙ্গতঃ সাধারণ ভাবে গণ-শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত জরুরী কথা বললেন স্বামীজী—তাহল এই যে শিক্ষার বাহন হবে অবশ্যই মাতৃভাষা এবং তার মৌখিক চলিত রূপ। কারণ হিসেবে দেখালেন যে আমাদের

দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত বিদ্যা লিপিবদ্ধ থাকার জন্য বিদ্বান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে এসেছে। যুগের প্রয়োজনে এই কৃত্রিম ব্যবধান ভাঙতে হবে। এবং উদাহরণ হিসেবে স্বামীজী জানালেন যে বুদ্ধ থেকে চৈতন্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা লোকহিতায় লোকশিক্ষার জন্য নেমে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের কথ্য ভাষায় জনসাধারণকে লোক শিক্ষা দান করে গেছেন। এবং স্বামীজী আরো বললেন: ভাষার ব্যাপারে আমার আদর্শ আমার গুরুদেবের ভাষা—একেবারে কথ্য অথচ ভাবপ্রকাশে সম্পূর্ণ সক্ষম। আমার ভারত অমর ভারত / ৫৫ পৃঃ। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীর একটি শাশ্বত ধ্রুব আদর্শ তুলে ধরলেন নারীসমাজের কাছে। বললেন: হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। বা ও র / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ২৪৯ পৃঃ। ভারতের নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীল জননী। পুনর্বার ঘোষণা: প্রাচ্যের নারীকে প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে বিচার করা ঠিক নয়। প্রতীচ্যে নারী হলেন স্ত্রী, আর প্রাচ্যে নারী হলেন জননী।···নারীর সারা জীবনে এই চিন্তা তাঁকে তৎপর রাখে যে, তিনি মাতা। আদর্শ মাতা হতে গেলে তাকে খুব পবিত্র থাকতে হবে। আমার ভারত অমর ভারত / ৫৬ পৃঃ। বার বার স্বামীজী বলে গেছেন যে নারীজাতির সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। বললেন: (নারীদের) অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটি সমস্যাও নেই, 'শিক্ষা'-এই মন্ত্রবলে যার সমাধান না হতে পারে। বা ও র ৯ম খণ্ড / ৪০৪ পৃ। তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তারপর তারাই বলবে, কোন জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার। আমার ভারত অমর ভারত / ৫৯ পৃঃ। শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ-সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রানী কেমন ছিল! মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে। বা ও র / ৯ম খণ্ড / ৪০২ পৃঃ। ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালন—এসব বিষয়ে শেখার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উপর স্বামীজী খুব জোর দিয়েছেন: আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক, এ আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে যদি তা করতে হয়, তবে নয়। বা ও র / ৭ম খণ্ড / ৩৭৫ পৃঃ। ভারতীয় নারী-আদর্শের মূর্তরূপ সীতা। আবার অন্য দিকে আধুনিক নারীর আদর্শ শ্রীমা সারদা। এই দুই আদর্শের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বা আলোকিত সমন্বয় ঘটাতে হবে—স্বামীজী তাই চেয়েছিলেন। আর এই নারীসমাজের শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে পবিত্র চরিত্র নিঃস্বার্থ,

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কিছু সর্বত্যাগী সেবাব্রতী সন্ন্যাসিনীদের উপর। তাই সে ত্যাগী বৈরাগ্যদপ্ত নারীদের জন্য একটি স্ত্রীমঠ স্থাপনার পরিকল্পনা করেছিলেন স্বামীজী। আজ তা বাস্তবায়িত। কিন্তু স্বামীজীর জীবদ্দশায় তা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। এই স্ত্রী-মঠ থেকেই বের হবে স্বার্থত্যাগী কর্মী দল যাঁরা নারী জাতির সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে নতুন ভারতবর্ষে কর্মে ধর্মে মহীয়ান এক নতুন নারী সমাজ নির্মাণ করবেন। তাঁরাই হবেন নারী সমাজের পথ নির্দেশিকা। আরো স্পষ্ট প্রত্যয়ে ঘোষণা করে গেলেন যে নারীদের ব্যাপারে কোনোক্রমেই পুরুষদের খবরদারি করা চলবে না। "নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার" থাকবে একমাত্র নারী সমাজের হাতে। অর্থাৎ স্বামীজীর ভাষায় "নারীদের এমন যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে যাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করে নিতে পারে।

ভারতবর্ষ যে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বাস করে, গ্রামের উন্নতিই যে দেশের যথার্থ উন্নতি—এই রূঢ় বাস্তব সত্যও আমরা দেখেছি স্বামীজীর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু একথা আমরা শুনেও শুনিনি। গ্রামের উন্নতি-বিধায়ক কোনো পরিকল্পনা, কোনো কর্মযোজনা আমরা আজো গ্রহণ করিনি। অথচ খালি পেটে যে ধর্ম-কর্ম কিছুই হয় না—এই মহত্তম জীবন সত্য তো যুগগুরুর কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। বাস্তব জীবন সত্যেও একথাই বলে যে অনশন-ক্লিষ্ট দুর্বল জনশক্তি নিয়ে কোনো জাতি এগোতে পারে না। তাই স্বামীজী বললেন, "অন্ন অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি স্বর্গে আমাকে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে আর পৌরোহিত্যের পাপ দূর করিতে হইবে।" Letters 174 p.

যে জনগণ সমস্ত শক্তির মূল উৎস (স্বামীজীর ভাষায় শক্ত্যাধার) তাদের অন্ধকারের আবর্তে ঠেলে ফেলে মানবজাতির মুক্তি অসম্ভব। যে শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত সভ্যতার মূলে ভিত্তি তাদের অবমাননা সব চেয়ে বড় পাপ। ভারতের শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্য করে তাই তিনি বললেন, "হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি? কে ভাবে একথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন —তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়,

দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি! তোমাদের প্রণাম করি।' বাণী ও রচনা / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ১ম সংস্করণ / ১০৬ পৃঃ। এই সব শ্রমজীবী মানুষেরা, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনগণই যে সত্যিকার জাতির মেরুদণ্ড; তাদের বাদ দিয়ে যে কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই তিনি বলতে পারেন, "এই যে চাষাভূষো, মুচি মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করেছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা হা চাকরি, জো চাকরি করে করে লোপ পেয়ে যাবি।" বাণী ও রচনা / ৯ম খণ্ড / ১ম সংস্করণ / ১০৭ পৃঃ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে জাত্যাভিমানী তথাকথিত উচ্চজাতিদের সম্পর্কে স্বামীজীর তীব্র ভর্ৎসনা বাণী—"আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন-রাতই কর, আর যতই কেন তোমরা ডম্‌ম্‌ম্‌ বলে ডম্ফই কর তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বচ্ছরের মমি! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতের যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা।...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" বাণী ও রচনা / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ১ম সংস্করণ / ৮১-৮২ পৃঃ।

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ যথার্থই নবজাগরণ ছিল কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ একে বলেছেন আধখানা নবজাগরণ। কেউ বা বলেছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। কেউ কেউ একে বলেছেন বুর্জোয়া আন্দোলন। আমাদের নবজাগরণ সার্বিক কোনো সম্পন্ন ফসলে জাতির রিক্ত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে দিতে পারেনি—একথাও অনেকে বলেছেন। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের রূপ-রীতি—আদর্শ ও কর্ম প্রয়োগবিধি সম্পর্কে এই সব মন্তব্য ও অভিমত আংশিক সত্য হলেও বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্যগুলি অর্থহীন হয়ে গেছে। কারণ তখন এ আন্দোলনের চেহারাটাই পালটে গিয়েছিল। কারণ স্বামীজীর নব-বেদান্তবাদের আদর্শ সামনে রেখে এই আন্দোলন তখন থেকে যথার্থ অর্থেই জাতীয় আন্দোলনে রূপান্বিত হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর সমগ্র আন্দোলনই ঐ মূর্খ, দরিদ্র, নির্যাতিত নিপীড়িত নিরন্ন জনতা ও ইতরসাধারণকে নিয়ে। অবহেলিত এই জনগণের

উন্নতিই একমাত্র জাতীয় কর্তব্য ও লক্ষ্য রূপে তিনি ঘোষণা করলেন। বাইরে থেকে কিছু সমাজ সংস্কার বা ধর্মীয় রীতিনীতির পরিবর্তন করে জাতির মূল সমস্যার কোনো সমাধান সম্ভব নয় — একথা তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। কজন বিধবার বিবাহ হল বা কোন পদ্ধতিতে কতজন লোক কোন মন্দিরে উপাসনা করল বা ঘোমটা খুলে কতজন মহিলা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিল তার উপরে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে না। তাই স্বামীজী স্পষ্ট করেই বললেন, "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয়-জীবন গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজ সংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না — ক্ষতটি কোথায়। বিধবা বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোনো জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে?···সমস্ত ত্রুটির মূলেই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি -যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।" বাণী ও রচনা / ৬ খণ্ড / ১ম সংস্করণ। ৪৩৫ পৃঃ। স্বামীজী আরো বললেন ঃ "আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজ সংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা, 'ভদ্রলোক নামে প্রথিত ব্যক্তিরা হইয়াছেন এবং রহিয়াছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।" বাণী ও রচনা। ৭ম খণ্ড। ১ম সংস্করণ ৩২৬ পৃঃ। আবেদন-নিবেদনের বক্তৃতাসর্বস্ব সৌখিন রাজনীতি নয়, সতীদাহ নিরোধ-আইন বা বিধবাবিবাহ-আন্দোলন নয়, ধর্মসংস্কার বা সমাজহিতের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা নয়, ভারতের মূল জাতীয় সমস্যা ও সংকট হল ইতরসাধারণ মানুষের দারুণ দারিদ্র্য ও চরম অশিক্ষা। স্বামীজীই এদিকে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে এ জাতি বাস করে দারিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটিরে ; এবং সে দিকেই সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। তাই তিনি বললেন, "আমার মনে হয় এই জন-সাধারণের প্রতি উপেক্ষাই একটি জাতীয় পাপ এবং ভারতবর্ষের পতনের ইহাই অন্যতম কারণ। কোনোপ্রকার রাজনীতিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না যতদিন না ভারতের জনগণের শিক্ষা ও খাওয়া-পরার পুনরায় সুষ্ঠু সমাধান হইতেছে। তাহারা আমাদের শিক্ষাদান ও মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ দান করিতেছে অথচ পরিবর্তে পাইতেছে পদাঘাত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমাদের দাসত্ব করিতেছে। যদি আমরা ভারতের পুনরভ্যুত্থান কামনা করি তবে তাহাদের জন্য কাজ করিতে হইবে।" Complete works, Vol V (1964) pp 222-23. জাতির যথার্থ নবজাগরণ ঘটাতে হলে হৃদয়কে প্রসারিত করতে হবে ভারতের দুঃস্থ দুঃখী ইতরসাধারণের জন্য। এছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাদের সুখ দুঃখ স্বপ্নসাধনায় একাত্ম হয়ে-যেতে হবে। বস্তুতঃ ইতরসাধারণের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে যেতে ভারত-বর্ষের মাটিতে আজ পর্যন্ত আমরা কাউকে দেখিনি। জনগণের সমস্যা নিয়ে এমন করে ভাবতে এবং সমাধান করতেও আজ পর্যন্ত আর কেউ এগিয়ে আসেন নি!

দরিদ্রের পর্ণকুটীরের সঙ্গে এমন গভীর পরিচয়ও আর কারো ছিল না। তাই স্বামীজী দেশের কোটী কোটী নির্যাতিত নিপীড়িত জনগণের একজন হয়েই এই সব কথা এমন দরদ ও ভালোবাসার সঙ্গে উচ্চারণ করে গেছেন। তাই তিনি এযাবৎ ব্যর্থ নবজাগরণ আন্দোলনের শ্রেণী সচেতন অহমিকায় আক্রান্ত কর্মীদের হৃদয়ে অনুভব সঞ্চারিত করবার জন্য তাদের উদ্দেশ্য করেই যেন বললেন ঃ "তোমরা কি অনুভব কর যে ঈশ্বরের ও ঋষিদের লক্ষ লক্ষ বংশধরগণ পশুত্বে পরিণত হইয়াছে? তুমি কি অনুভব কর যে লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও অনশনে কালযাপন করিতেছে এবং যুগ যুগান্ত ধরিয়া অনশন করিয়া আসিতেছে? তুমি কি অনুভব কর সমগ্র দেশ অজ্ঞান অন্ধকারে তমসাচ্ছন্ন? ইহা কি তোমাকে বিনিদ্র ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে? হৃদয়স্পন্দনের সহিত একীভূত হইয়া ইহা কি তোমার শোণিত ও শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত? এই চিন্তা কি তোমায় উন্মাদপ্রায় করিয়াছে? এই একটি মাত্র চিন্তায় অভিভূত হইয়া তুমি কি তোমার নাম, যশ, স্ত্রী-পুত্র, সম্পদ, এমন কি দেহবোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছ?··· দেশপ্রেমিকের ইহাই সর্বপ্রথম কর্তব্য।" Complete Works, Vol III (1960) pp. 225—26। জনগণের দুঃখে বিগলিত, জনগণের স্বার্থে এরকম সর্বনিবেদিত মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের সাক্ষাৎ আমরা একবার মাত্রই পেয়েছি। স্বামীজীর মধ্যেই আমরা দেখেছি দেশপ্রেমিকের এই মহত্তম রূপটি।

এখানে একথাও স্মর্তব্য যে, দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় নিয়ে স্বামীজীর আগেও কেউ কেউ আলোচনা করেছেন, তবে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার এবং ভারতীয় ভূস্বামী ও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর অভিজাত বুদ্ধিজীবিদের হাতে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের অন্তহীন শোষণ, নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী এর আগে কেউ এমন করে তুলে ধরেন নি। ১৮৩১ সালে স্বয়ং রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের কৃষকদের উপর গুরু করভারের প্রতিবাদ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দাদাভাই নওরোজী এবং গোবিন্দ রানাডে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিগণ আমাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ প্রভাকর, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, তত্ত্ববোধিনী, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অর্থনৈতিক প্রবন্ধাবলীও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইতরসাধারণের অন্নহীনতা ও অশিক্ষাই যে সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের মূলীভূত কারণ তা এমন যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় এবং অনুভব দিয়ে স্বামীজীর আগে বা পরে কেউ কোনোদিন এত স্পষ্ট প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন নি। এবং অবশ্যম্ভাবী শূদ্ররাজত্বের কথাও স্বামীজীর আগে কারো চেতনায় ধরা পড়েনি। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির বলেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক নতুন যুগের আগমনী-সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। কারণ "সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা

ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।" বাণী ও রচনা / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ১ম সংস্করণ / ২৩৮ পৃ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ইতিহাসের নিয়মেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শূদ্রযুগ (proletariate dictatorship) আসছে।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর নিজের কথাই নিবেদন করা যাকঃ মানবসমাজ পরপর চারটে বর্ণের দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)। প্রতিটির শাসনকালেই রাষ্ট্রে দোষ-গুণ দুই-ই বর্তমান থাকে। পুরোহিত-শাসনে, বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে। তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের অধিকার-রক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে। তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শেখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাদানেরও না। এ-যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ-সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতরা মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ ; কিন্তু ক্ষত্রিয়রা এতটা অনুদার নন। এ-যুগে শিল্পের সামাজিক কৃষ্টির (culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। তারপর বৈশ্য-শাসন যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ। এ-যুগের সুবিধা এই যে, ব্যবসায়ীরা সর্বত্র যাতায়াত করে বলে আগের দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈশ্যযুগ ক্ষত্রিয়যুগের চেয়েও উদার—কিন্তু এই সময় কৃষ্টির অবনতি শুরু হয়। সর্বশেষে শূদ্র-শাসন-যুগের আবির্ভাব হবে। এ-যুগের সুবিধা হবে—এ-সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দের বিস্তার হবে। কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি হবে। সাধারণ শিক্ষার খুব প্রসার হবে ; কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ক্রমশই কমে আসবে। ...তবুও প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ রোধ করতে পারবে না। আমার ভারত অমর ভারত / ৩৬-৩৭ পৃ। এমন সময় আসবে, যখন শূদ্ররা তাদের শূদ্রসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো সঙ্গে নিয়েই প্রাধান্য লাভ করবে। অর্থাৎ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য-গুলো আয়ত্ত করে শূদ্রজাতি যেমন প্রধান হয়ে উঠছে সেরকম নয়...শূদ্র-প্রকৃতি এবং আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে সবদেশের শূদ্ররাই সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে। তারই পূর্বাভাষ পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে এবং সকলেই তার ফলাফল ভেবে আকুল। সোস্যালিজম্ এনার্কিজম, নিহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। আমার ভারত অমর ভারত / ৩৭ পৃ। হ্যাঁ, পৃথিবীর শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই এই, সেই হল শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট। চেয়ে দেখো, চীনের ভবিষ্যৎ মহান অভ্যুত্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার দেশসমূহের জাগরণ।...তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি আবরণের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি। ভগবানের আশীর্বাদে এই

অন্তর্দৃষ্টি আমি অর্জন করেছি। অধ্যয়ন করো এবং ভ্রমণ করো, তাই হল সাধনা। দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্‌রা যেমন নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তদনুরূপ পৃথিবীর ঘটনাবলীর গতিও আমার দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে। তোমরা আমার থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথম ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এই ভারত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ : স্বামী বিবেকানন্দ / ৩০৮ পৃঃ।

তিনি স্থির প্রত্যয়ে পুনর্বার বললেন :

"এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে,...শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে।" বাণী ও রচনা / ৬ষ্ঠ খণ্ড ১ম সংস্করণ / ২৪১ পৃঃ। তিনি জানতেন ভারতেও এই গণ-অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। একদিন এদেশে ব্রাহ্মণের রাজত্ব ছিল, তারপর এল ক্ষত্রিয়ের রাজত্ব ; ক্ষমতার অপব্যবহার করে, মানুষকে অপমান করে, জনগণকে উপেক্ষা করে, জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের পতন হল। এল বৈশ্যযুগ ; নির্মম শোষণ ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের ফলে বৈশ্যযুগেরও শেষ লগ্ন হল সমাগত। এবারে শূদ্ররাজত্বের অভ্যুত্থান অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু হিংসার পথে অকারণে মানুষের রক্তস্রোত বইয়ে ভারতের মাটিতেও গণবিদ্রোহ ঘটুক তা স্বামীজী চাননি। তাই তিনি তথাকথিত উচ্চবর্ণের জাতিগুলোকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন—এই সব মূক মূঢ় অসহায় নির্যাতিতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে, তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সহযাত্রী হতে। তাই তিনি বললেন : "দরিদ্রদেবো ভব. মূর্খদেবো ভব।" বললেন : মুচিমেথর চণ্ডাল দুঃস্থ দুঃখী দরিদ্র ভারতবাসীকে ভাইয়ের মত ভালোবাসতে, তাদের বুকে তুলে নিতে। শূদ্র রাজত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই এ দুর্ভাগা দেশকে অপমানিতের সঙ্গে একাসনে নেমে আসতে অনুরোধ করলেন। "সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ—" "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে" : ইতিহাসের নির্মম নির্দেশে কোথাও কখনো পরিত্রাণ মেলেনি প্রেমহীন অত্যাচারীর। কিন্তু স্বামীজীর সোনার ভারতবর্ষে সেই একই ইতিহাসের রক্তাক্ত পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য সকলের মধ্যে সেই মানুষের নারায়ণে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নমস্কার করে ঘরে তুলে নিতে চেয়েছিলেন।

যদিচ স্বামীজী সম্পর্কেও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা যায় : "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন। সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে। সবার পিছে, সবার নীচে সর্বহারাদের মাঝে।" তথাপি তাঁর প্রিয় সর্বহারাদের জন্য ইউরোপের মতো, চীনের অনুরূপ ভারতবর্ষেও হিংসার পথে, হানাহানির মধ্যে দিয়ে মানুষের রক্ত ঝরিয়ে,

মানুষকে খুন করে শূদ্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হোক—স্বামীজী তা চাইতেন না। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে শ্রেণীহীন সমাজ কাঙ্ক্ষিত থাকলেও শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী সংঘাত কখনোই চাননি স্বামীজী ; চেয়েছিলেন শ্রেণী-সমন্বয় বা শ্রেণী-সাম্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক শূদ্র-রাজত্ব —সকলের সহযোগিতা আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অন্তত তাঁর চিরপ্রিয় পরম আরাধ্য পুণ্যভূমি দেবভূমি মহান ভারতবর্ষের মাটিতে।

তাই তিনি অকপট চিত্তে জানালেনঃ যদি এমন রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের কৃষ্টি, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি, শূদ্রের সাম্যের আদর্শ —এই সব গুলোই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলো থাকবে না তা হলে তা একটা অদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?··· আর সব কটা প্রথাই (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শাসন) জগতে চলেছে এবং তাদের দোষ ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্তত আর কিছুর জন্যে না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও, শূদ্র-শাসনেরও, একবার পরীক্ষা হোক না কেন। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তারচেয়ে সুখ-দুঃখটা যাতে পালাকরে সবার মধ্যে ভাগ হতে পারে, সেটাই ভাল। জগতে ভাল-মন্দের সমষ্টি চিরকালই সমানে থাকবে ; তবে নতুন শাসন-পদ্ধতিতে এই জোয়ালটা (yoke) এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে পড়বে, এই পর্যন্ত। বাণী ও রচনা। ৭ম খণ্ড। ৩০১-৩০২ পৃ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণী—"The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China" (Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers (1961)—203 page) অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লব এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নব্য চীনের অভ্যুত্থান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বামীজীর অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রসঙ্গে তাঁর 'Patriot-Prophet' গ্রন্থে বলেছেন যে স্বামীজী যখন শূদ্র-অভুত্থানের আগমনী গেয়েছিলেন তখন রাশিয়ার লেনিন সর্বহারাদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের চিন্তাও করেন নি, চীনের মাওৎ-জে-তুঙ্-এর তখন পর্যন্ত অভ্যুদয়ই ঘটে নি।

অবশ্যম্ভাবী এই শূদ্ররাজত্বের রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনেই বোধ হয় প্রত্যহের মৌখিক ভাষাকে,যথার্থ গণবাণীকে, সাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন স্বামীজী। কথ্যভাষাকে সাহিত্যে সুপ্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামীজী যে শুধু পথিকৃৎ তাই নয়, আমাদের বহু ব্যবহৃত প্রত্যহের লৌকিক ভাষার মধ্যে তাঁর মতো এমন শক্তির ও গতির সঞ্চার করতে পারেননি কেউ। এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ এমন সবল এবং শক্তিসম্পন্ন, এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রত্যক্ষ ও মর্মভেদী এবং এত ধ্বনিময় বাংলা কথ্য-ভাষার একমাত্র তুলনা মেলে তাঁরই গুরু, ঠাকুরশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃতে'। স্বামীজীর 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি সাহিত্যকীর্তিগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যুগের প্রয়োজনেই একই বাংলাভাষাকে প্রথম গণরাষ্ট্রের আদর্শ ভাষায়

রূপান্তরিত করে গেলেন স্বামীজী। এবং ঐ একই কারণে স্বামীজীর সাহিত্য-সৃষ্টিতে লালিত্যের চেয়ে মননধর্ম এবং কল্পনার রামধনুছটার থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তুর প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করি। মানবাত্মার সর্বাত্মিক বন্ধন মুক্তির প্রয়োজনেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা। অন্যথায় তিনি যদি শুধুমাত্র কাব্য বা সাহিত্যসাধনা নিয়েও থাকতেন তাহলে আমাদের বাংলা সাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যরথী হতে পারতেন : এ মন্তব্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের। (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থের ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : ৩১ — ৩৬ পৃঃ)

শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপরও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ্যকরা যায়। তিনি লিখেছেন :—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" ইহা উপনিষদের বাণী নহে - বিবেকানন্দের···(পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা) উক্তির প্রতিধ্বনি। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' নামক কবিতায়। ···কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করছি : হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, / অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান / মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, / সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, / অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে / ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে ···তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে, । সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে ॥"—স্বামীজী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি (বহুপূর্বে) অনুরূপ উক্তি করেছিলেন। (পৃষ্ঠা···দ্রষ্টব্য) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কবিতাটি লিখেছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে : "শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার, / মানুষের নারায়ণে তবুও করোনা নমস্কার।" —এই 'মানুষের নারায়ণ'—যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'দরিদ্রনারায়ণ' হতেই উদ্ভূত তাহা অস্বীকার করা কঠিন। কারণ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যে সার্ধ তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমরা জানি তাহাতে 'জীবে শিব' বা 'দরিদ্র নারায়ণ'—এই দুইটি অনুভূতির উল্লেখ আছে—এরূপ প্রমাণ আমার জানা নাই। মহাত্মাগান্ধীর 'হরিজন' ও রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের নারায়ণ' এই দুটি সংজ্ঞাই যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সূচিত করে—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

স্বামীজীর মতো এমন দ্যাবা (পৃথিবী পরিব্যাপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং বিচিত্র পথগামী বহুমুখী প্রতিভা) পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এরকম বড় মাপের মানুষদের সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের বিচিত্র দিক নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা খুবই মুশকিলে পড়ি। অংশকে সমগ্র বলে বোঝাতে গিয়ে সবটাই এলোমেলো হয়ে যায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল অম্লান আত্মপ্রকাশকে তাঁর সমগ্র

বিশাল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঠিক যেন মেলাতে পারি না। এই কারণেই তাঁর সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

"Nowadays the youngmen imbibed with a smattering of Marxism call him a reactionary. In his lifetime the social reformers of the day called him a reactionary as well; because he did not advocate that only by giving widows to remarriage or making some inter-cast marriage and such like social reforms India's regeneration would be achieved. The desideratum according to him is to raise the masses, to educate them and to elevate them in the scale of advanced humanity." Patriot Prophet by Dr Bhupendra Nath Dutta.

বস্তুত স্বামীজী আমাদের জাতীয় জীবনের এবং বিশ্বজীবনের ও বিশ্বমানবতার এমন কোনো সমস্যা নেই যা নিয়ে আলোচনা করেন নি এবং আলোকসম্পাত ঘটাননি। মানবসভ্যতার আগামী দেড় হাজার বছরের পথ-নির্দেশ রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যে, তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর পত্রাবলীতে,তাঁর বহুমুখী বিচিত্রধারা কর্মের পরিকল্পনায়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে আধুনিক মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসার ও সমস্যার—সামাজিক, ব্যবহারিক, আত্মিক, অর্থনৈতিক—জৈবিক, শৈল্পিক, রাজনৈতিক—দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সঙ্গীত চারুকলা-সম্পর্কিত—এমনকি বিপ্লব বিলাস, খেলাধুলা, আসবাবপত্র, শিশুপালন, স্বাস্থ্য, জীববিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, বিবাহ, পরিবার-পরিকল্পনা—এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবন এবং অদৃশ্য জীবনাতীতের সব কিছু নিয়েই আলোচনা-সমালোচনা করেছেন এবং সমাধান নির্দেশ করে গেছেন।—কিন্তু এহো বাহ্য। এসবের চেয়েও তাঁর ব্যক্তিত্ব আরো অনেক বড়, বিশাল। সেই বিশাল ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়েই আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—তাই সমালোচক যথার্থই বলেছেন কোনো বাঁধা-ধরা ছকে ফেলে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা দুরাশা। তিনি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও প্রথম সচেতন সোস্যালিষ্ট অভিধায় চিত্রিত! সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের দুঃস্থ দুঃখী ইতর সাধারণের জন্য নিদ্রাহীন যন্ত্রণাবিদ্ধ রাত্রি যাপন করেন। মানুষের অপরিসীম বেদনা ও দুর্দশা দেখে অশ্রুপ্লাবিত হন। বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হয়েও তিনি আমাদের জাতীয়তার মহান উদগাতা এবং জাতির শৃঙ্খল-মুক্তির আন্দোলনেও পথিকৃৎ। আবার জাতীয়তাবাদের আদিগুরু হয়েও বিশ্বসৌভ্রাত্র ও শুদ্ধ আন্তর্জাতিকতার শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা। সচেতন সাহিত্যশিল্পী না হয়েও তাঁর সাহিত্য, তাঁর কাব্য-কবিতা—তাঁর পত্রাবলী, তাঁর বক্তৃতারাশি—মানুষের মনে আগুন জ্বালে। মানুষকে প্রবুদ্ধ করে। ঊর্ধ্বায়ত চেতনায় করে সমুত্তীর্ণ। এই সব আপাত বৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতার সমাধান করতে হলে যেতে হবে আরো মর্মের গভীরে। যেতে হবে তাঁর গুরুর কাছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও সাধারণ্যে স্বামীজীর প্রধান পরিচয়—তিনি একজন

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তবু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর এত সব জিজ্ঞাসা ও সমাধান-প্রয়াস কেন? এ কেনর উত্তর নিহত রয়েছে গুরুর সেই অসাধারণ উক্তিটির মধ্যেঃ "খালি পেটে ধর্ম হয় না"।

গণজাগরণের ব্রতে ব্রতী হয়ে গণমুক্তির জন্য আজীবন সর্বস্বপণ করার পশ্চাতে রয়েছে গুরু শিষ্যকে কেন্দ্র করে আরো একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। এখানে তা উল্লেখ না করলে গুরু-শিষ্যের জীবনবাণীকে, সামগ্রিকভাবে তাঁদের কুশলকর্ম প্রয়াসকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। রক্ত-মাংস-স্নায়ু-ধর্মে আক্রান্ত, নীচতা-সর্বস্ব আমাদের দিব্য চক্ষু দান করতে এই ঘটনাটি এবং উভয়ের দ্যাবা-পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত মহান বিশ্বরূপটির কিছুটা অন্তত আমাদের দৃষ্টির গোচরীভুত হতে পারবেঃ অধ্যাত্ম সাধনার পরম প্রাপ্তি নির্বিকল্প সমাধি গুরু-শিষ্য উভয়ের কাছেই চিরাকাঙ্ক্ষিত। এবং যে কোনো গুরু শিষ্যের এই পরমা প্রাপ্তিতে উল্লসিত হয়ে উঠবেন আনন্দে খুশীতে। এবং আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অজস্র আশীর্বাদে অভিনন্দিত করবেন শিষ্যকে। শিষ্য নরেন্দ্রনাথ গুরুর কৃপায় আস্বাদ লাভ করেছেন নির্বিকল্প সমাধির। গুরুর কাছে প্রার্থনা জানালেন এই আনন্দে ডুবে থাকবার। শুধু মাঝে মাঝে দেহধারণের জন্য অন্ন গ্রহণ আর সর্বসময় অতীন্দ্রিয় আনন্দে হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ কেমন গুরু? খুশী হয়ে আশীর্বাদ তো দূরের কথা, নির্মম ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন, ধিক্কার দিলেন শিষ্যকেঃ ছি ছি ছি, তোর মন এত ছোট! কোথায় ভেবেছি তুই বটগাছ হয়ে সকলকে ছায়া দিবি, ফল দিবি, আশ্রয় দিবি, তা না হয়ে হীন স্বার্থপরের মতো আত্মমুক্তি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। আত্মমুক্তি নয়, গণমুক্তির মহান প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবারে যে গণদেবতার মর্ত্যে অবতরণ। প্রেমের দেবতা—মানব প্রেমের মহান দায়ভাগ দুরূহ কঠিন ক্রুশদণ্ডভার তুলে দিলেন প্রিয় শিষ্যের স্কন্ধে। "নরেন লোকশিক্ষা দেবে"। লোকশিক্ষার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে গুরুর কাছ থেকে গণমুক্তি-সংগ্রামের মহান সেনাপতি-সর্বাধিনায়ক হয়ে বেরিয়ে পড়লেন আসমুদ্র হিমাচলের পথে প্রান্তরে, দেশে-দেশান্তরে। গণমুক্তিই যে এবারের একক অন্বিষ্ট এই যুগ্ম যুগদেবতার। বিশ্বব্যাপী সকল ব্রাত্যজনের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি চাই। কোথায় আছে ত্রিশ কোটী মানুষের উজ্জ্বল উদ্ধার?

এখানে আবার স্মরণ করব ঠাকুর-প্রদত্ত অনুপম সেই বেলের তুলনাটিঃ

"বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তাহলে যে ওজনে কম পড়বে।"—

বুঝলেই ভগবান, চোখ মেললেই নেই।"—এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই বিবেকানন্দের কণ্ঠে উৎসারিত হল নতুন যুগের প্রাণবার্তা ঃ—

"......May I be born again and again, and suffer thousands of miseries so that I may worship the oniy God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls—and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship." Complete works/Vol. V (1964) 136 p. "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি।"—বাণী ও রচনা। ৭ম খণ্ড। ১ম সংস্করণ। ৩৬৪ পৃঃ। স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে চেয়ে আর্ত মানবতার কথা স্মরণ করে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ "যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রু মোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।" বাণী ও রচনা। ৬ষ্ঠ খণ্ড। ১ম সংস্করণ। ৫০৪ পৃঃ। বললেন ঃ "আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি...সর্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের কথা শোনাইয়া কোনো লাভ নাই।" Vivekananda –A Biograply by Swami Nikhilananda (1953) 55 page. "তুমি যদি নিজের মুক্তি খোঁজ, তবে তুমি নরকে যাইবে। তোমাকে খুঁজিতে হইবে অপরের মুক্তি। ...যদি অপরের জন্য কাজ করিয়া তোমাকে নরকে যাইতে হয়, তবে নিজের মুক্তি খুঁজিয়া স্বর্গে যাইবার অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক বেশী। "The life of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Disciples (1960) 630 page. ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ গুরুর কাছে এই জগৎ এবং জীবনও পরম সত্যরূপেই প্রতিভাত। বাস্তব জীবনের দুঃখ-ব্যথা-দারিদ্র্য মায়ামাত্র নয়। পরন্তু সমস্ত মানুষ, সমস্ত প্রাণ সেই বিশ্বময়ীরই রূপ। সেরূপেই তাঁকে সেবা করো। পূজা করো। তাঁর গুরুর এ উপদেশ শিরোধার্য করলেন শিষ্য। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, সর্বাত্মক বন্ধন-মুক্তিই শেষতম কৃত্য হলেও আগে মানুষকে মানুষের মত খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এবং এ কাজ শুরু হবে গৃহাঙ্গন থেকে। এবং সেভাবেই তাঁর পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন এবং ধাপে ধাপে সর্বাত্মক মুক্তির পথে তাঁর পদক্ষেপ।–ইহ এবং পর এই দুই নিয়েই যে জীবনে সমগ্রতা—সম্পূর্ণতা। তাই গুরু বলতেন, "আমি নিত্যেও আছি, লীলায়ও আছি।" অর্থাৎ দৃশ্যমান এই প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন-সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে, নারীকে "নরকের

দ্বার" ঘোষণা করে শুধু তথাকথিত অলৌকিক অধ্যাত্মসাধনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে স্থান পায়নি কোনোদিন। ভূমাচেতনা এবং মানুষের অন্তর্নিহিত অখণ্ড অব্যয় পরম সত্তার অপাবৃতি জীবনের চরম পরম উদ্দেশ্য—একথা মানলেও স্বামীজীর সঙ্গে, এমন কি তাঁর গুরুর সঙ্গেও অন্যান্য সাধু-সন্তদের অনেক পার্থক্য। অন্যান্য সাধু-সন্তদের মত পরমার্থ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেও—স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী তাঁর সাহিত্যকর্ম—বক্তৃতাবলী—চিঠিপত্র এবং কর্ম-যোজনা—শুধুমাত্র ওখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বলা চলে জগৎ ও জীবনের সমস্ত প্রসঙ্গই সমমর্যাদায় তাঁর অখণ্ড কর্মযোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সাহিত্যকর্মেরও অন্তর্গত। প্রত্যক্ষ পরিচিত ব্যক্ত জীবনের এই যে কোটি কোটি মানুষ "পোকার মত কিলবিল করছে" এদের দুঃখ-দৈন্য-যন্ত্রণা-অভাব-অপ্রাপ্তি—তার কথাও যে ভাবতে হবে—কারণ তার সমাধান-সাধনাও যে যথার্থ ধর্মের অনন্য কৃত্য। তাই বিপন্ন বিধ্বস্ত মানবতার কথা খুব স্বাভাবিকভাবেই বিবেক-সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেয়েছে। বহুরূপে সম্মুখে স্থাপিত যে ঈশ্বর, সামগ্রিক আত্মসমর্পণে তাঁর পূজা পদ্ধতিই—বিবেক-সাহিত্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। অর্থাৎ বেদান্তের সামগ্রিক সম্প্রয়োগের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বিবেক-সাহিত্য ও বিবেক-চরিত্রের সমস্ত আপাত বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্যের একক সমাধান। তাই শুধুমাত্র মুমুক্ষু অধ্যাত্মরস-পিপাসুদের জন্যই তিনি কলম ধরেন নি। সকল মানুষের সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তিই যেহেতু তাঁর আদর্শ এবং ভারতবাসীকে স্বধর্মে এবং স্বভূমিতে স্থাপনাও, তাই সার্বিক জীবন রচনায় দায়বদ্ধ হয়েই স্বামীজীকে দেশের ও বিদেশের সর্বস্তরের সকল মানুষের কথাই ভাবতে হয়েছে—বিশেষ করে দুঃস্থ আর্ত নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের দেহ-মন ও হৃদয়-যন্ত্রণার কথা। এবং যন্ত্রণা-দুঃখ-মুক্তির সমাধান।

নবজাগরণের সার্থক রূপকার হিসেবে সকল মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি ও কল্যাণের যে প্রেরণায় স্বামীজী সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, গুরুর যে আদর্শ বুকে করে বাইরে তিনি ভারত কথার প্রচারক এবং দেশে আধুনিক ভারত-চিন্তার সংগঠক ও নতুন ভারতবর্ষের স্রষ্টা, সেই একই প্রেরণা তাঁর হাতে কলম তুলে দিয়েছিল। এই একই লোকহিত ও জগদ্ধিতায় বহুজনসুখায় কর্মপ্রেরণা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে উত্তীর্ণ করেছিল একই সঙ্গে কবিকর্মী-লেখক-বাগ্মী ও প্রচারকের ভূমিকায়। সমালোচকের ভাষায় "এই সংগঠনব্রতী কর্মনিষ্ঠার জন্যেই বাংলা ভাষায় কখনোই তিনি ঠিক সাহিত্তিক হতে চান নি। ইংরেজীতেও তিনি ঠিক সাহিত্যিক নন। তাঁকে বাগ্মী ও ব্যাখ্যাতা বলাই শ্রেয়।...ইহ জীবনে সাহিত্যই যে তাঁর অভিব্যক্তির প্রধান দিক ছিল না, সাহিত্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি আনুষঙ্গিক দিকমাত্র, এই সত্যটি সর্বদাই স্বীকার্য। মূলতঃ তিনি সত্য-সাধক।" তা সত্ত্বেও তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে যে সামান্য পরিমাণ রচনা করেছেন (প্রাচ্য পাশ্চাত্য ১৯০২, বর্তমান ভারত ১৯০৫, পরিব্রাজক ১৯০৬, ভাববার কথা ১৯০৭, কয়েকটি বাংলা গান এবং ইংরেজী ও বাংলা

ভাষায় কিছু চিঠিপত্র, কাব্য কবিতা এবং তাঁর বক্তৃতাবলী—) তার মধ্যে যে যথার্থ মহৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে তার কোনো তুলনা নেই। বিবেক-সাহিত্যের এই গুণগত উৎকর্ষ স্মরণ করেই ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "If Narendra Nath Datta had not been Swami Vivekananda, Bengal might have one more addition to the large number of her good poets of the nineteenth century."—সিংহশাবক ও মেষপালের গল্পটি পুনর্বার স্মরণ করতে বলি পাঠকদের। গল্পের সিংহ-শাবকের মতোই অবক্ষয়ের অতল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত আত্মভ্রষ্ট ভারতবর্ষকে তার বিস্মৃত আত্মমুখ দেখানোর সাধনাই ছিল স্বামীজীর—একথা আগেই বলেছি। আমাদের নবজাগরণের অনন্য রূপকার বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যেরও ছিল ঐ একই কৃত্য। বস্তুতঃ সমগ্র বিবেক-সাহিত্যই জাতির আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি ফিরিয়ে আনার মহান উদ্বোধনী সঙ্গীত। "Sinners? It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up O Lions, and shake off the delusion that you are sheep." জাতির কাছে—এই আশ্বাসবাণীই বিবেক-সাহিত্যের অনন্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিঘোষণা। এবং বিশ্বমানবতার কাছেও বিশ্বৈক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত এক শাশ্বত পরিকল্পনায় নব জীবনরচনার অমল উদাত্ত অঙ্গীকার। "Never forget the glory of human nature. We are the greatest god that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I am" Complete works / Vol VII. (1958) 78 page. এই "I am He"-র সাধক বিবেকানন্দের কাছে জীবনও ইহ-পরত্রের সম্বন্ধ সমাহার। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক মিলিয়েই তিনি এক মহাসঙ্গীতের স্বরলিপি রচনায় মগ্ন ছিলেন সমস্ত জীবন ধরে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য-জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্যই লিখিবেন।" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সৃষ্টির দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন (১) দেশের বা মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন এবং (২) সৌন্দর্য সৃষ্টি। স্বামীজী মনুষ্য জাতির মঙ্গলসাধন—বিশেষ করে নির্যাতিত নিপীড়িত দুঃখী আর্ত মানবতার সর্বাত্মক কল্যানব্রত উদযাপনের জন্যই কলম ধরেছিলেন। কিন্তু এই প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়েই নিজের অজ্ঞাতে এমন সৌন্দর্য-সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে, যা পেশাদার সাহিত্য-স্রষ্টার পক্ষেও একান্ত দুর্লভ। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "style is the man." Style এর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। তবে এককথায় style বলতে আমরা বুঝি লেখকের চারিত্র্যশক্তি। এই চারিত্র্য শক্তির দুর্লভ অধিকার অর্জন করা লেখকের পরম প্রাপ্তি এবং বলা বাহুল্য, অর্জনসাপেক্ষ। কিন্তু কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মত বিবেকানন্দের style তাঁর সহজাত হয়ে দেখা দিয়েছিল। ব্যক্তি-

জীবনে তাঁর সেই প্রদীপ্ত পৌরুষ, বীর্য-সাহস, কর্মদীপ্ত শুদ্ধ যৌবনের উদ্দামতা, ত্যাগ-তিতিক্ষাময় অমল শুভ্র চরিত্র—সবই যেন তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়ে ধরা দিয়েছে। গোটা মানুষটা যেন তাঁর উদাত্ত বিশ্বরূপে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাঁর রচনায় তাঁর কথোপকথনে, তাঁর বক্তৃতাবলীতে। একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সার্থক বাণীশিল্পীর পক্ষেই এই অসাধারণ গুণটি অর্জন করা সম্ভব। বিবেক-সাহিত্যে সেই আশ্চর্য দুর্লভের সহজ সমারোহ। সাহিত্যিক হিসেবে এখানেই স্বামীজীর অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব।

কেবল সার্বিক জীবন রচনা, ধ্যানপ্রকল্প, কর্মযোগের অসাধারণ অনন্য ব্যাপ্তিতে গভীরতায় এবং কর্মে পরিণত নব বেদান্তের সামগ্রিক সম্প্রয়োগে বনের বেদান্তকে ঘরে আনার প্রসঙ্গেই নয়, সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রেও তিনি কোনো কোনো বিষয়ে পথিকৃতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে। শুধু বক্তব্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তিতেই নয়, উপস্থাপনা ও আঙ্গিক-প্রকরণেও তিনি একক, অনন্য-সাধারণ। যথার্থ প্রধান অভিযাত্রীর এবং সার্থক পরিব্রাজকের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'সাধারণের বিশ্বাস যে প্রমথ চৌধুরীই 'সবুজপত্র' নামক মাসিক পত্রে কথ্যভাষার প্রথম ব্যবহার করেন। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই স্বামীজী 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গ্রন্থে কথ্য ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন।" শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর চলতি গদ্য আর বিবেকানন্দের চলতি গদ্যের ধাতুপ্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অকৃত্রিম সহজ প্রকাশে যে ভাষায় আমরা আলোচনা করি এবং মনে মনে চিন্তা করি—স্বামীজীর চলতি গদ্য তাই এবং তার style অনতিক্রান্ত।" শুধু দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নমূলক কর্মের মধ্যেই নয়, "নিজে সামান্য কয়েকটি কবিতা লিখেও এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির উপর সাহিত্যিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।" পূর্বেই উল্লিখিত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' কবিতায় "মানুষের নারায়ণে" কথা দুটির ব্যবহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপর স্বামীজীর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। স্বামীজী মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির কর্মযোজনায় আত্মনিবেদিত মহান সন্ন্যাসী এবং এই সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির প্রয়োজনেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পদপাত ঘটেছে। দুঃখী দুঃস্থ দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, মেথর ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীর সর্বাত্মক উন্নয়ন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রয়াস ও প্রচেষ্টার বিরাম নেই। অভ্রান্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তিনিই প্রথম শূদ্র-রাজত্বের কথা (Dictatorship of the Proletariates) উচ্চারণ করেছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটিরেই যে ভারতের প্রাণ এই তথ্যও তিনি প্রথম জাতির কাছে তুলে ধরেন। ইতিহাসের নিয়মেই—ইতিহাসের পথ ধরে শূদ্র-রাজত্ব আসছে—এও তিনি জানতেন। বোধ হয় এই শূদ্র-রাজত্বের জন্য নির্মিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনেই প্রত্যহের মৌখিক ভাষাকে, অর্থাৎ যথার্থ গণবাণীকে সাহিত্যের স্বর্ণ-

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন স্বামীজী। এসব কথা আগেই লিখেছি। চলতি ভাষার স্বপক্ষে কথা বললেও সাধু গদ্যও তিনি প্রয়োজন বুঝে ব্যবহার করেছেন। এবং তা খুব সার্থকভাবেই। অপূর্ব ভাষানৈপুণ্যে, শুদ্ধ আবেগের আত্মপ্রকাশে, বক্তব্যের মহত্বে ও মাধুর্যে 'বর্তমান ভারত'-এর অনেক জায়গা তো ঘন সন্নদ্ধ রসনিবিড় কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে একথা ঠিক যে বিবেক-সাহিত্য মূলতঃ মননধর্মী। একদিকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয় ভাব, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বপ্রেম। একদিকে কর্ম, অন্যদিকে ভক্তিবাদ। একদিকে জীবন-রস-রসিকতা, অন্যদিকে নির্দ্বন্দ্ব নিঃশ্রেয়স পরম এষণার অমল উপলব্ধি—এ সবই তাঁর সাহিত্যে আশ্চর্য এক সমন্বয় ও সমাহারে পুষ্পের মত স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর বক্তৃতাবলী ও পত্রগুচ্ছের ভিতরেও ঐ একই সত্য নানাভাবে প্রকাশ-তন্ময় হয়ে আছে।

সংস্কৃত ইংরেজী ও বাংলা—এই তিন ভাষাতেই স্বামীজী কবিতা রচনা করেছেন। দৃশ্যমান এই জগৎ ও জীবনকে তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দেন নি। বরং তাকে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অদ্বৈততত্ত্বের পরমার্থ চেতনায় প্রভাস্বর করে তার ঊর্ধ্বায়ন ঘটিয়েছেন। বেদান্তের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতাকে প্রত্যহের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত করে যে আশ্চর্য একটি সমন্বয় ঘটালেন এবং মানবকল্যাণের নানা পথে প্রবাহিত করে দিলেন,—সেই সব জীবন সত্যই বিবেকানন্দের কাব্য কবিতায় একটি ত্রিমাত্রিক ভাবসৌন্দর্যে প্রদীপ্ত ও মহান হয়ে আছে। জাতি-গঠন, জীবন রচনা ও বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, অথবা ভগিনী নিবেদিতা যাকে বলেছেন "double purpose—one of world moving and another, of nation making—"একদিকে দেশ ও জাতির নব জাগৃতি বা সর্বাত্মক বন্ধন মোচনের কর্মযোজনা, অন্যদিকে বিশ্বমানবের আত্ম-উন্মোচন বা মানবজাতির অধিমানসিক বা আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটানো—স্বামীজীর জীবনের দুটি পরম কৃত্যের প্রয়োজনেই একদিকে যেমন বিচিত্র কর্মোদ্যোগ, অন্যদিকে আবার আত্মোপলব্ধির মহৎ প্রেরণায় ধ্যান-তপস্যার প্রবর্তনা ও অধ্যাত্ম সাধনার নিদিধ্যাসনা—এই দুটি দিক নিয়েই স্বামীজীর সমগ্র জীবন। তাঁর গদ্য রচনা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী প্রভৃতি প্রধানতঃ প্রথম দিক নিয়েই। ঠিক তেমনি অধ্যাত্মসাধনা ও তপস্যা প্রসঙ্গে নানা জিজ্ঞাসা, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা—এই সব ছিল তাঁর কাব্য-কবিতার বিষয়বস্তু। ভাবসম্পদে এবং চিত্তপ্রসারণার ক্ষমতায় এবং আত্মস্বরূপ জাগৃতির নিবিড়তায় এগুলি উপনিষদের কাব্যমন্ত্রের মতই গভীর এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের একগুচ্ছ শ্রেষ্ঠতম ফসল।

স্বামীজীর পত্রাবলীর প্রসঙ্গে সমালোচক উল্লেখ করেছেন, "পরিব্রাজক জীবন থেকে তাঁর অগোচরেই চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাঁর ভাষা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎবহ হয়ে উঠেছে।" বস্তুতঃ স্বামীজীর সমগ্র রচনা ও বক্তৃতাবলী—সবই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎবহ বলে মানুষের বুকে এমন করে আগুন জ্বালে, এমনভাবে নাড়া দেয়। অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বিবেক-সাহিত্যের এখানে সেখানে। বস্তুতঃ এ ক্ষমতা—এই প্রাণের

উত্তাপ সঞ্চারণার ক্ষমতা ভাষার উপর নির্ভরশীল নয়, এ তাঁর নিজস্ব দুর্বার অথচ মহান চারিত্রশক্তির প্রকাশ। স্বামীজীর জীবনের মতোই তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও এই প্রাণের স্পর্শই মানুষকে এমন করে আকর্ষণ করে। এই প্রাণের আগুন—দিকে দিকে মানুষের মনে মনে ছড়িয়ে দেবার দুর্লভ ক্ষমতা বিবেক-সাহিত্যের মহা সম্পদ। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার—মৃতের বুকে প্রাণের স্পন্দন আনার যে সঙ্কল্প স্বামীজীর কর্মে ও তপস্যায়, তারই বাঙ্‌ময় বহিঃপ্রকাশ তাঁর সাহিত্যে। মা বলতেন, "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" স্বামীজীও জানতেন কেমন ভাবটি, কোন ভাষায় কী ভাবে, কার কাছে, কেমন করে পরিবেশন করতে হবে। তাই প্রয়োজনমত তিনি সাধু-চলিত দুই ভাষাই সমান কুশলতায় প্রয়োগ করে গেছেন। পরিহাস-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হিউমার, স্যাটায়ার, তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ—সবই তিনি স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে অসাধারণ নৈপুণ্যে অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করে গেছেন। একজন মহৎ সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে এখানেও তাঁর চূড়ান্ত কলাসিদ্ধি। দুরন্ত আশাবাদের সঙ্গে নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়, প্রচণ্ড গতিময়তার সঙ্গে তেজ-বীর্যের শক্তির সম্পন্ন সমাহার—বিবেক-সাহিত্যের প্রধান সুর বলে অনেকে মনে করেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও বলেছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম"। বিবেকসাহিত্যের একজন দীন পাঠক হিসেবে আমার কিন্তু বার বার মনে হয়েছে—"এ হো বাহ্য"। সব কিছুর অন্তরালে রয়েছে দয়ার্দ্র-চিত্ত করুণাঘন এক শুদ্ধ প্রেমিক হৃদয়। বিবেকানন্দ এ যুগে আমাদের মধ্যে যে জিনিষটির অভাব দেখে দুঃখ করেছেন, আবির্ভাব ঘটাতে চেয়েছেন আমাদের চেতনায়-চরিত্রে, বিবেকানন্দের সমগ্র আন্তর সত্তা সেই 'শ্রদ্ধা' দিয়ে গড়া। তাই বিবেক-সাহিত্য পড়তে পড়তে ভক্তির পুষ্প চন্দন সুরভি সব কিছু ছাপিয়ে পাঠককে যেন আবিষ্ট করে রাখে। একটি প্রসারিত প্রেমিকের মন রয়েছে সবার পশ্চাতে। তাই প্রেমের দৃষ্টির মোহন মাধুর্যে, শ্রদ্ধায় সমর্পণে, ভক্তির বিনম্র আত্মদানে অপরূপ হয়ে আছে সমগ্র বিবেক-সাহিত্য। তাঁর বিদ্রোহ ক্ষোভ বেদনা—তেজবীর্য—তেজস্বিতা, সিংহবিক্রম, নির্ভীকতা-সাহস-কর্মময়তা, প্রচণ্ড রজোগুণ, ধৈর্য-অধ্যবসায়, নির্ভয় যোদ্ধৃভাব—সবই মনে হয়, ঐ প্রেমের উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে। "শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবন সত্য সার / তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার। / মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, / ত্যাগ-ভোগ-বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম' 'প্রেম'—এইমাত্র ধন। / জীব ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূতপ্রেত আদি দেবগণ / পশু-পক্ষী-কীট-অণুকীট—এই প্রেম হৃদয়ে সবার।" বিবেক-সাহিত্যের কবিত্বগুণ, প্রাণধর্ম ও লাবণ্যময়তা এই সব শক্তিই আত্মপ্রকাশ করেছে এই প্রেমের হাত ধরেই। দেশ ও জাতির প্রতি প্রেম, সমগ্র মানবতার জন্য, বিশেষ করে দুঃখী-আর্ত মানবতার জন্য (suffering humanity) অপরিসীম বেদনাবোধ এবং উদ্বেলিত প্রেম। এই প্রেমের প্রেরণাই তাঁকে বার বার নিয়ে গেছে নির্যাতিত নিপীড়িত নিরন্ন আর্ত মানবতার

পাশে, এই প্রেমের অভিঘাতেই নিপীড়িত নির্যাতিতের বন্দনা গানে মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর কবিকণ্ঠ। প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা ও বান্ধবী ম্যাকলাউডের কাছে তাঁর গুরু সম্পর্কে বলেছিলেন, "To me he was all love." প্রেমের এই অমৃত-যন্ত্রণা হৃদয়ে লালন করেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও এই সংসারকে—স্বর্গে রূপান্তরিত করার প্রয়াসে নিত্যযুক্ত হয়েছিলেন। "সদা-জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" ঈশ্বরের সেবা জনগণের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। গণচেতনার সর্বাত্মক জাগরণ প্রকল্পও তিনি ঐ একই কারণে গ্রহণ করেছিলেন। বনের বেদান্তকে তিনি এমনি করেই সর্বত্র সম্প্রযুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। সমাজের উচ্চমঞ্চের মানুষেরা যে বিশাল জনগণকে শোষণ করে এসেছে—তার বিরুদ্ধে ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করে গেছেন ঐ একই অনুপ্রেরণায়ই।

বস্তুতঃ জনগণের উপর ছিল তাঁর অপরিসীম আস্থা ও সহানুভূতি। অন্যদিকে তথাকথিত অভিজাতশ্রেণী যারা শাসনের নামে চিরকাল শোষণ চালিয়ে এসেছে—তাদের চিত্তশুদ্ধির প্রয়াসেও তিনি ছিলেন সমান তৎপর। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। সমাজ-শক্তির একক—'শক্ত্যাধার' জনগণকে উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কেউ বাঁচেনি। বৈশ্যশক্তিও সেই একই অহং-মনোভাব হৃদয়ে লালন করে আসন্ন ধ্বংসের দিকে ধাবমান। অন্যদিকে সমস্ত শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জকেও তিনি উদ্বোধিত করে গেছেন সুস্থ সুন্দর জীবনের অভিমুখে। সিংহ-শিশুর মেষপালের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠার গল্প, কিংবা প্যাটের গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। জনগণের আত্মচেতনার উন্মেষ,—তাদের ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণের প্রয়োজনেই স্বামীজী জনশিক্ষা ও জনসেবার উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জনসেবা ও জনশিক্ষার এক সুচিন্তিত প্রকল্পও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। গণচেতনার জাগরণ এবং গণশক্তির সংহতি ছাড়া দেশের মুক্তি সম্ভব নয়, এই সত্য তিনিই বোধহয় প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। বাস্তব ও যুক্তিনিষ্ঠ পন্থায় তিনি জনসাধরণকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থদুটি 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রয়েছে গণজাগরণের অভ্রান্ত পথনির্দেশ। গণচেতনার জাগরণের জন্য শিক্ষা একটি প্রধান হাতিয়ার। যথার্থ শিক্ষা মানুষকে তার ভিতরের অপার সম্ভাবনা ও অনন্ত শক্তি সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। শিক্ষার পূর্ণ ফল পেতে হলে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে অধ্যাত্মবোধেও পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন। শিবজ্ঞানে জীবকে সেবা করতে হবে এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ: যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোনো মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না।"—বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। ১ম সংস্করণ। ২৫১ পৃঃ॥ আবার বললেন: "জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য করি, তাহার মুখ্য ফল—আমাদের চিত্তশুদ্ধি।" —বাণী ও রচনা।

১ম খণ্ড। ১ম সংস্করণ, ১১১ পৃঃ। বস্তুতঃ 'অপর' বলে কেউ নেই। নিজের আত্মারই প্রসারিত অস্তিত্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে জগৎ সংসার। সর্বত্র তাঁকে দেখার সাধনাই জীবনের পথ—বাঁচার পথ। এপথেই একমাত্র বিশ্বের ক্রমমুক্তি সম্ভব। ম্যাক্সমূলের থেকে রোঁমা রোঁলা, টয়েনবি, উইল ডুরাণ্ট পর্যন্ত সকলেই ভারতীয় এই অদ্বৈতবাদকেই বিশেষ করে স্বামীজী প্রবর্তিত "Practical Vedanta"কেই "only way of Salvation for the whole mankind" বলে উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। সংগ্রামের পথে —আত্মমুখী আন্তর সংগ্রামের পথে এগোতে হবে। তাইতো বললেন ঃ "পূজো তাঁর সংগ্রাম অপার সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।' একদিকে সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মনে প্রেমের অভিসঞ্চার ঘটানো এবং অন্যদিকে জনসাধারণের চেতনার জাগরণ নিয়ে আসা। এই দুদিকেই স্বামীজীর কর্মপ্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জনগণেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার, নিজের হৃত ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার শিক্ষা দিতে হবে, মুখস্থ করে পাশ করার কেতাবী বিদ্যা মাত্র নয়। বিবেক-সাহিত্যের সর্বত্রই এই গণজাগরণের উদ্বোধনী সঙ্গীতের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সুবিধাভোগী তথাকথিত উচ্চশ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে—"সেই নিম্নে নেমে এস –নহিলে নাহিক পরিত্রাণ"—এই ছিল তাঁর একান্ত আবেদন। তাই লিখলেন,…"পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি দরিদ্র দেবো ভব', 'মূর্খদেবো ভব', দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী কাতর –ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।" পত্রাবলী ১ম ভাগ ৩১১-১২ পৃঃ। বিশেষ সুবিধাভোগী তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে তিনি আরো বললেন, "যারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হয়ে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও তাদের কথা একটিবারও চি া করবার অবসর পায় না, তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করি।" Letters 113 page. দুঃস্থ দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করা, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, মূর্খকে অক্ষর-জ্ঞানহীনকে বিদ্যা দান, আর্ত অসহায় রোগীকে চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা—এই সব নানা প্রকল্প গ্রহণ করতে তিনি তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিতেন। পরাধীন ভারতের বহু রাজা-মহারাজা স্বামীজীর নির্দেশে নিজেদের রাজ্যে জন-উন্নয়নমূলক কর্মযোজনা গ্রহণ করেছিলেন। এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজী সহ অন্যান্য গুরুভাইয়েরা তো স্বামীজীর একান্ত সহযাত্রী ছিলেন এই সব কুশল কর্মের অজস্র উদ্যোগ-আয়োজনে। স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। আবার অন্যদিকে নিস্তেজ দুর্বল ভারতীয় জনগণকেও তিনি উৎসাহবাণী দিয়ে অগ্নিবীর্যে উদ্বোধিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভারতীয় জনগণের অপার সহিষ্ণুতা, কর্মক্ষমতার কথা উল্লেখ করে হীনবিত্ত জনতাকে নব নব কর্মোদ্যমে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন ঃ "এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল

জীবনী-শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !! অতীতের কঙ্কালসয়। এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত। বাণী ও রচনা / ৬ষ্ঠ খণ্ড / ১ম সংস্করণ / ৮২ পৃঃ। আমাদের দেশের সাধারণ, অশিক্ষিত শ্রমজীবী জনসাধারণের উপর স্বামীজীর ছিল অকুণ্ঠ বিশ্বাস —, তিনি আস্থাবান ছিলেন তাদের স্বর্ণদীপ্ত ভবিষ্যতের প্রতি। বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে —স্বামীজী তা বিশ্বাস করতেন। এদের সত্যপ্রিয়তা, ধর্মজ্ঞান সদাচার ও কর্তব্যজ্ঞান প্রসঙ্গে বার বার স্বামীজী প্রশান্তি উচ্চারণ করে গেছেন। অক্ষরজ্ঞানের মাপক ঠিতে শিক্ষিত না হলেও এদের সহজাত কর্তব্যজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবোধের প্রসঙ্গে স্বামীজী বার বার মহাভারতের "ধর্মব্যাধের কাহিনীটি" উল্লেখ করেছেন।—স্বামীজীই পৃথিবীতে প্রথম ব্যক্তি যিনি আসন্ন শূদ্র যুগকে মনে প্রাণে স্বাগত জানিয়ে গেছেন। সেই শূদ্র রাজত্বের উপযোগী করে তোলবার প্রয়োজনেই জনগণের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ও চিত্ত-চেতনার উৎকর্ষ যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্য নব নব কর্মযোজনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র রাজত্ব যে অবিমিশ্র কল্যাণকর নয় —তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু "নেই -রুটির চেয়ে আধখানা রুটিও শ্রেয়" এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে অবশ্যম্ভাবী শূদ্র-যুগকে গ্রহণ করতে এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সর্ব মানবের অশেষ হিতকারী কল্যাণধর্মী আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় তিনি সন্ধান করেছেন সমন্বয়ের, বলা যায় একটি আলোকিত সমন্বয়ের। আগেই উল্লিখিত হয়েছে শূদ্রজাগরণ প্রসঙ্গে ভারতের মাটিতেও ইতিহাসের রক্তাক্ত নাটক পুনর্বার অভিনীত হক —স্বামীজী তা চাইতেন না। শ্রেণী-বিশেষের উত্থান-অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করেও শ্রেণীসংগ্রাম, বিশেষ করে শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি হিসেবে তার যে অন্তিম রক্তাক্ত অধ্যায়টিও অনিবার্য বলে ঘোষিত —তা থেকে স্বামীজী ভারতকে বাঁচাতে চেয়েছেন। কারণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকল যুগেরই সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এমন অনেক বিশেষ অবদান রয়েছে যা মানুষের চিরকালীন সম্পদ। কোনো কারণেই তার বিনষ্টি মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বিপ্লব মানেই অনেক ধ্বংস, অনেক বিনষ্টি —একথা স্বামীজী জানতেন বলেই একটি গঠনমূলক পন্থা উদ্ভাবনে ব্রতী করেছিলেন। একথাও উল্লিখিত যে দেশ ও জাতির প্রতি, জনগণের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধের প্রেরণাতেই শূদ্রশাসনের অকল্যাণকর দিকগুলি ও অন্ধকার পরিণামগুলি এই জাতিকে যাতে স্পর্শ না করে, শূদ্র-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে সবরকম রক্তাক্ত হানাহানি, সংঘাত ও ধ্বংস এবং অকারণ হীন পাশববৃত্তির উদ্দাম আত্মপ্রকাশ পরিহার করতে একটি সহজ মিলনের ও ঐক্যপথের সন্ধান দিলেন। ইওরোপের মতো শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য এবং শূদ্রধর্মকর্মের সহিত শূদ্ররাজত্ব স্বামীজী কখনো চান

নি। মানুষেরই একদলকে নীচে নামিয়ে এনে আর একদলকে গায়ের জোরে টেনে তোলার আরণ্যক নীতি, একদলকে মেরে কেটে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে আর এক দলের সিংহাসন প্রাপ্তির পাশব পথ কখনো কোনো সভ্য মানুষের গ্রাহ্য জীবনদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। স্বামীজীর মতো বিশ্বমানবের কল্যাণকামী, জীব-শিব তত্ত্বে আস্থাশীল মানুষের পক্ষে তা কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ মানুষেরই হাতে নিপীড়িত নির্যাতিত শোষিত ক্ষুধার্ত অসহায় আর্ত মানুষের যে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দুর্গতি চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে, চারিদিকে যে মনুষ্যত্বহীন সুবিধাবাদের আগ্রাসন, এসবের প্রতিকারেই তো শূদ্ররাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে। সেখানেও যদি আবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা-সন্ধানীরা এসে ভিড় করে তাহলে তো সবই পণ্ডশ্রম, ব্যর্থ। সকলে মিলেমিশে মানবধর্ম বাঁচিয়ে, প্রীতিতে ভালোবাসায়, সহযোগিতায়-সহমর্মিতায়, বিশ্বের বিশাল মানবগোষ্ঠী কি একসঙ্গে সর্বাত্মক মনুষ্যত্বের উদ্বোধন-সাধনায় বেঁচে থাকতে পারে না? স্বামীজী নিজেই এ প্রশ্নের সদুত্তর দিলেনঃ "আমি বিশ্বাস করি। সত্যযুগ এসে পড়েছে· এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে।" পত্রবলী ১ম ভাগ/১৬২ পৃঃ। এই সত্যযুগের উপযোগী সমাধানই স্বামীজী জাতির কাছে তুলে ধরলেন। শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উত্তীর্ণ করতে হবে —এই তাঁর সাধনা। স্বামীজী কর্মানুগ জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন কিন্তু জন্মগত জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। স্বামীজীর মতে ব্রাহ্মণত্ব মানুষের একটি বিশেষ উন্নত অবস্থার নাম। এবং সাধনা দ্বারা সকলেই সেখানে পৌঁছাতে পারে। তিনি বললেনঃ "(শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনি-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।' পত্রাবলী/২য় ভাগ ৪৩ পৃ। কারণ স্বামীজী সত্যযুগ বলতে এক শ্রেণী বৈষম্যহীন, সর্ববিভেদমুক্ত, আদর্শ সাম্যে স্থিত, সুস্থ সুন্দর সবল সচ্ছল সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থার (millennium) কথাই বলতে চেয়েছেন। দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই তিনি এই আদর্শ সমাজব্যবস্থা ও উজ্জ্বল সার্বিক রাষ্ট্রস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ "সবার পরশে পবিত্র-করা-তীর্থ-নীরে"—জাতীয়তার মঙ্গলঘট পূর্ণ করেই স্বামীজী ভারতের মাটিতে স্বদেশের ঐতিহ্যানুগত নব সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্বোধন করলেন। এবং সমস্ত জাতি ও দেশের কাছেও ঐ একই পথ নির্দেশ করে গেলেন। একে বলা যায় বিবেকী সাম্যবাদ।

স্বামীজী-পরিকল্পিত এই সত্যযুগে অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে জনজীবনে। সর্বশোষণ-মুক্ত, সব সুবিধাবাদের অবসান ঘটিয়ে যে গণরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে সকল মানুষ পাবে বেঁচে থাকার ও পূর্ণ হয়ে ওঠার সমান অধিকার। এবং এ পথেই

সকল মানুষের সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। কিন্তু এই সর্বশোষণ-মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে কতগুলি দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদের সকলের—বিশেষ করে জনসাধারণের পয়সায় যারা আমরা শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অভিজাত বলে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করেছি, আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, যুগ-সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তিনটি প্রধান কাজ সম্পন্ন করতে হবে (১) জনগণের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দান (২) অশিক্ষার অন্ধকার দূর করা এবং (৩) আত্মবিস্মৃত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নির্যাতিত মানুষের বুকে উদ্বোধন ঘটাতে হবে আত্মবিশ্বাসের। তাই তিনি যুক্তিনিষ্ঠ প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেন: "আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য: আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য।...কতকগুলি চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে পড়তে শেখাও ও অনেকগুলি ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও...চাষাভুষো মৃতপ্রায়; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র।"—পত্রাবলী ২য় ভাগ ৩৮৭-৮৮ পৃ।
জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামীজীর নেই কোনো সামান্যতম সংশয়। তাই বললেন: "মনে রেখো, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন।...জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগের হৃত ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। Letters—76 page.

অভাব এদের মধ্যে সংঘশক্তির, অভাব আত্মপ্রত্যয়ের; অন্যথায় এরা কারো চেয়ে কম নয়। তাই বললেন: "এই যে চাষাভূষো, মুচি-মুদ্দাফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে।...তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে।...তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। তোদের মতো শার্ট-কোট পরে সভ্য না-হয় নাই হতে শিখেছে। তাতে আর কি এলো গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজার হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা 'ছোট লোক' ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?"

"জীবন সংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে,

আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পাচ্ছেএবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্যগণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকার ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর-জাতদের ন্যাষ্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।"

এখানেই শেষ নয়, তথাকথিত উচ্চ জাতের কর্তব্যেরও নির্দেশ দিলেন ঃ···তোরা এই mass (জনসাধারণ) এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালো-বাসি, ঘৃণা করি না।—তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।"—বাণী ও রচনা / ৯ম খণ্ড ১ম সংস্করণ ১০৭-০৮ পৃঃ।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ স্বামীজী সর্বত্রই তো সেই "এক"-এর অধিবাসনা প্রত্যক্ষ করেছেন। কেউ তো তাঁর শত্রু নেই। তাই অস্ত্রের সাহায্যে হিংসার পথে কোনো সমস্যার আপাত সমাধান তাঁর কাছে গ্রাহ্য হতে পারে না। বস্তুতঃ হিংসার সাহায্যে কোনো মানবিক সমস্যারই শাশ্বত সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র প্রেমের মধ্য দিয়ে সার্বিক জীবন রচনা সম্ভব। সম্ভব সমস্ত বিভেদের প্রাচীর অতিক্রম করে এক জাতি—এক পৃথিবীর অভিমুখে অভিযাত্রা। একমাত্র ভালবাসার, প্রেমের সাম্রাজ্য বিস্তারই ভারতবর্ষের চিরকালীন অন্বিষ্ট। এ সম্পর্কে তাই স্বামীজী বললেন ঃ "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া···" বাণী ও রচনা / ৫ম খণ্ড ১ম সংস্করণ / ৪৬৪ পৃঃ। আবার বললেন ঃ "ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে···চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে।···এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার জিনিষ তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন তাহাই করিতে হইবে। বাণী ও রচনা / ৫ম খণ্ড / ১ম সংস্করণ ২১৩—১৫ পৃঃ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়েই মানুষের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। "দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে" এই হল বিশ্বমানবতার একক মুক্তি পথ। তাই এই পথেই স্বামীজীর পদক্ষেপ। "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি"—বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে এই কথাই স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন বিশ্ববাসীর কাছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে স্বামীজীর এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নীতিই বর্তমান বিশ্বের সকল দেশ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হচ্ছে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়-তত্ত্বজাত শাশ্বত ভারতবর্ষের বিশ্বৈক্যবোধ ও সর্বাস্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 'যত মত তত পথ' জীবনদর্শন মেনে নিয়ে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক পৃথিবীর পঞ্চশীল সহাবস্থানের নয়া বনিয়াদ। এমন কি কট্টর সমাজতন্ত্রীও আজ একদা তাদের বহু-বিঘোষিত অনিবার্য রক্তাক্ত বিপ্লবের তত্ত্ব সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ করতে উৎসাহ বোধ করছেন না। স্বামীজীর আন্তর্জাতিক নীতির অনুসরণে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্র আজ অনিবার্যভাবে স্বেচ্ছায় সহাবস্থানের সূত্র মেনে নিয়েছে। স্মরণীয় যে ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' তত্ত্বের উপরেই গড়ে উঠেছে একালের সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসনদ। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ঠাকুর তাঁর 'যত মত তত পথ' তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি ও সমষ্টি বিশ্বের সকলকে দিয়ে গিয়েছেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার নিজস্ব ভূমি; দিয়ে গেছেন সকলকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে হয়ে ওঠার স্বাধিকার (to be and to make)।

তিনি আরো বললেনঃ বিস্তৃতিই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। অতএব প্রেমই বাঁচিয়া থাকিবার রীতি—।" এই বিশ্বমানব-প্রেমের মঙ্গল-সুসমাচারই কর্মে পরিণত বেদান্তের মাধ্যমে একক সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের মৌল লক্ষ্য। নিজের আদর্শ, মত ও পথ যত সুন্দর ও সার্থকই মনে হোক, অন্যের উপর চাপাতে গেলেই সেখানে দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত অনিবার্য। তাই কারো ঘাড়ে কোনো কিছু চাপিয়ে দেবার স্বৈরনীতি তিনি মেনে নিতে পারতেন না। নিজের দেশ সম্পর্কেও যেমন, অন্য দেশ, অন্য সমাজ, প্রসঙ্গেও তাঁর একই নীতি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদ প্রতি ধর্মের, প্রতি সংস্কৃতির, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাশীল। শুধু ভারতবর্ষেই ধনী-নির্ধনের মিলনের কথা নয়—, বস্তুতপক্ষে জীবন ও জগৎ এবং পরাজগৎ সম্পর্কেও এই সর্বাত্মক সমন্বয়বাদই বিশ্বের কাছে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ সুসমাচার। স্বামীজীকে তাই বলা হয়েছে—"

" · a great advocate of equilibrium between warring forces of life : reason and faith, matter and spirit, individual and society, science and religion, the past and the present, the East and the West and last but not the least, haves and have nots." The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man—by Dr Govinda Chandra Dev (1963) 105 page. বস্তুতঃ এই সর্বাত্মক সমন্বয়, এই সংহতির প্রয়োজনেই স্বামীজী চিরকাল নির্যাতিত নিপীড়িত সর্বহারার সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ সমানে সমানে ছাড়া এই লেন-দেন, এই পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব হয় না। সমন্বয় ও মিলনকে সত্যরূপ দিতে হলে আগে চাই সর্বদেশের সর্ব মানুষের জন্য সমতা ও সাম্যের ভিত্তি। স্বামীজী জানতেন আমাদেরও দেবার মতো অনেক কিছু আছে। বহু সম্পদ আছে আমাদের যা অনেকেরই নেই। আমরাও ওদের সম্রাটের মতো মাথা উঁচু করে দেব। কিন্তু

তার আগে আমরা যারা নিপীড়িত নির্যাতিত অবহেলিত—আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। পেট ভরে খেতে দিতে হবে। মানুষের মতো দেহে-মনে বুদ্ধিতে পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে হবে। খালি পেটে শুধু ধর্ম নয়, কিছুই সম্ভব নয় এই পৃথিবীতে। তাই আসমুদ্র হিমাচল এই ভারতবর্ষের নিরন্ন জনসাধারণের খালি পেটের সমস্যা সমাধান করতে স্বামীজী সবচেয়ে আগে এগিয়ে এসেছিলেন। এমনকি শিকাগো ধর্মমহাসভায় পর্যন্ত আমাদের এই খালি পেটের সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। এবং যেহেতু আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে না আনলে, মানব চিত্তে শুদ্ধ চেতনার জাগরণ না ঘটলে, খালি পেটের সমস্যার চিরন্তন সমাধান সম্ভব নয়, তাই জনগণকে আশ্বাসের অগ্নিবাণী শুনিয়ে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে—তাদের সর্বাত্মক জাগরণের জন্য আত্মমোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় সেবাধর্মকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন। আত্ম-উদ্বোধনের পথেই সম্ভব স্বরাজ্যলাভ। এবং এ পথেই আমাদের অর্জন করতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধিকার,কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধিকার ও স্বরাজ্য-লাভ ছাড়া সম্ভব নয় ক্ষুধার বন্ধন থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করে আনা, এমনকি ক্ষুধার বন্ধন যতক্ষণ আছে—জীবনের একমাত্র অন্বিষ্ট যে ঈশ্বরলাভ—তাও সম্ভব নয়। অথচ ক্ষুধার বন্ধন যে একান্তভাবে জড়িয়ে আছে পরাধীনতার বন্ধনের সঙ্গে। দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে তাই স্বামীজীকে এমন অগ্রবর্তী সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বামীজীর দেশপ্রেম স্বাজাত্যাভিমান এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সংগ্রামী সৈনাপত্য গ্রহণ এ সবেরই উৎস খুঁজতে হবে দেশের জনসাধারণকে ক্ষুধার বন্ধন, অশিক্ষার বন্ধন, হীনম্মন্যতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনার পবিত্র সংকল্পের মধ্যে। জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য-অশিক্ষা কুসংস্কার একান্তভাবে ব্যাকুল ব্যথিত করেছিল বলেই—এই ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। গণমুক্তির এছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় পথ নেই। মানুষের বুকের ভিতর ঈশ্বর চেতনাকে ত্বরান্বিত করার-ও অন্য কোনো উপায় নেই। মানুষকে মানুষের পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকবার জন্য মানুষের হাত থেকেই ছিনিয়ে নিয়েআসতেহবে শাসনের নামে শোষণের ও বঞ্চনার হিংস্র হাতিয়ার। সকল রকম বিশেষ সুবিধাবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে মানুষের পৃথিবীকে মানুষের জন্যই প্রত্যহের প্রাণচর্যায় কাত্যায়নী সভ্যতার যথার্থ কর্ষণায় আমাদের সবচেয়ে আগে বিকশিত হতে হবে। পাশ্চাত্যের অনুসরণে জয় করতে হবে বহিঃপ্রকৃতিকে। শিখতে হবে পাশ্চাত্যের কাছে ওদের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা। অন্যদিকে পাশ্চাত্যকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমাদের মৈত্রেয়ী সভ্যতার কাছে। ওদেরও আমাদের মত জয় করতে হবে অন্তঃপ্রকৃতিকে। শিখতে হবে আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। এবং এভাবে আমাদের মৈত্রেয়ী এবং ওদের কাত্যায়নী সভ্যতার সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই পূর্ণ হবে পূর্ব-পশ্চিমের প্রাণযজ্ঞ। এবং সেই প্রাণযজ্ঞ পূর্ণ হলেই বিশ্বমানবের মহামিলনের মুক্ত স্যন্দনা এগিয়ে চলবে পূর্ণের প্রাঙ্গণের অভিমুখে। এবং তখনই একমাত্র সত্য হয়ে উঠবে সর্ব মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির মহৎ তপশ্চর্যা। স্বামীজী প্রবর্তিত এই হল একালের সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ অনুশাসন। এই তাঁর আদেশ। এই উপদেশ।

সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বিবেকানন্দ

নলিনীকুমার ভদ্র

॥ ১ ॥

পরাধীন ভারতবর্ষেরও যে সমগ্র পৃথিবীকে দেবার মত নিজস্ব সম্পদ আছে তা প্রথম প্রমাণিত হল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে। সেই মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে উদ্ঘোষিত হল ভারতের আধ্যাত্মিকতার অমৃতবাণী। এই স্মরণীয় ঘটনার অনতিকাল পরেই আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে বেদান্তের আদর্শ প্রসারে প্রবৃত্ত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দিগ্বিজয়ী বীরের মত সর্বত্র লাভ করলেন তিনি অকুণ্ঠ অভিনন্দন—বিবেকানন্দ-প্রশস্তিতে মুখর হয়ে উঠল মার্কিন পত্র-পত্রিকাসমূহ।

চিকাগোতে স্বামীজীর ধর্মবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বেকার এবং তার পরবর্তীকালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন মেরী লুই বার্ক। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সেই গ্রন্থখানির অভিধা হচ্ছে: Swami Vivekanda in America—New Discoveres। লুই বার্কের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ স্বামীজীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের উপর অভিনব আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছে।

বিবেকানন্দের মার্কিন-বিজয়-বার্তা যখন তাঁর মাতৃভূমিতে এসে পৌঁছল তখন এদেশের সাময়িক পত্রিকাগুলিও মুখরিত হয়ে উঠেছিল তাঁর জয়গানে। কিন্তু সমকালীন পত্রিকাগুলি কি ভাবে করেছিল স্বামীজীর কৃতিসমূহের মূল্যায়ন সে বিষয়ে বহু তথ্য আজও পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে।

কলকাতার ইংরেজি পত্রিকাসমূহের মধ্যে Amrita Bazar Patrika-র তখন বিপুল প্রতিষ্ঠা। চিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার দুই মাসের কিছুকাল পরে, ১৮৯৩ সালের ২০শে নভেম্বরের পত্রিকার ক্রোড়পত্র (Supplement) "Hindu Religion in Amcrican Congress" অভিধাযুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং বিবেকানন্দ—মহাসভায় ভারতের এই প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে শেষোক্ত জনই যে, তাঁর আকৃতি, আচরণ এবং মতবাদের ব্যাখ্যান দ্বারা সকলের মনোযোগ সর্বাধিক আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেকথা বলা হয়েছে।

পশ্চিমে ভারতের বাণীবাহ বিবেকানন্দকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট নাগরিকদের সমাবেশে কলকাতার টাউন হলে এক সভার আয়োজন হল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিলেন স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের কথা অবগত হয়ে স্বামীজী

অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং এক পত্রে অভেদানন্দকে লিখেছিলেন "তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই বা দিই। অদ্ভুত কার্যক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়।" স্বামীজীর বাণী ও রচনা / সপ্তম খণ্ড / পৃ ৪০।

এই অনুষ্ঠানের পূর্বেকার এমন একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৯৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের Amrita Bazar Pa rika-য় যার উল্লেখ পর্যন্ত নেই স্বামীজীর জীবনচরিতসমূহে। উক্ত সংখ্যা অমৃত বাজারের Vivekananda শিরনামযুক্ত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, টাউন হলের সভার আগে বিবেকানন্দের কয়েকজন অনুরাগী বাগবাজারে একটি বাড়িতে আলোচনার উদ্দেশ্যে সমবেত হন। বিবেকানন্দের নিকট লেখা একটি খোলা চিঠি তাঁরা পাঠিয়ে দেন অমৃত বাজ র পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। স্বামীজী কর্তৃক আমেরিকায় প্রচারিত হিন্দু ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে এই পত্রে। তাতে এক জায়গায় স্বামীজীর প্রতি এই উক্তি করা হয়েছে:—"You thus proclaim before the world that Hinduism is not the religion of India alone, but the religion of all ages—the Sana'an Dharma."

এদেশের এবং আমেরিকার সবগুলো পত্রিকাতেই যে স্বামীজীর প্রশস্তি প্রকাশিত হত তেমন নয়, কোন কোন পত্রিকা শতমুখ হয়ে উঠেছিল বিবেকানন্দবিদ্বেষণে। বিশেষতঃ, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পত্রিকাগুলো সভ্যতার সীমা একেবারে ছাড়িয়ে গিয়েছিল একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী ১৮৯৪ সালের ২০শে জুন চিকাগো থেকে এক পত্রে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছেন: "মিশনারী সম্প্রদায় আমার ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর হইয়াই আছে এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পত্রিকাগুলিতে আমার বিরুদ্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিয়া এখানকার কাগজে ছাপা হইয়াছে।" স্বামীজীর বাণী ও রচনা / ষষ্ঠ খণ্ড / ৪৩৪ পৃঃ।

পেন্টেকোস্ট নামা এমনি একজন বিবেকানন্দ-বিদ্বেষী খ্রীষ্টান মিশনারীর কথা জানতে পারা যায় ১৮৯৪ সালের ২১ শে জানুয়ারির অমৃত বাজার পত্রিকায়। তাতে আছে……"Dr, Pen ccost is writing in the American papers against the teaching of Swami Vivekananda……"

কিন্তু মিশনারীদের এই সমস্ত অপচেষ্টা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছিল ব্যর্থতায়। আমেরিকার অভিজাত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় বহু নরনারীর অধ্যাত্ম-জীবনের নূতন পথের দিশারী হয়ে বিপুল প্রতিষ্ঠা এবং গৌরবের অধিকারী হলেন স্বামীজী। ১৬ই জুলাই, ১৮৯৪ সালের অমৃত বাজার লিখলেন—"The presence of Swami Vivekananda in america is, indeed a very great miracle and so is the conversation of Mrs Besant……"

এমনি ভাবে প্রায় দুটি বছর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে য়ুরোপের পথে পাড়ী জমালেন স্বামী বিবেকানন্দ। মাসকয়েক লণ্ডনে অবস্থান করে আবার তিনি ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। এবার কিন্তু বেশী দিন নিউইয়র্কে থাকা সম্ভবপর হল না তাঁর পক্ষে। সাগরের ওপার থেকে এসে পেঁছিল লণ্ডনের বন্ধুবান্ধবদের সাদর আমন্ত্রণ। তাঁদের অনুরোধে পুনরায় বিলেতে এসে পেঁছিলেন তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

স্বামীজীর এই দ্বিতীয় বার লণ্ডনে অবস্থানকালে ক্যাম্বিজে অনুষ্ঠিত এক মজলিসসম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় ১৮৯৭ সালের ৮ই জানুয়ারী Amrita Bazar Patrika-য়। প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে একথা জানা যায় যে, ঐ মজলিসের সংবাদ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় প্রায় এক পক্ষ আগে।

৮ই জানুয়ারী তারিখের প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে উপরোক্ত মজলিসে স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি। ক্রিকেট খেলায় রেকর্ড ভঙ্গকারী রণজিৎ সিং এবং আই. সি এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এতে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিনকার বৈঠকে সমবেত সকলের আলাপচারণার একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই দুই কৃতী ভারতসন্তানের অতুল সাফল্য। সভাপতি মহাশয়ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন এঁদের প্রশস্তিতে। কিন্তু এঁদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র বসু এই দুটি নাম উচ্চারিত না হওয়াতে পত্রিকা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং স্বামীজীর কৃতি সম্বন্ধে বললেন ঃ—"...The advent of the Swamiji in the west has done this service, that it has created an impression in many Quarters that the Indians are not inferior race as Sir Charles Elliot calls them......"

আমেরিকার ন্যায় য়ুরোপেও মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দীর্ঘ চার বছর পরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন স্বামীজী ১৮৯৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। নেপলস থেকে জাহাজ ছাড়ল ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে। ২০শেজানুয়ারি, ১৮৯৭ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় 'Vivekanand in the west' অভিধাযুক্ত যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার অংশবিশেষের অনুবাদ এখানে দেওয়া হচ্ছে ঃ "স্বদেশে প্রত্যাবর্তনশীল বিজয়ী বীরের অর্ঘ্যলাভ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ইংলণ্ডে তাঁর সম্বন্ধে আমরা শেষ খবর পাই যখন ইংরেজ শিষ্যেরা তাঁকে জ্ঞাপন করেন বিদায়-অভিনন্দন। অভিনন্দন-পত্রে ব্যক্ত হয় ভারতের প্রতি তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি জাহাজ থেকে কলম্বোতে অবতরণ করেন স্বামীজী। কলকাতায় এসে পেঁছেন ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। ফেব্রুয়ারির শেষভাগে[১] শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে

---

১ এই সভার তারিখ সম্বন্ধে স্বামীজী সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে গরমিল দেখা যায়।

উদ্‌যাপিত হল তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরের মাসেই 'ভারতী' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩০৩) প্রকাশিত হয় সরলা ঘোষাল (দেবী) লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ শীর্ষক প্রবন্ধ।[১] সংবর্ধনা-সভার পরদিন ইংরেজি সংবাদপত্রে স্বামীজীর বক্তৃতার সঙ্গে সভাপতির যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, সেটি উধৃত করেছেন সরলা দেবী, তাঁর প্রবন্ধে। সভাপতির বক্তব্য এই যে, কিছুকাল এদেশে কাজ করে স্বামীজী আবার যাবেন পশ্চিমে সেখানকার কাজ পুনরারম্ভ করার উদ্দেশ্যে।

স্বদেশে অবস্থান করেন স্বামীজী ১৮৯৯ সালের ১৯শে জুন পর্যন্ত। এই দুই বছরের কিঞ্চিদধিক কালের মধ্যে স্বামীজীর প্রধান কাজ হল রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা (১লা মে, ১৮৯৭) এবং মুখ্যতঃ মিসেস ওলি বুলের অর্থানুকূল্যে বেলুড়মঠ নির্মাণ (ডিসেম্বর, ১৮৯৯)। স্বামীজীর উৎসাহে এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের উদ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র উদ্বোধন প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (১৩০৫, ১ মাঘ)।

শুধু যে খ্রীষ্টান মিশনারীরাই স্বামীজীর উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, স্বদেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর আচারআচরণাদির এবং কৃতিসমূহের বিরূপ সমালোচনায় তাঁরা ছিলেন অত্যুৎসাহী। উদ্বোধন পত্রে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজক' প্রকাশিত হলে পর তাঁরা বিবেকানন্দের ভাষাকে গুরুচণ্ডালী দোষদুষ্ট বলে শতমুখে নিন্দা করেছিলেন। এমন কি 'বঙ্গহিতৈষী, নামক তখনকার দিনের একটি ক্ষীণকলেবর সাপ্তাহিক এরূপ মন্তব্য পর্যন্ত করেছিল যে, বাংলা-রচনায় শিক্ষানবিশীর কালে বিবেকানন্দের পক্ষে তাঁর গুরুভাই সারদানন্দের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করা সমীচীন।' Swami Vivekananda—Patriot-Prophet by Bhupendranath Dutta, p. 290।

---

১ সরলা ঘোষালের এই প্রবন্ধ এবং ভারতীতে প্রকাশিত 'প্রত্যাহার' শীর্ষক তাঁর আর একটি প্রবন্ধের উধৃতি দিয়েছি আমি 'যুগান্তরে' প্রকাশিত (৩১শে চৈত্র ১৩৬১) একটি প্রবন্ধে।

২ সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাব-সম্পদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও এর 'গ্রাম্যভাষা' সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বললেনঃ—"…'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ উপাদেয়। লেখক স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সন্দর্ভে বিবিধ রত্ন ঢালিয়া দিতেছেন।…যিনি না পড়িবেন, তিনি বঞ্চিত হইবেন। স্বামীজী ইচ্ছা করিয়া রচনাটিকে গ্রাম্যভাষার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলতি গ্রাম্যভাষা নহিলে যে সাধারণ বাঙালী বুঝিত না, এমন মনে হয় না। 'রাখাল বেশে' এই জ্ঞানগর্ভ রচনাটির সৌন্দর্যও হানি হইতেছে।"—সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩০৮।

উদ্বোধন-প্রকাশের মাসকয়েক পরে স্বামীজী দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন। এবারও পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ভারতে ফিরে আসেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরে। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই (২০শে আষাঢ় ১৩০৯) তাঁর অমর আত্মা অমৃতলোকে প্রয়াণ করে।

॥ ২ ॥

১৮৯৩ থেকে ১৯০২ মাত্র এই নয় বছরে স্বামীজীর অধ্যাত্মমহিমার রশ্মিচ্ছটায় শুধু ভারতবর্ষ নয়, প্রতীচ্য ভূখণ্ড পর্যন্ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যবিষয়ক বাংলা মাসিক পত্রিকাসমূহে তার প্রতিফলন বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ১৯০২ সালের বঙ্গদর্শন, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকা তন্নতন্ন করে ঘাঁটলেও সেগুলিতে স্বামীজীর লোকান্তরগমনের উল্লেখমাত্র নেই দেখে অবাক হতে হয়। এর লক্ষণীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে 'ভারতী'। ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হয় সম্পাদিকা সরলা ঘোষাল লিখিত '৺স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন' অভিধাযুক্ত প্রবন্ধ।

সেকালের প্রখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি কিন্তু বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে নি। লোকান্তরিত মহাপুরুষের উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত ভাষায় নিবেদিত হয়েছিল তাদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি। খুঁজে পেতে বসুমতী, (১৩০১, ১লা শ্রাবণ), সঞ্জীবনী (২৬শে আষাঢ় ও ৮ই শ্রাবণ, ১৩১৯) এবং অনুসন্ধান (১৬শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ; ২৯শে আষাঢ়, ১৩০৯) এই তিনটি পত্রিকায় স্বামীজী সম্বন্ধে আমি তিনটি রচনার সন্ধান পেয়েছি। বসুমতীর রচনাটি ১৩৭০ সালের বৈশাখ সংখ্যা বসুমতীতে প্রকাশিত আমার 'বিবেকানন্দ ও বসুমতী' প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সঞ্জীবনীর প্রবন্ধটির রচয়িতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম। 'অনুসন্ধানে'র প্রবন্ধটিতে[১] বিবেকানন্দের উপর নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজের বিরূপতার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

তত্ত্বমঞ্জরী ছিল সেকালের একটি সুপ্রসিদ্ধ ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। এর প্রকাশক ও কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী যোগবিনোদ। স্বামীজীর মহাসমাধির পর ১৩০৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় শ্রী ম—মিত্র লিখিত 'মহাপ্রস্থান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইনি পরমহংসদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন, পুরো নাম মনোমোহন মিত্র। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে কোনো কোনো শ্রেণীর লোক যে তাঁর মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন নি, রচনাটিতে তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের প্রায় পৌনে তিন বৎসর পরে ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫ তারিখে

---

১ অনুসন্ধানের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'সাময়িক-প্রসঙ্গ' বিভাগে। প্রবন্ধটি সচিত্র। 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী ছিলেন অনুসন্ধান কার্যালয়ের অধ্যক্ষ।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির উদ্যোগে বেলুড় মঠে যে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ সুধী ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতা-নিবন্ধন স্বামীজীর অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের পক্ষে ঐ সভায় যোগদান করা সম্ভবপর হয় নি। 'রামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ' অভিধাযুক্ত-যে প্রবন্ধটি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তা সভায় পঠিত হয়। এটি ১৩১১ সালের ফাল্গুন মাসের (অষ্টম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা) তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীজীর বিনয়নম্র আচরণ সম্বন্ধে যে ঘটনাটি উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে তা এখানে উধৃত করছি। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :—
"বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করিতে করিতে আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা মনে পড়িতেছে। সে ভালবাসার প্রতিদান হয় না, কিন্তু স্মৃতিপথ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মধুর আলাপ, যত্ন, মধুর বাগ্‌যুদ্ধ দ্বারা উপদেশ প্রদান, আমার ন্যায় অ মানীকে মানদান, —সে সমস্ত উল্লেখ করা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিই, — তিনি বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমান পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে আহূত হইয়া আসেন ; তিনি বাটীতে প্রবেশ মাত্র অনেকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল। আমিও চরণ স্পর্শ করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি অবনত হইতেছি, অমনি তিনি আমার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন 'কি করো ঘোষজা, আমার যে অকল্যাণ হবে।' এইরূপে অ-মানীকে মানদান ও নিরভিমানীর দৃষ্টান্ত যদি কেউ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। এইরূপ নিরভিমান ও লোকাতীত কার্য বিবেকানন্দতেই সম্ভব।"

সেকালের উদ্বোধন পত্রিকায় স্বামীজী সম্বন্ধে অজস্র তথ্য ছড়ানো রয়েছে। ১৩০৯ সালের উদ্বোধনে 'বাফেলো এক্সপ্রেস' নামক আমেরিকার তদানীন্তন সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনার অংশবিশেষের যে অনুবাদ বেরিয়েছিল এখানে তা উৎকলিত হচ্ছে।

"স্বামীজী শুধু যে দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন রীতিমত পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যদিও তিনি বিদেশে (অর্থাৎ ভারতে) জন্মিয়া বিদেশেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজী গদ্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশিত রচনা সকল ইংরাজী ভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। এই সকল পুস্তকের অধিকাংশ এখানে ও ইংলণ্ডে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা এবং ভারতীয় দর্শনবিষয়ক।

সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকায় বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইতিপূর্বে সরলা ঘোষাল সম্পাদিত ভারতীর কথা উল্লেখ করেছি। ভারতী ছাড়া সমকালীন আরো একটি সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনার সন্ধান পেয়েছি। সেই পত্রিকাটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য'।

সমাজপতি ছিলেন স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং তাঁর প্রচারিত আদর্শের অনুরাগী। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ অবান্তর বলে গণ্য হবে না। বাংলার জাতীয়তাবাদীরা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন, কিন্তু সরকারের কোপদৃষ্টির ভয়ে কেউই এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করতে রাজী হলেন না। অবশেষে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর ভাই জ্যোতিষচন্দ্রকে পাঠালেন বেলুড়মঠে স্বামীজীকে এই অনুষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করবার উদ্দেশ্যে। সকল কথা শুনে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীজী বললেন— "বেটী বলি চায়। ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট গিয়ে আমার নাম করে তাঁকে সভাপতি হবার জন্যে ধরুন। কেউ-ই যদি রাজী না হন তাহলে আমি নিজেই হব এই সভার সভাপতি।"

স্বামীজীর অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ এই ঘটনাটি শুনেছিলেন স্বয়ং সুরেশ সমাজপতিরই জবানিতে। Swami Vivekananda / B N. Datta / p 202।

সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্যের (১৩০৪ থেকে ১৩১০ সাল পর্যন্ত) সালের 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগ ঘাঁটলে মাঝে মাঝে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে খণ্ড মন্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মুখ্যতঃ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবেকানন্দ সম্পর্কিত প্রবন্ধের সমালোচনা করতে গিয়ে সমাজপতি ঐ সকল উক্তি করেছেন। এখানে ঐরূপ দুটি উধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

(১) উদ্বোধন, চৈত্র; ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। শ্রীম রচিত "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য" প্রবন্ধটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। লেখক অসাধারণ পরিশ্রমে স্বর্গীয় মহাপুরুষ বিবেকানন্দের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। বিবেকানন্দের জড়মূর্তির প্রতিরূপ নয়, তাঁহার ভাবনার, সংস্কারের বিশ্বাসের জীবন্ত ছবি। বিশ্বাসী ভাবুক ভক্তের স্বচ্ছ মানস দর্পণে স্বর্গীয় স্বামীর যে স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই প্রতিফলিত দেখিতেছি। আমরা কিঞ্চিৎ উধৃত করিতেছি— 'দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সৎশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্মসঞ্চয় হয়, এইজন্য স্বামী সর্বদা ভাবিতেন। কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে আফ্রিকাবাসী (coloured man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি *হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "স্বামী যখন আমরা তোমাকে* বলিলাম "তুমি কি আফ্রিকাবাসী? তখন তুমি কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন?" স্বামী বলিলেন, "কেন আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয়?" অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎছাড়া? নিগ্রোকে যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ

ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্বদা থাকা, তবে তাদের সেবা আগে। এরি নাম অনাসক্ত হয়ে সেবা। এরি নাম কর্মযোগ। সকলেই কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ করে ভগবানের অনেক দিন ধরিয়া নির্জনে ধ্যানচিন্তা না করিলে এরূপে স্বদেশের উপকার করা যায় না। 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে তো মায়া হইল; তোমার (ঈশ্বরের) এরা, তাই এদের সেবা করিব; তোমারই এ কাজ, আমি তোমার দাস। তাই এই ব্রত পালন করিতেছি। সিদ্ধি হউক, অসিদ্ধি হউক, সে তুমি জান, আমার নামের জন্য নয়। এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।" লেখকের সহিত আমরাও বলি ইহাই যথার্থ স্বদেশহিতৈষিতা—ideal Patriotism. ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "স্বামী বিবেকানন্দের পত্র" উপাদেয় বস্তু। তাঁহার উপদেশ বাঙ্গালীর পক্ষে সুপথ্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সাহিত্য / ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা. ১৩১০, বৈশাখ।

(২) ভারতী। আশ্বিন।···শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "ভারতীয় প্রশ্নচিন্তা" সময়োপযোগী প্রবন্ধ। লেখকের শেষ উক্তি অবধানযোগ্য,—

"······প্রাচীন সমাজ এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে গ্রাম-সম্পর্ক নাই, কামারদাদা, কুমরজ্যেঠা—শিক্ষিতের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের তারতম্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিক্ষিত কি নিজের পয়সায় শিক্ষিত হইয়াছেন? যাহারা শিক্ষিতের শিক্ষার নিমিত্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে, তাহারা শিক্ষিতের নিকট হেয় হয়। ইহা অপেক্ষা দুর্গতি হইতে পারে কি।"

স্বর্গীয় মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামীও বারংবার ইহাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুমূর্ষু সমাজের বধির কর্ণে তাঁহার 'উদ্বোধন'-বাণী কখনও প্রবেশ করিবে কি? সাহিত্য / কার্তিক, ১৩১০।

কলকাতার সমকালীন ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে স্বামীজীর জীবদ্দশায় Amrita Bazar Patrikaতে প্রকাশিত স্বামীজী সম্পর্কিত তথ্য এবং রচনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি প্রবন্ধের গোড়ায়। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের তিন দিন পরে (৭ই জুলাই, ১৯০২) The Englishman পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে মন্তব্য করেন নিম্নে তা উধৃত করছি:

A very remarkable religious reformer passed away at Howrah on Friday evening. He was not without his caluminators, but no man ever set a better example in the way of plain living and high thinking······His movements and actions recalled rather the warrior than the priest."

অর্থাৎ, "বিশেষভাবে উল্লেখ্য একজন ধর্মসংস্কারক শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়াতে পরলোকগমন করেছেন। এমন নয় যে, তাঁর দুর্নাম রটনাকারী ছিল না। কিন্তু সাদাসিধে জীবনযাপন এবং উচ্চ চিন্তার দিক দিয়ে এঁর চাইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর

কেউ কখনো স্থাপন করেন নি। তাঁর চালচলন এবং আচরণসমূহ আচার্যের চেয়ে বরং যোদ্ধার কথাই বেশী করে স্মরণ করিয়ে দিত।"

স্বামীজীর মহাসমাধির পরে কলিকাতা ভাবানীপুরে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভার যে বিবরণ ১৯০২ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলি' পত্রে প্রকাশিত হয়, তা অন্য কোনো কোনো পত্রিকায় এবং পুস্তকে উৎকলিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুধৃতি নিষ্প্রয়োজন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে 'বেঙ্গলি'র আর একটি মন্তব্য 'গল্পভারতী' পত্রিকায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত উনিশ শতকের শেষের দিকের এবং বিশ শতকের গোড়াকার দিকের ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকাসমূহের কীটদষ্ট পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কৃতি সম্বন্ধে কত তথ্য কত মন্তব্য, কত প্রবন্ধ যে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নই আমরা। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্য নিয়ে সংকলিত হলে এমন একখানি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, বিবেকানন্দের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জীবনচরিত রচনার পক্ষে যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবে অপরিহার্য বলে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শ্রমসাধ্য কৃত্যটি সম্পন্ন হয় নি। এখনো যদি এ বিষয়ে আমরা তৎপর না হই তাহলে এ আশঙ্কা অমূলক নয় যে, ভবিষ্যতে এক মহাজীবনের অমূল্য তথ্যসমূহ তলিয়ে যাবে চির-বিস্মৃতির অতলে। তা হলে আমরা—বিবেকানন্দের স্বদেশবাসী এবং স্বজাতিরা শুধু নিজেদের কাছে নয়, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছেও অপরাধী হয়ে থাকব।[১]

---

১ কিছুকাল আগে জাতীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শিত ৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৮৯৩ সালের Statesman পত্রিকার একটি কাটিং বা ছিন্নাংশ থেকে আমেরিকায় স্বামীজীর কৃতি এবং আলাপচারণাদি সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়। তাতে "Hindoos at the World fair" এই শিরোনামযুক্ত সংবাদ-নিবন্ধে (News article) Boston evening transcript" পত্রিকার জনৈক সাংবাদিকের উক্তি উধৃত হয়েছে। এই নিবন্ধ থেকে একথাও জানা যায় যে, স্বামীজী ওখানে তাঁর গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু পুস্তিকাও বিতরণ করতেন। নিবন্ধটিতে একথাও বলা হয়েছে যে, মজুমদার (প্রতাপ) পরমহংসদেবকে নিজের আচার্যের মত দেখতেন। এই মেলায় যোগদানকারী অপর একজন ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ আছে এতে। তিনি 'Nara Sinha Chari' (নরসিংহাচারী)।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বামীজীর কর্মযোগ

কর্মযোগী বিবেকানন্দ

তামসরঞ্জন রায়

ভারতের জাতীয় জীবনের সে এক মহাসমস্যার যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষার অমিতপ্রভাবে ভারতের চিন্তাজগৎ যখন সমাচ্ছন্ন, 'ডেকার্টের অহংবাদ', 'ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ', 'স্পিনোজার অদ্বৈতচিদ্বস্তুবাদ' হিউম এবং বেনের 'নাস্তিকতা', কোঁম্‌তে এবং স্পেন্‌সারের 'অজ্ঞেয়বাদ' প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গ যে সময়ে ভারতের যুবক-সম্প্রদায়ের চিত্ত অধিকার করিয়াছে, নরেন্দ্রনাথ সেই সংশয় এবং সন্দেহ-যুগেরই মানুষ। যৌবনের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান নরেন্দ্রনাথ এই কালে জন্মজন্মান্তরের প্রবল সংস্কার-প্রেরণায় অধীরচিত্তে স্থান হইতে স্থানান্তরে সত্যানুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ধর্ম ও সত্যলাভের ব্যর্থ প্রয়াসে অশান্ত চিত্তের সে কি দারুণ উদ্বিগ্নতা ও তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়াই এই সময়ে তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছিল। এইরূপেই যৌবনের প্রথম ভাগ কাটিয়া গেল। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতবাদ, ব্রাহ্ম সমাজের নীতিবিধান, মরুভূমির বুকে বারিবিন্দুর মতই নিমেষমধ্যে শুকাইয়া গেল, নরেন্দ্রনাথকে কিছুমাত্রও স্নিগ্ধ করিতে পারিল না। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরম সন্দেহের সৃষ্টি করিল।

তারপর কোন্‌ এক অদৃশ্যশক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে যুগ যুগান্তরের শাশ্বত বিধান দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারীর শ্রীপদপ্রান্তে যুবক নরেন্দ্রনাথকে আনিয়া উপস্থিত করিল। শ্রীভগবানের অলক্ষ নির্দেশে লোকান্তরে গুরুর সহিত শিষ্যের মিলন পূর্ণ হইল।

ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ উল্লেখ করিতে যাইয়া কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "পশ্চিমের দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজ শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই মাথার চুল ও বেশ-ভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থেই ইতর-সাধারণের মত একটা আঁটা নাই; সবই যেন তার আল্‌গা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব?

"মেজেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। * * * গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান তখন সে দু চারিটি মাত্র শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্ম সমাজের "মন চল নিজ নিকেতনে" গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনঃপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন গাহিতে লাগিল। শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।"

আবার স্বামীজীও স্বয়ং সেই দিনের কথা উল্লেখ করিয়া পরে এক সময়ে—বলিয়াছিলেন—"গান ত গাহিলাম, তাহার পরই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আসিয়া আমার

হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরের নির্জন বারান্দায় লইয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও কহিলেন, তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, "এতদিন পরে কি আসিতে হয়? আমি তোর জন্য কিরূপে প্রতিক্ষা করিয়া আসিতেছি, তাহা কি একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝালাপালা হইবার উপক্রম হইয়াছে—প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পারিয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে।"

আবার পরক্ষণেই আমার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ—ইত্যাদি।—আমি ত একেবার নির্বাক্—স্তম্ভিত।" আর স্বামীজীর এই স্তম্ভিত ভাব হইতেই কিন্তু এ কথা আমরা এখন ধারণা করিতে পারি যে, ঠাকুরের কথার গভীর মর্ম স্বামীজী তখন বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয়—এই প্রথম দর্শনের দিন হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী পাঁচ বৎসরকাল গুরু-শিষ্যের মধ্যে আদান-প্রদানের লীলাভিনয়ে এক বিরাট অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত বিচার ও অন্তর্যুদ্ধের মধ্য দিয়াই তিলে তিলে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পায়ে মাথা নত করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যে প্রক্রিয়ার সূচনা হইয়াছিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাহার চরম পরিণতি সংসাধিত হইল। স্বামীজী নিঃশেষে নিজেকে ঢালিয়া দিলেন ঠাকুরের পায়ে—আর ঠাকুর কাঙ্গাল হইয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন স্বামীজীর মধ্যে। তাই আত্মদান যে কে কাহাকে করিল ঠাকুর স্বামীজীকে বা স্বামীজী ঠাকুরকে, সে বিচার করা এখন অসম্ভব। তবে দক্ষিণেশ্বরের এই আত্মদানের খেলায় ভারতে যে নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছে, সেই কথাই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে।

তাহার পর দক্ষিণেশ্বরের সেই ৫/৬ বৎসরব্যাপী সুখের দিন অতীত হইয়া ধীরে ধীরে কাশীপুরের দঃখ ও বেদনাভরা দিনগুলি আসিয়া পড়িল। কিন্তু সেই পুঞ্জীভূত দুঃখ ও বেদনার কৃষ্ণযবনিকার অন্তরালেই যে সাধক নরেন্দ্রনাথের আজীবনের আকাঙ্ক্ষিত ধন সর্বমহিমায় বিরাজ করিতেছে তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তখন "শরীর ভাঙ্গিয়াছে, পরিচর্যার ছলে উৎসর্গীকৃত প্রাণগুলিকে তিনি একত্র করিয়াছেন। কাশীপুরের বাগান যেন তীর্থক্ষেত্র, থাকিয়া থাকিয়া গুরুগম্ভীর ধ্বনি—"অহং ব্রহ্মাস্মি," "শিবোঽহং," শিবোঽহং"। রাত্রির ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বৃক্ষমূলে ধুনি জ্বালিয়াছে,—সাধনার হোমকুণ্ডে তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়া ঠাকুরের সন্তানগণ তখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।" তার পর অচিন্তনীয়ভাবেই ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নির্বিকল্প সমাধিলাভে নরেন্দ্রনাথ ধন্য হইলেন। এই অবস্থার পরেই কিন্তু ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, "ওরে, তুই কি চাস্ বল দেখি ?" নিঃসঙ্কোচে নরেন্দ্রনাথ সে দিন উত্তর করিয়াছিলেন, নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।" আর ঠাকুর সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বলিয়াছিলেন, "ছিঃ, তুই এত ছোট ! আমি ত তাহা কখনও ভাবি নাই ওরে, সংসারে মানুষ দুঃখ-শোকে মরে গেল, আর তুই শুধু নিজের সুখটুকু নিয়েই বসে থাক্‌বি ? তার চাইতে বট-বৃক্ষের মত, শত তাপিত ক্লিষ্ট নর-নারী তোর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইবে। সংসারের চির-উপেক্ষিত যারা, তাদের জন্য জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তুই ধন্য হ'।" --এই সস্নেহ ভর্ৎসনা ও অনুপম গুরু-আজ্ঞাই পরবর্তী জীবনে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের প্রবল কর্মৈষণার অমৃত-উৎস। এই স্নেহের দায়িত্বই আজীবন ধ্যানসিদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দকে কর্ম হইতে কর্মান্তরে বিরাম-হীন, বিশ্রামহীনভাবে ঘুরাইয়াছে—নিজের ব্যক্তিগত সাধনা ও সমাধিসুখ লইয়া একান্তে বসিয়া থাকিতে দেয় নাই। এ ত্যাগ যে কত বড় ত্যাগ,—ইহার অন্তঃপ্রবাহ যে কত গভীর, তাহার সঠিক পরিমাপ এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। কখনও হইবে কি না, তাহাই বা কে জানে ? "অনুরাগের দায়ে এমন কাঙ্গাল হইতে জগৎ আর কখনও দেখে নাই। আনুগত্যের বোঝা বহিয়া এমন প্রেমের পরিচয় কোথাও বুঝি আর সম্ভব হয় নাই। দেহ, প্রাণ, জীবন-যৌবন, ইষ্টমূর্তির চরণে বলি দেওয়ার অসংখ্য নিদর্শন বিরল নহে, কিন্তু জন্ম জন্ম তপস্যার প্রভাবে অন্তর্দর্শনের দুয়ার যখন মুক্ত হয়, তখন সে দুয়ার বন্ধ করিয়া ইষ্টের আহ্বানে মুখ ফিরাইয়া যে দাঁড়াইতে পারে, তাহার নিঃস্বার্থ হৃদয়ের পরিচয় কেমন করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, কেমন করিয়া দেবত্বের অধিক গৌরব—এই মনুষ্যত্বের পূজো করিতে হয়, জানি না।"

এইখানেই ত মনে হয়, বুদ্ধের ত্যাগের তুলনায় স্বামীজীর ত্যাগের গভীরতা বেশী, শঙ্করের সন্ন্যাসের অপেক্ষাও স্বামীজীর সন্ন্যাস নিঃশেষে আত্মদানের দীপ্তমহিমায় মহীয়ান্। এইখানেই তো স্বর্গ আসিয়া মর্ত্যকে ধরা দিয়াছে। নির্মল মন্দাকিনী-ধারা ধূলিসমাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে আছাড় খাইয়াছে। এইখানেই সার্থক হইয়াছে বসুন্ধরা—সার্থক হইয়াছে মানুষের প্রাণ, বিশ্বমানবজাতি বিধাতার সৃষ্ট সফলতার স্বর্ণমুকুট মাথায় পরিয়া মূর্ত বিগ্রহান্বিত নরেন্দ্রনাথ। বিশ্বের মাথা তাই ইন্দ্রজালের মত এক দিন হঠাৎ তাঁহার চরণে ভূনত হইল, ভারতে বাজিয়া উঠিল জয়শঙ্খ, সে উৎসবের নহবৎ কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিল। ভারতের সে নবজন্মের পরিচয় দিবার যুগ যেন বহিয়া না যায়। দক্ষিণেশ্বরের নূতন ঋক্ আমাদের অন্তরে বাহিরে যেন ঝঙ্কার তুলিতে পারে"—এই প্রার্থনা বাণীই ছন্দে গাঁথিয়া আজ স্বামীজীর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে বাসনা করিতেছি।

ঠাকুরের সহিত স্বামীজীর দীর্ঘ ৫।৬ বৎসরের পূত সহবাসের প্রত্যেকটি দিনই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নব নব তথ্যাবিষ্কারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঠাকুর নিরন্তর সমাধি-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব আলোক প্রতিনিয়ত আনয়ন পূর্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন।" আর সিদ্ধ মহাপুরুষ

স্বামী সারদানন্দ পর্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"দুর্ভাগ্য আমাদের, তাঁহার সে সব কথা তখন কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। মনস্বী নরেন্দ্রনাথই কেবল ঐ সকল দেববাণী যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ পূর্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।

ঠাকুর শুধু বলিয়াছিলেন,—"কেদার যাহার ধ্যান করে, সে মুখ ধুইবার জল পায় না।" আর স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে ঃ—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বৈষ্ণব মতের সার ধর্ম—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন" এই তিনটি উপদেশ ভক্তগণকে বুঝাইতে যাইয়া ঠাকুর এক দিন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। "কৃষ্ণেরই সংসার, এ কথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজনে দয়া"—পর্যাপ্ত বলিয়াই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্ধ-বাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না—জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" আর ঠাকুরের অলৌকিক বাণীর স্থির প্রতিধ্বনিই স্বামীজীর London-এ প্রদত্ত "Practical Vedanta" শীর্ষক চারিটি অভিনব বক্তৃতা।

"Vedanta in home, Vedanta in hearth, Vedan a everywhere." এবং এই সূক্ষ্ম তথ্যেরই বিকাশ স্বামীজীর বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত দরিদ্রনারায়ণের সেবায়।

যে দৈবী কর্মপ্রেরণা—দায়স্বরূপে তিনি ঠাকুরের নিকট হইতে এই দীর্ঘ কয়েক বৎসরে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাকে কোন্ পথে পরিচালিত করিলে জাতি যথার্থই উপকৃত হইবে—তাহার গতিতে ঋজুতা, হৃদয়ে উদ্দীপনা এবং কর্মচিন্তায় পবিত্রতা আসিবে —"বালক স্বামীজী" তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই; এবং সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসরকাল স্বামীজী প্রায় সমগ্র ভারত পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া তাহার অতীত সভ্যতা, ধর্ম, স্থাপত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির গভীরতা ও উৎকর্ষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। প্রতি স্থানে দিনের পর দিন ধ্যানস্থ থাকিয়া ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও অতীত ভারতের সভ্যতা ও জীবনধারার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কি তীব্র উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুল প্রয়াসের মধ্য দিয়াই এই দীর্ঘ ৭ বৎসর তিনি যাপন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ("It was the struggle and torture of a lion, caught in a net.") ধনীর মর্মর প্রাসাদ ও নিঃস্বের জীর্ণ কুটীর সমভাবেই তাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল।

তারপর ভারতের জাতীয় জীবনের কোন মাহেন্দ্রক্ষণে সিংহলের নিকটবর্তী কন্যাকুমারীর মন্দিরের পাদমূলে শেষ প্রস্তর-খণ্ডটির উপর বসিয়াই সহসা তাঁহার

চক্ষুর সম্মুখ হইতে বহুদিনের সংশয়পাশ ছিন্ন হইয়া ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতির সুস্পষ্ট ধারা ফুটিয়া উঠিল। স্বামীজী বুঝিলেন, ভারতের জাতি, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীনকাল হইতেই আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্মই ভারতের প্রাণ। ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড,—আর ধর্মের উন্নতিসাধন করিতে পারিলেই ভারতের জাতীয় উন্নতিও সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। স্বামীজী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার অক্ষমতা, দাসসুলভ ঈর্ষা ও পরসুখসহিষ্ণুতাই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। সুতরাং ভারতের উন্নতিবিধান করিতে হইলে এ সমুদয় দূর করা প্রয়োজন, এবং সেই জন্যই প্রাচ্যের পক্ষে পাশ্চাত্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। ভারতের ধর্ম আছে, ধন নাই, দর্শন আছে—বিজ্ঞান নাই, মস্তিষ্ক আছে—কার্যকরী শক্তি নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশ হইতে ধর্ম ও দর্শনের বিনিময়ে ধন ও কর্মী আনিতে হইবে এবং উহা সাধন করিতে পারিলেই ভারত পুনরুজ্জীবিত হইবে—ঘরে ঘরে আবার মধুর সামগীতি পূর্বের মতই ঝঙ্কৃত হইবে।

সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ত্যাগব্রতধারী কৌপীন-সম্বল যুবক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভোগ এবং অনাচারের লীলাভূমি পাশ্চাত্য-দেশে যাত্রা এবং চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদান। কিন্তু সে মহাসভায় যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা যেমনই অলৌকিক, তেমনই অভাবনীয়। মহাসভার অধিবেশনের এক মুহূর্ত পূর্বেও কে ভাবিয়াছিল যে, পরাধীন ভারতের সর্বজন উপেক্ষিত তথাকথিত কুসংস্কারপূর্ণ (?) হিন্দুধর্মের যুবক প্রতিনিধিই ধর্ম মহাসভার সর্বোচ্চ সম্মানলাভে সমর্থ হইবেন? কে ভাবিয়াছিল যে, খৃষ্টান, য়্যহুদি, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি রথী মহারথবৃন্দের সম্মুখে এক নিঃসহায় সন্ন্যাসী যুবক উপেক্ষিত হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী তাহার শক্তিমান্ হস্তে সু-উচ্চে উড্ডীন করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু দৈবনির্দেশ কে খণ্ডন করিবে? দৈববলের নিকট মানববল কি করিতে পারে? তাই এক মুহূর্তে অভাবনীয় ও অচিন্তনীয়ভাবে অর্ধেক পৃথিবী তাঁহার পদানত হইলে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উপেক্ষা বা অস্বীকার করিবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই। স্বামীজীর আমেরিকায় থাকাকালীন তৎপরবর্তী সমুদয় ঘটনাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমেরিকাবাসিগণ এক দিন ভারতবাসীকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, 'হিদেন' বলিয়া গালি দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহারাই আবার এই মহাপুরুষের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে পারিলেও নিজেদের ধন্য মনে করিত। তাঁহার অনুপম দেবচরিত্রের প্রভাবে ধীরে ধীরে শত শত পাশ্চাত্য নর-নারী তাঁহার পায়ে মাথা নত করিতে বাধ্য হইল। ভারতহিতে উৎসর্গী-কৃতজীবন নিবেদিতা, গুডউইন, সারা-সি-বুল, সেভিয়ার দম্পতি, মিস্ ওয়াল্ডো প্রভৃতি স্বামীজীরই অগ্নিময় কর্মপ্রেরণার অলৌকিক সৃষ্টি।

এইরূপে বহির্ভারতে কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে

স্বামীজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। কিন্তু পাশ্চাত্যজগৎ স্বামীজীর যে মূর্তি দেখিয়াছিল—ভারত সে মূর্তি দেখিল না। পাশ্চাত্য জগতের যোদ্ধা বিবেকানন্দ, প্রতি পদে প্রবলপ্রতাপ-প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ধত শির নমিতকারী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ভারতে আসিয়া করুণার মূর্ত বিগ্রহরূপেই প্রকাশিত হইলেন। পশ্চিম তাহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অপ্রতিহত বীর্য, অভাবনীয় ত্যাগ দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিল। আর প্রাচী তাঁহার উদার, উন্মুক্ত, উচ্চ-নীচ সকলের সহিত সমবেদনাপূর্ণ প্রেমময় হৃদয়ের যোগ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। যে দৈব-শক্তি পাশ্চাত্য জগতে ক্ষুরধার তরবারির মতই স্বামীজীর হস্তে নিয়ত বিঘূর্ণিত হইত, তাহাই ভারতের দুঃখ-বেদনাপূর্ণ আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া করুণার অফুরন্ত অমৃতধারায় চতুর্দিকে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে নিঃস্বার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসীই ভারতের জাতীয় কর্মী, ভারতের জাতীয় জীবনস্রোত যুগে যুগে ইহাদেরই হস্তে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে—তাই ভারতে আসিয়াই স্বামীজী সেই সনাতন আদর্শানুসারে এক অভিনব কর্মিসম্প্রদায় গঠন করিতে মনস্থ করিলেন। নিজের স্ত্রী-পুত্র, ভোগ-বিলাস, কামনা-বাসনা লইয়া যে ব্যক্তি দিবারাত্র বিব্রত—দেশের জন্য, দেহ মন প্রাণ নিঃশেষে বিসর্জন দিবার তাহার সামর্থ্য কোথায়? ঊর্ধ্বতা, অনাসক্ত সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্যের কর্মী হইবার যোগ্যতা কৈ? তাই তন্ত্র, বৈষ্ণব ও গুপ্ত সন্ন্যাসীর দেশ বাঙ্গালায় স্বামী বিবেকানন্দের বর্তমান অভিনব-বৈদিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। অতি উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কর্মহীন জীবনেও অবসান, দৌর্বল্য ও সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যম্ভাবী, আর লক্ষ্যহীন কর্মিজীবন চরমে নামযশোরূপে বাস্তুরাবদ্ধ একটা আবর্জনামাত্রেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। "আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ"—স্বামীজীর এই উক্তিই সে সমস্যার অপূর্ব সমাধান। "নিজমুক্তিরূপ আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জগতের হিতসাধনে দেশপ্রাণ কর্মীকে অক্লান্তভাবে নির্ভয়ে চলিতে হইবে।"—স্বামী বিবেকানন্দের ইহাই অভ্রান্ত বিধান। "ভারতের সনাতন সাধনা ত্যাগ ও সেবা,ক্ষুধার্তের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিয়া, তৃষ্ণার্তকে জলদান করিয়া তাহার নিকট হইতে প্রতিদান প্রার্থনা করা ত ভুলই, পরন্তু এই ভাবিয়া কৃতজ্ঞ হইতে হইবে যে, পরোপকাররূপ মহাব্রত সাধন করিয়া নিজ জীবন মহিমান্বিত করিতে সেই নিরন্ন বা তৃষ্ণার্ত ভিক্ষুকই কর্মীর পরম সহায়ক—ইহাই স্বামীজীর কর্মযোগ। সমাজ-শরীরের আংশিক সংস্কার কোন দিনই স্বামীজীর কাম্য ছিল না; "Nationality, Nation-making" প্রভৃতি শব্দও তিনি কখন ব্যবহার করেন নাই,—'Man making', he said, 'was his only task'.

ভারতের জন্য তাঁহার প্রাণ দিবানিশি কিরূপ হাহাকার করিয়া কাঁদিত, তাহা ধারণা করাও আমাদের সাধ্যাতীত। ভারতের কল্যাণ-কামনায় অধীরচিত্ত স্বামীজীর এই

সময়ে মানসিক উদ্বেগ এবং চিন্তাধারার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে গিয়া তদীয় মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছিলেন,—

'India ! India ! India was his day-dream, India was his nightmare. The thought of India was to him like the air he breathed. He was born a lover and the queen of his adoration was his motherland."

তদানীন্তন রামপুর স্টেট কলেজের প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মানন্দ সিংহ এম-এ মহোদয়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় –

"He was a Tyagi (ত্যাগী), he had renounced the world, and yet India was the inmost depth of his soul. India was his love, he felt and wept for India, he died for India. India throbbed in his breast, beat in his pulses, in short, was inseperably bound up with his very life."

* * * *

"Vedantic brain, Buddhist heart and Islamic body."—এই তিনের একত্র সম্মিলনে ভবিষ্যৎ ভারত গড়িয়া উঠিবে—ইহাই স্বামীজীর ধারণা ছিল। আর তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে সেই ভাবই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। নিজের প্রিয় শিষ্যবর্গকে স্বামীজী অনেক সময়েই বলিতেন—"তোদের এত ভালবাসি. কিন্তু তবু কেবলই মনে হয়, দেশের জন্য খেটে খেটে তোরা মরে যা আমি দেখে সুখী হই।" দেশের যথার্থ কল্যাণকামী বিবেকানন্দের ইহাই ছিল যথার্থ স্বরূপ।

* * *

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে ; আর একটি কথা মাত্র। শ্রীগুরুর নিকট হইতে দায়স্বরূপে প্রাপ্ত সুমহান্ কর্মব্রত নিজ জীবনের শেষ রক্তবিন্দুদানে বীর সাধক স্বামী বিবেকানন্দ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল কর্মভার সমগ্র বাঙ্গালার যুবক ও ভারতের যুবকবৃন্দের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আজ সেই সুমহান দায়িত্ব আমরা কিরূপে বহন করিব, তাহাই গভীরভাবে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার এই পুণ্যদিনে টাঙ্গাইলের নিঃস্বার্থ, উন্নতচিত্ত যুবক কর্মি-সম্প্রদায়কে সেই কথাই ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ : যোগী ও কর্মী

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান বিশ্বের এক বিচিত্র বিস্ময়। কারণ তিনি একাধারে যোগী ও কর্মী। যোগশাস্ত্রকে (পতঞ্জল যোগদর্শন) দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বলা হয়েছে। যোগের আটটি অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সাধকের সমাধিলাভই যোগের পূর্ণ পরিণাম। এই যোগানুশীলনের দ্বারা জীব পরব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করতে পারে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের ত্রিবিধ ধারায় যোগী মায়িক সত্তার অপহ্নব ঘটিয়ে মনকে অচিন্ত্যতায় লীন করে, বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর যে-আকর্ষণ তাকে সর্বদা বিচঞ্চল করে, তাকে নিরোধ করলেই মন সর্বপ্রকার প্রাতিভাসিক অধ্যাস থেকে রক্ষা পেতে পারে। মোক্ষসাধনাই যোগদর্শনের মূলকথা ; মোক্ষ অথবা নির্বিকল্প সমাধি, যা লাভ হলে জীব জন্মজরার হাত থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করে। তাই বলা হয়েছে "যোগশ্চ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য দূর হলেই তবে মোক্ষের দ্বার উন্মোচিত হয়। দর্শন আপ্তবাক্য হলেও তার একটা প্রতীতিগম্য অবস্থানভূমি চাই। তাই ইন্দ্রিয়ময় জগৎচেতনাকে গ্রহণ করেই তাকে বর্জন করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ যোগদর্শনের আচার্য—নির্বিকল্প সমাধিযোগের দিশারী। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন অন্তরের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে। পাশ্চাত্য দর্শন তাঁর অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে পারেনি, পারেনি কোনো শাস্ত্রসংহিতা তাঁর সংশয় ও চিত্তপ্রদাহ দূর করতে ; শেষে আশ্রয় পেলেন দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধকের কাছে। তাঁর বাণী থেকে বাণী আহরণ করে, তাঁর জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে নিজের অন্তর-প্রদীপটি জ্বালিয়ে নিয়েই তাঁর সাধ্যসাধনা। ক্ষণিকের জন্য নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে তিনি নিত্যকালের জন্য চিদানন্দ-সমুদ্রে ডুবে থাকতে চাইলেন, ঠাকুরের কাছে সেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। সব ধর্মগুরু শিষ্যের এতাদৃশ অধ্যাত্ম-আকাঙ্ক্ষা দেখলে খুশিই হতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মানসপুত্রকে কেবল নিজের জন্য মোক্ষমুক্তি সন্ধান করতে দিলেন না। পূর্বযুগে সাধকগণ প্রায়ই নিজ নিজ মোক্ষমুক্তিনির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্ট হতেন, অন্যের জন্য বড়ো একটা ভাবনাচিন্তা করতেন না। বুদ্ধদেবই প্রথম নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুমের তলে বসে করুণামৈত্রীর রসে আপ্লুত হয়ে ত্রিতাপদগ্ধ মর্ত্যমানবের নির্বাণের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং এইভাবে অস্মিতার আবরণ ভেদ করে ব্রহ্মবিহার লাভ করেছিলেন।

এই মহাজীবনে উত্তীর্ণ হতে গেলে চিত্তকে শাসন করতে হবে। যোগসাধনার প্রথম পদক্ষেপ হল শান্ত স্থিতধী অচঞ্চল সত্তায় প্রতিষ্ঠা। তবেই সাধকের মোক্ষ-

মুক্তি-নির্বাণ। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী বাস্তব দর্শন এবং মোক্ষমার্গের ভাববাদী দর্শন পড়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি ; সেই তৃপ্তি ও শান্তি লাভের জন্য তিনি ঠাকুরের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখলেন, এই নবযুবক আত্মনির্বাণের যোগপন্থা অবলম্বন করার জন্য আবির্ভূত হননি, সাধু হয়ে হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে ঘুরে বেড়ানোর জন্যও তাঁর জন্ম হয় নি। শুধু যোগী হলেই চলবে না, তাঁকে কর্মী হতে হবে। কিন্তু কর্ম তো বন্ধন। কর্মের ফাঁসে আমরা নিত্য বিড়ম্বিত জীবন যাপন করছি। তাই বলে কি সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে জড়ভরত হয়ে থাকতে হবে? কর্ম মানেই বন্ধনপাশ নয় ; যে কর্মের পশ্চাতে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে, যার সঙ্গে সুখদুঃখবোধ অনুস্যূত হয়ে থাকে, অস্মিতা, মমকার অহঙ্কার যাকে বেষ্টন করে সেই কর্মটি যথার্থ বন্ধন। নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ নিস্কামভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করলেই তবে যথার্থ যোগী হওয়া যায়, তাহলেই তিনি সহজে মোক্ষের দ্বারে উপনীত হন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সেই নির্বাণ প্রার্থনা করেছিলেন যার থেকে আর ব্যুত্থান হয় না। আবরণভঙ্গের পর ঘটির জল সমুদ্রে মিশে গেলে আর কোনো পার্থক্য থাকে না। নরেন্দ্রনাথ বারেক সমাধিযোগ লাভ করে সেই ব্যাখ্যাতীত ধারণাতীত চেতনায় নিত্যকালের জন্য ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, সপ্তর্ষিলোকের এই পথভোলা পথিক শুধু সমাধিযোগের আত্মতৃপ্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারবেন না। তাঁকে জীবজীবনের দুঃখপাশ মোচন করতে হবে। সুতরাং তাঁকে কর্মের সাগরে ঝাঁপ দিতে হল। লোহা দিয়ে যেমন লোহা কাটা যায়, তেমনি কর্ম দিয়েই কর্ম ক্ষয় করতে হয়। তাই যোগী বিবেকানন্দ কর্মের পথে নেমে এলেন। শুধু যোগী হলে তিনি পুরাতনী ঋষিদের মতো হিমাচলগুহায় অবস্থান করে নিজের মোক্ষ-মুক্তির কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু তিনি দুই গোলার্ধ ভ্রমণ করে সারা ভারতের কোণে কোণে বিচরণ করে অসহায় মানুষের প্রাণের কান্না শুনলেন। দিকে দিকে তাঁর গুরুর বাণী ছড়িয়ে দিলেন। নিস্কাম কর্মই জীবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, তা হলে নিঃস্পৃহভাবে জীবসেবা করা যাবে। তাই তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন করলেন বনের বেদান্তকে মনের বেদান্তে পরিণত করলেন। য়ুরোপে-আমেরিকায় প্রচার করলেন—সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, ধ্যান ও সাধনা। কারণ পাশ্চাত্য জাতি কখনো তমোগুণের দ্বারা কবলিত, কখনো-বা রজোগুণের উত্তেজনায় অহরহ চঞ্চল, নিত্য সংঘর্ষ-সংগ্রামে লিপ্ত। তারা প্রতিমুহূর্তে গতিশীল, নিত্য ধাবমান। সুতরাং আত্মোলব্ধির জন্য তাদের শান্ত হতে হবে, শুদ্ধ হতে হবে, আত্মার গভীরে ডুব দিতে হবে। তাই তিনি তাদের কাছে বেদান্তের তত্ত্ব নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কারণ প্রতীচ্যের নরনারী শুধু কুবের ও কামের পুজো করতে শিখেছে, ইন্দ্রিয়সুখকর ভোগকেই তারা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির করেছে। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো এ আর্যবাণী তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং ভোগপ্রবৃত্তি সংযত করতে হবে, তাদের সীমাবদ্ধ সত্যকে সংকীর্ণতা থেকে তুলে ধরতে হবে। অপর দিকে বিবেকানন্দ

ইতিহাস থেকে প্রমাণ করলেন যে, ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল পরশাসনের নিগড়ে বদ্ধ থেকে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ঘোর তামসিকতাই তার কাছে সাত্ত্বিকতা বলে মনে হয়েছে। সে চলছে বটে, কিন্তু তা সম্মুখের পথে নয় একই বৃত্তপথে সে ঘোরাঘুরি করছে—"আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে"। তাই ভারতবর্ষে কর্মের বাণী ঘোষণা করবার জন্য বিবেকানন্দ ভিন্ন পন্থা নিলেন। যুবকদের নিষ্কাম কর্মের মধ্যে আহ্বান করলেন। সেবাধর্মকে একমাত্র প্রাণধর্ম বলে গ্রহণ করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন। গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা এদেশের যুবকদের বেশী প্রয়োজন। কারণ স্বাস্থ্যহীন, আশাহীন নিষ্কর্মা যুবকগণ দেশের ভারস্বরূপ। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীরা এখন কিছুদিন ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই যোগনিদ্রা দিন, যুবকগণ বরং তদ্যুত কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়ুক। কর্মই ঈশ্বর, কর্মই সাধনা, কর্মই পরম অভীপ্সিত। ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে কিন্তু কর্ম চোখের সামনে পরিদৃশ্যমান, কর্মানুশীলনই ধর্মানুশীলন। তাই তিনি যুবকদের জন্য সেবাধর্ম নির্দেশ করলেন, আতুরের সেবা, মুমূর্ষুর চিকিৎসা, নিরন্নের অন্নদান, ধর্মজ্ঞানহীন মূর্খদের বিদ্যানুশীলনের দ্বারা চক্ষুষ্মান করে তোলা—সর্বোপরি দেশভক্তি। দেশই মহামায়ার প্রতীক, দেশ শুধু মাটি মাত্র নয় তা চিন্ময়। সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য বিবেকানন্দ তরুণসমাজকে কর্মে আহ্বান করলেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, অধ্যাত্ম-যোগসাধনার সঙ্গে বিবেকানন্দ-প্রচারিত কর্মসাধনার কি সম্পর্ক? যোগসাধনার অর্থ সীমাবদ্ধ সত্তার অসীমের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। কর্মসাধনার উদ্দেশ্য বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় সংযোগ। যিনি অধ্যাত্ম-পিপাসু ও মুমুক্ষু তিনি যদি কর্মের জালে জড়িয়ে পড়েন, হোক তা শিবজ্ঞানে জীবসেবা, তাতে তাঁর পারত্রিক মুক্তি বাধা পাবে নাকি? অপরদিকে যিনি কর্মকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করেছেন, তিনি কি জড়জগতের সীমাবদ্ধতার মধ্যে বন্দী হয়েই থাকবেন? এই বিষয়ে আমাদের প্রাচীন আচার্যেরা সবসময়ে দুটির সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। কোনো কোনো আচার্য বলেছেন, "বনং বা যৌবনং বা"। হয় বনে গিয়ে ধ্যান কর, আর না হলে সংসারে থেকে যৌবন ভোগ কর—এই-ভাবে তাঁরা অধ্যাত্ম জগৎ ও বাস্তব জগৎকে স্পষ্টতঃ দুভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ধর্মার্থকামমোক্ষ সমানভাবে সেবা করতে হবে, যে একটিতে লগ্ন হয়ে থাকে, সে জঘন্য। অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনের জন্য শুধু ধর্ম-ধর্ম করলেই হবে না, সংসারের সব কাজ মিটিয়ে সর্বশেষে মোক্ষ নির্বাণ। ভারতবর্ষ এভাবে ভোগের সঙ্গে ত্যাগের রাখী বেঁধে দিয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দী থেকে ভারতে পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটেছে। উচ্চতর সভ্যতাভিমানী ভারত তার চেয়ে বহু নিম্নস্থানের অধিকারী শত্রুকে বাধা দিতে পারেন নি। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে," "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" ইত্যাদি আর্য বাক্য সামনে থাকলেও তাতে হত্যাকাণ্ড ও পরাজয়ের গ্লানি দূর হয় নি। গ্রীক আক্রমণ দূর স্মৃতিবহ, কিন্তু ইসলামের

আক্রমণ ভারতের ভিত্তিভূমি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। মুসলমান অভিযান কারীরা গ্রীক-পারসিকদের মতো লুটপাট করেই নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়নি, তারা ভারতকেই উপনিবেশরূপে মেনে নিয়েছিল। শত্রুতা বা মিত্রতা—যে কোনা সম্পর্কেই হোক না কেন, তারা প্রায় হাজার বছর ধরে এদেশ শাসন করেছে। অবশ্য সে শাসন কখনো নির্বৈর হতে পারেনি। ধর্মান্তরীকরণ ও পরধর্মবিদ্বেষের জন্য তারা সারা ভারতেই দুঃস্বপ্ন তৈরী করেছিল। হাজার বছরের শাসনের ফলে ভারতবর্ষ ইসলামের কাছ থেকে কিছু ভোগসুখের সামগ্রী, নাগরিক ঐশ্বর্য এবং কদাচিৎ কদাচিৎ সুফী সম্প্রদায়ের ভক্তিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বস্তুতঃ ভারত-ঐতিহ্যে ইসলামের গূঢ়ার্থবহ দান কোনো দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ নয়। মঠ-মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ এবং বিধর্মীদের ইসলাম ধর্মে আনবার জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ, কোথাও বা লোভ লালসার জাল বিছিয়ে অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও ধনিকগোষ্ঠীকে নিজ ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা—তার বহু বেদনাপূর্ণ দৃষ্টান্ত ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শুধু তরবারির সাহায্যে ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রভাব বিস্তার করেনি। হিন্দুসমাজের অচ্ছুৎ অপাংক্তেয় সম্প্রদায়—যারা উচ্চবর্ণের কাছ থেকে শুধু অবহেলা পেয়েছিল, তারা ইসলামধর্মের উদার বাণীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল, উপরন্তু সাধারণের ধর্মবিশ্বাস—পীরফকিরদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। সে যাই হোক, ইসলাম ধর্ম প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও অন্তর্লোকে ঝড় তুলতে পারে নি। ব্রাহ্মণ কর্মচারী নবাবসরকারে কাজকর্ম করে সায়ংকালে ঘরে ফিরে স্নানাহ্নিক করে নিজ ধর্মকর্মে লিপ্ত হতেন। অর্থাৎ ইসলামের আক্রমণে ভারতের হিন্দুসমাজ হাজার বছরের জন্য মূর্ছিত হয়ে থাকলেও তার অন্তঃপ্রকৃতিতে বিশেষ আঘাত লাগেনি। কিন্তু যুগান্ত এলো ইংরেজ শাসনে। পাশ্চাত্য শিক্ষার একদিকে যেমন ভারতবর্ষকে বাস্তব চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, তেমনি আবার তার চরিত্রের অনেকটাই কালিমালিপ্ত করেছে। ভারতের শতশতাব্দীব্যাপী নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা গভীরভাবে আহত হয়েছে আগন্তুক প্রধর্ষী, ইহকেন্দ্রিক, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা। আধুনিক জীবনের অযুত ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের দুয়ারে বন্যার মতো ভেঙ্গে পড়েছে, ভোগের অসংখ্য উপাদান ভারতবর্ষের শান্ত স্থিতধী নিরুদ্বেগ জীবনকে রাজসিক কর্মবেগ চঞ্চল করে তুলেছে। তবে ভারতবর্ষের আর্যচেতনার মধ্যে এক প্রকার গ্রহণ করবার শক্তি আছে, তাই বিপরীত ও প্রতিকূলকে ভারতবর্ষ যুগে যুগে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। তবু পাশ্চাত্য ইহবাদী জীবচেতনাকে এত সহজে মেলানো সম্ভব হল না। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে' ভারতবর্ষ কিছুকালের জন্য দিবান্ধ হয়ে পড়েছিল। সর্বপ্রথমে বাংলাদেশ সেই মানসিক মূঢ়তা থেকে সমগ্র জাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, ক্রমে সেই ভাবধারা সারা ভারতকেই প্লাবিত করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্রগণ সেই সঙ্কটে যথার্থ পথের দিশারী হয়ে এলেন, যাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দই দেশের নেতৃত্ব করেছেন। দয়ানন্দের মতো তিনি শুধু বৈদিক ধর্মানুশীলনেই অনন্ত কর্মশক্তি নিয়োগ

করলেন না, যুবসম্প্রদায়কে কর্মযজ্ঞে আহ্বান করলেন। বেদান্ত ও গীতানুশীলনের মধ্যে সেই নিষ্কাম কর্মকেই লক্ষ্য করলেন। আত্মার সীমাবদ্ধতা বিদূরণই ভারতবর্ষের মূলকথা। তার জন্য প্রয়োজন নিষ্কাম কর্ম, কর্মেই কর্মের সার্থকতা, তার ফলাফল যাই হোক না কেন। এই কর্মযোগ ও শাস্ত্রানুমোদিত ধ্যানযোগের মধ্যে বস্তুতঃ কোনো পার্থক্য নেই। যুবসমাজ যদি নৈষ্কর্ম্যের দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তবে তাই হবে যথার্থ অধ্যাত্মসাধনা। সে নিষ্কাম কর্মের স্বরূপ কী, তা স্বামীজী বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জগদ্ধিতায় মহামায়ার চরণে অর্পণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ সেই কর্মযজ্ঞ করেছেন সমগ্র জীবন ধরে, যুব-সমাজকেও সেই মন্ত্রে উদ্বোধিত করেছেন। তাঁর আয়ুষ্কাল আর একটু বেশী হলে, অর্থাৎ ১৯০২ সালে তাঁর তিরোধান না হলে, ১৯০৫ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কি ঝাঁপিয়ে পড়তেন? দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসীম মমতা ও গভীর প্রেম, তা তাঁকে হয়তো রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে টেনে নিয়ে যেতে পারত, যে বন্যাবেগ ভগিনী নিবেদিতা জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী নিশ্চয় বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আন্দোলন ও তাঁর কর্মযোগ, দেশসেবা, নরের মধ্য দিয়ে নারায়ণের উপলব্ধি কখনো এক ব্যাপার নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্যাগ তিতিক্ষা নির্যাতন স্বাধীনতা-ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবু তা একচক্ষু হরিণের মতো—শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের দ্বারা ক্ষমতা লাভের চেষ্টা। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের নেতৃত্ব করলেও শেষপর্যন্ত তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। স্বামীজীর সে আশ্রম হয়েছিল সমগ্র দেশ, সমাজ ও সম্প্রদায়।

স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রজের ক্রিয়াকর্মাদি বিচার করেছেন। একালের কেউ কেউ মনে করেন স্বামীজী আর একটু দীর্ঘজীবী হলে কংগ্রেস-প্রবর্তিত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, এবং শেষ পর্যন্ত ভিক্ষার রাজনীতি ত্যাগ করে হয়তো সন্ত্রাসবাদের রক্তপতাকা তুলে নিতেন। কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শ ও সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বিচার করলে তাঁকে কিছুতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সংকীর্ণ পথে ধরে রাখা যায় না। তিনি যে দরিদ্র মানুষের জন্য সিংহবৎ গর্জন করে উঠেছিলেন তার কারণ এই কৃষক শ্রমজীবীরা—সমগ্র সম্পদকে যারা অনন্তনাগের মতো শিরে ধারণ করে আছে, তারা উচ্চবর্ণের কাছ থেকে সামান্য মানুষের অধিকারও পাচ্ছে না। ফলে তারা ক্রমাগত তামসিকতার তমোগহ্বরে ডুবে যাচ্ছে। তাদের তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে নয়। তাদের বুকের মধ্যে তিনি নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। সে জাগরণ সম্ভব হবে কর্মের দ্বারা, কর্মের দ্বারাই তারা আত্মসম্বিৎ লাভ করবে নিজেদের হারানো সত্তাকে খুঁজে পাবে। রাজনীতি জীবনের একাংশকে খণ্ডিত করে দেখে। স্বামীজী পূর্ণ জীবনবোধের মধ্যে সকলকে অবহিত করেছিলেন। তাই তিনি হচ্ছেন

যোগসাধনা ও কর্মসাধনার যুগ্ম প্রতীক। সে যোগের অর্থ—ক্ষুদ্র জীবনকে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা, সে কর্মের অর্থ—ফলাকাঙ্ক্ষার বিসর্জন দিয়ে বিশ্বহিতে কর্ম করে যাওয়া। যুবসমাজকে তিনি সেই ঐক্যের মধ্যে আহ্বান করেছিলেন।

পরবর্তীকালে দেশনেতাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই ঐক্য বিনষ্ট হল। স্লোগান-সর্বস্ব চতুর রাজনীতি হল একমাত্র হাতিয়ার। মানুষকে না জাগিয়ে, চরিত্রকে প্রস্তুত না করে, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত না হয়ে আমরা শাসকের সঙ্গে দ্বৈরথে প্রস্তুত হয়েছি, তাও আবার অতিক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য; জোড়াতালি দিয়ে কোনো-প্রকারে ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করা। নিজেদের অপরাধের বোঝার অতিভারে তলিয়ে যাবার পূর্বেই অতি সুচতুর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারী ইংরেজ-শাসক মানে মানে সরে পড়ল বটে, কিন্তু পিছনে রেখে গেল অভিশপ্ত দেশের বিধ্বস্ত ইতিহাস। স্বামীজীর আহ্বানে সমগ্র দেশ সাড়া দিলে আজকের এ দুর্গতি কলঙ্কচিহ্ন হয়ে কপালে বিরাজ করত না। তাঁর যোগক্ষেম কর্মযজ্ঞের গূঢ় তাৎপর্য বুঝবার মতো বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দেশনেতারা হারিয়ে ফেলেছেন বলে বিবেকানন্দকে তাঁরা ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতা বলে মনে করেন। তাঁর হিন্দুধর্ম বিশেষে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। তার মৌল ভিত্তি হচ্ছে বেদান্ত, নিষ্কাম কর্ম ও মানব প্রেম। বেদান্তসূত্র বাদরায়ণ না বেদব্যাস, কে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাই নিয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু তত্ত্বের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। অবশ্য পরবর্তীকালে বেদান্তসূত্রের একাধিক ভাষ্য রচিত হয়েছিল। আচার্য শঙ্কর ছিলেন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী ও সর্বপ্রকার ভেদবিরোধী। আবার রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি ভক্তি-বাদীরা ভেদের মধ্য দিয়ে জীব-ব্রহ্মের সম্পর্কে বুঝে নিয়েছেন। সে যাই হোক, বেদান্ত-দর্শনের মূলতত্ত্বে যে-কোনো সম্প্রদায়ের পূর্ণ অধিকার। তা তিনি আস্তিক হোন, আর নাস্তিক হোন, ব্রহ্মজ্ঞানী হোন অথবা তেত্রিশকোটি দেবতার ভক্ত হন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকলেই বেদান্তের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। তার সার কথা হল নিষ্কাম কর্ম, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সাযুজ্যসাধন—যার দ্বারা অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ হয়ে ওঠে। স্বামীজী সেই ঐক্য তত্ত্বটি জীবনে গ্রহণ করবার জন্য, চিন্তামার্গে অনুশীলন করবার জন্য যুবকসমাজকে আহ্বান করেছিলেন। আমরা কি সেই আহ্বানে সাড়া দিতে পেরেছি?

সপ্তম অধ্যায়

স্বামীজী ও যুবশক্তি

"বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনো কোনো দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বৎসরাধিক সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই এই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"যুববর্ষ ও স্বামী বিবেকানন্দ"

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের প্রায় প্রতিটি বছর এসেছে এবং আশা করা যাচ্ছে আসবেও, একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়ে, নারী বর্ষ, শিশুবর্ষ প্রতিবন্ধী বর্ষ ইত্যাদি। এমনই ভাবে একটি বর্ষ ইতোমধ্যে কেটে গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছিল যুববর্ষ এবং সেই যুববর্ষের প্রতীক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিশুবর্ষের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি শিশুকে আদর্শ শিশুর জীবন এনে দেওয়া, প্রতিবন্ধীবর্ষের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি প্রতিবন্ধীকে প্রতিবন্ধকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। সম্ভবতঃ যুববর্ষেরও প্রতিশ্রুতি ছিল প্রতিটি যুবকের সামনে আদর্শ যুবকের (স্বামীজীর) জীবন ও বাণী স্থাপন করা ও তাদের সেই পথে এগিয়ে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

যুববর্ষ কেটে গেছে, যুববর্ষ পালনের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে, আশা কতটা বাস্তবে রূপ নিয়েছে, তার হিসাব এখনও হয়ত নেওয়া হয়নি। সমীক্ষকরা সময় ও শ্রম ব্যয় করলে কি ছবি পেতেন, সেটি আশাব্যঞ্জক বা হতাশার ছবি হত, তা এখনই বলা যাবে না।

অতীতে আরও অনেক তরুণ তাঁদের নিজ নিজ যুগে বিশ্বকে কাঁপিয়ে গেছেন। তবু তাঁদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে স্বামীজীকে। স্বামীজীকে যখন আদর্শ করা হয়েছে তখন তাঁর জীবন ও কর্ম অনুসরণ করা সকল যুবকেরই কর্তব্য, এবং বোধকরি আমাদের রাষ্ট্রেরও সেই অভিপ্রায়।

স্বামীজীর গুরু বলেছেন মন ও মুখ এক করতে। মুখে যা বলা হচ্ছে তা যেন মনের কথা হয়, আর মুখে যা বলা হচ্ছে তা যেন কাজেও প্রকাশ পায়। মন, মুখ ও কাজের মধ্যে অভেদ ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। স্বামীজী কি চেয়েছিলেন ও কি চাননি ; কি করেছেন ও কি নিষেধ করেছেন, তা স্মরণ রেখে যদি বলা যায় তবেই স্বামীজীকে আদর্শ মানা স্বার্থক নচেৎ নয়।

প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করে প্রশ্নের অদ্যর্থক উত্তরটি জেনে নেওয়া দরকার। প্রশ্নটি হল, স্বামীজী যা বলেছেন তা ঠিক বলেছেন তো? উত্তর যদি সত্যিই হ্যাঁ হয় (সৌজন্যের খাতিরে হ্যাঁ নয়) তবে দেখা যাক তাঁর প্রধান উপদেশ ও নির্দেশগুলি কি?

তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা (মূলধারা আজও অপরিবর্তিত) সম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন ছিল সেটাই সর্বাগ্রে দেখা যাক, কারণ শিক্ষা এমন এক বস্তু যা যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে, মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্বামীজী বলেছেন--তোমরা এখন যে শিক্ষা পাইতেছ তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে কিন্তু আবার কতকগুলি বিশেষ দোষ ও আছে, আর দোষগুলি এত বেশী যে গুণভাগ

নগণ্য হইয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না। (তিনি বারবার বলেছেন, মানুষ তৈরীকর) ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিকভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় বা যে কোন নৈতিমূলক শিক্ষায় সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, মৃত্যু অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। বালক স্কুলে গিয়া প্রথম শিখিল তার বাপ একটা মূর্খ. দ্বিতীয়তঃ তার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্যগণ ভণ্ড আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা।—বিদেশী শিক্ষার কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন —একটি শিশুর পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যদি সে এমন একটি পরিপার্শ্বিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে যেখানে সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা নেই, যেখানে শুধু ধন লিপ্সার মনোভাব, যেখানে আশৈশব তাকে চিন্তা করতে শেখান হয় জীবনে সব চেয়ে বেশী মূল্যবান জিনিস, কি করে বেশী অর্থ, বেশী ঐশ্বর্য লাভ করা, যায় কি করে বেশী মনুষ্যত্ব, বেশী মহত্ত্ব, বেশী মাধুর্য, বেশী সৌন্দর্য লাভ হয় – তা নয়। একটি নবীন জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী কক্ষপথ থেকে এভাবে কুশিক্ষার প্রভাবে সবলে বিচ্যুত করা তার আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থেকে তাকে ছিনিয়ে আনবার এমন প্রয়াস, মূল্যহীন সাধারণ জাগতিক লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দেওয়া বড়ই নির্দয় কাজ।

স্বামীজী শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—মাথায় কতকগুলো তথ্য ঢুকানো হইল যা সারা জীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত করিতে পারো তবে যে ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।

মেকলের দুরভিসন্ধিমূলক শিক্ষানীতির অসারতা সে যুগের বহু মনীষীর মতো স্বামীজীও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ঐ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের বাদামী ইংরেজ তৈরী করা; যারা দেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের সব কিছুকে নিজের করে নেবে।[১] ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ জোরদার করার জন্য এমন কিছু স্বজাতি ও স্বধর্ম বিদ্বেষী ভারতীয়র প্রয়োজন ছিল।

১ We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons. Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions in morals and in intellcct···. It is my firm belief if our plans of education are followed up there will be no: be a single idolator among the respectable classes in Bengal 30 years hence—

স্বামীজী ব্রিটিশ সরকারের ঐ শিক্ষাব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছেন—আলস্য, বুদ্ধিহীনতা কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। তোরা ভাবছিস আমরা শিক্ষিত। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ এর নাম আবার শিক্ষা? তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল, না হয় বড় জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরির চাকুরি, এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল?—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর, চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। এই অন্ন বস্ত্র সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ তৎপর হতে উপদেশ দিই।

স্বামীজী বলেছেন মহৎ ভাবগুলি থেকে কিছু বেছে নিয়ে তা পালন কর – ভাবগুলির মধ্যে আছে শ্রদ্ধা অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, সত্যবাদিতা, ভয়শূন্যতা ত্যাগ, সেবা ও স্বার্থশূন্যতা। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এই সব গুণগুলি থাকার কথা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির শক্তিকে সংহত করে তা অন্যের কল্যাণে নিয়োগ করা।

একটি কথা আমরা প্রায়ই শুনি এবং বলেও থাকি। অর্থ ধন সম্পত্তি নষ্ট হলে তা লোকসানের মধ্যেই পড়ে না। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে কিছু ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু চরিত্র নষ্ট হলে সে ক্ষতি হবে অপূরণীয়। স্বামীজী চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর চিন্তায় শিক্ষা মানে উপযুক্ত চরিত্রের অধিকারী হওয়া। তাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যাবে যা দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের কর্তব্য ঠিক মতো পালন করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী চরিত্র বলতে কি বুঝিয়েছেন তা জেনে নেওয়া দরকার। চরিত্র হল ব্যক্তির ব্যবহারের সমগ্রতা। ব্যক্তির চিন্তায়, কথায় ও কাজে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে অন্যান্য জীবের মতো পাশবিক গুণ-গুলির সঙ্গে মানবিক গুণও কিছু থাকে। অনুশীলনের দ্বারাঐ পাশবিক বৃত্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে মানবিক বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। দেবতা ও শয়তানের মধ্যে ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য নেই। তফাত কেবল স্বার্থপরতা ও স্বার্থ-শূন্যতায়। দেবতা স্বার্থশূন্যে উদার; শয়তান স্বার্থপর। আমরা অমৃতের পুত্র আমাদের স্বার্থশূন্য হতে হবে, পিতৃগৌরব বজায় রাখতে হবে। বারবার পড়ে যেমন পড়া মুখস্থ করতে হয়, বারবার অভ্যাস করে সততা, নিষ্ঠা, উদ্যম, সহনশীলতা, সৌজন্য, সহানুভূতি, আত্মসংযম, ধৈর্য, সেবাপরায়ণতা স্বার্থশূন্যতা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলিকে আয়ত্ত করতে হয়। আয়ত্ত হয়ে গেলে ব্যক্তির কাজের মধ্যেই ঐ গুণেরই প্রতিফলন ঘটবে। আগেই বলা হয়েছে ঐ সৎ গুণের সমাহারই আদর্শ চরিত্রের পরিচায়ক।

স্বামীজী একথাও বলেছেন—বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করা খুবই ভাল ও বড় কথা, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা আরও মহত্তর। যে সকল নিয়মানুসারে গ্রহ নক্ষত্রগুলি

পরিচালিত হয় সেগুলি জানা উত্তম কিন্তু যে সকল নিয়মানুসারে মানুষের কামনা মনোবৃত্তি ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি জানা অনন্তগুণে মহত্তর ও উৎকৃষ্ট।

স্বামীজীর ভাবনায় শিক্ষা ও চরিত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষিত অর্থে বই মুখস্থ করে সজীব বিশ্বকোষ হওয়া নয়, চরিত্রবান হওয়া। স্বামীজীর সমরমন্ত্র হল ভালো হও এবং ভালো কর। আগে মানুষ তৈরী কর। অবশ্যই তিনি 'মানুষ' বলতে সেই সব ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন যাদের মধ্যে মানবীয় গুণ বর্তমান। আলাসিঙ্গা ও অন্যান্যদের লেখা চিঠিতে (১০।৭।৯৩) লিখেছিলেন —'India wants the sacrifice of at least a thousand of her youngmen —men, mind not brutes.'

এখানে লক্ষ্যণীয় স্বামীজী মানবিক গুণ শূন্য ও চরিত্রহীন ব্যক্তিকে সরাসরি পশু বলতে দ্বিধা করেন নি।

স্বামীজী তাঁর স্বদেশমন্ত্রে পরানুবাদ ও পরানুকরণের নিন্দা করেছেন। চাল-চলন, আচার-আচরণ, সব ব্যাপারেই আমরা বিদেশীদের অনুকরণ করতে ভালোবাসি। আমাদের ভারতীয় ধারাকে ভোলার জন্য, তা ত্যাগ করার জন্য আমরা অনেকে বিশেষভাবে আগ্রহী। এই প্রবণতা স্বাধীনতার আগে যতটুকু ছিল এবং যত কম লোকের মধ্যে ছিল স্বাধীনতার পর তা ভয়াবহ আকারে বহু মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। সংক্রামক রোগের মতো এর সংক্রমন ক্ষমতা খুব বেশী। আহারে বিহারে কথায় ও আচরণে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিদেশীর অনুকরণযোগ্য জীবনযাত্রার প্রতি আমাদের আগ্রহ বেড়ে চলেছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধা গভীরতর হচ্ছে। 'এখনও কুমার সম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়া ও উড়িষ্যার শিল্পীর তৈরী প্রস্তর শিল্পের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে বিলেতী চিনা মাটির তৈরী পুতুলের দিকে হাঁ করিয়া তাকাবার প্রবণতা থেকে গেছে।' এর কারণ স্বামীজীর কথায় আত্মবিশ্বাসের অভাব। তিনি সতর্ক করে বলে গেছেন--কোন মানুষ বা কোন জাত যেদিন থেকে নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে সেদিন থেকেই তার মৃত্যু শুরু হয়। বিদেশীর শাসনকালে বিদেশী শিক্ষা দিয়ে ভারতীয়কে বাদামী ইংরেজ করার প্রত্যক্ষ চেষ্টা হয়েছিল বিদেশীর নিজস্ব স্বার্থে। নিজের দেশের অতীত এমনকি নিজের বাপ ঠাকুর্দাকেও ঘৃণা করতে শেখানর যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা আজও বহাল আছে--বরং উপযুক্ত পরিচর্যার ফলে তা সম্ভব হয়েছে, বিস্তার লাভ করেছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদির জয়যাত্রা অব্যাহত।

স্বামীজীর কাছে ধর্ম অর্থে জীবরূপী শিবের সেবা। গরীব মানুষের মুখে অন্ন যোগাড় করে দেওয়াই, তাঁর কাছে ধর্ম। আলাসিঙ্গাকে ২০।৮।৯৩ তারিখের চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন—"The poor, the low, the sinner in India have no friends as help—they cannot rise, try however they may. ···The Lord once more came to you as Buddha and faught you how to feel, how to

sympathise with the poor : the miserable the sinner, but you heard Him not. "স্বামীজী এই অবহেলিত দরিদ্র মানুষকে ভালোবেসেছিলেন তাই বলতে পেরেছিলেন—"নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অপমান ও শোষণের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—ভারতের উপেক্ষিত কৃষক তাঁতি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিজেতার নিপীড়ন ও স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা সত্বেও স্মরণাতীত কাল থেকে নীরবে কাজ করিয়া আসিতেছে অবহেলা ও অবজ্ঞার ফলে তাহারাও যে মানুষ সেই হুঁসটুকুও লোপ পাইয়াছে। ফলে তাহারা আত্মসম্ভ্রমহীন ক্রীতদাসের শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলেছেন; চিরপ্রবহমানা, নির্ঝরিণী আমাদের সম্পত্তি অথচ জনসাধারণকে পরিবেশন করিতেছি নর্দমার জল।…তাহাদের পরিশ্রমজাত ফলের সারাংশ চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায় আত্মসাৎ করিয়াছে। এই সব ম্লান মূক জনসাধারণকে তোমাদের আরাধ্য দেবতা মনে করিয়া অবিরত তাহাদের কথা ভাব, তাহাদের সেবা কর।—যতদিন ভারতের কোটি কোটি নরনারী অশিক্ষিত বুভুক্ষু থাকিবে ততদিন উহাদের কল্যাণ সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন হইয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেককেই আমি দেশদ্রোহী মনে করি। নিঃস্ব ব্যক্তিদের নিষ্পেষণ করিয়া যাহারা সদর্পে জাঁকজমক করিয়া বেড়াইবার অর্থ সংগ্রহ করিতেছে, অথচ বিশ কোটি ক্ষুধার্ত বর্বরপ্রায় ভারতবাসীর জন্য কিছুই করে না, তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য।—আমি কোটি কোটি অনাহার ক্লিষ্টের আর্তনাদের আড়ালে ব্যক্তিসুখের সন্ধান করব না। জীবন্ত দেবতাকে ঠেলে তাঁর অনন্ত প্রকাশের অবমাননা করব না।

স্বামীজী বারবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা শুনিয়েছেন। শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন—শ্রদ্ধা চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। আমি চাই এই শ্রদ্ধা।—তিনি আরও বলেছেন—আমাদের জাতির শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে, সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও।

শ্রদ্ধার অভাব হলেই ঘৃণার প্রাবল্য ঘটে। আমাদের জনজীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মনোভাব নেই, পরিবর্তে একে অপরকে ঘৃণা করার প্রবণতা তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন অপরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, অপরদিকে তেমন উদারতার অভাব। ব্যক্তি আপন আপন স্বার্থরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর।

এই স্বার্থসচেতনতা থেকে জন্ম নেয় বিশেষ অধিকার ভোগের ইচ্ছা। স্বামীজী এর বিরোধিতা করে বলেছেন- বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলংক স্বরূপ।…প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা। দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয় তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী সে তাহাদের উপর একটি অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অধিকার লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে সেইজন্য সে অধিকতর সুবিধার দাবী করে।

স্বামীজী সখেদে বলেছেন -আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে। আমাদের কার্যে মহা বুদ্ধিভেদ। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

স্বামীজী ইউরোপ আমেরিকায় স্ত্রী স্বাধীনতা ও সম্মান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আজ থেকে একশ বছর আগে তিনি ভারতীয় নারীর উন্নতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন —যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই ; সে দেশ সে জাত কখনও বড় হতে পারে নি ; কস্মিনকালেও পারবে না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।

নারীর অবমাননার জন্য যিনি এতো কাতর, যিনি নারীর উন্নতির জন্য এতো উৎসাহী তাঁর মতে ভারতীয় নারীর উন্নতি হবে এদেশীয় ধারাতেই। স্বামীজী তাই বলেছেন এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের চরিত্র, সেবাভাব. স্নেহ দয়া. তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায় পৃথিবীর আর কোথাও দেখলুম না—আমাদের নারীদিগকে আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিবার যে সকল চেষ্টা হইতেছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতা চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে তবে সেগুলি বিফল হইবে। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ। নারীগণের আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম বিসর্জন দিয়া নহে। যে শিক্ষাকালে প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত যুগের নারী-জাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলি বা মহত্ব বিকাশে সহায়তা করিতে সমর্থ তাহাই আদর্শ শিক্ষা।

স্বামীজী এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক ইহা আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়া যদি তাহা করিতে হয় তবে নয়। তোমরা যাহা জান তাহার জন্য তোমাদের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তোমরা যেভাবে মন্দকে ফুল দিয়া ঢাকিয়া চল তাহা আমি পছন্দ করি না।

চরিত্রের উপর স্বামীজী বরাবর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন --সতীত্বের

জন্য প্রাণ দিতে (তারা যেন) কাতর না হয়। ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্যা, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালন এ সব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। আদর্শ নারী চরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা এদের জীবন চরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।

নারী শিক্ষা ও মুক্তি সম্পর্কে স্বামীজীর অপর ইচ্ছাও জানিয়েছেন—আমরা কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করবো।···ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে তবে তো দেশের কল্যাণ, ভারতের কল্যাণ।

দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বামীজী বলেছেন মানুষের সততার উপর, ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই বেশি দিন টিকিতে পারে না। ভারতের মতো বহু ধর্ম ও বহু ভাষার দেশে সুস্থ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ধর্মের সংহতি চাই। জাতির কল্যাণের জন্য পরস্পরের সর্ববিধ মতভেদ ও অকিঞ্চিৎকর কলহ বর্জন করতে হবে। স্বামীজী অদ্ব্যর্থক ভাষায় বলেছেন ···আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মেলনভূমি। ঐ ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐক্যের মূল।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না স্বামীজী মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য কি ভেবেছিলেন। তিনি যা ভেবেছিলেন ও করতে চেয়েছিলেন তা যদি বাস্তবায়িত করা হয় তবেই তাঁর মতো মহাপুরুষকে যুববর্ষের আদর্শ পুরুষ নির্বাচন স্বার্থক; পরিবর্তে যদি দেখা যায় তাঁর আদর্শ পথে চলার ও চালানর জন্য কোন সক্রিয় ও সাধু প্রচেষ্টা করা হয় নি, তবে স্বামীজীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।

অষ্টম অধ্যায়

সোভিয়েতে বিবেকানন্দ-চর্চা

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে দুই সোভিয়েত লেখক

অমিয়কুমার মজুমদার

সোভিয়েত দেশে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা নিয়ে বহুদিন যাবৎ নানা প্রকার গবেষণা চলছে। আমি বর্তমান প্রবন্ধে দুজন গবেষককে বেছে নিয়েছি; একজন ডঃ ওয়াই চেলিসেভ, ইনি মস্কোস্থিত Institute of Asian Studies-এর অধ্যক্ষ। অপর জন ডঃ ভি. এস. কোস্টিউচেন্‌কো, ইনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার।

চেলিসেভ বিবেকানন্দকে একজন মানবমিত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে বিবেকানন্দের মানবিকতা ইউরোপীয় মানবিকতাবোধ থেকে স্বরূপতঃ ভিন্ন। মানুষকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, তাকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিবেকানন্দ জীব-শিব তত্ত্ব প্রচার করেছেন। মানুষ বিবেকানন্দের কাছে ঈশ্বর (I call that God which ignorant people call man)। মানব-শরীরের অন্তস্থিত মানবাত্মাই একমাত্র পূজার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মানুষে, কীট পতঙ্গে, পশুতে, লতাগুল্মে— সর্বত্রই বিরাজমান; মানুষের সঙ্গে কীটপতঙ্গের প্রভেদ শুধু ব্রহ্মশক্তির প্রকাশের তারতম্যে।

চেলিসেভ বিবেকানন্দের মানবিকতা বোধের ভিত্তিভূমিতে যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে একথা স্বীকার করেন না। তথাপি তিনি বিবেকানন্দের মানবিকতাবোধের ব্যবহারিক প্রত্যয়ের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তাঁর মতে, মানুষের দাসত্বমোচনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার অদম্য অভিলাষ, মানুষের দায়িত্ববোধ ও মর্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা—এ সবই বিবেকানন্দের অমূল্য দান। বিবেকানন্দের মতে, যে জনসাধারণ, কৃষক, শ্রমিক, মজুর আমাদের সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে যাদের শ্রমের বিনিময়ে আমরা বিরাট অট্টালিকা কলকারখানা প্রভৃতি পেয়েছি, তাদের প্রতি আমাদের চরম ঔদাসীন্য মহাপাপ। কাজেই বিবেকানন্দ শুধু দরিদ্র, বঞ্চিত, শোষিত সাধারণ মানুষের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি তাদের জীবনকে সামগ্রিকভাবে রূপান্তরিত করে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই প্রচেষ্টা কতকগুলি ছোটখাট সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি বৈপ্লবিক। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে একটা জাতির ঐতিহাসিক অগ্রগতির মূলে প্রধান অবদান হচ্ছে জনসাধারণের (the masses)। তাই তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে শূদ্র রাজত্ব একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য বিবেকানন্দ কোনরূপ রক্তাক্ত বিপ্লবের সুপারিশ করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে ওপরতলার মানুষের শুভবুদ্ধি একদিন জাগ্রত হবে এবং

তারা বেদান্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল রকম বিশেষ সুযোগ সুবিধা নেবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবে।

চেলিসেভ মনে করেন, এ সব উক্তি শুধু একটি কথাই প্রমাণিত করে যে বিবেকানন্দ ছিলেন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী (Utopian Socialist)। তবুও চেলিসেভ একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে বিবেকানন্দের রচনায় অস্পষ্টতা থাকলেও তাঁর প্রাণ ছিল ভারতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্য আমরণ সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামে তিনি যুবশক্তিকে এবং শ্রমজীবীকে শরিক করে নিয়েছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অমানুষিক অত্যাচার এবং শোষণ সম্বন্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ ও মেধাবী যুবক আর চরিত্রবান এবং বীর্যবান মানুষ তৈরী করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। চেলিসেভ মনে করেন, বিবেকানন্দ চিরকালই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামী সৈনিক হিসেবে এগিয়ে এসেছেন। একদিকে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার সংঘবদ্ধতা, স্ত্রীস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ যেমন প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তেমনি ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়া আদর্শবাদ, পুঁজিবাদের অসম প্রতিযোগিতা লাভের প্রতি অদম্য লালসা, শোষক শ্রেণীর অত্যুগ্র বিলাসবহুল জীবনযাপন —এ সকলেরও নিন্দা করেছেন। বিদেশে গণতন্ত্রের নামে যে প্রহসন চলছে যে ধনী, সে ভোট কিনে নিচ্ছে, গঠিত সরকারকে নিজের পায়ের তলায় পিষে রাখছে, নানাবিধ ছলের মাধ্যমে দরিদ্রের জীবনের রসটুকু নিংড়ে নিচ্ছে। চেলিসেভ আক্ষেপ করেছেন যে যদিও রুশ বিপ্লবী ক্রপটকিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনার কথা বিবেকানন্দ জীবনীতে পাওয়া যায়, তবুও উভয়ের মধ্যে কি কি বিষয়ের আলাপ আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন দলিল আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই।

অপর রুশ লেখক কোস্টিউচেনকো মোটামুটিভাবে বিবেকানন্দের অবদানের একজন অনুরক্ত সমজদার। তিনি বিবেকানন্দের বেদান্তভিত্তিক জাতীয়তাবাদের একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভারতকে শোষণ করবার জন্য কি জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। স্যালিসবেরী নামে একজন উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারী নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ "যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের রক্ত শুষে নেওয়া, সেইজন্য আমাদের অস্ত্রোপচারের ছুরি সেই জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে যেখানে আসলে রক্তের আধিক্য আছে।" কোস্টিউচেনকো এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে বৃটিশ শাসকদের রক্ত লোলুপতা এত তীব্র ছিল যে ভারতবর্ষের সমাজদেহে যেখানে রক্তাল্পতা ছিল, সেখানেও তারা ছুরি চালিয়েছেন।

কোস্টিউচেনকো মন্তব্য করেছেন যে বিবেকানন্দের তীব্র স্বদেশপ্রীতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল আমেরিকা থেকে অর্থ সাহায্য এনে ভারতের দুর্গত, নিরন্ন, বঞ্চিত জনসাধারণের উন্নতি বিধান করা। কিন্তু তাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি।

আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে বিদেশকে জয় করাও বিবেকানন্দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিসংখ্যানের সাহায্যে কোস্‌টিউচেনকো দেখিয়েছেন যে বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচারের পরেও আমেরিকাতে যখন ১ লক্ষ বৌদ্ধধর্মমতাবলম্বী লোক ছিলেন, সেখানে বৈদান্তিক ছিলেন, মাত্র ১ হাজার। এ সত্ত্বেও বিবেকানন্দের বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশে বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি কি সুফল পেয়েছিলেন তার মূল্যায়ন করেছেন লেখক। লেখকের মতে বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী ভারতের সম্বন্ধে বিদেশীর মনের বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর রাজযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ সম্বন্ধে ভাষণ আমেরিকাবাসীদের মনে ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্রেক করে। বিবেকানন্দ যদিও নিজেকে বারবার শ্রীরামকৃষ্ণের দাস বা দীন সেবক বলে অভিহিত করেছেন তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-সূত্রের সুসমঞ্জস ও সামগ্রিক ভাষা রচনা করে রামকৃষ্ণ ভাবনাকে সংহত রূপ দিয়েছেন। যেমন ধরা যাক শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের পরিকল্পনা। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ এত গভীর ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন যা একান্তই তাঁর নিজস্ব, যদিও এ ভাবনা শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তার মধ্যে বীজ আকারে নিহিত ছিল বলা যেতে পারে। শিক্ষায় কারিগরী বিদ্যা ও বিজ্ঞানের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, ব্যবহারিক শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে কোন বিভেদ আছে কি না এবিষয়েও বিবেকানন্দ মৌলিক, এবং কখনও কখনও বৈপ্লবিক মতামত প্রকাশ করেছেন। রহস্যবাদ ও ইন্দ্রজালের সঙ্গে প্রকৃত অপরোক্ষানুভূতির প্রভেদ কোথায় একথাও বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতের জাতীয় সমস্যাগুলিকে বিবেকানন্দ পুরোভাগে রেখেছিলেন কারণ তাঁর অনুভূতি-সঞ্জাত উক্তি ছিল ঃ "ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।" ভারতের সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভই ছিল বিবেকানন্দের লক্ষ্য।

চেলিসেভের মত কোস্‌টিউচেনকোও মনে করেন বিবেকানন্দের বিপ্লব চিন্তা আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ কাল্পনিক (Utopian)। তবুও কোস্‌টিউচেনকো স্বীকার করেছেন যে বিবেকানন্দই ভারতের জাতীয় নেতাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি অনুভব করেছিলেন যে জনসাধারণ —শ্রমিক, কৃষিজীবী, মজুর — যদি জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে তাহলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন কোনদিনই সার্থক হবে না। বিবেকানন্দ ভাবনার মধ্যে লেখক তিনটি প্রধান সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমত, বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে একটি সর্বজনীন ধর্ম (যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের ধর্ম) প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েছেন বিবেকানন্দ। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। তৃতীয়ত, খাঁটি মানুষ যে দেহে ও মনে শক্তিশালী চারিত্রিক বলে বলীয়ান, যে "অভীঃ" মন্ত্রকে জীবনের অন্যতম মন্ত্র বলে গ্রহণ করেছে তাকে তৈরী করা ছিল বিবেকানন্দের দিনের চিন্তা ও রাতের স্বপ্ন। ধর্মভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে, বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতের দুঃখদুর্দশা দূর হবে—বিবেকানন্দের

এই প্রত্যয়, কোস্‌টিউচেন্‌কো গ্রহণ করতে নারাজ। যে অর্থে বিবেকানন্দ বেদান্তকে সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয়ের কথা বলেছেন তাকেও কোসটিউচেন্‌কো অতিসরলীকরণ বলে মন্তব্য করেছেন।

এই দুইজন রুশ লেখক বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাসংগ্রাম সম্বন্ধে যেমন সাধুবাদ করেছেন, তেমনি বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্ম তাঁর অদ্বৈতবাদ বা বেদান্তভিত্তিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বেদান্ত বা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি এঁদের অনাহার কারণ বোধ হয় এই যে এঁরা কি অর্থে বেদান্ত বা ধর্ম কথাটি বিবেকানন্দ ব্যবহার করেছেন তা খুঁটিয়ে দেখেন নি।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আগে সাধারণত "বেদান্ত' বলতে উত্তর ভারতের লোকেরা শংকর প্রবর্তিত অদ্বৈতবেদান্তকেই বুঝতেন, আবার দক্ষিণ ভারতের লোকেরা "বেদান্ত" বলতে বুঝতেন রামানুজ-প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিবেকানন্দই প্রথমে "বেদান্ত' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। এই অর্থ ও তাৎপর্য একান্ত তাঁর নিজস্ব। বেদান্ত একাধারে দর্শন ও ধর্ম, পৃথিবীর সকল ধর্মমতই বেদান্তের অন্তর্গত এবং পৃথিবীতে মানুষ যেখানে যে শুভ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে, যেমন জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়, যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয়, বিজ্ঞান ও রহস্যবাদের সমন্বয়—সেখানেই বেদান্ত পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কর্মযোগ ও অপরোক্ষানুভূতি, মানুষের সেবা ও ঈশ্বরের উপলব্ধি—বেদান্তের দৃষ্টিতে একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। একদিকে 'বেদান্ত' কথাটি যেমন বিবেকানন্দ ব্যাপক ও সমন্বিত অর্থে ব্যবহার করেছেন, যে অর্থ একান্তই তার নিজস্ব তেমনি আবার "বেদান্ত" ও "বিবেকানন্দের বাণী" সমার্থক বলে তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, আলাসিঙ্গাকে লেখা তাঁর ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ তারিখে লেখা চিঠি, যেখানে বিবেকানন্দ বলছেন আমি নানা ভাবে বেদান্তের শিক্ষাই প্রচার করছি। গোঁড়া, কেতাবী দার্শনিকেরা বিবেকানন্দের বেদান্ত ব্যাখ্যা হয়ত মানতে অস্বীকার করবেন। কিন্তু একথা কোনমতেই ভুললে চলবে না যে, ইতিহাসের ও তুলনামূলক ধর্মের একনিষ্ঠ ছাত্র হিসাবে বিবেকানন্দের বেদান্ত মূল্যায়ন অনন্য ও বিস্ময়কর। শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ বেদমূর্তি আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন বেদবেদান্তের জীবন্ত ভাষ্য। আগে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলে, বেদ-বেদান্ত পড়া নিরর্থক হয়ে যায়। একথা অনস্বীকার্য যে বিবেকানন্দের বেদান্তভাবনা তাঁর নিজের উপলব্ধি-সঞ্জাত। কাজেই প্রচলিত কেতাবী ভাষ্যকে তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। যখনই প্রচলিত বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে বেদান্তের আপাতবিরোধ তিনি লক্ষ্য করেছেন তখনই তিনি সাংখ্যদর্শনের গ্রহণযোগ্য প্রত্যয়গুলি মেনে নিয়ে বেদান্তের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ তিনি সাংখ্য ও বেদান্তের বিরোধের অংশ বর্জন করে যেখানে উভয়ের মধ্যে মিল আছে সেটুকু গ্রহণ করেছেন। বিবেকানন্দ বেদান্ত সম্বন্ধে যে নতুন কথা জগৎবাসীকে শোনালেন সে কথাগুলি

যুক্তিপরম্পরা থেকে নিঃসৃত কোন সিদ্ধান্ত নয়। অপরোক্ষানুভূতি-সঞ্জাত এক অতীন্দ্রিয় সত্যের কথাই তিনি বলেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ: "যতদিন আমি এই পৃথিবীতে থেকে কাজ করে যাচ্ছি ভাবছি, আসলে শ্রীরামকৃষ্ণই আমার ভিতর থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। জগৎকে দেবার মত আমার একটা বাণী আছে এবং সেটা আমি আমার মত করেই দোব। আমি হিন্দুয়ানি, খৃষ্টানি, ইসলামীয় -কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করে আমার বাণী প্রচার করব না। "I will only Myizc it"—আমি আমার মত করে বলব।" এইখানেই আমাদের মত সাধারণ মানুষের অসুবিধা। আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিবেকানন্দকে বিচার করতে যাই। কিন্তু তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারের নাগালের বাইরে। ৬ই মে, ১৮৯৫ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠি: "সকল ধর্মের সার সত্যই বেদান্তের মধ্যে নিহিত আছে, অর্থাৎ বেদান্তের তিনটি সোপানের মধ্যে নিহিত আছে। এই তিনটি সোপান হল, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। একটির পরে আর একটির আবির্ভাব। মানুষের আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের জন্য তিনটিরই প্রয়োজন। ভারতের বিভিন্ন জাতিগত ও মতাদর্শগত আচার ব্যবহারের প্রতি বেদান্তের প্রয়োগ হলেই তার নাম হয় হিন্দুধর্ম। ইউরোপের জাতিগত গোষ্ঠীর ওপর দ্বৈতবেদান্তের প্রয়োগ হলে তার নাম হয় খৃষ্টধর্ম। সেমিটিক গোষ্ঠীর ওপর ঐ একই দ্বৈতবেদান্তের প্রয়োগ হলে আমরা বলি ইসলামধর্ম; যোগজ প্রত্যক্ষের ওপর অদ্বৈত বেদান্তের প্রয়োগ হলে তার নাম হয় বৌদ্ধধর্ম। বেদান্তের মূলসূত্রগুলি বিভিন্ন জাতির প্রয়োজন, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বিবেকানন্দের এই আবিষ্কার এক অর্থে বৈপ্লবিক আবিষ্কার। বেদান্ত কি অর্থে, শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর, সংস্কৃতি ও উজ্জীবনের ভিত্তিভূমি সেকথা আজ আমাদের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। রুশ লেখকেরা শুধু চিন্তা, বিচার, বিতর্ক অবলম্বন করে বিবেকানন্দকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। সেইজন্য তাঁদের সিদ্ধান্ত একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের কণ্ঠে যেসব গান শুনতে ভালবাসতেন তার একটি ছিল: (আমায়) দে মা পাগল করে। আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে। বলতেন, ঈশ্বর বেদবিধির পার। বেদবেদান্ত শাস্ত্র পড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়? এই সাধনের জগৎ, এই অপরোক্ষানুভূতির জগতের সন্ধান পেতে হলে প্রথমেই প্রার্থনা করতে হবে: আমার বিচারের মাথায় বজ্রাঘাত হোক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, নরেন যেদিন আপনাকে জানতে পারবে, সেদিন আর দেহ রাখবে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিবেকানন্দকে না দেখলে কেন তিনি সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি-ভূমিতে বেদান্তকে বসিয়েছিলেন সেকথা বোঝা যাবে না। যে মানবিকতাবোধের কথা রুশ লেখকেরা বলেছেন সে মানবিকতাবোধের মূলেও রয়েছে মানুষের অন্তর্নিহিত ভগবত সত্তা Every man is Potentially divine। এই মূল প্রত্যয়টি ভুলে গেলে বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেম, তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রাম, মানুষের উজ্জীবনের জন্য তাঁর

অনলস প্রয়াস --কিছুই উপলব্ধি করা যাবেনা। ১৯শে মার্চ ১৮৯৪ তারিখে রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত বিবেকানন্দের উক্তি: "তোমরা হয়ত মনে করতে পার কি utopian nonsense ! (বিবেকানন্দের আদর্শ সম্বন্ধে)। আমার ভিতরে কি আছে তোমরা মোটেই জাননা। আমাদের ভেতর যদি কেউ আমার পরিকল্পনা সফল করতে সহায়তা করে তাহলে উত্তম, নতুবা আমার গুরুদেবই আমাকে পথ দেখাবেন।"

সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসেছিলেন অধ্যাপক ড. ই. পি. চেলিশেভ। অধ্যাপক চেলিশেভ সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ভারততত্ত্ববিদ্। বেশ কিছুকাল আগে তিনি ছিলেন মস্কোর ইনস্টিট্যুট অব এশিয়ান স্টাডিস-এর অধিকর্তা সমসাময়িক ভারতীয়, বিশেষতঃ হিন্দি সাহিত্য বিষয়ে তিনি একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। বহু বছর তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিট্যুট অব্ ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস-এ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় প্রধানের পদ অলংকৃত করেছেন। বর্তমানে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স আকাডেমীর অ্যাসোসিয়েট-মেম্বার, সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়নের সদস্য, সোভিয়েত শান্তি কমিটির সভ্য এবং সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী পরিষদের সহসভাপতি। অধ্যাপক চেলিশেভ জওহরলাল নেহেরু শান্তি পুরস্কারেও সম্মানিত। মোট কথা অধ্যাপক চেলিশেভ বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য ও কৃষ্টি জগতের একজন প্রধান পুরুষ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের একটি বিশেষ প্রিয় ক্ষেত্র স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর বছর কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ সেণ্টিনারি মেমোরিয়্যাল ভলুম'-এ স্বামীজী সম্পর্কে অধ্যাপক চেলিশেভের একটি অসাধারণ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ আছে। গত তিরিশ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়াতে বিবেকানন্দ-চর্চা এবং বিবেকানন্দ-গবেষণার প্রসারের কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। শুনেছিলাম বর্তমানে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের জন্য ভারতে এসেছেন।

কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব্ কালচারের আন্তর্জাতিক অতিথিভবনে তাঁর সঙ্গে যেদিন দেখা হল সেদিন ছিল নভেম্বরের শেষ দিন। সেটাই অবশ্য আমার প্রথম দেখা নয় তাঁর সঙ্গে। তবে স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সেই প্রথম গেলাম তাঁর কাছে।

সকাল নটা। ঘরে একাই বসেছিলেন তিনি। হাতে একখানা বই—পড়ছিলেন। সদা হাস্যময় মানুষটি আমাকে দেখেই উচ্ছল হয়ে উঠলেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হিন্দিতে বললেন : 'আসুন, আসুন নমস্কার।' এর আগে দেখেছি, অধ্যাপক চেলিশেভ চোস্ত হিন্দীতে অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন বললাম : কি পড়ছিলেন? হাতের বইটি পাশে রেখে বললেন : "ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ইট্স সিক্রেট।" এটা বিবেকানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস-এর দ্বিতীয় খণ্ড। বিবেকানন্দের লেখা আমার খুব প্রিয়। খুব ভাল লাগে পড়তে। আপনি আমাকে বিবেকানন্দের একটি ছোট মূর্তি যোগাড় করে দিতে পারেন? শুনেছি কলকাতায় নাকি ঐরকম মূর্তি পাওয়া যায়। মস্কোতে

আমার ঘরে টেবিলে মূর্তিটি রাখব। আমি বললাম ঃ চেষ্টা করব যোগাড় করতে। তারপর বললাম ঃ অধ্যাপক চেলিশেভ, আপনি বলছিলেন বিবেকানন্দের লেখা আপনার খুব ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ডঃ চেলিশেভের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ঃ 'নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন। বিবেকানন্দের লেখা শুধু যে আমারই ভাল লাগে তাই নয়, সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন যাঁরা বিবেকানন্দকে ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তাঁর লেখা। আর মানুষের প্রতি কী গভীর দরদ! প্রায় নব্বই বছরের পুরানো হলেও তার লেখা আজও সমান তেজোদীপ্ত, সমানভাবে প্রেরণাপ্রদ। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশবাসীর মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে। আমরা মনে করি, বিবেকানন্দের চিন্তা, তাঁর আদর্শ, তাঁর রচনা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।'

প্রশ্ন করলাম ঃ কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী ধর্ম জগতের মানুষ। মার্কসবাদী হয়েও তাঁর প্রতি আপনার এবং আপনার দেশের মানুষদের এই আকর্ষণ, আপনার এখানকার মার্কসবাদী বন্ধুদের অনেককে অবাক করবে না?

ডঃ চেলিশেভ আমার মুখ থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন ঃ 'আমাকে এদেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নন? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার যে-সব মার্কসবাদী বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাবশতঃ বিবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে ধরে নিয়ে বসে আছেন। বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি খুব ভালভাবে পড়েছি এবং তার উপর পড়েছি তাঁর কয়েক খানা প্রামাণিক জীবনী। তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে বিবেকানন্দকে যদি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারক হিসাবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে একটা বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায় বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান "প্রফেট"। তিনি ছিলেন মৌলিক ভাবনাসম্পন্ন একজন চিন্তানায়ক, স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্র-প্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিনাশ চাইতেন সামাজিক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন সকল রকম শোষণের—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। সর্বপ্রকার বিশেষ অধিকার ও সুবিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি।

সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ তাই এত জনপ্রিয়। তিনি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সর্বহারাদের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, নিজেকে একজন সমাজ-তন্ত্রবাদী বলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীণ সচ্ছল এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার। অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন হাতিয়ার হিসেবে।' আমি সংশোধন করে বললাম : হাতিয়ার নয়, ভিত্তি হিসেবে। ডঃ চেলিশেভ বললেন : 'মার্কসীয় পরিভাষায় দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। সে যাই হোক, এই নীতির সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। লক্ষ যদি এক হয়, তাহলে মতের ভিন্নতা আপত্তির কারণ হতে পারে না। দেশ কাল অবস্থা ভেদে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর ভারতবর্ষ ? তার মাটিতেই তো ধর্ম। তাই বিবেকানন্দের মতো বিচক্ষণ সমাজনায়ক যদি ধর্মকে ভিত্তি করে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত মানুষদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তাতে দোষ কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায় ?'

প্রশ্ন : কিন্তু যাঁরা দোষ দেখেন, বিরোধ খুঁজে পান ?

উত্তর : 'সেটা যাঁরা দেখেন, তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। তাঁরা বোঝেন না তথাকথিত যে-ধর্মকে মার্কস-লেনিন নিন্দা করেছেন, তাকে তো বিবেকানন্দও নিন্দা করেছেন। সেটা হল ধর্মের নামে, অর্থাৎ ধর্ম বলে যা চলে তা প্রীস্টক্র্যাফ্ট—পুরোহিততন্ত্র। সেটা তো সত্যিই শোষণের হাতিয়ার—কি ভারতবর্ষে, কি অন্য দেশে। বিবেকানন্দ যাকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন তা হল মানবতাবাদ, মানুষের প্রতি দরদ, মানুষের প্রতি ভালবাসা। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল গভীর মানবপ্রেম।'

প্রশ্ন : সেকথা ঠিক। তবে এগুলির সঙ্গে 'ধর্ম' বলতে বিবেকানন্দ বুঝিয়ে-ছিলেন মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যের বিকাশকে—যাকে কখন তিনি বলেছেন ডিভিনিটি—দেবত্ব, কখন বলেছেন স্পিরিচ্যুয়ালিটি —আধ্যাত্মিকতা।

অধ্যাপক চেলিশেভ : 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। আমি তো আগেই বলেছি, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ। মার্কসবাদী হিসেবে আমি মনে করি, যে কোন দেশের বাস্তব পরিস্থিতির চেহারা একজন কম্যুনিস্টের যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে তা অনুধাবন করা উচিত। একজন প্রকৃত কম্যুনিস্টের বোঝা উচিত, তথাকথিত ধর্ম যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে।'

এই সময় মার্কসীয় মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে একজন সাংবাদিক আসেন অধ্যাপক চেলিশেভের সাক্ষাৎকার নিতে—যা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল। চেলিশেভ তাঁকে বসতে বললেন। তারপর বললেন : 'আসলে

ধর্মের দুটো দিক আছে—একটা ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক দিকটিই বেছে নিয়েছিলেন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিভেদ বাড়িয়ে তোলে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, বিবেকানন্দের চিন্তা ও পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। তাই বিবেকানন্দকে এবং তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা প্রচলিত অর্থে নিছক ধর্মনেতা মাত্র বলে ভাবি না। বিশ্লেষণধর্মী কোন গবেষকের কাছেই তাঁদের সেভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। তাঁরা যে সব ধর্ম-উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন পরিণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতাবাদী চিন্তাবিদের মতের কোন অমিল নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন: "খালি পেটে ধর্ম হয় না", "যার হেথায় নেই, তার হোতায়ও নেই" আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: "আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না যে-ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে" বলছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো", বলছেন, "জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম।" কোন দেশের কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরুর মুখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শুনেছে? আমার মনে হয়, মার্কসীয় ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণবিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি। বিবেকানন্দের "কালী দি মাদার" কবিতায় কালীর যে কালনৃত্য কল্পনা যেখানে কালীর তাণ্ডব নৃত্যের প্রত্যেক পদাঘাতে সৃষ্টি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার তাৎপর্য হচ্ছে, পুরানো সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার আবির্ভাবকে আহ্বান জানাচ্ছেন বিবেকানন্দ। কালীর নৃত্য ঐ প্রক্রিয়ার প্রতীক। বিবেকানন্দের "অ্যারাইজ অ্যাণ্ড অ্যাওয়েক" বাণী শ্রমজীবী মানুষদের জাগরণের মন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বলি, রাশিয়ার জনৈক সাম্প্রতিক কবি বিবেকানন্দের এই বাণীকে অবলম্বন করে একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। বিবেকানন্দ রাশিয়ায় না গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের পটভূমি তৈরি এবং সেখানকার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সামাজিক কাঠামোয় আসছে এক বিরাট পরিবর্তন আর সে পরিবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়া থেকেই। বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সে-কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত জনগণ তাই বিবেকানন্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান। বিবেকানন্দ তাই তাদের বড় কাছের মানুষ।

'বিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনাকে আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন এবং অবস্থার সঙ্গে উপযোগী করে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। তাঁর বেদান্তের নাম দিয়েছিলেন তিনি "প্র্যাক্-

টিক্যাল বেদান্ত"। কম্যুনিস্টরা বেদান্তের অতীন্দ্রিয়বাদকে বুঝতে পারেন না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাযুজ্যই আছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শন ও বাণীর তাৎপর্য সম্পর্কে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। তাতে আমার বিবেকানন্দ-চর্চা ও গবেষণা প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

'বিবেকানন্দকে একদল ধর্মীয় অতিন্দ্রিয়বাদী বলে চিহ্নিত করেন, আর একদল বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজেপেয়ে তাঁকে মার্কসবাদী আখ্যাদেন। আমার মতে, স্বামী বিবেকানন্দ এর কোনটাই নন। মার্কসের দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে পরিচয় থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজদার্শনিকদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে। শ্রমজীবি মানুষের জাগরণের ব্যাখ্যা তিনি তাঁর নিজের মতো করেই দিয়েছেন, সমাজের ব্যাখ্যাও তাঁর নিজস্ব। সামাজিক সমস্যা সমাধানের যে-সব সূত্র তিনি দিয়েছেন সেগুলি আমাদের মতে ভাববাদী (idealistic)। সে-সব বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন সেভাবে কোন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ভাবেননি বা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁর ধর্মের মধ্যে ভাববাদী যে অংশটুকু তার সমর্থকও আমরা নই ঠিকই, কিন্তু তাকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকারও আমরা করি না। কারণ একথা আমি আগেই বলেছি, দেশকালের পরিপেক্ষিতে তাঁর ধর্মের ভাববাদ যদি তাঁর দেশের মানুষকে কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে,সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অস্বীকার করব কি করে ? আসল কথা হল মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, সমাজের কল্যাণ এবং অবহেলিতের উত্থান। যেখানেই মার্কস ও বিবেকানন্দ উভয়েই একই ভাবনার শরিক, সেখানেই তাঁদের মিলনসূত্র।'

প্রশ্ন করলাম : বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে আপনার ধারণার কথা আগে দু-একবার উল্লিখিত হলেও তাঁর সম্পর্কে আপনার বা আপনাদের ধারণা একটু বিশদভাবে বলবেন কি ?

উত্তর : দেখুন, বিবেকানন্দ-চর্চা এবং গবেষণার কাজে তাঁর গুরুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কারণ রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নকেই তো বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই রামকৃষ্ণদেবও আমার এবং আমার দেশবাসীর কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বাণী বস্তুতঃ অভিন্ন। বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় মানবসভ্যতা যখন চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পথ আজ

সবচেয়ে কার্যকরী সমাধানের সূত্রটি উত্থাপন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বোম্বার স্কোয়াড্রনের একজন নেভিগেটিং অফিসার। যুদ্ধের বিভীষিকা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শুরু হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে তা সহস্রগুণ মারাত্মক হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু সোভিয়েত দেশেই অন্তত কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। এরই অভিজ্ঞতা থেকে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আজ চলছে শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সমর্থনে আন্দোলন, মিছিল। শান্তি, মৈত্রী ও বিশ্বভাতৃত্বের বাণীই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী। সেই বাণীই আজকের বিপন্ন পৃথিবীতে বাঁচার পথ দেখাতে পারে। আমি মনে করি, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যেভাবে বিশ্বকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া খুব প্রয়োজন। সমকালীন ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে তাঁদের বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে তার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশী। ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে ঐ ভাবাদর্শকে বোঝার জন্যে আজ সোভিয়েত রাশিয়ায় বহু গবেষক ও চিন্তাশীল মানুষ রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে বিবেকানন্দ-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমার ভাবতে গর্ব হয় যে, আমাদের দেশে এই চর্চায় আমি অন্যতম পুরোধার ভূমিকা পালন করতে পেরেছি। আমি মনে করি, আমাদের এই কাজ সমগ্র মানব জাতির সেবাস্বরূপ। আমি আনন্দিত যে, সম্প্রতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চা সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পর্ষদ সংগঠিত হয়েছে আমাকে তার অন্যতম সহ-সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে। শুনেছি চীনেও এখন বিবেকানন্দ-চর্চা আরম্ভ হয়েছে। এ সংবাদে আমি খুশী। আমার চীনা কম্যুনিস্ট বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা বিবেকানন্দ সম্পর্কে কাজ করেচেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান হতে পারে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার আন্তর্জাতিক পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ এ. এল. ব্যাসমের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তিনি অবশ্য কম্যুনিস্ট নন, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও এ-ব্যাপারে মত-বিনিময়ে আমরা আগ্রহী। শুধু এঁরাই নন, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যাঁরা এবিষয়ে চর্চা করতে আগ্রহী তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় অমরা কাজ করতে চাই। এ-সম্পর্কে আমার এক্ষুণি কয়েকজনের কথা মনে পড়ছে, যেমন (পূর্ব) বার্লিনের হামবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভি. মরগেনরথ, বুলগেরিয়ার সোফিয়া সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক এন. জোদোরভ, হাঙ্গেরীর বুডাপেস্ট সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক জে. হারমাতা এবং মঙ্গোলিয়ার উলান বতর সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক ডামডিন্‌সুরেন। এঁরা অবশ্য সকলেই সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ এবং আমারও বিশেষ পরিচিত। আমার পুত্রবধু ইরিনা চেলিশেভও বিবেকানন্দ-চর্চায় বিশেষ আগ্রহী। বর্তমানে সে যে-বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত তার বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকবেন বিবেকানন্দ। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ-গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা সামনের সারিতে আছেন অধ্যাপক

এ. পি ন্যাচুক-দানিলচুক এবং অধ্যাপক আর রাইবাকভ তাঁদের অন্যতম। আশা করি, আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার উত্তরোত্তর বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

'সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে বার বার আমার মনে হয়েছে, ভারতীয় সাহিত্য সাধকদের বিবেকানন্দ বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। হিন্দী-লেখকদের মধ্যে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা), সুমিত্রানন্দন পন্থ এবং প্রেমচাঁদ, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুল ইসলামের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। বিবেকানন্দের তেজস্বিতা, গতিশীলতা এবং মানুষের প্রতি জ্বালাময় মমতা তাঁর সমকালের এবং পরবর্তী সময়ে সাহিত্য-শিল্পীদের আকর্ষণ করেছিল। বিবেকানন্দের চেতনার স্তর জুড়ে ছিল মানুষ,—তাঁর ঈশ্বরও ঐ মানুষের মধ্যে। তিনি বলতেন : "আমার ঈশ্বর কোন দূরে গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসী নয়, অজ্ঞতাবশতঃ যাকে আমরা মানুষ বলি সে-ই আমার ঈশ্বর।" মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তিনি একটি মর্যাদা, নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলার প্রেরণা আর দুঃখ বেদনাকে উপেক্ষা করার সংকল্প।'

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ খ্রীষ্টীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। আপনি এ-সম্পর্কে কি মনে করেন?

উত্তর : 'আমার গবেষণা এবিষয়ে আমাকে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আমার মতে, বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় মতাদর্শের কোন মিলই নেই। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। খ্রীষ্টীয় মতাদর্শ মানুষকে কর্মহীনতার দিকে নিয়ে যায়, মানুষকে ভগবানের করুণাপ্রার্থী ভিক্ষুকে পরিণত করে। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মানুষকে কর্মের জোয়ারে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, লড়াই করতে প্রেরণা যোগায়। বিবেকানন্দ তাঁর মানবতাবাদের ধারণায় মানুষের মর্যাদাকেই উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন। সেই চিন্তার মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচেতনাই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি তাঁর ধর্মচেতনা অথবা মানবতাবাদের চিন্তা-ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে এবং সেই আদর্শকে তিনি দেশের সেবায় ব্যবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে যখন ভারতের জনগণের মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের মানবতাবাদ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নিজেদের মর্যাদা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে সচেতন করেছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের ঐক্যের ব্যগ্র বাসনাই বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের সেই ঐক্যের ধারণা ভাববাদী হলেও তা ছিল তাঁর সামগ্রিক চিন্তাদর্শের মূল কথা এবং তার যৌক্তিকতা এবং অপরিহার্যতায় ছিল তাঁর গভীর বলিষ্ঠ বিশ্বাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করতেই হবে। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে

ভারতবর্ষে যে সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তার প্রক্রিয়াকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দর বাণী ও আদর্শ। সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে রামমোহন রায় অথবা মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে নতুন ভারত গড়ার স্থপতি হিসাবে বিবেকানন্দের অবদান বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে।'

কথাগুলি বলার পর অধ্যাপক চেলিশেভ সহসা জিজ্ঞাসা করেন: 'আচ্ছা, বিবেকানন্দ বিবাহ করেননি কেন?' আমি বললাম: কারণ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী।

অধ্যাপক চেলিশেভ: 'কিন্তু খ্রীষ্টান ফাদাররা তো করেন।'

আমি: সে আপনি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকদের কথা বলছেন। প্রোটেস্ট্যান্ট-মতে সন্ন্যাসের প্রচলন নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না।

অধ্যাপক চেলিশেভ: 'কিন্তু ভারতবর্ষেও তো দেখেছি অনেক সন্ন্যাসী বিবাহিত।'

আমি: ভারতবর্ষে সেরকম কোন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় আছে বলে আমি জানি না। তবে বিবাহিত ব্যক্তি পরে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন—এমন হতে পারে। তখন বিবাহিত স্ত্রীও জননীসদৃশা তাঁর কাছে। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসের ঐতিহ্যে সন্ন্যাস এবং বিবাহ এক সঙ্গে চলতে পারে না। সন্ন্যাসীর কাছে নারী মাত্রই জননী। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ঐতিহ্যকেই বহন করেছেন।

শেষের কথাগুলি শুনে যেন চমকে উঠলেন অধ্যাপক চেলিশেভ। বললেন: 'ধন্যবাদ। আমার জানা ছিল না। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলেও এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম।'

অধ্যাপক চেলিশেভকে এর পর আমার শেষ প্রশ্নটি করলাম: বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনার আগ্রহের সূচনা হয় কখন থেকে?

হাসতে হাসতে অধ্যাপক বললেন: 'সে এক ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি বিষয় খুব আলোচিত হতে থাকে। তা হল ভারত অল্প দিনের ভিতর স্বাধীনতা লাভ করতে চলেছে। তখন থেকেই ভারত সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে থাকে। অনেকেই তখন ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশুনো করতে শুরু করেন। ঐ অনেকের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমার আগ্রহের বিষয় ছিল ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য। ঐ বিষয়ে কিছু লেখালেখিও করতে শুরু করেছিলাম। ঐ সময়েই ভারতের জাতীয় জাগরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, বিশেষতঃ বিবেকানন্দের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কিছু তথ্য আমার গোচরে আসে। ইতিপূর্বে রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দের জীবনী আমি পড়েছিলাম। একটা ধারণা ছিল। এর কিছুদিন পরে—ইতিমধ্যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে—১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি এসেছিলাম দিল্লীতে। সেই আমার প্রথম ভারতে আসা। আমি এসেছিলাম সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের অন্যতম হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে। দিল্লীতেই বসেছিল সেই সম্মেলন। আন্তর্জাতিক স্তরে

উত্তেজনা প্রশমন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুস্থ সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্রটি তুলে ধরা ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সেবারের সেই আসাই আমাকে নিয়ে এসেছিল বিবেকানন্দের কাছে এবং তাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণের কাছে—যাঁরা বিশ্বসম্প্রীতি ও বিশ্বমৈত্রীর ক্ষেত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আশ্চর্য এই প্রতীকী যোগাযোগ। তার পরের কাহিনী আমি "স্বামী বিবেকানন্দ সেণ্টিনারি মেমোরিয়্যাল ভল্যুম"-এ বিস্তারিত লিখেছি। খুব সংক্ষেপে এইটুকুই আজ বলছি : '১৯৫৬-র শরৎকালের একদিন। ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারীতে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। প্রস্তরময় সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে—যেখানে তিন-সমুদ্র এসে মিলিত হয়েছে, সেখানে একটা জায়গায় পরম সৌভাগ্যবশে দেখেছিলাম এক অপূর্ব অবিস্মরণীয় দৃশ্য—একটি নতুন দিনের আবির্ভাব। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত প্রভাত সূর্যের প্রথম কিরণগুলি ত্রিসমুদ্র-সঙ্গমে কন্যাকুমারী-মন্দিরের গম্বুজাকৃতি চূড়া এবং স্তম্ভশ্রেণীকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল। দক্ষিণে শ-দুই মিটার দূরে রয়েছে একটি নির্জন শিলাখণ্ড যার উপর এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। "ঐ হল বিবেকানন্দ শিলা"—কে একজন যুবক বলে উঠেছিল ! যুবকটি দাঁড়িয়েছিল আমার কাছেই। বলেই চলল সে—"ঐ সেই শিলা যেখানে স্বামী ভারত ছেড়ে দূরে বিদেশে যাত্রার আগে তিনদিন কাটিয়ে ছিলেন।" আমি তাকে বললাম : ঐ দ্বীপখণ্ডটিতে যেতে কি যে ইচ্ছে হচ্ছে আমার !" যুবক জবাব দিয়েছিল : "একটু অপেক্ষা করুন, —আমি জেলেদের কাছ থেকে একটা ডিঙি নিয়ে আসছি।"

'কিন্তু বিবেকানন্দ-শিলায় যাবার ইচ্ছা আমার এতই তীব্র হয়েছিল যে, ঐ যুবকের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার ছিল না। সাঁতার দিয়ে শিলায় যাব স্থির করলাম। যখন অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছি তখন পিছনে তাকিয়ে দেখি একটি জেলে ডিঙি। তার উপর যুবকটি দাঁড়িয়ে। সে চীৎকার করে কিছু বলছিল আর হাত নাড়ছিল। কিন্তু বাতাসের গতি তার কথাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উল্টো দিকে। তার সঙ্কেতের অর্থও আমার বোধগম্য হয়নি। যা হোক, আমরা প্রায় একই সময়ে সেই দ্বীপে গিয়ে পেঁীছেছিলাম। এবং পাথরের খাঁজ ধরে ধরে শিলার চূড়ায় উঠেছিলাম।

আমার ঐ নতুন বন্ধুটি একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর নিজে বসে আমাকেও বলে : "বসুন এখানে, আর ভাবুন তাঁর কথা যিনি আমাদের নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছেন।" আমি তার নির্দেশ পালন করেছিলাম। ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের নির্ঘোষ ছাড়া আর কোন শব্দই সেখানে ছিল না।...

'বিবেকানন্দ সম্পর্কে যা-কিছু পড়েছিলাম সব ঐ সময়ে আমার মনে পড়তে লাগল। রবীন্দ্রনাথের সেই কথা—যদি কেউ ভারতবর্ষকে জানতে চায় তাকে বিবেকানন্দ পড়তেই হবে ; বিবেকানন্দ যুবকদের মধ্যে জাগিয়েছেন মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ও ভক্তিময়তার প্রেরণা, অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ এবং উজ্জ্বল

ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। বাস্তবিকই তাই। বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি পড়েছি—একবার নয়, বার বার, আর প্রত্যেকবার সেগুলির মধ্যে এমন নতুন কিছু পেয়েছি যা ভারতবর্ষকে গভীরভাবে বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে—সাহায্য করেছে ধারণায় আনতে তার দর্শন ও জীবনদর্শনের রূপ, তার জনগণের অতীত ও বর্তমানের আচার-আচরণ এবং তাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

'হয়তো এখানেই—ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় এই নির্জন শিলাখণ্ডে বসে বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছিলেন : শৌর্যের সূর্যোদয় হয়েছে ; আমার মাতৃভূমি জাগরিত হবেনই ; কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ভারতবর্ষ আর কোনদিন নিদ্রিত হবে না।

'আমি তাঁর জীবনের কথা সেই থেকেই ভাবতে লাগলাম—সূচনা সেদিন থেকেই।'

নবম অধ্যায়

তুলনামূলক

বুদ্ধ ও শঙ্কর : স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান শঙ্করাচার্য দুটি উজ্জ্বল নাম। প্রাচীন ঋষিকুল-আচরিত আর্যধর্ম যখন অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য প্রেম, ত্যাগ, সত্য, লোকহিতচিকীর্ষা—এসব থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, তখন ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হয়ে প্রকৃত আর্যধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই হিংসা-দ্বেষপূর্ণ মানবসমাজকে অহিংসা ও করুণার বারিধারায় শীতল করে, দুঃখময় পৃথিবীকে দুঃখশূন্য করার ব্রত নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেমের ধর্ম। আবার ভগবান বুদ্ধের প্রায় দেড়হাজার বছর পরে কালক্রমে সনাতনধর্ম যখন কলুষিত হয়ে আচারসর্বস্ব অনুষ্ঠানবাদী ও কুতার্কিকদের প্রভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল তখন ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। বেদান্তের সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনিয়ে মৃতপ্রায় আচারসর্বস্ব সনাতনধর্মে প্রাণসঞ্চার করলেন তিনি। ধর্মকে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে তার হৃতগৌরবও পুনরুদ্ধার করলেন তিনি। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য, যা বার বার উপনিষদে ঘোষিত হয়েছে, কুতার্কিকদের কুট জাল যুক্তিবলে ছিন্ন করে তিনি পুনর্বার প্রতিষ্ঠা করলেন 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—এই মতবাদ, যা অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

এই দুই মহাচার্যের উপর স্বামী বিবেকানন্দের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর দৃষ্টিতে এই দুই মহামানব কিভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন তা-ই স্বল্প পরিসরে এ-প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই যে-মহাপুরুষ অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনি ভগবান বুদ্ধ। তাঁর জীবনী ও রচনাবলী পাঠ করলে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় যে তিনি আজীবন বুদ্ধের গুণগ্রাহী ছিলেন। বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মের কিছু ত্রুটির দিকে নির্দেশ করলেও ব্যক্তি-বুদ্ধকে স্বামীজী দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয়ে পরম শ্রদ্ধার আসন। স্বামীজী বুদ্ধের দর্শনও পেয়েছিলেন এবং সে-দর্শন তিনি পেয়েছিলেন তাঁর কিশোর বয়সে স্কুলে পড়বার সময়ে। আমরা জানি, নরেন্দ্রনাথ আবাল্য ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। একদিন তাঁর নিভৃত কক্ষে ধ্যানকালে এক শান্ত-সৌম্য সন্ন্যাসীর দর্শন তিনি পেয়েছিলেন। সে-সন্ন্যাসী কে, তা তখন বুঝতে না পারলেও পরে "তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল তিনি সেদিন বুদ্ধদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন।"[১]

স্বামীজী ইতিহাসের সচেতন পাঠক ও ধর্মানুসন্ধিৎসু হিসাবে ছাত্রাবস্থায় যে

---

১. যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৭৬

ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন করেছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তিনি যেসব ভাষণ প্রদান ও আলোচনাদি করেছেন সেগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বুদ্ধের ত্যাগ-বৈরাগ্য, অপরিসীম আত্মবিশ্বাস, নিষ্কাম কর্ম, প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং তাঁর বিশাল হৃদয় স্বামীজীকে আকৃষ্ট করেছিল গভীরভাবে। ঠাকুরের জীবৎকালেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বৈরাগ্যের প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। কাশীপুরে থাকাকালে বুদ্ধের জীবন ও মতবাদ নিয়ে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে খুব আলোচনা হতো এবং 'ললিতবিস্তর' ও 'ত্রিপিটকাদি' পঠিত হতো। "বুদ্ধ ও বুদ্ধের চিন্তায় নিরত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথ তখন জ্ঞানের কথা খুবই বলিতেন। তাঁহার মুখে এমন কথাও শোনা যাইত, 'আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না'।"[১]

স্বামীজী বুদ্ধ সম্বন্ধে যখন কোন কথা বলতেন তখনই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তেন। তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য, উদার হৃদয় এবং লোকহিতচিকীর্ষার কথা এমন চিত্তাকর্ষভাবে বর্ণনা করতেন যে তা শ্রোতার মনে একটা দাগ রাখত। দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ধর্মসম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক এক ব্যক্তিকে "বুদ্ধের বৈরাগ্য, অদম্য সত্যানুসন্ধিৎসা, পরিশেষে সত্যলাভ এবং প'য়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ ভুলিয়া ঐ সত্যের প্রচার" বিষয়ে বলে তিনি ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে ছিলেন।[২]

একবার একজন শ্রোত্রী স্বামীজীর বুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন: "স্বামীজী, আমি জানতাম না যে, আপনি বৌদ্ধ!" তখন স্বামীজী তাঁর দিকে ফিরে বললেন, "আমি বুদ্ধের দাসানুদাস।"[৩]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভগবান বুদ্ধ ত্যাগের মূর্তবিগ্রহ। তাঁর মতো ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মাননি। ত্যাগই যে ভারতের জাতীয় জীবনের উৎস স্বামীজী বারবার এ-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যখনই ভারতে এই ত্যাগের অভাব ঘটেছে তখনই জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে। আবার যখন ত্যাগের আদর্শকে আশ্রয় করেছে তখনই জীবন স্রোত বলবান হয়েছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের জাতীয় জীবনে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার মূলেও ছিল এই ত্যাগের অভাব। তাই বুদ্ধ এসে আবার নতুন ভাবে ত্যাগের মন্ত্র প্রচার করলেন। স্বামীজী বলেছেন: "বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত ইহা শুনিল; এবং এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই

১. যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সং পৃঃ ১৮৬
২. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৭৭
৩. ঐ (৩য় খণ্ড) ঐ পৃঃ ১১৬

ভারতের জাতীয় জীবনের উৎস।"[১] একদিন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে ত্যাগ-বৈরাগ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর কথা হচ্ছে। শিষ্যের অভিমত যে, উপনিষদাদি গ্রন্থে ত্যাগ-বৈরাগ্য সম্বন্ধে বিশদ উপদেশ পাওয়া যায় না। এ-কথায় স্বামীজী বললেন: "বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ।···তবে আমার বিশ্বাস ভগবান বুদ্ধের পর থেকেই ভারতবর্ষের এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বিষয়-বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মাননি।"[২] ভগবান বুদ্ধ যে শুধু ত্যাগের বাণীই প্রচার করেছেন তা নয়। এই ত্যাগ তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। রাজপুত্র তিনি। ভাবীকালের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনিই। তার উপর সুন্দরী স্ত্রী ও সুকুমার শিশুপুত্র। যে সব বিষয় মানুষকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে তার সবগুলিই বুদ্ধের জীবনে পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু এসকলকে তুচ্ছজ্ঞান করে সকল মানবের কল্যাণের জন্য তিনি সব ত্যাগ করেছিলেন। তাই বুদ্ধের ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ। স্বামীজীর কথায় "বুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করিলেন—ইহাই প্রকৃত ত্যাগ বটে।"[৩]

সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ, তারপর বেদান্তবাণী প্রচার দ্বারা বিশ্ববিজয় করে স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে আত্মবিশ্বাসই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করতে পারে। তদানীন্তন ভারতবর্ষের অবনতির একটি অন্যতম কারণরূপে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এদেশের লোকের আত্মবিশ্বাসের অভাব। সামাজিক নিপীড়ন, শিক্ষার অভাব এবং পরাধীনতার ফলে ভারতবর্ষের একটা বিপুল অংশের মানুষ যেন নিজেদের 'মানুষ' বলে ভাবতে ভুলে গেছে। তাই স্বামীজী আত্মবিশ্বাসের বাণীপ্রচার দ্বারা ঘুমন্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই আত্মবিশ্বাসের মূল উৎস তিনি যেমন পেয়েছিলেন বেদান্তে, তেমনি এই আত্মবিশ্বাসের মূর্তবিগ্রহরূপে দেখেছিলেন ভগবান বুদ্ধকে। তাঁর দৃষ্টিতে বুদ্ধ এমন ব্যক্তি যিনি কারও সাহায্য না নিয়ে, কোন অলৌকিক শক্তি বা দেব দেবী কিংবা কোন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস না রেখে শুধু আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত মনোভাবকে বুদ্ধ অস্বীকার করেছিলেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল করে। সবকিছুর জন্যই যদি মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তবে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই যে সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর বিদ্যমান—এ-কথা ভুলে গিয়ে বাইরের কোন সর্বশক্তিমানের উপর নির্ভরশীল হয়ে লোকে আত্মবিশ্বাস হারায়। তাই বুদ্ধ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন: "লোক-শিক্ষকদের মধ্যে বুদ্ধই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে সবচেয়ে বেশি করে শিক্ষা দিয়েছেন; তিনি শুধু মিথ্যা 'অহং'-এর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করেননি, অদৃশ্য ঈশ্বর বা দেবতাদের উপর নির্ভরতা থেকেও মুক্ত করেছেন।"[১] স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধই এমন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন: "কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টাদ্বারা নিজের মুক্তিসাধন কর।"[২] "আত্মা নয়, ঈশ্বর নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও।"[৩] "নিজেরাই নিজেদের নির্বাণ লাভ কর।"[৪]

স্বামীজীর জীবনের প্রথমদিকে আমরা দেখি তিনি যাতে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে পারেন সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সেসময়ে নিজের মুক্তিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তা থেকে নিবৃত্ত করে সকল মানুষের মুক্তির পথ-প্রদর্শকরূপে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন। স্বামীজী মাথা পেতে নিলেন সে নির্দেশ। নেমে এলেন সমাধি থেকে নিষ্কাম কর্মযোগে। বুঝতে পারলেন শুধু নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টাও এক ধরণের স্বার্থপরতা। এ-শিক্ষা তিনি একদিকে যেমন গ্রহণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবন থেকে, আরেক দিকে এ-বিষয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধের জীবন থেকে। শুধু নিজের মুক্তির জন্য জীবনোৎসর্গ করেছিলেন—এমন নিঃস্বার্থ অকপট আদর্শ কর্মযোগী বুদ্ধের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। স্বামীজী তাঁর 'কর্মযোগের আদর্শ' বক্তৃতায় কর্মযোগের আদর্শ বলতে বুঝিয়েছেন, কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করা—নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সকলের কল্যাণার্থে অভি-সন্ধিবর্জিত হয়ে কর্ম করা তাই বক্তৃতার উপসংহারে স্বামীজী ভগবান বুদ্ধকেই উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে বলেছেন: "...তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষা কার্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব; একমাত্র তিনিই ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন।...মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। ...ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাচাই হউক না হউক, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।

"তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আর কোন্

মানুষ তাঁহা অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপর এত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন! সমুদয় মনুষ্যজাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র উদ্ভূত হইয়াছে, যেখানে এত উন্নত দর্শন ও এমন উদার সহানুভূতি! এই মহান দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর জন্যও গভীরতম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন; মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে—যত মানুষ পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।···

"যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে···এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শ।"[১]

এই বক্তৃতা ছাড়াও স্বামীজীর বাণী ও রচনার বহু স্থানে নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গ হিসাবে বুদ্ধের কথা দেখা যায়। সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভগবান বুদ্ধ নিষ্কাম কর্মযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ। তিনি বলেছেন: "ভগবান বুদ্ধ ধর্মের অন্যান্য প্রায় সকল ভাবকে সেই সময়ের জন্য বাদ দিয়া 'তাপিত জগৎকে সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম'—এই ভাবটিকেই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন;···আমাদের উচ্চতম কল্পনাশক্তিও বুদ্ধদেব অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্মীর ধারণা করিতে অক্ষম।"[২]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ ছিলেন এক মহান সংস্কারক। বৈদিক যুগের চতুর্বর্ণ বিভাগ থেকে কালক্রমে ভারতে বহু জাতিবিভাগের উৎপত্তি হয়। এই জাতিবিভাগ ভারতীয় সমাজে এমন কঠোরভাবে বলবৎ হয় যে ক্রমশঃ তা সামাজিক উৎপীড়নের রূপ নেয়। সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিশেষতঃ পুরোহিতেরা নিম্নবর্ণের মানুষের অনেক সামাজিক অধিকারের সঙ্গে ধর্মীয় অধিকারও কেড়ে নেয়। সেইসঙ্গে নারী-জাতির সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারও অস্বীকৃত হয়। স্বামীজী তাঁর একাধিক ভাষণে অপূর্ব ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় রেখে প্রাক্ বৌদ্ধযুগে ভারতের ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা করে ভগবান বুদ্ধই যে মহান সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা দেখিয়েছেন। সেসময়ে ভারতের ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন: "ভারতবর্ষে তখন ধর্ম প্রধানতঃ মানুষের আত্মার প্রকৃতি লইয়া বাদ-বিতণ্ডায় ব্যাপৃত। ধর্মজীবনের প্রত্যবায়সমূহের অপনোদনের জন্য তদানীন্তন ধর্মের শিক্ষায় প্রাণিহত্যা, যাগযজ্ঞ এবং অনুরূপ প্রণালীগুলির উপরই নির্ভর করা হইত।

"ধর্মীয় মতবাদ যখন বৃদ্ধি পায়, পিতৃপুরুষগণের ধর্মে অন্ধবিশ্বাস যখন প্রবল হয় এবং কুসংস্কারকে যখন যুক্তিদ্বারা সমর্থনের চেষ্টা চলে, তখন একটি পরিবর্তনের

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬-৪৭
২. ঐ ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২

প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেন-না ঐসকলের দ্বারা মানুষের অনিষ্টই বাড়িতে থাকে, উহাদের শোধন না হইলে মানুষের কল্যাণ নাই।"[১] আর বুদ্ধদেবই এই সংস্কার কার্যটি করেছিলেন। তিনি এই সংস্কার কার্যটি করেছিলেন কাউকে আঘাত করে নয়। কারণ, "বুদ্ধের মতে বল প্রকাশ করিয়া ইহার প্রতিশোধ সম্ভবপর নয়, ময়লা দিয়া ময়লা ধোয়া যায় না ; ঘৃণাদ্বারা ঘৃণা নিবারিত হয় না।"[২] অহিংসার ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, নিঃস্বার্থ কর্মের ধর্ম প্রচার করে জাতি-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে তিনি তাঁর ধর্মে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর কাছে জাতি-বর্ণের বিচারে কেউ ছোট-বড় ছিল না। কেউ বিশেষ কুলে জন্মেছে বলে অপরের থেকে সে শ্রেষ্ঠ, "ভগবান বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথার এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন।[৩] তাঁর ধর্মে সকলের ছিল সম-অধিকার। এজন্য "বিশাল জনতা বুদ্ধের অনুগামী হয়েছিল।"[৪] আবার বলছেনঃ "নির্বিচারে সকলের মধ্যে তিনি বেদের সারমর্ম প্রচার করেন···, নির্বাণের উদার পথ তিনি সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।"[৫]

আরেক দিক থেকেও স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তা হল তাঁর জনহিতকর কার্যপ্রণালী। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে স্বামীজীর একদিনের কথোপকথনে পাওয়া যায় যে একটি ছাগশিশুর জন্য বুদ্ধের মতো ব্যক্তির প্রাণ দিতে যাওয়া শিষ্যের মতে অযৌক্তিক। উত্তরে স্বামীজী বললেনঃ "কিন্তু তাঁর fanaticism-এ জগতে জীবের কত কল্যাণ হল—তা দেখ্ দেখি। কত আশ্রম—স্কুল-কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্য হাসপাতাল), কত পশুশালা স্থাপন, কত স্থাপত্য-বিদ্যার বিকাশ, তা ভেবে দেখ্। বুদ্ধদেব জন্মাবার পূর্বে এদেশে এসব ছিল কি ?—তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলো ধর্মতত্ত্ব তাও অল্প কয়েকজনের জানাছিল মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব সেগুলি practical field-এ (কার্যক্ষেত্রে) আনলেন ; লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদের স্ফুরণ মূর্তি।[৬]

বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গে স্বামীজী বুদ্ধের যে-বৈশিষ্ট্যটির কথা বার বার উল্লেখ করে তাঁকে হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন, তা হল ভগবান বুদ্ধের বিশাল হৃদয়। স্বামীজীর মতে এতবড় হৃদয়বান পুরুষ আর জন্মাননি। বুদ্ধের নিষ্কাম কর্ম, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সব কর্মেরই মূলে ছিল তাঁর এই বিশাল হৃদয়। শুধু নিজের

---

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯০-৯১
২. ঐ ঐ পৃঃ ৯০
৩. ঐ ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯
৪. ঐ ঐ পৃঃ ৩১৪
৫. ঐ " পৃঃ ৩০৮

মুক্তিলাভের জন্য নয়, সকল মানুষের কল্যাণের জন্য—সকল মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর সাধনা। 'বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়' বুদ্ধের জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। বুদ্ধ, স্বামীজীর ভাষায়, "সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন কিসে অপরের কল্যাণ হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তা ছিল।...তিনি বনে গিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের মুক্তির জন্য নয়।"[১] বুদ্ধের এই হৃদয়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বামীজী বলেছেন: "আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।"[২] বলেছেন: "আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী।... অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এর চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তার জন্ম। সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে; কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনও নিজের জন্য ভাবনা ভাবেননি। এতবড় মহৎ জীবনের ধারণা আমাদের মতো অজ্ঞ স্বার্থান্ধ সংকীর্ণচিত্ত মানুষ কি করে করতে পারে?"[৩] সকল প্রাণীর প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। এই মহৎ হৃদয়ের প্রেরণায়ই তিনি একটি ছাগশিশুর জন্য আত্মবলিদান দিতে চেয়েছিলেন। বিরাট হৃদয়ের প্রেরণায়ই তিনি সক্ষম হয়েছিলেন ধনী শ্রেষ্ঠীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সমাজে ঘৃণিত বেশ্যা অম্বাপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে, পেরেছিলেন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এক অন্ত্যজের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গলিত মাংস ভক্ষণে প্রাণ বিসর্জন দিতে। তাই স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব" আর এই মহামানবকে স্বামীজী তাঁর হৃদয়ের পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন: বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর।"[৪]

॥ ২ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্ব জয় করেছিলেন বেদান্তের বাণী প্রচার করে। এই বেদান্ত-নির্ঘোষেই তিনি জাগিয়েছিলেন তমসাচ্ছন্ন ঘুমন্ত ভারতবর্ষকে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—ইহাই বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাকার ভগবান শংকরাচার্য। 'জীব-ব্রহ্ম-ঐক্যবাদ' শংকরাচার্য যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, পণ্ডিত মহলে তা আজও বিস্ময়ের ব্যাপার। অসাধারণ মনীষাবলে তিনি বেদান্তদর্শনে

যে-মতবাদ স্থাপন করেছেন তা 'অদ্বৈতবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। স্বামীজী মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ ও রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে সাধকের বিভিন্ন উপলব্ধির স্তর হিসাবে স্বীকার করে নিয়েও শঙ্কর-ব্যাখ্যাত 'অদ্বৈতবাদ'কেই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ দর্শন হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচার করেই দেশ-বিদেশে বন্দিত হয়েছেন, এ-কথা সর্বজনবিদিত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বেদান্তকে যুগোপযোগী করে পরিবেশন এবং বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলি এ-যুগে কার্যকরী করার পথনির্দেশ করে তিনি 'নববেদান্তী'রূপে আখ্যায়িত হয়েছেন। কিন্তু শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈতবাদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে, এবং তাকে অবলম্বন করেই তিনি সর্বত্র বেদান্ত প্রচার করেছেন। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনায়' দেখা যায় প্রায় সর্বত্রই তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শঙ্কর-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কোথাও কোথাও শাঙ্করভাষ্যের উধৃতি সহায়ে নিজ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে "বেদান্ত-দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য।"[১] এ-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য: "তিনি (শঙ্কর) অকাট্য যুক্তিসহায়ে বেদের সার-সত্যগুলি সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়; ব্রহ্মনির্দেশক পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যাবলী গ্রথিত করিয়া দেখাইয়াছেন, একমাত্র সেই নির্বিশেষ সত্তাই আছেন।"[২] বলছেন: "শঙ্করাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান।···বেদ ও উপনিষদ্‌সমূহের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করাই তাঁহার সমগ্র জীবনের কাজ।"[৩] বলছেন: "উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ।"[৪] অথবা: "কবীর, দাদু, নানক, রাম-সনেহী প্রভৃতি সকলেই ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি।"[৫] বলছেন: "ভগবান শঙ্করাচার্যের এই মহিমা যে, তিনি নিজ প্রতিভা বলে ব্যাসের ভাবগুলি অপূর্বভাবে বিবৃত করিয়াছেন।"[৬] অতএব বিবেকানন্দের মতে "বর্তমান ভারতে যেসব অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই শঙ্করের অনুগামী।"[৭] অথবা: "মহাত্মা শঙ্করের নিকট জগতের প্রত্যেক অদ্বৈতবাদীই ঋণী।"[৮] তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীজী শঙ্করাচার্যকে কিছুটা ন্যূন করে

---

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫
২. " " "
৩. " ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৯
৪. " ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ: ৩১৫
৫. " " পৃ: ৮৪

দেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একদিন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী শঙ্কর-প্রসঙ্গে কথা তুললে স্বামীজী বললেন: "শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি—তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐরূপ ছিল বলে বোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না—একথা বেদান্তভাষ্যে কেমন সমর্থন করে গেছেন!…কিন্তু দেখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়! 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজ-জীবন দান করতে প্রস্তুত! দেখ কি উদারতা—কি দয়া!"[১]

তার উত্তরে বলা যায়, যা সত্য স্বামীজী তা-ই বলেছেন। এখানে ইচ্ছাপূর্বক কাউকে ছোট করে বা বড় করে দেখানোর প্রশ্ন আসে না। আবার যে-ব্যক্তির সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি শঙ্করাচার্যের মতের গোঁড়া পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজী চাইতেন না যে কেউ কোন মত সম্পর্কে গোঁড়া হয়। তাই শিষ্যের শিক্ষার জন্য এসব কথা বলেছিলেন মনে হয়। তবে শঙ্করের রচনার একটি দোষও স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, উপনিষদের যেসব মন্ত্রে দ্বৈতভাব বিদ্যমান, শঙ্কর সেগুলিরও টেনে-হিঁচড়ে অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া জাতি-ব্যাপারে শঙ্কর ছিলেন বর্জনশীল। কিন্তু শঙ্করের উদারতার দিকটিও স্বামীজী মোটেই উপেক্ষা করেননি। তিনি বলেছেন: "শঙ্করকে কতকটা বর্জনশীল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাঁহার লিখিত গ্রন্থে এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী যেমন তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা বিকৃত হয়েছে, তেমনি শঙ্করাচার্যের উপদেশাবলীর উপরও যে সঙ্কীর্ণতা দোষ আরোপিত হয়; সম্ভবতঃ তাহাতে শঙ্করের কোন দোষ নাই, তাঁহার শিষ্যদের বুঝিবার অক্ষমতার দরুণই এই দোষ শঙ্করে আরোপিত হয়ে থাকে।"[২] যে-শঙ্কর জাতি-ব্যাপারে বর্জনশীল, সে-শঙ্কর যে জাতিব্যাপারে উদারও ছিলেন তা-ও স্বামীজী দেখিয়েছেন। বলেছেন: "শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্যগণ জাতিগঠনকারী ছিলেন। …সময়ে সময়ে তাহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্তে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন।"[৩] তাছাড়া যে উপনিষদের চর্চা শুধু অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই করতেন, শঙ্করাচার্য তাতে গৃহস্থদের অধিকার স্বীকার করলেন। স্বামীজীর ভাষায়: "প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চা করতেন। শঙ্কর একটু সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে তাঁহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না।"[৪]

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪
২. ” ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০
৩. ” ” পৃঃ ১৯৩
৪ ” ” পৃঃ ১৩৭

আচার্য শঙ্করের মতে জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী। কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় মাত্র। আত্মজ্ঞান কখনও হয় না। তাই শঙ্কর 'জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়বাদ'-এর বিরোধিতা করেছেন। বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদী হয়েও কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে ভগবান শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেও তিনি সঙ্ঘে 'লোকহিতায়' কর্মযোগের প্রবর্তন করেন। এজন্য সন্দেহ হতে পারে যে অদ্বৈতবাদী হলেও বিবেকানন্দ এক্ষেত্রে শঙ্করকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কর্ম প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের কারণ না হলেও পরোক্ষভাবে জ্ঞানের কারণ হয়। এজন্য কর্মযোগের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে। আর এ সম্বন্ধ আচার্য শঙ্করও স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ কর্মযোগের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কেউ জ্ঞানের অধিকারীই হতে পারেনা। স্বামীজীও কর্মযোগের প্রবর্তন করেছেন চিত্তশুদ্ধির জন্যই। উচ্চ অদ্বৈততত্ত্বের দিক দিয়ে তিনিও স্বীকার করেছেন "জ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র নেই।"[১] কর্মকে তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই স্বীকার করেছেন, পারমার্থিক ক্ষেত্রে নয়। এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় শিষ্যের সঙ্গে স্বামীজীর একদিনের আলাপচারিতায়ঃ "এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাতেই দোষ থাকবে।...তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে? যতটা পারিস, ভাল কাজ করে যেতে হবে।

শিষ্য। ভাল কাজটা কি?

স্বামীজী। যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তা-ই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব বিকাশের সহকারী-ভাবে করা যায়।...

শিষ্য। মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী—জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে?

স্বামীজী। আচার্য শঙ্কর ঐরূপ বলেন আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহকারী এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ-সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া-কর্তা-ও কর্ম-বোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না করে বসে থাকে? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যেসব কর্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন করে যা না? কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে।"[২] তাই দেখি স্বামীজী আরেকদিন শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেনঃ "তোদের বলি, অভেদ-বুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে বড় বড়

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭
২. " " পৃঃ ২০৬-৭

সাধুরাও এতে বন্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্যই ফলাকাঙ্ক্ষা হীন হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথাই বলেছে কিন্তু জানবি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সৎকর্ম-দ্বারা বড়জোড় চিত্তশুদ্ধি হয়। এ-জন্যই ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য) জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের প্রতি তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন।"[১]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শঙ্করাচার্য ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি ছিলেন স্বয়ং শাস্ত্রপ্রমাণ। স্বামীজী তাই বহু জায়গায় তাঁর বক্তব্য বলতে গিয়ে শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ ও ভাষ্যের উধৃতি দিয়ে নিজ মত স্থাপন করেছেন। এ-বিষয়ে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে প্রাণায়ামসহায়ে নাড়ীশুদ্ধির আবশ্যকতা অনেকে স্বীকার করেছেন এবং এর প্রমাণ হিসাবে আচার্যের মত তুলে ধরেছেন। বলেছেন ঃ "রাজযোগের অন্তর্গত নয় বলিয়া অনেকে ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। কিন্তু যখন ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের ন্যায় প্রামাণিক ব্যক্তি ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমি মনে করি, ইহা উল্লেখ করা উচিত। আমি উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ-বিষয়ে তাঁহার মত উধৃত করিব।"[২]—এই বলে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রের ভাষ্য থেকে আচার্যের মত তুলে ধরলেন।

কিরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি গুরু হতে পারেন, তা বলতে গিয়েও স্বামীজী 'বিবেক-চূড়ামণি'গ্রন্থে শঙ্কর যে গুরুর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা-ই উধৃত করেছেন ঃ "শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।"[৩] অর্থাৎ যে বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, কামনা-শূন্য, ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই প্রকৃত গুরু হতে পারেন।

ভগবান বুদ্ধের মতো আচার্য শঙ্করকেও মহান সংস্কারকরূপে অভিহিত করেছেন স্বামীজী। স্বামীজী দেখিয়েছেন যে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্বে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতীয় সমাজে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে যে-সকল অসভ্য ও অশিক্ষিত বিভিন্ন জাতি আর্য-সমাজে প্রবেশ করেছিল তারা বুদ্ধদেব-প্রচারিত আদর্শগুলি ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি। এইসকল জাতি তাদের নানাবিধ কুসংস্কার এবং বীভৎস উপাসনা-পদ্ধতিসমূহ সঙ্গে নিয়ে আর্য সমাজে প্রবেশ করতে লাগল। তারা তাদের সর্প, ভূত প্রভৃতি উপাসনা সমাজে চালু করে দিল। এরূপে সমগ্র ভারত কুসংস্কারে পূর্ণ হয়ে অনবত হল। আবার প্রথমদিকে বৌদ্ধগণ প্রাণি-হিংসার নিন্দা করতে গিয়ে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-সমূহের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রচারের ফলে ঐসব যজ্ঞাদি ক্রিয়া লোপ হয়ে গেল। তৎপরিবর্তে বিরাট বিরাট মন্দির, জাঁকালো অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপ্রিয় পুরোহিতদল এবং যেসব বীভৎসতা ধর্মের নামে চলে না—এ-সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের ফলে সৃষ্ট হল। স্বামীজী

বলেছেন: "অতঃপর সেই মহান সংস্কারক শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুবর্তিগণের অভ্যুদয় হইল, আর তাঁহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্যন্ত কয়েকশত বর্ষ যাবৎ ভারতের সর্ব-সাধারণকে ধীরে ধীরে সেই মৌলিক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ধর্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা চলিতেছে।"[১] স্বামীজী বলেছেন: "কোন নূতন মতবাদের প্রচার না করে বা কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা না করে তিনি বৈদিক ধর্মকেই পুনর্বার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করেছিলেন।"[২] আর একাজ তিনি করেছিলেন শাস্ত্রকে অনুসরণ করেই, বুদ্ধের মতো শাস্ত্রকে অস্বীকার করে নয়। স্বামীজী বলেছেন: "শঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি শাস্ত্রও মেনে ছিলেন; আবার সকলের সামনে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছেন।"[৩] বলেছেন: "শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মুগাচার্যগণ জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যেসব অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না।...ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি, আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষাত্রিয় করিয়া ফেলিতেন: দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি-মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপ ভক্তি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।"[৪]

॥ ৩ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বুদ্ধ এবং শঙ্কর উভয়েই অসাধারণ মহাপুরুষ। উভয়েই যুগাচার্য। বুদ্ধের ছিল বিশাল হৃদয়, আর শঙ্করের ছিল অসাধারণ, ক্ষুরধার বুদ্ধি। একজন সর্বগ্রাসী প্রেমের বলে এবং অপর জন অসাধারণ বুদ্ধি বলে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ভারতভূমিকে রক্ষা করেছিলেন। বর্তমান বিজ্ঞান-মনস্ক মানব-সমাজের জন্য বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এই উভয়ের সম্মিলন—হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির সম্মিলন। বলেছেন: "এখন প্রয়োজন উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ।"[৫] কেন-না স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছেন মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। বেদান্তবাদী হিসাবে বিবেকানন্দের উপলব্ধি প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ। মানুষও স্বরূপতঃ তা-ই। মানুষ কতটা তার স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের দিকে এগুচ্ছে সেই মানদণ্ডেই বিচার হয় মানবজাতির উন্নতির তারতম্য। মানুষ যখন তার স্ব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দের অর্থাৎ অনন্ত সত্ত্বা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়, তখনই

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০৬

২. ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৬-৯৭

সে উন্নতির চরম অবস্থায় পেঁছে। তাই উন্নতিকামী মানুষের আদর্শ হবে এমন সমাজ গঠন করা যে-সমাজের আদর্শ হবে মানুষকে সেই অবস্থায় পেঁছানোর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদেরকে চালনা করা। জ্ঞান এবং প্রেমের সম্মিলন-পথে এগিয়ে গেলে অর্থাৎ শঙ্করের অসাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধের বিশাল হৃদয়ের মিলনেই সেরূপ আদর্শ সমাজ গঠিত হতে পারে। আর এরূপ হওয়া অসম্ভবও নয়, কেননা, স্বামীজীর মতে ঃ "শঙ্করের মেধার সহিত বুদ্ধের হৃদয় লাভ করা সম্ভব।" এবং তা সম্ভবায়িত স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে।

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আজ একটি বিশেষ দিন। এই দিন তিনবার করে ধন্য। কেননা, বৈশাখী পূর্ণিমার এই দিনে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই দিনে তিনি নির্বাণলাভ করেছিলেন এবং এই দিনেই তাঁর ঘটেছিল মহাপরিনির্বাণ। অপূর্ব সুন্দর একটি দিব্য জীবন! সেই দিব্য জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী এই দিনে সমাপ্তিলাভ করেছিল। এটা চিন্তা করে বিস্ময়ে ও আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি। স্মরণীয় বরণীয় দিন এটি। আমাদের দেশে যত মহাপুরুষ, অবতারপুরুষ ও অবতারকল্পপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তার কারণ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য অবতারপুরুষদের অনেকেই হচ্ছেন পৌরাণিক পুরুষ। তাঁদের জীবনের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বুদ্ধই হচ্ছেন প্রথম অবতারপুরুষ, যাঁর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, এমন-কি ভগবান যীশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিকতা অবিসংবাদিত নয়। প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফেরার পথে জাহাজ যখন ভূমধ্যসাগরে ক্রীটদ্বীপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন স্বামীজী একটি স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নে তিনি দেখলেন, ঋষিতুল্য একজন বৃদ্ধকে। তিনি স্বামীজীকে বললেন, 'তুমি এখন ক্রীটদ্বীপে এসেছ—এই দেশেই খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। যে-সব থেরাপুট্টি এখানে বাস করত, আমি তাদেরই একজন। আমরা যে-সব উপদেশ দিতাম, খ্রীষ্টানরা তা-ই যীশুখ্রীষ্টের বাণী বলে প্রচার করেছেন। যীশুখ্রীষ্ট নামে কোন ব্যক্তিরই কোনকালে জন্ম হয়নি। এখানে খনন করলে এ-কথার প্রমাণ মিলবে।' স্বপ্ন দেখার পরই স্বামীজী জাহাজের একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমরা এখন কোথায়?' উত্তর পেয়েছিলেন, 'ক্রীটদ্বীপ থেকে ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে।' ঐ স্বপ্নে তিনি দুটি শব্দ শুনেছিলেন। একটি শব্দের উল্লেখ আগেই করেছি—'থেরাপুট্টি'। দ্বিতীয় শব্দটি খুব সম্ভব 'এসিনি'। 'এসিনি' বলে একটি সম্প্রদায় ছিল, খুব সম্ভব আলেকজান্দ্রিয়াতে। 'থেরাপুট্টি' শব্দটি 'স্থবিরপুত্র' বা 'থেরাপুত্র' থেকে এসেছে কিনা সে-বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। বয়স্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে 'থেরা' বলা হত। অন্যদিকে এইরকম মত আছে যে, যীশুখ্রীষ্ট 'এসিনি' সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এই স্বপ্ন দেখে স্বামীজীর মনে হয়েছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক যীশুখ্রীষ্ট কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। বাইবেলের 'হায়ার ক্রিটিসিজম'-এও এ-ধরনের কথা আছে।

সে যাই হোক, বুদ্ধ কিন্তু হচ্ছেন প্রথম ঐতিহাসিক অবতারপুরুষ। তিনি ধর্মস্থাপনের জন্য দৈত্যদানব বধ করেননি। অথবা miracles—অলৌকিক ঘটনাও প্রদর্শন করেননি। তিনি সাধারণ মানুষরূপেই ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ

মানুষের মতই জীবনযাপন করেছিলেন, যদিও সেই জীবনে তিনি মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবন আলোচনা করতে গেলে তৎকালীন যে-পরিবেশ, সেই পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ ইতিহাস না পেলেও এটা আমরা অনুমান করতে পারি যে, সে-যুগে যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মাদিই ছিল মানুষের ধর্ম। উপনিষদ্‌ তখন আবিষ্কৃত, উদ্‌গীত ঋষিদের কণ্ঠে। কিন্তু তখনো তা জনসমাজে আসেনি। সেটি লুক্কায়িত ছিল অরণ্যের গভীরে, কতিপয় ব্যক্তির জন্য। সেই সময়ে মানুষ যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মে পশুহত্যাদি করত এবং সেটাকেই ধর্ম বলে মনে করত। কিন্তু ঔপনিষদিক যে-ধর্ম, সে-ধর্ম মানুষকে এই যাগযজ্ঞের ধর্মে আবদ্ধ থাকতে বলেনি। যাগযজ্ঞাদির ফলে যে-স্বর্গাদিপ্রাপ্তি, তার চেয়ে উচ্চাবস্থার কথা বলেছে। সে-অবস্থা হচ্ছে মোক্ষাবস্থা। সেটি হচ্ছে পরমার্থ, পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এই মোক্ষধর্ম ছিল জনসাধারণের প্রাপ্তির বাইরে। বুদ্ধদেব এই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলি তাঁর সময়ের বহু পরে লেখা। তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ললিতবিস্তর এবং জাতকের উপক্রমণিকা। এই উপক্রমণিকা নিদানকথা নামে পরিচিত। এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থ আছে। ইতিহাসে কিছু কিছু ছড়ান-ছিটান রয়েছে তাঁর জীবনের ঘটনা। বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে, তাঁর জন্ম ও জীবন সম্বন্ধে নানারকম পুরাণকথার উদ্ভব হয়েছিল। যেমন সংস্কৃতে লেখা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে রয়েছে যে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসীকে দেখে বুদ্ধদেবের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। একথার উল্লেখ কিন্তু পালিভাষায় লেখা গ্রন্থে নেই। পালিভাষায় লেখা গ্রন্থে রয়েছে, বুদ্ধদেব নিজে বলছেন যে, তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে ছিলেন ; তারপরে তাঁর মনে নির্বেদ উপস্থিত হল এবং তার ফলে তিনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। এই সব কথা থেকেই পরবর্তী কালে একটি সুন্দর উপাখ্যান রচনা করে বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে গ্রথিত করা হয়েছিল।

বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি ক্ষুদ্র রাজবংশে। যৌবনেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মানুষের জীবনে যে-দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে, তা অতিক্রম করা যায় কিনা ? আপনারা জানেন, এরপরে একদিন গভীর নিশীথে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ২৯ বছর। গৃহত্যাগ করে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন শিক্ষকের সন্ধানে। এবং উপস্থিত হন বৈশালী নগরে। সেখানে আরাড় কালাম নামে একজন সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যতটুকু জানতে পারা যায়, তা থেকে আমরা বুঝি যে, তিনি সেখানেই প্রথম সাংখ্য ও যোগশিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যোগশিক্ষার ফলে উচ্চ ধ্যানাবস্থা লাভ করলেও তাঁর মনে হয়নি যে, তাঁর পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে। সেইজন্য তিনি আরাড় কালামের আশ্রম ত্যাগ করে রাজগৃহের (রাজগীর) উপকণ্ঠে রুদ্রক রামপুত্রের

আশ্রমে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দেখলেন, রুদ্রক যে অতি উচ্চ ধ্যানাবস্থা লাভ করেছেন, তা-ও শেষ কথা নয়। তাই তিনি রুদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন পাঁচজন ব্রাহ্মণ তপস্বী। ছ বছর দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে তাঁর শরীর বিশীর্ণ হয়ে উঠল। একদিন উঠতে গিয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। মৃতকল্প অবস্থায় তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, ঐ-ধরনের তপস্যায় ঈপ্সিত বস্তু পাওয়া যাবে না। তাই তিনি প্রাণধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আহার গ্রহণের সংকল্প করলেন। এতেই তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ত্যাগ করলেন। তখন তিনি উরুবেলায় একটি বৃক্ষতলে আসীন হলে সুজাতা নামে একটি গ্রাম্য বালিকা বাটিতে করে কিছু পায়েস আনল এবং তাঁকে দিল। তিনি সেই পরমান্ন গ্রহণ করে আবার ধ্যানে বসলেন। এই ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমি উল্লেখ করলাম। তাৎপর্য এই যে, ভগবান বুদ্ধও সাধারণ মানুষের মতোই তপস্যা বলতে প্রথমে বুঝেছিলেন শরীরকে তপ্ত করে, উৎপীড়িত করে, বিশীর্ণ করে মনকে বশীভূত করা। এখনো পর্যন্ত তপস্যার এই সংজ্ঞাই বহু সম্প্রদায়ে গৃহীত। বুদ্ধদেবের সময়েও এটা ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব ঐভাবে তপস্যা করে নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরমান্ন গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝলেন, মধ্যম পন্থাই অবলম্বনীয়। পরবর্তী কালে তা-ই তিনি প্রচার করেছিলেন।

সুজাতার পরমান্ন গ্রহণ করে বুদ্ধদেব আবার ধ্যানে বসলেন। ধ্যানে বসবার সময় তিনি সংকল্প করলেন যে, বোধিলাভ না করা পর্যন্ত তিনি আসনত্যাগ করবেন না। সেই রাত্রেই তাঁর বোধিলাভ হল। এখানেও অনেক উপাখ্যান আছে—'মারে'র উপাখ্যান। সেগুলি পরের যুগের। 'মার' কিছু বাইরের বস্তু নয়। মানুষের মনের মধ্যে যে প্রলোভন থাকে, তা-ই 'মার'। 'মার' রূপী সেই প্রলোভনকে জয় করে তিনি বোধিলাভ করলেন।

> 'অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
> গহকারকং গবেষান্তো গবেষন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
> গহকারক ! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
> সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং।
> বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা॥'

> —'জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি,
> পাইনি সন্ধান
> সে কোথা গোপন আছে, এ গৃহ যে
> করেছে নির্মাণ।
> পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব
> পেয়েছি এবার,

হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি
রচিবারে আর ;
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার
গৃহভিত্তিচয়,—
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি
পাইয়াছে ক্ষয় ॥'

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই গৃহকারক কে?—তৃষ্ণা। গৃহ কী —দেহ। তৃষ্ণা বা কামনার ফলেই বারংবার দেহধারণ।

তারপর আরম্ভ হল একুশদিন ধরে চঙ্ক্রমণ। তিনি ঘুরে বেড়ালেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে। জীবনের সারবস্তুকে তিনি পেয়েছেন এবং সেই আনন্দেই তিনি ঘুরে বেড়ালেন। তারপর আবার উপবিষ্ট হলেন আসনে। আবার সেই রাজ্যে চলে গেলেন—সেই নির্বাণের প্রশান্তিতে। উপাখ্যানের ভেতর বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা এসে বললেন, সমস্ত পৃথিবী দুঃখ পাচ্ছে, তুমি যে-জ্ঞান পেয়েছ, সেই জ্ঞান বিতরণ কর।' বুদ্ধদেব তখন স্থির করলেন যে, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' তিনি তাঁর নিজের পরম প্রাপ্তির আনন্দ পরিত্যাগ করে ধর্মপ্রচার করবেন। এটা আমার মনে হয়, বুদ্ধদেবের মনের গহনে জীবের প্রতি যে অপার করুণা নিহিত ছিল, তারই প্রেরণা ও প্রকাশ। তারপর তিনি এসে উপস্থিত হলেন সারনাথে, তখনকার দিনে যার নাম ছিল মৃগদাব। সেখানে ছিলেন সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তপস্বী, যাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের তিনি উপদেশ দিলেন এবং এইভাবে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' করলেন। কি উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। তিনি কোন পরমবস্তুর কথা বলেননি। তবে চারটি আর্য সত্যের কথা তাঁর উপদেশে রয়েছে—

(১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণও আছে ; কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা বাসনা, (৩) দুঃখের নিরোধও আছে, এবং (৪) দুঃখনিরোধের উপায় হচ্ছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের যে ব্যাখ্যা বুদ্ধদেব নিজে দিয়েছেন, তা হল—

(১) সম্যক্ দৃষ্টি ঃ চারটি আর্য সত্য সম্বন্ধে যথার্থ দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান।

(২) সম্যক্ সংকল্প ঃ অহিংসা, অবিদ্বেষ, কামনারাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে সংকল্প।

(৩) সম্যক্ বাক্ ঃ অসত্য বাক্য, অপ্রিয় বাক্য, পরনিন্দা, অসার বাক্যালাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করা।

(৪) সম্যক্ কর্মান্ত ঃ অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা, প্রাণীহত্যা না করা ভোগাসক্ত না হওয়া।

(৫) সম্যক্ আজীব ঃ ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জন করা।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম ঃ এই সব বিষয়ে চেষ্টা—মনে কুভাব না আসে ; কুভাব এলে, তা দূর করা ; যে-সব সৎ ভাব মনে উদিত হয়নি, সেগুলি যাতে উদিত হতে

পারে ; যে-সব সৎ ভাব মনে উদিত হয়েছে, সেগুলির পূর্ণতা-সাধন।

(৭) সম্যক্ স্মৃতি ঃ সর্ববিষয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা। ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন, অশন, বাক্য-উচ্চারণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে সজাগ থাকা, সচেতন থাকা।

(৮) সম্যক্ সমাধি ঃ গভীর ধ্যান। এই সমাধির চারটি স্তর আছে। সমাধিই অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ ধাপ। প্রথম সাতটি ধাপ অতিক্রম না করে কেউ শেষ ধাপে পেঁছিতে পারে না।

বুদ্ধদেবের এই অষ্টাঙ্গিক সাধনামার্গ দেখলে মনে হয়, যোগের যে-অষ্টাঙ্গ, তার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থকে গ্রহণ করেননি। অমুক গ্রন্থ, অমুক দর্শন, এমন-কি বেদকেও তিনি স্বীকার করেননি। এইজন্য হিন্দু দার্শনিকের কাছে বৌদ্ধদর্শন আস্তিক দর্শন নয়। সেটা হচ্ছে নাস্তিক দর্শন। সাংখ্যদর্শন আস্তিক দর্শন, যদিও সাংখ্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছে। পূর্বমীমাংসায় ঈশ্বরকে, এমন-কি দেবতাকেও অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দেবতা আর কিছুই নয়—চতুর্থী-বিভক্তি-যুক্ত শব্দ। 'অগ্নয়ে স্বাহা', এই 'অগ্নয়ে' কথাটুকু মীমাংসকদের দেবতা। তবুও পূর্বমীমাংসা আস্তিক দর্শন, কেননা মীমাংসকরা বেদকে মেনেছেন। বুদ্ধদেব বেদকে মানেননি। বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত যোগশাস্ত্রকেও তিনি মানেননি। কিন্তু তিনি যোগটা নিয়েছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'ঈশ্বর কি আছেন?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি কি বলেছি ঈশ্বর আছেন?' 'তাহলে কি ঈশ্বর নেই?' 'আমি কি বলেছি ঈশ্বর নেই?' এই ছিল তাঁর উত্তর। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

'চারি দিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়,
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপর ফেনা ঢেউ'-পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ—
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।'

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন কিসের?

'এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে শরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,

যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সবে পথ।'

বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে এটি খুবই প্রযোজ্য। কারণ, যেদিকে তিনি 'দুখানি নয়ন' ফিরিয়েছেন, সেই দিকেই মানুষ পথ দেখেছে। দার্শনিক আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণের ভেতরে তিনি যাননি। তিনি বলেছেন, একজন যদি তীরবিদ্ধ হয়ে তোমার কাছে আসে, তখন তুমি কি করবে? তাকে কি তুমি জিজ্ঞাসা করবে, 'কে তীর ছুঁড়ল? সে কোন্ বর্ণের?—ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শূদ্র? সে কোন্ স্থান থেকে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়েছিল? কত দূরে থেকে ছুঁড়েছিল? তীরটা কি রকম ধনুক থেকে ছুঁড়েছিল?' এইগুলি আমি আমার ভাষায় বলছি, বুদ্ধদেব তাঁর ভাষায় বলেছিলেন। ভাবটা একই। এই সব বৃথা আলোচনা না করে তীরটা উঠিয়ে ফেলে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে হবে—এই হচ্ছে বুদ্ধদেবের মত। নির্বাণের আনন্দ পরিত্যাগ করে তিনি মানুষের জন্য দিয়ে গেছেন নির্বাণের বাণী এবং চেয়েছিলেন প্রত্যেক মানুষের কাছে যেন নির্বাণের বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়। খুব সংক্ষেপে বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম।

এরপর বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ। আপনারা যাঁরা বিবেকানন্দের জীবনচরিতের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ—তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত—একদিন রাত্রে তাঁর ঘরটিতে বসে ধ্যান করছিলেন। গভীর ধ্যানের শেষে, তখনও তিনি আসনে বসে আছেন, এমন সময়ে ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীমূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালেন। নরেন্দ্রনাথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, যেন কিছু বলবেন। নরেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। তারপর তাঁর মনে কেমন-একটা ভয় এল, তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে গেলেন। মনে রাখতে হবে তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। যাই হোক, পরবর্তীকালে তাঁর ধারণা হয়েছিল, সেদিন ভগবান বুদ্ধই তাঁকে ঐভাবে দর্শন দিয়েছিলেন।

জীবনের প্রথমে খোলা চোখে ভগবান বুদ্ধদেবের দর্শন। তারপর তিনি যখন কাশীপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, তখন বুদ্ধদেবের জীবন ও মতবাদ সম্বন্ধে খুব আলোচনা করতেন। ফলে তাঁর বুদ্ধগয়াদর্শনের ইচ্ছা হয়। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং তিনি গিয়ে উপস্থিত হন বুদ্ধগয়ায়। সেখানে ধ্যান করতে করতে হঠাৎ প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে পাশে উপবিষ্ট স্বামী শিবানন্দকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবিসর্জন করতে থাকেন! সহজাবস্থায় ফিরে এলে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলাম···সবই তো রয়েছে কিন্তু তিনি কোথায়?···বুদ্ধদেবের বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে সামলাতে পারলাম না।' এখানেও ভগবান বুদ্ধদেবের একটা প্রভাব তাঁর জীবনের উপর পড়েছিল। তিনি বারবার ভগবান বুদ্ধদেবের হৃদয়বত্তার কথা বলেছেন। বুদ্ধদেবের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি বলেছিলেন, 'I am the servant of the servants of the servants of Buddha.' (আমি বুদ্ধের দাসের দাসের দাস]।

কী অপরিসীম শ্রদ্ধায় একথা বলেছেন! কেন বলেছেন? আমার অনুমান এই যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব—এই দুটি ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের অনন্য ঘটনা এবং দুটির ভেতরে সৌসাদৃশ্য অনেক। এই সৌসাদৃশ্যের জন্যই ভগবান বুদ্ধদেবকে স্বামী বিবেকানন্দ এত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলেছেন, 'ভগবান বুদ্ধই আমার দেবতা।' তিনি আরও বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে—'ভগবান বুদ্ধদেবের জীবের প্রতি যে দরদ, তার তুলনা হয় না।' কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধির নিরিখে পরীক্ষা না করে কোন-কিছুই গ্রহণ করতেন না। অবতার-পুরুষরাও তাঁর সমালোচনার হাত থেকে নিস্তার পাননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অবতারদেরও সমালোচনা করি, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এতটুকু না কমিয়ে।' তিনি সব কিছুই বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার সপক্ষে ছিলেন। প্রত্যেকটি জিনিস বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে। এদিক থেকে বুদ্ধদেব তাঁর অনেক কাছের মানুষ।

বুদ্ধদেব কোন miracle, যাকে বলে অলৌকিক ঘটনা, তাতে বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিতেন না। এসব ঘটনার আলোচনা পর্যন্ত করতে দিতেন না। স্বামী বিবেকানন্দও তা-ই করতেন। ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি কররেখা ইত্যাদি সম্বন্ধে একদিন আলোচনা করছিলেন। এই ব্যাপারে স্বামীজী তাঁদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। একসময়ে তিনি বলেছিলেন যে, মানুষের জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু প্রভাব থাকতে পারে কিন্তু মানুষের আত্মশক্তি গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। সেই আত্মশক্তির উদ্বোধন করা—এইটি সব চেয়ে বড় কথা। বুদ্ধদেবও সেই কথাই বলতেন।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, শঙ্করের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধের হৃদয়—এ-দুটির মিলন। যাঁর ভেতর এ-দুয়ে সমন্বয় রয়েছে, তিনিই আদর্শ পুরুষ। কাজেই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজন স্বামীজী স্বীকার করতেন। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকে স্বামীজী গ্রহণ করেননি, শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্বকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বের যে কর্মে প্রয়োগ, সেটা নিয়েছিলেন বুদ্ধের জীবন থেকে। এই নিয়ে দুটোকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই মিলনটা তিনি দেখেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

আর একটি জিনিস স্বামীজী বুদ্ধদেব থেকে গ্রহণ করেছিলেন, সেটা হল সংঘ-স্থাপন। কিন্তু বৌদ্ধসংঘের একটা দোষ ছিল এই যে, বৌদ্ধরা সমস্ত ভারতবর্ষকে একটা মঠে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সমস্ত কিছুই সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহস্থদের জন্য কিছুই নয়। এটা ঠিক নয়। স্বামীজী সকলকে সন্ন্যাসী করতে চাননি। শ্রীরামকৃষ্ণও চাননি। তিনি অনেককে বলেছেন, খেয়ে নে, পরে নে, ভোগ করে নে। তারপর আসিস্। বলা বাহুল্য স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকেই অনুসরণ করেছিলেন। বৌদ্ধসংঘ আর স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সংঘের মধ্যে আর একটা পার্থক্য আছে। বৌদ্ধ-সংঘ কেন্দ্রিত ছিল না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ কেন্দ্রিত। যাই হোক, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে বুদ্ধের যতটা প্রভাব, সেরকম প্রভাব তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ছাড়া আর কারোর ছিল না। বুদ্ধকে তিনি সর্বদা শ্রদ্ধা করেছেন, প্রণাম করেছেন। ত্রিধন্য এই পুণ্যদিনে সেই প্রণামের সঙ্গে আমাদেরও প্রণাম যুক্ত হোক।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য

পরিমলকান্তি দাস

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বর্তমানকালে যতটুকু মূল্যায়ণ হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে তিনি একজন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মননশীল সন্ন্যাসী। তুলনামূলকভাবে একথা বলা যায়, যে তাঁর মধ্যে শঙ্করের ধী এবং বুদ্ধের হৃদয়ের সমন্বয় ঘটেছিল। এহেন বিবেকানন্দ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে প্রাচ্যের বেদান্ত বাণী পাশ্চাত্ত্যে প্রচার করতে গিয়েছিলেন। জয় করেছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ আসন। পরবর্তীকালে এই প্রতিভাদীপ্ত সন্ন্যাসী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বহু আলোচনা করেছেন। এ সবের মধ্যে ভারতীয় মহাপুরুষদের দিব্যজীবন প্রসঙ্গেও তিনি বক্তব্য রেখেছেন। দেখিয়েছেন, তাঁদের আবির্ভাবের তাৎপর্য এবং যুগোপযোগী তাঁদের মতবাদের বিশিষ্টতা। এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু হল বিবেকানন্দের মননে-চিন্তনে শ্রীচৈতন্যদেব কিভাবে উদ্ভাসিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাবে যখন সনাতন হিন্দু ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত, সেই সময় এলেন অদ্বৈতবাদী আচার্যশঙ্কর। সনাতন হিন্দু ধর্মকে তিনি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। শঙ্করের প্রবর্তিত ধর্মের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানই প্রধান এবং তা জাতিগত ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সেজন্য সর্বসাধারণ তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। শঙ্করের আবির্ভাবের কয়েকশ বছর পরে এলেন রামানুজ। নূতন করে প্রচার করলেন লুপ্ত প্রায় বৈষ্ণব ধর্মকে, ভক্তি সাধনকে। পরবর্তী বেশ কিছুকাল এই সাধনা ভারতভূমিকে অভিসিঞ্চিত করলো। তারপর ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল এই উপাসনা। পরিবর্তন এলো সমাজে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে তন্ত্র সাধনাই প্রচলিত ছিল। নবদ্বীপে তখন একটি ছোট গোষ্ঠী বৈষ্ণব ধর্মের একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল মাত্র। এই সময় সমাজে স্বকপোলকল্পিত মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী বিষহরি ইত্যাদির পূজাই প্রচলিত ছিল। পাষণ্ডেরা সৎলোকের ঈশ্বর আরাধনায় বিঘ্ন ঘটাতো। ব্যাভিচারী শাক্তদের অত্যাচারের হাত হতে জনগণকে রক্ষার জন্য আচার্য রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়মাকারে প্রবর্তনের জন্য চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন, এগুলি যথাক্রমে শ্রী, রুদ্র, চতুর্মুখ ও চতুঃসন। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি ও সাত্ত্বিকভাব বজায় রেখে চলতো। এই সম্প্রদায় ধর্মের মধ্য দিয়ে প্রথমতঃ ভক্তি ও প্রেম ধর্মের উদয় হয়। মাধবেন্দ্র পুরী, যমুনাচার্য প্রভৃতি সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁদের জীবনের প্রেমভক্তির ধারা

প্রবাহিত হয়ে শ্রীবাস, অদ্বৈত ও হরিদাসকে অভিসিঞ্চিত করে সাগর সদৃশ শ্রীচৈতন্যের হৃদয় পরিপ্লাবিত করে পরবর্তীকালে মহাপ্লাবনের রূপ নেয়।

স্বামীজী যুক্তিবাদী মানুষ। সহজে সবকিছু গ্রহণ করেন না। সুনির্দিষ্ট যুক্তি বা অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানকেই স্বীকার করেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সহজে গ্রহণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে এক সময় তিনি ঠাকুরের সঙ্গে তর্কও করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বৃন্দাবনের কথা তুলে ঐতিহাসিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার সেই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।[১]

অনুরূপভাবেই স্বামীজী শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্বকে সহজে গ্রহণ করেন নি। স্বীকার করেন নি তাঁর সংকীর্তন ও নাচানাচিকে। এর প্রধান কারণ, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধনার স্তিমিত ভাব। তাঁর মতে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামীরা কেবল তাঁর (মহাপ্রভুর) নাচ ও সংকীর্তন গ্রহণ করে নরম হয়ে গেছে। কীর্তনের জোরে ভগবানে তন্ময়তা আসে, চোখে জলও আসে, কিন্তু কীর্তনান্তে সেই ভাব সহজেই নেমে যায়। ভাবটিকে ধরে রাখা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের ত্যাগটাকে ভক্তেরা গ্রহণ না করে প্রেমটাকে গ্রহণ করেছেন বলেই এই দশা। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম সাধারণ মানুষের বোধের বাহিরে। কারণ, সে প্রেম মানবিক প্রেম নয়—ঐশ্বরিক প্রেম।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশে ধর্মের নামে অনাচার চলছিল। বৌদ্ধধর্মের অবসান হলেও বিকৃত বামাচার সাধনা তখনও দেশে প্রবল। এই বিকৃত ভোগবাসনা ও ধর্মাচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রেমধর্মের প্রচার। তাঁর মতে সচ্চিদানন্দ মন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই জগতে একমাত্র পুরুষ বাকী জগতের যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ, জীবকুল প্রত্যেকেই তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশ বিশেষ। সে কারণে তারা সকলেই স্ত্রী। যদি জীব শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে তাঁকে (সেই পরমাত্মাকে) পতিরূপে সর্বান্তঃকরণে ভজনা করেন তবে তাঁর কৃপায় মুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যায়। এটাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মধুর ভাব, সাধনার মূল কথা। মহাভাব সর্বভাবের একত্র সমাবেশ।

অবশেষে অবতারতত্ত্বের আলোচনায় স্বামীজী শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতার পুরুষ হিসাবে স্বীকার করে বলেছেন, 'নদীয়ার অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাভাবের যেমন বিকাশ হইয়াছিল, তেমনটি আর কখনও হয় নাই।'[২] অবতার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার, কারণ ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল।'[৩] স্বামীজীর উক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যে তিনি হৃদয়বত্তাকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছেন। মানুষের সদ্‌গুণ গুলির মধ্যে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হলেও তাঁর ধারণা হৃদয়বত্তা বুদ্ধির উপর। স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে হৃদয় প্রসঙ্গে যদিও তিনি বুদ্ধকে উল্লেখ করেছেন তথাপি তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের মহান হৃদয়ের কথা ভোলেন নি।

স্বামীজীর ধারণা ছিল যে যে-কোন মানব হিতৈষীমূলক কাজ করতে হলে মহান

হৃদয়ের প্রয়োজন। মনের উদারতা ও হৃদয়ের প্রসারতা ভিন্ন নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ না করলেও যথার্থ কল্যাণমূলক কাজ করা যায় না।

স্বামীজী দক্ষিণদেশের সংস্কারকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁরা যে পথিকৃৎ একথা তিনি উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, 'তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশ প্রীতিদরিদ্র ও অত্যাচারিত জনগণের প্রতি ভালবাসার জন্য আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। ...ভারতে কি কখনও সংস্কারের অভাব হইয়াছিল ? তোমরা তো ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ ? রামানুজ কি ছিলেন ? শঙ্কর ? নানক ? চৈতন্য ? কবীর দাদু ? এই যে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন ?[৪] মানবতাবোধ সম্পর্কে তিনি তাঁদের জীবন আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, নীচ জাতির জন্য তাঁদের মন কেঁদেছিল। সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয়তা আনবার চেষ্টা করেছিলেন। রামানুজের কথা উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, তিনি আচণ্ডালে উপাসনার পথ খুলে দিয়েছেন। এই পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবকে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'আর্যাবর্তে ঐ তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেখানে কয়েকজন আচার্য ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার বহুদিন পরে মুসলমান শাসনকালে ঘটিয়াছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর্যাবর্তবাসী আচার্যগণের মধ্যে চৈতন্যই শ্রেষ্ঠ।'[৫]

বর্তমান ভারতের সম্প্রদায়কে স্বামীজী মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত করেছেন। দ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে অন্যান্য সম্প্রদায় এই দুইয়েরই অংশভূত। রামানুজের দ্বৈতবাদ এবং ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। এইসব সমন্বয়তা লক্ষ্য করে তিনি শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে বলেছেন, 'অন্যান্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে দাক্ষিণ্যাত্যের আচার্যপ্রবর মাধবমুনি এবং তাঁর অনুবর্তী আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব মধ্বের মতই বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন।[৬]

'সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্তীগণও যে মহাত্মা মধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই মহান দাক্ষিণাত্য।[৭] আবার দেখা যায় শ্রীচৈতন্যদেব যে নৃত্যকীর্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেছিলেন তার আদিস্থান দাক্ষিণাত্য।'[৮]

দাক্ষিণাত্যবাসীদের কাছে আর্যাবর্তবাসী বিশেষভাবে ঋণী। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী উদারকণ্ঠে সেই কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ইঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। যে মহাত্মা শঙ্করের নিকট জগতের প্রত্যেকটি অদ্বৈতবাদীই ঋণী, যে মহাত্মা রামানুজের স্বর্গীয় স্পর্শে পদদলিত পারিয়াগণকেও আলওয়ারে পরিণত করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্যাবর্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ।'

শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রেমাবতার বলা হয়। বাস্তবিক তাঁর মধ্যে যে প্রেমের স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল, এরূপ আর কোনকালে কারও হয়েছিল বলে জানা যায় না। অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ এবং বাহিরে শ্রীরাধা বিরহ এ এক অত্যাশ্চর্য লীলা। এই প্রসঙ্গে ভাবতন্ময় হয়ে স্বামীজী একদিন আলোচনা করেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমাস্পদ শ্রীরাধিকার মিলনের মুহূর্তটি রায় রামানন্দ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সেদিনের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী ঐটির উধৃতি দেন,

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢল অবধি না গেল ॥
ন সো রমন না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি ॥

স্বামীজী বলছেন, 'কাম থাকতে প্রেম হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব মহাত্যাগী পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না।'[৯] অর্থাৎ স্বামীজীর দৃষ্টিতে ত্যাগই প্রধান। আসক্তিহীন হলে তবে নিঃস্বার্থভাবে মানব কল্যাণের কাজ করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের ত্যাগের দিকটা আমাদের প্রথমে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে তাঁর আচণ্ডালে সহানুভূতির ভাব। তাঁর মধ্যে যে প্রেমের প্রকাশ তা হল রাধা-প্রেম। সেটা সাধারণ লোক গ্রহণ করতে পারে না। মহাত্যাগী পুরুষরাই তা অনুধাবণ করতে পারেন। ভক্তিবাদের অন্যতম অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ভারতে এতই বিস্তৃত যে এখনও সেই ভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও আজ সেই দল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত তবুও মূল সূত্রটি এখনও অনুরণিত হচ্ছে। স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে ইহাই প্রত্যক্ষ করেছেন। সেজন্য তিনি বলছেন, 'সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমার্গ পরিজ্ঞাত, সেখানেই লোকে তাঁহার বিষয়ে সাদরে চর্চা করেও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সংশোধিত শাখা মাত্র। কিন্তু তাঁহাব তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিভাবে সমগ্র ভারতে সক্রিয়। কি করিয়াই বা জানিবেন? শিষ্যগণ গদিয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবানকে ভালবাসে।[১০]

কোন এক সময় স্বামীজী গুরুভাইদের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থকে ব্যঙ্গ করে পড়তে দেখে বলেছিলেন, এই রকম করে ভাল জিনিষটা মাটি করে? আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।'[১১]

বিধর্মীদের স্বধর্মে আনয়নের ব্যাপারে স্বামীজীর মত হচ্ছে যে যারা অন্যধর্ম হতে হিন্দু ধর্মে আসতে চান তাদের সকলকেই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সমাজের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, স্মরণ রাখিবেন, বৈষ্ণব সমাজে ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্মান্তর

গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্যই ইহা করিয়াছেন।'[১২]

অবতার পুরুষের অন্তরঙ্গতা প্রসঙ্গে স্বামীজী অনেক কথা বলেছেন। বলেছেন, 'তাঁরা চিহ্নিত পুরুষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তিনি শুনেছিলেন, অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহ ধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান কার্য করেন বা জগতে ধর্মপ্রচার করেন।··· শঙ্কর রামানুজ শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরু পরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করে আসছেন।'[১৩]

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিবাদের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদী। তবে তাঁর অদ্বৈত জ্ঞানও ছিল। একথা জানা যায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। পুরীতে সার্বভৌমের ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি একথা উল্লেখ করেছেন। সেই কারণে এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন, 'চৈতন্যদেব পুরীতে সার্বভৌমকে বলেছিলেন যে ব্যাসসূত্র আমি বুঝি, তাহা দ্বৈতবাদ, কিন্তু ভাষ্যকার অদ্বৈত করিতেছেন'···।[১৪]

স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে এইটুকুই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের প্রকৃতরূপ ও তার অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা জানবার জন্যে ঘরে ঘরে যেতে হবে, জানতে হবে তাদের অবস্থা। প্রকৃত মানবদরদী পুরুষ জানবে তার রূপ এবং চেষ্টা করবে সমস্যাগুলি সমাধান করতে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ভারত পরিক্রমা সম্পর্কে বলছেন,—তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবানকে ভালবাসে।'[১৫] শ্রীচৈতন্যদেবের এই পরিব্রাজক জীবনকে স্বামীজী মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন এবং বুঝেছেন তিনি সত্যই মানব প্রেমিক। মানবের কল্যাণের জন্য, নীচ জাতির উদ্ধারের জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে আহ্বান জানিয়েছেন। আলিঙ্গন দিয়েছেন আচণ্ডালে। কি তার প্রেম, কি তার ভালবাসা। একবার যিনি তাঁর উদাত্ত আহ্বান শুনেছেন, তিনিই ধন্য হয়েছেন।

অবতার বা আচার্যেরা যুগোপযোগী এক একটি মত অনুসরণ করে ঈশ্বরলাভে আত্মনিয়োগের জন্য ভক্তদের উপদেশ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যতমত ততপথ এই সমন্বয় বাণীর পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেকানন্দ বলেছেন,'যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতার পুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে তাদের জীবৎকালে ঐরূপ 'দলফল' সচরাচর হয় না।'[১৬] তবে শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে দল প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছেন, 'হ্যাঁ এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখনা, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিনশ সম্প্রদায় হয়েছে, যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।'[১৭] স্বামীজীর

মতে কালে দল হবেই তবে তার মূল ঐক্যটি থাকবে সেই মহামানবের আদর্শের মধ্যে তাঁর প্রচারিত মতের মধ্যে।

শ্রীচৈতন্যদেব বা রামানুজ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ছুৎমার্গ পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে তা কেবলই বিকৃতভাবেই হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ এবং অন্যান্য খাদ্য বর্জন সম্পর্কে যে নীতি বর্তমানে চালু আছে তা সঠিক নয়। আচার্য রামানুজ খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে যে নিয়ম নিষ্ঠা করেছিলেন তা প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা—

১। জাতিদোষ অর্থাৎ উত্তেজক খাদ্য বর্জন।

২। আশ্রয় দোষ অর্থাৎ দুষ্ট লোকের অন্ন বর্জনীয় এবং

৩। নিমিত্ত দোষ অর্থাৎ ময়লা পচা খাদ্য বর্জনীয়।

এগুলি কিন্তু পরবর্তীকালে বিকৃত হয়েছে, ছুৎমার্গ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর উক্তি, 'খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ক্ষেত্রে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়।'[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতাররূপে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর অশেষ গুণাবলীর প্রশংসাও করেছেন। নবদ্বীপ 'ন্যায়' শাস্ত্রের পীঠস্থান। ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করতে আসতেন। কিন্তু শ্রীচৈত্যদেবের কালে বা তার পূর্বে বঙ্গদেশে বেদ চর্চা বিশেষ হোত না। সেই সময় এখানে কোন পতঞ্জলির ভাষ্য পড়াবার লোক ছিল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব মেধার কথা স্মরণ করে স্বামীজী বলছেন, 'একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল; কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।'[১৯]

সময়োপযোগী সেইকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল, একথা স্বামীজী বুঝেছিলেন। সেই সময় মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম এবং আচণ্ডালে তা বিতরণ ছিল প্রয়োজন সঙ্গত নতুবা সনাতন হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম প্রাধান্য লাভ করত। স্বামীজী শ্রীচৈতন্যের ভাবকে প্রথমে যে ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর সে ধারণার পরিবর্তন হয়। ফলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম সংকীর্তনকে তিনি গ্রহণ না করলেও শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব প্রেমের স্ফুরণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আরও অভিভূত হয়েছিলেন মহাপ্রভুর পরিব্রাজক জীবন এবং তাঁর আচণ্ডালে সহানুভূতির ভাবকে লক্ষ্য করে।

সেই সময় সমাজে ছিল ঘোর শাক্ত প্রভাব, ছিলনা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ অভিব্যক্তি। ভক্তিবাদ ছাড়া অবতারের আবির্ভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং ভক্তি সাধনার পুনরুত্থান এই কালে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনকালে স্বামীজী এসেছিলেন বলে তাঁর মাধ্যমে বুঝতে

পেরেছিলেন প্রকৃত প্রেম কি? শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভক্ত ও সন্ন্যাসী সন্তানদের শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব ও আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও তাঁর অদৃষ্ট পূর্ব সাধন ইতিহাস বর্তমান যুগে আমাদের ঐ চরম তত্ত্ব বিশদ ভাবে শিক্ষা দেয়। সাধক জীবনের প্রথম দিকে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে ঠাকুরের বিরূপ ধারণাই ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল তিনি মহাপ্রভুকে অবতার রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের সত্বা দেখেছেন, গৌর-নিতাই তাঁর দেহ হতে নির্গত হয়ে আবার দেহেই লীন হলেন। ভাবাবেশে লক্ষ্য করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তন, কলুটোলা চৈতন্য সভায় ভাগবত পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্য ভাবে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। আবার গৃহীভক্ত নবগোপাল ঘোষকে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে দর্শন দিয়ে কৃপা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ভাবে অনুভব করেছেন শ্রীচৈতন্য সত্ত্বাকে। তাঁর অনুভূতি লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা তিনি পরবর্তীকালে ভক্ত ও সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে বলেছেন।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি লব্ধ ঘটনাকে স্বামীজী সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং দেখেছেন ঠাকুরের মধ্যে সেই প্রেমের স্ফুরণ, আর্তদের কৃপাদান এবং মানুষের কল্যানের জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন। অজ্ঞানী মানুষদের জন্য, আর্ত জীবের নিমিত্ত কতটা ভালবাসা, কতটা হৃদয়বত্তা থাকলে তবে এই আচরণ সম্ভব! সেই কারণেই অবতার বরিষ্ঠ সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই স্বামীজী খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবকে, বিশ্বাস করেছিলেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্যকে।

উৎস নির্দেশ :

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড) স্বামী সারদানন্দ, ১০ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলি-৩, পৃঃ ২৭৩-৭৪

২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৪র্থ খণ্ড) ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয় পৃঃ-৩০৯

৩. ঐ (৭ম খণ্ড) ঐ ঐ পৃঃ-৩৪৩

৪. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড), ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ-১০৮

৫. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-১৬০

৬. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-২২১

৭. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-৪৪৭

৮. তদেব (৭ম খণ্ড) ... ... পৃঃ৯০-৯১

৯. তদেব (৯ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-৪২৮

১০. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-৪৫১

১১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম কথিত, ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট। বরানগর মঠ/ ১ম পরিচ্ছেদ : পৃঃ ২৫৮

উৎস নির্দেশ ঃ

১২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ-৪৮৫
১৩. তদেব (৯ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-২৫১
১৪. তদেব (৬ষ্ঠ খণ্ড) ... ... পৃঃ-২৯২
১৫. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-৪৫১
১৬. তদেব (৯ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-১১১
১৭. তদেব (৯ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-১১২
১৮. তদেব (৬ষ্ঠ খণ্ড). ... ... পৃঃ-১৭৩
১৯. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃঃ-৪৫১

গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, পাঞ্জাব এবং স্বামী বিবেকানন্দ

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিবাস পাই স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, একদিন স্বামীজী একটি শিশুকে কোলে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে একটি পাঞ্জাবী গান গেয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন গানটি গুরু নানকের রচনা। একদিন সন্ধ্যার সময় নানক একটি মন্দিরে গেছেন। মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছে বিগ্রহের। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাঁকে প্রবেশ করতে দিলেন না। তখন নানক সঙ্গে গিয়ে এই গানটি গেয়েছিলেন ঃ

গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে···

আকাশ যেন আরতির রৌপ্যপাত্র, আর সূর্য চন্দ্র যেন প্রদীপ···। গানটির বাংলা রূপান্তর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই গানটি ছিল স্বামীজীরও অত্যন্ত প্রিয়।

গুরু নানককে স্বামীজী কেবল শিখ সম্প্রদায়ের নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নানক সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন তিনি ছিলেন 'যথার্থ অবতার'। স্বামীজীর দৃষ্টিতে নানক ছিলেন ধর্মাচার্য হিসাবে "ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো", নানক ছিলেন প্রকৃত 'সমাজ-সংস্কারক'। নানকের উদার হৃদয়ের দিকটি স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শুধু গুরু নানকই নন, সকল শিখ-গুরুগণই তাঁর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই গুরু নানক ও অন্যান্য শিখগুরুদের নানা কাহিনী তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের শোনাতেন। নিবেদিতা তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন ঃ স্বামীজী শিখগুরুদের কথা বললেন। গ্রন্থসাহেব থেকে গুরু নানকের একটি কাহিনী শোনালেন। নানক মক্কা গেছেন, সেখানে কাবা মসজিদের দিকে পা করে শুয়ে আছেন। তা দেখে ক্রুদ্ধ মুসলমানেরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে এই মারে তো সেই মারে। কী! আল্লার স্থানের দিকে পা করে শোয়া? নানক শান্তভাবে উঠে শুধু বললেন, 'তাহলে আমাকে তোমরা দেখিয়ে দাও, কোনদিকে ভগবান নেই, আমি সেই দিকেই পা করে শোব!'

স্বামীজী শিখদের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে বীর্যধর্মের সমন্বয় দেখেছিলেন। সেইজন্যে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে বলেছিলেন ঃ "এই যুগের (মুসলমান যুগের) শেষে হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।" অবশ্য স্বামীজী এখানে হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে সনাতন ভারতীয় ধর্মের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের স্মরণমাত্র স্বামীজী প্রবল উন্মাদনা বোধ করতেন। শিখদের সংগ্রামী প্রতিভার মধ্যে তিনি ভারতীয় সনাতনধর্মের, যা হিন্দুধর্ম হিসাবে পরিচিত, তারই বীরত্বের ভাবকে প্রবলরূপে প্রকাশিত দেখেছেন। এবিষয়ে নিবেদিতা বলেছেন ঃ "শিখদিগের বিখ্যাত খালসা শিখদলের মতো সঙ্ঘ অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার (স্বামীজীর) মতে তা হিন্দু-

ধর্মেরই সৃষ্টি এবং তাহারই অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কি আগ্রহের সঙ্গে তিনি আমাদের কাছে বার বার গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্যগণের প্রতি, কে ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে?—এই আহবান ও সেই দৃশ্যের জবলন্ত বর্ণনা করতেন।" আসলে স্বামীজী মনে করতেন যে হিন্দুধর্মের তিনটি পৃথক স্তর আছে। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রাচীন, শাস্ত্রানুবর্তী ধর্ম। দ্বিতীয়টি মুসলমান রাজত্বকালের ধর্মসংস্কারগণ প্রবর্তিত সম্প্রদায়সমূহ। তৃতীয় ক্ষেত্র বর্তমানকালের সংস্কার প্রয়াসী সম্প্রদায়সমূহ। তাই স্বামীজী মনে করতেন,ভারতের সনাতনধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মতবাদ, চিন্তাধারার বিভিন্ন পথের একত্রিত সংহত রূপেই আজ হিন্দুধর্মরূপে অভিহিত। হিন্দুধর্ম আসলে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা প্রকাশ করে না, বিভিন্ন মত ও পথের বক্তব্য ও চিন্তাকে সে ধারণ করে আসছে অনাদি কাল থেকে। এই 'এ্যাসিমিলেশন' বা আত্মীকরণই ভারতীয় সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তাই তার মধ্যে যেমন দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা আছেন, তেমনি আছেন সাকার ও নিরাকারবাদীরা। আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্যরাও যেমন আছেন তেমনি আছেন নিরীশ্বরবাদীরাও। এর কিছুকে ফেলা যায় প্রাচীন, ও শাস্ত্রানুবর্তী ধর্মের মধ্যে, কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় মুসলমান রাজত্বকালে ধর্মসংস্কারগণ প্রবর্তিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে, আর কোন কোন মত ও পথকে আনা যায় বর্তমানকালের সংস্কারপ্রয়াসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে।

গুরু গোবিন্দ সিংহকে হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করে স্বামীজী লাহোরে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ "কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদ-বাচ্য যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে;···যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষি হিন্দু নামধারী তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; যখন হিন্দুনামধারী যে-কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে এবং নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; ···যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে তোমাদের আমি গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি। এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজ শোণিত-পাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন—কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের ও নিজ আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাকুক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমনকি দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে অপসৃত হইয়া দক্ষিণদেশে গিয়া, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞ-ভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। ···যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও তোমাদেরও প্রত্যেককে এক একজন গোবিন্দ সিংহ হইতে হইবে। ···এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দু নামের

যোগ্য। আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।"

গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম দিয়ে ভারতীয় সনাতনধর্মের আদর্শকে সাহসিকতা ও বীর্যবত্তার ক্ষেত্রে সার্থকতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুতরাং আদর্শ হিসাবে গুরু গোবিন্দ সিংহ সর্বদাই আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই স্বামীজী গুরু গোবিন্দ সিংহের আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরে আমাদের সামনে তিনি কর্তব্য হিসাবে বললেন, প্রথমতঃ, আমাদের সামনে এরূপ আদর্শ সবসময় থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ভুলতে হবে। তৃতীয়তঃ, চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করতে হবে। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে তিনি শিখদের শৌর্যবীর্যের প্রতি এবং তাঁদের গুরুদের প্রতি যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন, ঠিক তেমনি প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্যও পালন করেছিলেন শিখদের উত্থানের সঙ্কীর্ণতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসলে তিনি সেদিনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়েই তাঁর প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে তিনি ভারতবর্ষের মানুষের গৌরবটিকেও যেমন ধরতে পেরেছিলেন, তেমনি তাদের সীমাবদ্ধতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

কেবল শিখধর্ম বা শিখ জাতিই নয়, সমগ্র পাঞ্জাবের প্রতিই ছিল স্বামীজীর বিশেষ দুর্বলতা। পাঞ্জাবের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রই তাঁর একটি অপূর্ব শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিত। শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ, সাহসিকতা এবং সংগ্রামের এক অসাধারণ ভিত্তিভূমি পাঞ্জাব ছিল ভারতীয় সভ্যতার বহুবর্ণময় এক পটচিত্র। এই চিত্র দর্শনে তাঁর হৃদয়ে কোন ভাবের সৃষ্টি করত তার অনন্য পরিচয় দান করেছেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি উত্তরভারত ভ্রমণের সময় স্বামীজীর পাঞ্জাব সম্পর্কে যে আবেগ-উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলেন তার অসাধারণ রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেছেন: "পাঞ্জাবে প্রবেশ করেই আমরা আচার্যদেবের স্বদেশপ্রেমের গভীরতম পরিচয়ের ঝলক দেখতে পেয়েছিলাম। যে-কেউ তখন তাঁকে দেখলে তিনি বলতেন যেন স্বামীজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি পাঞ্জাবের সঙ্গে নিজেকে এতই অভিন্ন করে ফেলেছিলেন যে মনে হতো যেন তিনি ঐ প্রদেশের লোকের সঙ্গে বহু প্রেম ও ভক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যেন তিনি তাঁদের কাছে পেয়েছেন অনেক এবং দিয়েছেনও অনেক। কারণ, তাঁদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন যাঁরা পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলতেন যে, তাঁর মধ্যে তাঁরা গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের—তাঁদের প্রথম এবং শেষ গুরুর—অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন।"

পাঞ্জাব ও শিখগুরুরা স্বামীজীর কাছে কিরূপ শ্রদ্ধেয় ছিলেন তা তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথোপকথনে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন: "স্বামীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা – প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামীজী ঐ বাটীর ছাদে বেড়াইতেছেন।

শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা, ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরু গোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, ওজস্বিনী ভাষায় সেসকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরু গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেন :

সওয়া লাখ পর এঁক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউঁ॥

অর্থাৎ গুরু গোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষামন্ত্র) শুনিয়া এক ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরু গোবিন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রবণতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইতে যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত! ধর্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল।" উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় স্বামীজীর অন্তরে শিখধর্ম, শিখজাতি ও গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রতি কী অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। গুরু গোবিন্দের যে-বিষয়টি তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণ করত তা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত করে দেওয়ার ক্ষমতা। সেদিন শিষ্য স্বামীজীকে বলেছিলেন : এটি কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করে একই উদ্দেশ্যে চালিত করতে পেরেছিলেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় দেখা যায় না। স্বামীজী তার উত্তরে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর রাষ্ট্র ধর্ম ও সমাজচিন্তার গভীরতাই কেবল ফুটে ওঠেনি, তিনি সেদিন যে অসাধারণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা এককথায় অসাধারণ। তিনি বলেছিলেন : "Common interest (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা) না হলে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest বা (স্বার্থ) এক না হয়। গুরু গোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরু গোবিন্দ common interest create করেননি, কেবল সেটা ইতর সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান

—সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে প্রদত্ত 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি' বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি পাঞ্জাবের পবিত্র ভূমিকে ও তার মহান ইতিহাসকে বন্দনা করে বলেছিলেন যে, এই ভূমি "পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম" এবং মনু মহারাজের মতে এই ভূমি হচ্ছে 'ব্রহ্মাবর্ত'। এই পবিত্র ভূমিতেই বহু মনীষীর আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়েছে এবং তাঁদের মহান সিদ্ধির প্লাবনে সমস্ত ভারত আর সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হয়েছে। বিচিত্র ধর্মের যেমন মহান সম্মেলন ঘটেছে বার বার এই ভূমিতে, তেমনি বিভিন্ন জাতি যখন বার বার ভারত আক্রমণ করেছে তখন সেই ভূমিতেই প্রথম রক্তপাত ঘটেছে এবং এখানকার মানুষের বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যের সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণকে বার বার প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবকে বিশ্বপ্রেমের মহান ক্ষেত্রভূমি বলে বর্ণনা করে বলেছেন: "এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া, বাহু প্রসারিত করিয়া, সমগ্র জগৎকে, শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদেরও আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়-বর্গের রক্তপাত করিয়াছিলেন।..."

বক্তৃতার সূচনায় পাঞ্জাব এবং গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উদ্বেলিত কণ্ঠে উদাত্ত আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন: হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখানে—আমাদের এই প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই। ...দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নয়—কোথায় আমাদের মিলনভূমি তাহাই অন্বেষণ করিতে। আমি আসিয়াছি ইহাই বুঝিতে কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সেই ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে বাণী অনন্ত-কাল আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে। তোমাদিগকে কিছু গড়িবার প্রস্তাব দিতেই আমি আসিয়াছি, ভাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়।" আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামীজী পাঞ্জাবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলছেন যে তিনি এসেছেন "গড়িবার প্রস্তাব দিতেই—ভাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়।" আজ স্বামীজীর এই মিলনের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার ও অন্বেষণের ব্যাপারটি দেশবাসীর সামনে সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরার দরকার। সমন্বয় ও মিলনের এই স্বর্ণসূত্রটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে—

যিনি ছিলেন সমন্বয় ও সংহতির মূর্ত প্রতীক। সেদিন স্বামীজী সেই পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত শিখ-সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব ও শৌর্যবীর্যকে উপলক্ষ করে, শিখগুরুদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন: যথেষ্ট সমালোচনা, যথেষ্ট দোষদর্শন হইয়াছে। আর নয়। এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে এবং সেই সমষ্টি শক্তির সহায়তায় বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। এখন বাড়ি পরিষ্কার হইয়াছে। ইহাতে নূতন ভাবে বাস করিতে হইবে। পথ পরিষ্কার হইয়াছে। আর্য সন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।"

আজ থেকে নব্বই বছর আগেকার স্বামীজীর এই উদাত্ত আহ্বান-বাণী আজকের ভারতবর্ষের পক্ষে যে কত জরুরী প্রয়োজন বর্তমানে আমরা তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। স্বামীজী ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিপুরুষ। তিনি ভারতবর্ষকে সেদিন আহ্বান করেছিলেন এক নূতন ভারতবর্ষে পদার্পণের।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ, আধুনিক কালের এই দুইজন মহামনস্বী আবির্ভূত হয়েছিলেন একই কালে এবং একই পরিবেশের মধ্যে। দুইজনেরই জন্মস্থান উত্তর কলকাতায় পরস্পরের অতি নিকটবর্তী স্থানে। তাঁদের জন্মকালের ব্যবধানও অতি সামান্য, পুরো দেড় বৎসরও নয়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ই মে তারিখে, আর বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি। বস্তুতঃ বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথের অনুজ বুধেন্দ্রনাথের (১৮৬৩-৬৪) স্থানীয় মনে করা যায়। তৎকালে বাংলাদেশে অর্থাৎ কলকাতায় যে-সব ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলছিল, তার সম্বন্ধে দুইজনই প্রায় সমভাবে আগ্রহান্বিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জড়িতও ছিলেন। একই স্থান-কাল ও পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জীবনধারা যে দুই পথে প্রবাহিত হয়েছিল তার মূল কারণ তাঁদের জন্মগত প্রকৃতি এবং অংশত পারিবারিক প্রভাব। আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে যে ব্যবধান দেখা যায়, গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে ব্যবধান দুস্তর নয়। সে ব্যবধানে বস্তুতঃ তাঁদের কর্মপ্রণালীর মধ্যে তাঁদের মননধারা ও হৃদয়ধারার মধ্যে নয়। আরও একটি কারণ তাঁদের পরমায়ুর অসমতা। বিবেকানন্দের তিরোধানের কালে দুইজনের চিন্তা-ভাবনা ও আনন্দ-বেদনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও মনন যে সীমায় উপনীত হয়, বিবেকানন্দের অনুভূতি ও মনন থেকে দূরবর্তী নয়। বস্তুতঃ কোন কোন বিষয়ে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী ছিলেন। তার কারণ বিবেকানন্দের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের থেকে গভীরতর ও বিচিত্রতর ছিল। উভয়ের উনচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনধারার কথা স্মরণ করলে এ কথার সার্থকতা বোঝা কঠিন হবে না। বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয়ের কীর্তি অর্জন করেছিলেন ত্রিশ বৎসর বয়সে ১৮৯৩ সালে। রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার কুড়ি বৎসর পরে বাহান্ন বৎসর বয়সে। বিবেকানন্দের জীবনের বেগ ও কর্মের গতি ছিল দ্রুততর, ঝড়ের মতো বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের গতি ছিল মন্থরতর, কিন্তু স্থির। বিবেকানন্দের তিরোধানের সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টা অনেকাংশেই আবদ্ধ ছিল সাহিত্যসৃষ্টির সীমার মধ্যে। তাঁর মনন ও কর্মপ্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় বিবেকানন্দের জীবনের একেবারে শেষদিকে। উভয়ের মনন এবং কর্মের তুলনা করতে হলে বিবেকানন্দের জীবনধারায় শেষ নয় বৎসর এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর কালকে একই পর্যায়ভুক্ত করা প্রয়োজন তা হলেই উভয়ের চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য পরিস্ফুট হবে।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি ও শিল্পী। তাঁর মননের গভীরতা ও বৈভব যতই হক,

তাঁর কবিকৃতির তুলনায় তা গৌণ। ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত কবিকৃতি ও শিল্প-সৌন্দর্য তাঁর মনকে প্রায় সর্বোতভাবেই অধিকার করেছিল। তাঁর মনন সম্পদের যথার্থ-রূপে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে বিংশ শতকের প্রথম থেকে বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ে তার সূত্রপাত। তাঁর মননের সঙ্গে কর্মপ্রচেষ্টাও দেখা দেয়। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা তার প্রমাণ। বিবেকানন্দের প্রকৃতিতেও কাব্য এবং শিল্পবোধ ছিল প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু তার প্রকাশ সুপরিস্ফুট হবার সুযোগ পায়নি। যেটুকু নিদর্শন আমাদের কাছে এসে পেঁাচেছে, তাও দেখা দিয়েছিল তাঁর কর্মধারার অনুবর্তীরূপে। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনা হয় না। যে তুলনা সম্ভব, শুধু সম্ভব নয় প্রয়োজনীয়, তা মননের ক্ষেত্রেই। বর্তমান আলোচনায় আমরা সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করব না। সময়ান্তরে সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হবার আশা রইল।

বর্তমান প্রবন্ধে এমন দু-একটি প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব যা অনেকের মনে স্বভাবতঃই উদিত হয়, অথচ যার সদুত্তর পাওয়া আয়াসসাধ্য।

একটি প্রশ্ন এই—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল কি? স্থান-কাল ও পরিবেশের দিক থেকে তাঁরা পরস্পরের এত নিকটবর্তী যে, উভয়ের মধ্যে দেখা না হওয়াই বিচিত্র। বস্তুতঃ তাঁদের মধ্যে চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎ একাধিকবারই হয়েছিল বলে মনে করার হেতু আছে। তখনকার দিনে 'হিন্দুমেলা'-উৎসব এবং তার অনুষ্ঠানাদি যুবকমাত্রেরই আগ্রহের বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে ঐ মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তা সুবিদিত। নরেন্দ্রনাথের ন্যায় সর্ববিষয়ে উৎসাহী যুবক যে সে-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন তা মনে করা যায় না। এই উৎসবের ক্ষেত্রে উভয়ের উপস্থিতিই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হবার মতো কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাতের আর-একটি সাধারণ ক্ষেত্র বা যোগসূত্র ছিল গান। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ, এই দুইজনই ছিলেন গানের ক্ষেত্রে সুখ্যাত। এই গানের আকর্ষণেই দুইজন যে এক ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, যথাস্থানে তার কিছু প্রমাণ দেওয়া যাবে।

বাংলাদেশের তৎকালীন এই দুই প্রতিভাবান যুবকের আর-একটি সাধারণ আগ্রহের বিষয় ছিল বাংলাসাহিত্য। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংযোগের বিষয় উল্লেখ করা বাহুল্য। নরেন্দ্রনাথ নানা বিদ্যার চর্চায় আগ্রহান্বিত ছিলেন।

কিন্তু তাঁর জীবনীকারের (প্রমথনাথ বসু) মতে—"তাঁহার সর্বাপেক্ষা অনুরাগ ছিল বাঙ্গালা ভাষার প্রতি"। তিনি আরও বলেন, "নভেল, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাদির প্রতি তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল"। ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত থেকে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত তৎকালীন সমস্ত লেখকের রচনার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সুতরাং উদীয়মান সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি যে উদাসীন ছিলেন

তা মনে করা যায় না। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর সহপাঠী। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করছি।

বিবেকানন্দকেও দেখেছি। কর্তাদাদামশায়ের কাছে আসতেন। দীপুদার সহপাঠী ছিলেন ; 'কি হে নরেন' বলে তিনি কথা বলতেন।"

—'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৩৫১), পরিচ্ছেদ ১৫, পৃঃ ১০৯

দেবেন্দ্রনাথের কাছে নরেন্দ্রনাথ কেন আসতেন, এই প্রশ্নটাও স্বাভাবিক। তার একটা উত্তর পাওয়া যায় জীবনচরিতকার প্রমথনাথ বসু-প্রদত্ত একটি বিবরণ থেকে। নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়তেন তখন পাশ্চাত্ত্যদর্শন আলোচনার ফলে তাঁর মনে এক গভীর আধ্যাত্মিক সংকট দেখা দেয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা তাঁর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এই সংশয় ও সংকট থেকে ত্রাণলাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এক সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সহায়তাপ্রার্থী হন। এই প্রসঙ্গে জীবনচরিতকারের উক্তি এই।—

"প্রাণের উৎকণ্ঠায় তিনি একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তখনকার শিক্ষিত লোকদিগের নিকট একজন উচ্চশ্রেণীর ধর্মশিক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।···তিনি মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বহির্বিকাশ সাধন করেন। সুতরাং নরেন্দ্র মনে করিলেন তাঁহার নিকট যাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মহর্ষি তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া গভীর ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। শীঘ্রই একটি দল সংগঠিত হইল। মহর্ষি প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণের জন্য ধ্যানাভ্যাস প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে কে কেমন উপলব্ধি করিতেছে তাহার পরিচয় লওয়া হইত।···মহর্ষি বুঝিলেন, এই যুবকটি সাধারণ যুবকসম্প্রদায় হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং নিজে যতদূর পারিলেন এই বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এমন কি, অপরের নিকট তাঁহাকে একজন অসাধারণ সুপ্তশক্তিমান যুবক বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। নরেন্দ্র শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাতায়াত ও তাঁহার উপদেশ মত কার্য করিতে লাগিলেন।"

—'স্বামী বিবেকানন্দ' (১ম খণ্ড), অকুল চিন্তাসাগরে আশ্রয়

মহর্ষির কাছে কাছে নরেন্দ্রের এই যে যাতায়াত, এটি সম্ভবতঃ ১৮৮২ সালের ঘটনা। তখন তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাবিপ্লবে বিচলিত।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি মহর্ষির এই যে স্নেহানুরাগ, পরবর্তীকালেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে। —

"আমেরিকার চিকাগোর সংবাদ যখন কলিকাতা শহরে প্রকাশিত হইল এবং সেই বিষয় লইয়া যখন সকলে আলোচনা করিতে লাগিলেন, সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তাঁহার দারোয়ান মারফত ৩নং গৌরমোহন

মুখার্জি'র গলির বাড়িতে পাঠাইয়া দেন।…মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন নরেন্দ্রনাথদের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ জানিতেন না। নরেন্দ্রনাথের জননী ও অন্যান্য ভায়েরা তখন রামতনু বসু গলির বাড়ীতে বাস করতেন। অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়। দুঃখের বিষয় গৌরমোহন মুখার্জি'র বাড়ীতে যাঁহারা তখন বাস করিতেন তাঁহারা তখন পত্রখানি লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। সেইজন্য সেই পত্রখানি সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত রহিল।"

—'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,' তৃতীয় খণ্ড (১৩৬৭), পৃঃ ১১৭-১৮

পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের অন্যতম যোগসূত্র ছিল গান। সেই গান ছিল প্রধানতঃ ব্রহ্মসংগীত। নরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থাতেই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তখনকার দিনে ব্রাহ্মরাই ছিলেন সর্বপ্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বাহক। জীবনচরিতকার প্রমথনাথ বসু এ প্রসঙ্গে বলেন—

"নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমে রীতিমত খাতায় নাম লিখাইয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন। এমন কি, যখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, তখনও হয়তো ব্রাহ্মদিগের খাতায় তাঁহার নাম ছিল।"

—'স্বামী বিবেকানন্দ,' ১ম খণ্ড (১৩৬২), মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা

নরেন্দ্রনাথ কখন কিভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈত-আশ্রম থেকে প্রকাশিত ইংরেজী জীবনচরিতের একটি উক্তি স্মরণীয়।—

"In 1878 there was a split in the Brahmo Samaj and a number of the members headed by Pandit Shiva Nath Shastri and VijoyKrishana Goswami, formed a new Society called the Sadharan Brahmo Samaj. Naren identified himself with the new organisation and his name is still on the rolls of the original members."

—Chapter IV

উল্লিখিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সালের মে মাসে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা জীবনচরিতকারের বিবৃতির মধ্যে একটা পারস্পরিক বিরুদ্ধতা দেখা যায়। বাংলা জীবনচরিতকারের মতে নরেন্দ্র ১৮৭৭ সালে মধ্যপ্রদেশে রায়পুর-নামক স্থানে যান এবং সেখানে পিতামাতার সঙ্গে দুই বৎসর যাপন ক'রে ১৮৭৯ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। যদি এই বিবরণ সত্য হয়, তা হলে নরেন্দ্রনাথের পক্ষে ১৮৭৮ সালের মে মাসে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রাথমিক সদস্য হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। বস্তুতঃ ১৮৭৮ সালে পনর বৎসর-বয়স্ক ইস্কুলের ছাত্র নরেন্দ্রনাথের পক্ষে ঐ সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য বলে গণ্য হওয়া স্বাভাবিক বলেও

মনে হয় না। সম্ভবতঃ ১৮৭৯ সালের পরবর্তী কালে কোন সময়ে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে সত্যতা নিরূপণের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দলিলাদি পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

১৮৭৯ সাল থেকে নরেন্দ্রনাথ যে উত্তরোত্তর বেশি করে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন, তাতে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না। এই যোগের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নরেন্দ্রনাথের সংগীত-দক্ষতা। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উৎসবের সময় যেসব গায়কদের ডাক পড়ত, তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রগণ্য। তদানীন্তন কালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে জানা যায়, ঠাকুরবাড়িতে মাঘোৎসবের সময়ে জনতার ভিড় সংযত রাখা দুঃসাধ্য হত। তার প্রধান কারণ দুটি—স্বয়ং মহর্ষির উপাসনা-পরিচালনা এবং নূতন নূতন সংগীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শক ১৮০২ (ইং ১৮৮১) মাঘসংখ্যা তত্ত্ববোধিনীর একটি বিজ্ঞাপন উধৃত করা গেল।—

"শ্রীযুক্ত প্রধান-আচার্য মহাশয়ের ভবনে ১১ই মাঘের উৎসবে অত্যন্ত জনতা ও লোকেরা মৃতকল্প হয়, তজ্জন্য ঐ দিবসে রাত্রিকালে উপাসনার সময় উপাসনাক্ষেত্রের বসিবার স্থান লোকপূর্ণ হইলে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"

পরবর্তী ফাল্গুন সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী থেকে জানা যায়, ১১ই মাঘের উৎসবের দিন প্রাতঃকালের অনুষ্ঠানে বালিকারা যেসব সংগীত করেন তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্ররচিত "মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ"—এই গানটি এবং সায়ংকালের অনুষ্ঠানে বালকবালিকারা যেসব গান করেন তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের আর-একটি গান—"এ কি সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ"। এই বালক-বালিকাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের উপস্থিত থাকা অসম্ভব নয়। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মোৎসবাদিতে গান করতেন এবং ঠাকুর বাড়িতেও যাতায়াত করতেন, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন দ্বিপেন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের স্নেহভাজন। সুতরাং গানশেখা এবং অন্যবিধ নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হত, এ কথা মনে করা অসমীচীন নয়।

বাংলা জীবনচরিতকারের মতে নরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭-৭৮ এই দুই বৎসর কলকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন। পক্ষান্তরে ১৮৭৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারি—এই এক বৎসর পাঁচ মাস রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলাতে। ১৮৭৭-এর পূর্বে এই দুই যুবকের পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাতের সম্ভাবনা খুব কম। ১৮৮০ ফেব্রুয়ারির পরে উভয়ের যোগাযোগ ঘটে এ কথা মনে করাই সংগত বোধ হয়। আমরা অনুমান করছি যে, ১৮৮১ সালের মাঘোৎসবের সায়ংকালের অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ গায়কদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এর পূর্ব থেকেই হয়তো তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নূতন গানগুলি লিখে নিতে হয়েছিল। এ অনুমান যে একেবারে ভিত্তিহীন নয়, তা মনে করবার হেতু আছে। কয়েক মাস পরে ওই ১৮৮১ সালেই তিনি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন নূতন গান শিখে নিয়েছিলেন তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। শক ১৮০৩

(ইং ১৮৮১) ভাদ্রসংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'বিবাহ'-শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ স্থলে সেটি সমগ্রভাবে উধৃত করা গেল।—

"গত ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থী কন্যার সহিত ময়মনসিংহনিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মিত্রের পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্রের শুভ পরিণয় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহসভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ এবং কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পাত্রীর বয়স সতর, পাত্রের বয়স আটাইস বৎসর। পাত্রীটি সুশিক্ষিতা ও সুশীলা। পাত্রটি কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও সুধার্মিক। এই বিবাহে কন্যার ইচ্ছাই বলবতী ছিল। শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার সুপাত্র হওয়া প্রযুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণবাবু তাঁহার নিজ কন্যার বিবাহে প্রথমাবধি সম্মত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার আদিসমাজ অবলম্বিত বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন তিনি বিবাহে অসম্মতি দেন। কিন্তু কন্যা বয়স্কা এবং তজ্জন্য ভালমন্দবিচারে সক্ষমা বিবেচনা করিয়া তিনি এই বিবাহে কন্যার মত জিজ্ঞাসা করেন। কন্যা এই বিবাহে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণবাবু নিজ কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণপূর্বক তাঁহার সুখসৌভাগ্যের অন্তরায়স্বরূপ হওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া কন্যারই ইচ্ছানুসারে কার্য হওয়া শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করেন। বিবাহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হওয়াতে রাজনারায়ণবাবু ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্রাহ্মই উহাতে যোগ দিতে সক্ষম হন নাই। এক্ষণে ঈশ্বর নবদম্পতিকে ধর্মপথে রাখিয়া তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সাধন করুন।

এই বিবাহপ্রসঙ্গে কোন ব্রাহ্ম সুকবি কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন; তন্মধ্যে একটি আমরা নিম্নে উধৃত করিয়া দিলাম।—

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।......"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৩ ভাদ্র, পৃঃ ৯৮

তত্ত্ববোধিনী আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। উক্ত 'ব্রাহ্ম সুকবি' ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবাহোৎসবের জন্য সংগীত রচনা করা আদি ব্রাহ্মসমাজের বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাই সম্পাদক উক্ত 'সুকবি'র নামোল্লেখে বিরত ছিলেন। কিন্তু গানটি যে রবীন্দ্রনাথের তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। 'গীতবিতানে' এই গানটি এখনও পাওয়া যায়। তত্ত্ববোধিনীতে সমগ্র গানটি উধৃত হয়েছিল। আমরা বাহুল্যভয়ে মাত্র দুই পংক্তি উধৃত করলাম। রাজনারায়ণ বসুর উক্ত চতুর্থী কন্যা লীলাবতীর বিবাহের

যে বর্ণনা 'লীলাবতী মিত্র' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এ স্থলে উধৃত করা প্রয়োজন।—

"১৮৮১ সালের ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হয়।······সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে লীলাবতীর বিবাহ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় বিবাহের আচার্য ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুণিলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ) মহাশয়গণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে বিবাহপদ্ধতি ও চারিটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'দুই হৃদয়ের নদী,' 'জগতের পুরোহিত তুমি,' 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে তাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

ইতঃপূর্বে মন্দিরে কখনও কোন বিবাহ হয় নাই। বহুলোক বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আরাধনা, উপদেশ, বিবাহমন্ত্র ও সুবিখ্যাত গায়কদের সঙ্গীত শুনিয়া কয়েক ব্যক্তি এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

—'লীলাবতী মিত্র,' পৃ: ১১-১২

'লীলাবতী মিত্র' বইখানি সম্ভবতঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহায়তায় তাঁর কন্যা কুমুদিনীর রচনা। তত্ত্ববোধিনী ও এই পুস্তকের বিবরণ পরস্পরের পরিপূরক। এই দুই বিবরণ থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তত্ত্ববোধিনীতে উল্লিখিত 'ব্রাহ্ম সুকবি' যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আদিমসমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হতে দ্বিধা বোধ করেননি, এই তথ্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিছুকাল পূর্বে তিনি বিলাতবাস সমাপ্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মন যে উদারতার দিকে ঝুঁকেছিল সে-কথা সুবিদিত। তিনি স্বয়ং এই বিবাহানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কি না, তা এই দুই বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি অন্ততঃ তিনটি গান রচনা করেছিলেন এবং গায়কদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এটাই তাঁর তদানীন্তন কালের মানসিক প্রবণতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এই গানের ভাষার মধ্যেও এই প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। যেমন—

পথে বাধা শত শত
পাষাণ পর্বত কত
দুই বলে এক হয়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়।

এই কথাগুলিকে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে আপত্তি ও বাধার কথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে তার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে গণ্য করা যায়। লীলাবতী তাঁর পিতার আপত্তির বাধা মানেন নি এবং রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর পিতার অভিপ্রায়-

অনুসারে কাজ করেন নি, তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী-কালের একটি উক্তি স্মরণীয়।

"আমি ইস্কুলপালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডী দেওয়া হয়েছে, সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনও। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করিতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সেজন্যে কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতম জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনও কখনও তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।" —'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), মানবসত্য

১৮৮১ সালের পূর্বোক্ত ঘটনাটিকে এই স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায়।

পূর্বোক্ত ঘটনাটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথের প্রবণতাও ছিল অনুরূপ। যিনি একসময়ে কেশবচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন তাঁর পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে এই প্রবণতাই সূচীত হয়। পরবর্তীকালে অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

"প্রীত ন মানে জাত-কুজাত।
ভূখ ন মানে বাসী ভাত॥

আমি ত এই জানি।"

'দুই হৃদয়ের নদী' গানটিতে বাধা অতিক্রমের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, নরেন্দ্রকথিত উক্ত দুটি লাইন তারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, উক্ত বিবাহ উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে অন্ততঃ তিনটি গান শিখেছিলেন। গান শেখা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ এই যে প্রথম হল তা নাও হতে পারে। এর আগে এবং পরে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। নরেন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথের গান নানা উপলক্ষেই গাইতেন তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন (রামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ)
(২) গগনের থালে রবি-চন্দ্র দীপক জ্বলে (রামকৃষ্ণ কথামৃত তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ)
(৩) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা (রামকৃষ্ণ কথামৃত চতুর্থ ভাগ)
(৪) মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ (রামকৃষ্ণ কথামৃত চতুর্থ ভাগ)

এই গানগুলি তিনি শুনিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে। অনেক সময় এসব গান যে তিনি স্বাধীনভাবেও গাইতেন তার কিছু প্রমাণ আছে। যেমন—প্রথম ও চতুর্থ গান দুটি তিনি যে তাঁর বি. এ. পরীক্ষার প্রথম দিনে (১৮৮৫ নভেম্বর) তাঁর বন্ধুদের শুনিয়েছিলেন সে কথা জানা যায় তাঁর বাংলা জীবনচরিত (প্রমথনাথ বসু প্রণীত)

থেকে। এই গানগুলি যে রবীন্দ্ররচিত এ কথা তিনি জানতেন না তা মনে করা যায় না। তখনকার দিনে বাংলা সাহিত্যের সর্বকিছু রচনার সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

১৮৮১ সালের শ্রাবণমাসে লীলাবতীর বিবাহ উপলক্ষ্যে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। ওই সালেরই নভেম্বর মাসে পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। কিন্তু ওই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে বেশ কিছুকাল সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে আনুমানিক ১৮৮২ সালে তিনি মহর্ষিদেবের কাছে যাতায়াত ও তাঁর নির্দেশমতো ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৮৩ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বি. এল. পড়া শুরু করেন। এই সময়ে ১৮৮৪ সালের প্রথমভাগে আকস্মিকভাবে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। ফলে তিনি কঠোর সংকটের সম্মুখীন হন। বোধ করি এই সময় থেকেই পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ক্রমে ছিন্ন হয়। এই সংকটের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তিন বৎসর অতীত হয়। ইতিমধ্যে পরমহংসদেবেরও তিরোধান ঘটে (১৮৮৬ অগাষ্ট ১৬)। তার কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করে ভারত পরিব্রজ্যায় বহির্গত হন। এভাবে ছয় বৎসর (১৮৮৭-৯৩) কাটিয়ে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার জন্যে আমেরিকা যাত্রা করেন। অতঃপর আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৯৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে। সুতরাং এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কেবল ১৮৯০ সালে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের একটি পরোক্ষ উপলক্ষ ঘটে। ওই সালের প্রথমভাগে নরেন্দ্রনাথ গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়ের আশ্রয়ে কিছুকাল (জানুয়ারি-মার্চ) বাস করেন। এই ঘটনার বৎসর দুই পূর্বে (১৮৮৮) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজিপুরে এসে গগনবাবুর আশ্রয়ে বাস করে যান সুতরাং নরেন্দ্রনাথ যে গগনবাবুর কাছ থেকে সে-বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন তা অনুমান করা অসংগত নয়। অর্থাৎ গগনবাবুই ছিলেন উভয়ের মধ্যে পরোক্ষ যোগসূত্র। অতঃপর আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের (১৮৯৩ সেপ্টেম্বর) পর স্বামী বিবেকানন্দের খ্যাতি বাংলাদেশকে আলোড়িত করে তুলল। মহর্ষিভবনেও সে-আলোড়নের ঢেউ লেগেছিল। স্নেহভাজন নরেন্দ্রনাথের এই কীর্তিতে আনন্দিত হয়ে মহর্ষি নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও স্বভাবতঃই সে আনন্দের স্পর্শ লেগেছিল, এ কথা অনুমান করা অসংগত নয়।

এই ঘটনার প্রায় চার বৎসর পরে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি যখন কলকাতায় পদার্পণ করলেন, তখন সমগ্র মহানগরী উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ওই মাসের আটাশ তারিখে তাঁকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়

এবং তার উত্তরে তিনি যে প্রতিভাষণ দেন, তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই উপলক্ষে সরলা দেবী 'ভারতী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই প্রবন্ধটি পাঠ করে শুধু যে আনন্দিত হলেন তাই নয়,প্রথমে পত্রযোগে এবং পরে সাক্ষাতে সরলাদেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করলেন। এই উপলক্ষে সরলা দেবী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে একাধিকবার স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিবেকানন্দের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। একদিকে 'ভারতী' পত্রিকা অপরদিকে সরলা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ, এই দুয়ের যোগে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই অবগত ছিলেন, এই অনুমান অসংগত নয়।

বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্ররূপে বিদ্যমান ছিলেন আরও তিনজন প্রভাবশালী ব্যক্তি—ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং জাপানী মনস্বী কাউণ্ট ওকাকুরা। এই যোগসূত্র পরোক্ষ হলেও দুর্বল ছিল না। এঁদের যোগে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ পরস্পরকে সত্যরূপে জানবার যথেষ্ট সুযোগই পেয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাতের কোন নিদর্শন নেই। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উদাসীন এ কথা অনায়াসেই মনে করা যায়। কিন্তু তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের কোনো বিশেষ উপলক্ষ ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও কোনো অভিমত প্রকাশের প্রত্যক্ষ উপলক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব তাঁর তৎকালীন নানা রচনায় পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। এই পরোক্ষ প্রতিফলন আবিষ্কার নিবিষ্ট অনুসন্ধান ও সূক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু তা কখনও বিতর্কের অতীত হবে বলে মনে করা যায় না। তবে এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কখনও অবিমিশ্র ছিল না। এ বিষয়ে যথাস্থানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাবে।

১৯০২ সালের ৪ জুলাই তারিখে বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেন। সমগ্র দেশে তখন যে শোকের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল তা পূর্বে কেউ কখনও দেখে নি। এই প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকেও স্পর্শ করেছিল এ কথা মনে করা অসংগত নয়। কিন্তু তার কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নি। এই প্রসঙ্গে শুধু দু-তিনটি তথ্য আমরা স্মরণ করতে পারি। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আরম্ভ-কালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহযোগী। বিবেকানন্দের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর উত্তরসাধকের ব্রত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ ভবানীপুর সাবার্বান স্কুলের ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের উদযোগে স্বামীজীর একটি স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামীজীর জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ভগিনী নিবেদিতা। এ কথা জানা যায় সৌরীন্দ্রমোহনের

'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থ (১৩৬৩, দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ ৪৫-৪৬) থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওই সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর সম্বন্ধে কি বলেন তা জানা যায় নি। তৃতীয়তঃ ওই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৩০৯ ভাদ্র) 'মরণ' নামক যে সুপরিচিত কবিতাটি প্রকাশিত হয়, সেটির সঙ্গে বিবেকানন্দের মৃত্যুর একটু পরোক্ষ যোগ থাকা অসম্ভব নয়। এই কবিতাটির মূলকথা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নলিখিত অংশগুলিতে—

কহ মিলনের একি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই—
নেই কোন মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট,
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত জয়পট,
সে কি আগে-পিছে কেহ রবে না ?

* * *

তুমি চুরি করি কেন এস চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ?
শুধু নীরবে কখন নিশি-ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরণ।
তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

* * *

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিও মোর সব কাজ—
কোরো সব লাজ অপহরণ।

এই কবিতাটির রচনার অতি অল্পকাল পূর্বে (১৯০২ জুলাই ৪/১৩০৯ আষাঢ় ২০, শুক্রবার) স্বামীজী তাঁর জীবনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অকালমৃত্যু বরণ করেন। সেই অকালমৃত্যুর মধ্যেই যে বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হয়েছিল এবং যে গৌরবমহিমা প্রকাশ

পেয়েছিল, এই কবিতাটির মধ্যে তার পরোক্ষ প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। নতুবা কবির মনে অকস্মাৎ জীবনের কাজ সমাপ্ত না করেই গৌরবময় মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা কেন দেখা দিল, তার কোনো সংগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। যে মৃত্যুর আগমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, যার আবির্ভাব সমারোহহীন, সে মৃত্যু কবির কাম্য বা বরণীয় নয়—স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক মৃত্যুর দেশব্যাপী শোকোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় রেখে বিচার করলেই এ ভাবটির যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বলে মনে করি।

"বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করলেন। দেশ শোকসন্তপ্ত হল, কিন্তু দেশের ভিতর তাঁর কাজ চলতে থাকল। আমারও ভিতর বিবেকানন্দের কাজ চলতে থাকল।

…তারপরে এলেন এক 'dynamic personality'—স্বামী বিবেকানন্দ। 'Dynamic' সেই—যার ভিতর বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার শক্তি। সেই বারুদের আগুন থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ আমার ভিতর এসে পড়েছিল—আমায় ভেঙ্গে গড়ে তুলেছিল।"

—'জীবনের ঝরাপাতা', অধ্যায় ২২

সরলা দেবীর এই উক্তির সত্যতা সন্দেহাতীত। বিবেকানন্দের জীবনের যথার্থ কাজ শুরু হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরেই। সে কাজ চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে এবং তাঁর শক্তি অনেকেই ভেঙে গড়ে তুলেছিল। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে যেসব বড় বড় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল সম্ভব হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলেই, তিনিই তার বিভিন্ন ভিত্তিভূমি রচনা করে গিয়েছিলেন, এটা ঐতিহাসিক সত্য। যাঁর শক্তির প্রবলতা এতখানি, তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদাসীন থাকা সম্ভবও নয়, প্রত্যাশিতও নয়। কার্যতঃও দেখা যায় তিনি মাঝে মাঝে নানা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেছেন। এমন কি, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বেও তিনি প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য রাণী চন্দ-কৃত 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ,' ১৯৪১ মে ২৩ তারিখের আলোচনা, পৃঃ ১১১) কিন্তু অনেকগুলি উল্লেখেরই বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই। তাই এস্থলে লঘু-গুরু নির্বিশেষে বিবেকানন্দের সবগুলি উল্লেখ থেকে বিরত রইলাম। যেসব স্থলে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, শুধু সেগুলির উল্লেখ করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। পূর্বেই বলেছি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত অবিমিশ্র ছিল না। তাতে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল দৃঢ় মতপার্থক্য। প্রথমে মতপার্থক্যের বিষয়টাই উল্লেখ করা যাক।

সর্বাগ্রেই মনে আসে গুরুপূজার প্রশ্ন। গুরুপূজার আদর্শ যে রবীন্দ্রনাথের মনে স্থান পেতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলা দেবীকে লিখিত বিবেকানন্দের ১৮৯৯ এপ্রিল ১৬ তারিখের পত্র। অতঃপর সন্ন্যাসধর্ম, মায়াবাদ ও যোগসাধনার আদর্শ—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় মনোভাব সকলেরই সুবিদিত।—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
*   *   *   ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।"

তৎকালে বৈরাগ্য ও যোগসাধনার আদর্শ দেশের চিত্তকে বিশেষভাবে আলোড়িত করছিল। এই আদর্শের প্রধান উৎসস্থলই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারই প্রতিক্রিয়া কবির চিত্তকে যে প্রবর্তনা দিয়েছিল, তাই প্রকাশ পেয়েছে উধৃত কবিতাংশটিতে। নতুবা আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথ এসব কথা লিখতে প্রবৃত্ত হলেন কেন, তার সন্তোষজনক কারণ দেখা যায় না। যোগসাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব স্পষ্টতর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পরিণত জীবনের রচনায়। —

"মানসিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই।···মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায় এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কি না, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত করে বলব কী করে।"

—'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), অধ্যায় ২

বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় মতপার্থক্যের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে বিবেকানন্দের সহিষ্ণুতা। এ বিষয়টি জানা যায় ফরাসী মনস্বী রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা (১৯৩০ আগষ্ট) থেকে। রল্যাঁ ভারতবর্ষের সর্বধর্মসহিষ্ণুতার সপ্রশংস উল্লেখ করলে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"Perhaps that has also been our weakness and it is due to an *indiscriminate spirit of toleration* that all sorts of religious creeds and crudities have run riot in India, making it difficult for us to have realize the true foundation of our spiritual faith." (বক্রলিপি লেখকের।)
—Rolland and Tagore (1945).পৃঃ ১৯

দৃষ্টান্তস্বরূপে রবীন্দ্রনাথ ধর্মানুষ্ঠানে পশুবলির উল্লেখ করেন। অতঃপর রল্যাঁ এসব অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতামতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"So far as I can make out, Vivakanand's idea was that we must accept the facts of life...······It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude towards truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil·········As a

matter of fact, today Indian religious life suffers from the lack a *mholesome spirit of intolerance*, which is characteristic creative religion." (বক্রলিপি লেখকের।)

—পূর্ববৎ, পৃ ১০৪

এর থেকেই বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রধান মতপার্থক্যের বিষয়গুলির পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করি। মতপার্থক্যের তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে এ কথা বলা সংগত মনে করি যে, এ ক্ষেত্রে উভয়ের মতপার্থক্য যতখানি দুস্তর বলে প্রতিভাত হয়েছে আসলে সম্ভবতঃ তা নয়। বিবেকানন্দের অভিমতের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পেলে আশা করি দেখা যাবে যে, উভয়ের পার্থক্যটা বস্তুতঃ খুব বেশি ছিল না। মূল পার্থক্যটা ছিল প্রথমোক্ত দুই বিষয়েই।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাও কম সুগভীর ছিল না। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেছে বিবেকানন্দর তিরোধানের পরে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অবিমিশ্র ছিল না বলেই তাঁর জীবিতকালে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি এবং তার উপলক্ষও ঘটে নি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, নরেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কখনও উদাসীন ছিলেন না, উদাসীন থাকা সম্ভবও ছিল না। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার সঙ্গেও যে তাঁর পরিচয় ছিল তারও একটু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কুমুদবন্ধু সেনের 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধ থেকে একটি অংশ উধৃত করছি।—

"আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামীজীর বাংলা রচনা। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের (১৯০১) কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারবার অনুরোধ সত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল। দীনেশচন্দ্র বলিলেন—'আমি এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, "আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময় রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।"

এছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।' বইখানি লইয়া দীনেশবাবু চলিয়া গেলেন।"

—'উদ্বোধন', ১৩৫৪ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা

বিবেকানন্দের উদার দৃষ্টি এবং পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়-আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ অভিমতের কথা একটু পরে পুনরুত্থাপন করা যাবে।

বস্তুতঃ ১৮৮০ –৮১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষেই যে তাঁর সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। বিবেকানন্দের তিরোধান পর্যন্ত তিনি তাঁর সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, সংগত কারণেই। তাঁর তিরোধানের পরে সে-মনোভাবের যে প্রকাশ ঘটেছে তা ঘটেছে প্রধানতঃ শ্রদ্ধারূপেই। এই শ্রদ্ধার কারণ ত্রিবিধ—(১) পূর্ব-পশ্চিমের মিলনসাধন ও বিশ্বমানবতাবোধ, (২) বিশ্বজগতে ভারতবর্ষের যথার্থ গৌরবকে প্রতিষ্ঠাদান এবং (৩) ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে শক্তিসঞ্চার ও গতিদান।

পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনসাধনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে রামমোহনের সঙ্গে একই পর্যায়ে স্থাপন করেছেন। 'পূর্ব ও পশ্চিম'-নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধটি (প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র) থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উধৃত করছি।—

"অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

—'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম (১৯০৮)

পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে (১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ দেশের সম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন, তারই ভিত্তিপত্তন হয়েছিল বিবেকানন্দের সাধানায়। এটাই ছিল তাঁর বিশেষ পরিতৃপ্তির বিষয়।

বহির্বিশ্বে ভারতের বাণী প্রচার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় দিলীপকুমারের 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থ থেকে। ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কিছুকাল পরে ইউরোপে অবস্থানকালে কোন এক প্রসঙ্গে তিনি দিলীপকুমারকে বলেছিলেন—

"আমরা এ স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জাহীনতা ভীরুতা প্রচার করে এদের আদর কাড়তে ছুটব? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয়

তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ্, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদের এনে ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলে।…আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কিভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে।…বলতেন, 'ভারতের বড় দিক্‌টার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড় করে দেখো না।' আমেরিকানদের সামনে এসে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের কথা।"

—'স্মৃতিচারণ (১৩৬৭), দ্বিতীয় পর্ব, অধ্যায় ২১, পৃঃ ৪৭০-৭১

বলা বাহুল্য এই ভাষাটা রবীন্দ্রনাথের নয়। কিন্তু মনোভাবটা যে তাঁরই, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা জানেন তাঁরা একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

নবীন ভারতকে বিবেকানন্দ যে প্রবর্তনা দান করেছিলেন, তার চিত্তে যে নবোদ্‌বুদ্ধ শক্তি ও বেগ সঞ্চার করেছিলেন, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৮ এপ্রিল ৯ তারিখের তাঁর একটি রচনা (প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২৮৫-৮৬) থেকে। এই রচনাটি ইদানীং পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উধৃত করা গেল।—

"চরকা কাটো একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই—এইজন্যে এ কথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্‌বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়—কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।"

—অমৃত ১৩৭০ বৈশাখ ২৬, পৃঃ ১১-১২

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই যে সুস্পষ্ট অভিমত তা-ই আরও সংহত আকারে প্রকাশ পেয়েছে আরও কয়েকমাস পরে রচিত নিম্নলিখিত বাণীটিতে।—

"বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। বিবেকানন্দের এই বাণী

সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।"—১৩৩৫ ফাল্গুন। ১৯২৯ ফেব্রুয়ারি-মার্চ

এই উক্তিটি পাওয়া যায় বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' গ্রন্থাবলীর মলাটে। এটি কি উপলক্ষে রচিত এবং এটির সম্পূর্ণ রূপ কি, তা এখনও জানতে পারি নি।

বলা প্রয়োজন যে, বিবেকানন্দের এই প্রবর্তনাকে তিনি স্থাপন করেছেন মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় বিবেকানন্দের তুলনায় মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ছিল সংকীর্ণ ও যান্ত্রিক আচারগত। সেইজন্যেই মহাত্মাজীর আন্দোলনের সংকীর্ণতা যখন তাঁর চিত্তকে পীড়া দিচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের কথা এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন। মহাত্মাজীর চারিত্র্যমহিমার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর মনস্বিতা ও কর্মপ্রণালীর প্রতি নয়। এইজন্যেই তিনি বলেছিলেন —

"আমি নিজের সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করব যে, মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চারিত্র্যপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তা হলে অন্যরকম প্রণালীতে কাজ করতুম।…আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আত্মার প্রভাব নেই।"

—'কালান্তর', কংগ্রেস (১৯৩৯)

এই মননের ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দকে তিনি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন। ওই শ্রদ্ধার দ্বিতীয় কারণ তাঁর চরিত্রের মহত্ব ও তেজস্বিতা। মহাত্মাজীর সংকীর্ণ কর্মপ্রণালীর প্রভাবে দেশের যুবকদের চিত্তে বিবেকানন্দের মনস্বিতা ও তেজস্বিতার প্রভাব চাপা পড়ে যায়, এই আশঙ্কায় তিনি আশঙ্কিত ছিলেন।

এ কথা বোধ করি নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে যে, পরমায়ুর অসাম্য ও কর্মধারার দুস্তর পার্থক্যের ফলে বাংলাদেশের এই দুই মহামনস্বীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্র অতিশয় সংকীর্ণ হওয়া সত্বেও কালধর্মের প্রেরণায়ও মননধারার সমতায় তাঁদের মধ্যে একটি সুগভীর আন্তরিক যোগসূত্র রচিত হয়েছিল এবং ওই অলক্ষ্য যোগসূত্রই উভয়কে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ মহাত্মা গান্ধীর পূর্বসূরী। স্বামীজী ছিলেন সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেশপ্রেমিক আর মহাত্মাজী দেশপ্রেমিকদের মধ্যে ধার্মিক ব্যক্তি। অবশ্য উভয়েরই দেশ-প্রেমের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। তা ছিল বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত। উভয়েরই জীবনের গোড়াকার কথা ভগবানে পরম নির্ভরতা ও সত্যনিষ্ঠা। তাই দুইজনের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য বর্তমান। স্বামীজী চেয়েছিলেন সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে জনসেবার কাজে অগ্রণী করতে আর মহাত্মাজী চেয়েছিলেন রাজনীতিকে অধ্যাত্মময় করতে।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"—এই স্বামীজীর কথা।

আর মহাত্মাজী ১৯২১ সালে কংগ্রেস সেচ্ছাসেবকের প্রতিজ্ঞাপত্রের গোড়ায় লিখলেন "আমি ভগবানের নামে এই শপথ করছি।"

স্বামীজীর জন্মের ছয় বৎসর কয়েক মাস পরে মহাত্মাজীর জন্ম। উভয়েই ছিলেন পরম মাতৃভক্ত। মার তপশ্চর্যা হতে উভয়েই শিক্ষালাভ করেছেন। স্বামীজী সন্ন্যাসী হয়েও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মত 'মা'কে ভোলেননি। মহাত্মাজী জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন 'মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনে।

মহাত্মাজী স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু কখনও উভয়ের সাক্ষাৎকার হয় নি। ১৯০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হতে কিছুকালের জন্য ভারতে ফিরে আসেন মহাত্মাজী। ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন কলিকাতা হতে হেঁটে বেলুড় মঠে যান স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। স্বামীজী তখন খুব অসুস্থ হয়ে কলিকাতায়। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধ। এর কয়েক মাস পরেই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। কাজেই মহাত্মাজীর সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে যায়।

দুজনেরই ধর্মমতে কোন গোঁড়ামি ছিল না। হিন্দু খাঁটি হিন্দু হোক, মুসলমান খাঁটি মুসলমান হোক, খৃষ্টান খাঁটি খৃষ্টান হোক এই ছিল উভয়ের মত। নিজ নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান হয়ে ও অপরের ধর্মমতের উপর শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা উভয়েইবলতেন। মহাত্মাজীর কথা ছিল 'সর্বধর্মে সমানত্ব,' 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম'। '১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের সার কথা রূপে স্বামীজী মা ইম্নস্তোত্রের 'রুচিণাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথযুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব'—'মানুষ রুচির

বৈচিত্র্যবশত সরল ও বক্র নানাপথ ধরে,কিন্তু নদীসকলের একমাত্র গন্তব্যস্থল যেমন সমুদ্র তেমন মানুষের একমাত্র গন্তব্যস্থলও তুমি (ভগবান)—এর উল্লেখ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে বলতেন, 'যত মত তত পথ' বা 'ছাদে উঠবার বিভিন্ন রাস্তা মাত্র।' স্বামীজী ও মহাত্মাজী সেই মতের অনুগামী ছিলেন। দুইয়ের জীবনেই ছিল কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ। কিন্তু স্বামীজী ছিলেন জ্ঞানপ্রধান আর মহাত্মাজী ভক্তিপ্রধান। স্বামীজী অদ্বৈতবাদী আর মহাত্মাজী বৈষ্ণব। স্বামীজী দুর্বলতা দূর করার জন্য শঙ্করাচার্যের 'শিচদানন্দরূপ শিবো হহং শিবো হহং' আবৃতি করতে বলতেন। তাঁর মুখে ছিল 'অহং ব্রহ্মাহস্মি,' সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম'—আমিই ব্রহ্ম,' 'এই সবই একমাত্র ব্রহ্ম'। দুর্বলতা দূর করার জন্য মহাত্মাজীর উপদেশ ছিল রাম নাম করা। তিনি ভগবানের উপর নির্ভরশীল হতে বলতেন। প্রায়ই শ্রীমদ্ভাগবতের 'গজেন্দ্র মোক্ষ' উপন্যাসের উল্লেখ করতেন তিনি।

দুইজনেই ছিলেন সাধক মহাপুরুষ। ভগবৎচিন্তা করতে করতে হয় স্বামীজীর দেহত্যাগ, আর রামনাম মুখে নিয়ে হয় মহাত্মাজীর জীবন অবসান।

মহাত্মাজীর মূলমন্ত্র ছিল তিনটি ঃ—অভীঃ বা নির্ভীকতা, সত্য ও অহিংসা। স্বামীজীও অভীঃ ও সত্যের উপর জোর দিয়েছেন। অহিংসার উপর জোর দেন নি বটে কিন্তু সত্যাশ্রয়ী হিংসার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কারণ হিংসা মিথ্যাশ্রয়ী। সত্যের মধ্যেই অহিংসা ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। আর অহিংসা মানে সর্বজীবে প্রেম। এই জীবপ্রেমের উপর খুব জোর দিয়েছেন স্বামীজী।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল সাধারণ মানুষের জন্য দরদ। ভারতের অপরিসীম দারিদ্র্য উভয়কেই খুব ব্যথিত করে। মহাত্মাজী বলতেন, 'এই দরিদ্র দেশে ভগবানকেও খাদ্যরূপে অবতীর্ণ হতে হবে আর স্বামীজীর কথা ছিল এই যে দরিদ্রের মুখে অন্নের ব্যবস্থা না করে উচ্চাঙ্গের ধর্মোপদেশ দেওয়া নিরর্থক। স্বামীজী 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দের স্রষ্টা। মহাত্মাজীর এই শব্দটি খুব মনঃপূত ছিল। আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যারা অবহেলিত, উৎপীড়িত ও শোষিত তাদের সকলের জন্য এঁদের সমস্ত অন্তরের দরদ। স্বামীজীর ভাষায় "ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" মহাত্মাজীর হরিজন সেবা সুবিদিত। তিনি একটি তথাকথিত অস্পৃশ্য সমাজের মেয়েকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করে সবরমতী আশ্রমে রাখেন। মেয়েরা আমাদের সমাজে অবহেলিত দেখে উভয়েই তাদের ন্যায্য স্থান দেওয়ার উপর জোর দেন।

মহাত্মাজী চেয়েছিলেন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আর্থিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। স্বামীজী রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেনি বটে তবে স্বাধীনতাকামী ছিলেন। আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উভয়েই নিজ নিজ মতানুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন।

উভয়েই চেয়েছিলেন মানুষের সামগ্রিক বিকাশ। তার জন্য প্রচলিত শিক্ষা

ব্যবস্থার পরিবর্তন যে প্রয়োজন এ কথা উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন। "যাহাতে মানুষ গঠিত হয় এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষা চাই"—এই ছিল স্বামীজীর মত। মহাত্মাজীর ত আদর্শ সমাজব্যবস্থা বা শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। স্বামীজী জীবিত থাকলে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন বলে আমার নিশ্চিত ধারণা।

এক কথায় মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য ছিল সর্বোদয় বা সকলের কল্যাণ। সমাজবাদের উদ্দেশ্যও তাই। "I am not born to grow at the cost of others"—'অন্যের ঘাড়ে চেপে বা অন্যের অনিষ্ট করে বড় হওয়ার জন্য আমি জন্ম গ্রহণ করি নি' আমেরিকায় স্বামীজীর এই উক্তি হতে সুস্পষ্ট যে তিনি সর্বোদয়ের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। যদিও সর্বোদয় শব্দটির স্রষ্টা মহাত্মাজী।

দরিদ্র ভারতবর্ষেরও যে জগৎকে কিছু দান করবার আছে তা দেখিয়ে গিয়েছেন উভয়ে। উভয়েরই মূলমন্ত্র ছিল ত্যাগ, চমকবুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা ও ভগবানের বিশ্বাস। উভয়েই মনে করতেন টাকাকড়ি সোনারূপো সম্পদ নয়—সম্পদ মানুষ। স্বামীজীর ভাষায় "মানুষ চাই, মানুষ চাই আর সব হইয়া যাইবে।"

স্বামীজী জন্মশতবার্ষিকী হয়ে গেল। আর পাঁচ বৎসর পরে মহাত্মাজী জন্মশত-বার্ষিকী পালন করার কথা। কিন্তু শতবার্ষিকী পালন সার্থক হবে যদি একদল মেয়ে ও পুরুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ভারতের সাধারণ মানুষের কল্যাণের কাজে। এই দুই মহাপুরুষের অমর আত্মার আশীর্বাদে তা হোক এই প্রার্থনা।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

"...no longer at ease here, in the old dispensation, with an alien people clutching their gods.

I shall be glad of another death".

T. S. Elliot : Journey of the Magi

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ শ্রীঅরবিন্দকে নব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী আখ্যা দিয়েছেন।[১] বুদ্ধিজীবী বলতে যদি তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে—প্রজ্ঞা দিয়ে জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করেন তবে রোলাঁ-প্রদত্ত শ্রীঅরবিন্দের এই আখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বস্তুত, বুদ্ধি দিয়ে জগতের অবস্থা-ব্যবস্থা বোঝবার এবং তার গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করবার সাধনায় নবযুগে শ্রীঅরবিন্দ শুধু ভারতে নন, সমগ্র পৃথিবীতেই একরূপ তুলনাহীনা।

শ্রীঅরবিন্দকে রোলাঁ আবার বিবেকানন্দের বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ('the real intellectual heir of Vivekananda'), 'নয়া বেদান্তের প্রকৃত ধারক ও বাহক', 'চিতা থেকে উত্থিত বিবেকানন্দের কণ্ঠ' ('voice of Vivekananda risen from the pyre') বলেও বর্ণনা করেছেন ;[২] অতএব, রোলাঁর মতে, নব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী স্বামী বিবেকানন্দই উত্তরাধিকার বহন করেছেন। অবশ্য এই উত্তরাধিকারকে তিনি যে নিজস্ব অবদানের দ্বারা আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন, তাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তা না হলে তিনি শ্রীঅরবিন্দই হতেন না।

শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব স্বীকৃতি

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তাঁর ঋণ শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন এবং স্বামীজীর জীবন ও দর্শনের যে মূল্যায়ন তিনি করেছেন তার ছত্রে ছত্রে মিশে আছে এই স্বীকৃতি। স্বামীজীকে তিনি 'নরপতি' (king among men') বলে অভিহিত করেছেন[৩] এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংরক্ষণের ('preservation through reconstruction') উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং প্রধান প্রবক্তা বলে বর্ণনা করেছেন।[৪] এবং এই দর্শনই হল বহুলাংশে শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব সমাজদর্শন। তিনি লিখেছেন : "রামকৃষ্ণ

১, Prophets of the New India.

২. Ibid.

৩. Interview with Dilipkumar Roy ; also Bhawani Mandir.

৪. Renaissance in India.

ও বিবেকানন্দের চিরস্মরণীয় নামের সঙ্গে জড়িত আন্দোলন অতীতের ধর্মভাব ও ধর্মসাধনার সার্থক সমন্বয়। ত্যাগ ও সন্ন্যাসধর্মের ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এতে নতুন উপাদানের অভাব নেই।"[১] শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করেছিলেন যে, বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পরপর পনের দিন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং আর একবার বরোদায় হঠযোগ-সাধনাকালে অনুরূপ অনুভূতি লাভ করেছিলেন. তা মোটামুটি অনেকেরই জানা। সত্যাশ্রয়ী শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি যে, এই সকল ঘটনা ও স্বামীজীর শিক্ষা তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীঅরবিন্দের মতে, স্বামী বিবেকানন্দই সমাজের জাতীয় জীবনের স্রষ্টা ও প্রধান নায়ক। তাঁর আদর্শই আজ ভারতের জাতীয় আদর্শে পরিণত হয়েছে।[২] ১৯১৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন: "বিবেকানন্দ ছিলেন অতি শক্তিশালী মহাত্মা, অন্যতম পুরুষসিংহ···তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব এখনও আমরা অনুভব করি। কিভাবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তা অবশ্য বলতে পারি না। হয়ত এমন কিছুর মধ্যে যা এখনও রূপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু যখনই দেখি কোন কিছু মহৎ আলোড়নকারী অনুভবযোগ্য শক্তি ভারতের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে ক্রিয়া শুরু করেছে তখনই বলি, ঐ দেখ মাতার এবং মাতার সন্তানদের আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও সঞ্চরমান"।[৩]

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে এ ধারণা করা অবশ্য ঠিক হবে না যে, শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটেই পৃথক ছিল না। এ প্রসঙ্গে ডক্টর কে. আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলেছেন, "(স্বামী) বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর (শ্রীঅরবিন্দের) প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল আর (শ্রী) রামকৃষ্ণের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ়তম ভক্তি। তবে তিনি যে বিবেকানন্দের দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।"[৪] মোটামুটিভাবে বলা যায়, রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক 'নয়া বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি' বলে অভিহিত শ্রীঅরবিন্দ ঈশ্বর ও সন্ন্যাসধর্মের ধারণায় স্বামী বিবেকানন্দ থেকে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। বিষয়টি অবশ্য আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কিত নয়।

দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা :

আমাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নব ভারতের এই দুজন স্রষ্টার প্রতিক্রিয়া। ১৮৯৩ সালে—যে বছর স্বামী বিবেকানন্দ

১. Ibid.

২ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ,—'ধর্ম" পত্রিকা ৩০শে ফাল্গুন, ১৩১৬

৩. Bankim-Tilak- Dayananda

৪. Sri Aurodindo.

চিকাগো ধর্মসম্মেলনে ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেন—বিলেত থেকে ফিরেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বন্ধু কে. জি. দেশপান্ডে-সম্পাদিত এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'পুরাতনের পরিবর্তে নূতন আলো' ('New Lamps for old')। শ্রীঅরবিন্দ রচনাটির সূচনা করেন সেই পুরোনো প্রশ্ন দিয়েঃ একজন অন্ধ যদি আর একজন অন্ধের হাত ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে দুজনেরই কি গর্তে পড়বার আশঙ্কা থাকে না? এবং ঘোষণা করেন যে, সূত্রটি ভারতীয় জাতীয় কংগেস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।[১] কংগ্রেস তখন সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব না করে একটা বিশেষ শ্রেণীরই স্বার্থসাধন করছে—এই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং তিনি উপসংহার করেন এই বলে যে, মাত্র সার্মাগ্রক সমাজভিত্তিক জনপ্রিয় আন্দোলনই মহান বলে পরিগণিত ও সফল হতে পারে—কোন সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ আন্দোলন নয়।

কয়েক বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দকে অনুরূপভাবেই কংগ্রেসের শ্রেণী-চরিত্রের (class-character) সমালোচনা করতে দেখা যায়।[২] তিনি কংগ্রেসের উদ্ভবকে স্বাগত জানালেও ঐ সংগঠন যে জনজাগরণ সংঘটিত করে জাতীয় মুক্তির বাহন হবে, এরকম আশা মোটেই পোষণ করতে পারেন নি।

জাতীয় মুক্তির জন্যে শ্রীঅরবিন্দ 'রক্ত ও অগ্নি শুদ্ধির' ('Purification by blood and Fire) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।[৩] এই শুদ্ধিমন্ত্রকে স্বামী বিবেকানন্দের 'ত্যাগ ও সেবার' ('renunciation and service') প্রকারভেদ, এমনকি ভিন্ন নামকরণ বলেও বর্ণনা করা চলে। সর্বহারার দলই যে দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তা, একথা শ্রীঅরবিন্দ বারবার বলে গেছেন। তাঁর এই ধারণার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাই 'পুরাতনের পরিবর্তে নূতন আলো' রচনায়, কিন্তু বোধহয় তাঁর এই ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয় দরিদ্রনারায়ণের মুক্তির জন্য স্বামী বিবেকা-নন্দ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে। অন্তত শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' পুস্তকটি পড়ে এই ধারণাই হয়।

ধারণাটির বিরোধিতা করা গেলেও জাতীয়তাবাদ ও আনুষঙ্গিক ভাবের (ideas) পরিস্ফুটনে শ্রীঅরবিন্দের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবকে অস্বীকার করা কঠিন।

১ 7th August, 1893. শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষায়, "The title 'New Lamps for Old' intended to imply the offering of new lights to replace the old and reformist lights of the Congress"—"Sri Aurobindo on himself and on the mother"

২ C.W.VI. 426-27

৩ 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত আর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের নাম।

মানবাত্মার মুক্তি ঃ

জাতীয়তাবাদকে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিপ্রয়াসী মানবাত্মার বিরতিবিহীন সংগ্রামের অন্যতম দিক বলেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর যখন মানুষকে বিশুদ্ধ ও স্বাধীন রূপেই সৃষ্টি করেছেন, তখন মানুষ কি আর মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে পারে? সুতরাং জাতীয়তাবাদ (Nationalism) কোন ভাবাদর্শ বা আন্দোলন নয়; জাতীয়তাবাদ মানুষের ধর্ম। অতএব "তুমি যদি জাতীয়তাবাদী আখ্যা পেতে চাও, যদি জাতীয়তাবাদ-ধর্মকে অনুসরণ করতে চাও তবে তোমাকে ধর্মভাবের বিশুদ্ধতা নিয়েই অগ্রসর হতে হবে।"[১] মাত্র ঐকান্তিকতাই (spirit) শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে; ফলে "মনের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ ও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির মাধ্যমেই আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত ও মহৎ বলে পরিগণিত হতে পারি"।[২] অতএব, শ্রীঅরবিন্দের সংজ্ঞায়, "স্বাধীনতা হলো আমাদের নিজস্ব সত্তার বিধিনিয়মকে মেনে চলার স্বাধীনতা, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা, আমাদের নিজস্ব পরিবেশের সঙ্গে বাধাবিহীনভাবে সামঞ্জস্য-বিধানের রীতিপদ্ধতি।"[৩]

মানবাত্মার মুক্তির ওপর এই যে গুরুত্ব আরোপ (emphasis on the deliverance of human spirit), তা ধর্মচিন্তা ও রাজনীতির মধ্যে গভীর সম্পর্কভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বেরই পরিণতি। স্বামী বিবেকানন্দই যে এই দার্শনিক তত্ত্বের সূত্রপাত করেন, একথা লালা লাজপত রায় প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন কুণ্ঠা না রেখেই স্বীকার করেছেন।[৪]

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ঃ

মানবাত্মার মুক্তি বা আত্মিক মুক্তি মানুষের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ হবার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতার সকল রূপকেই নির্দেশ করে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারণার ('Ideas of 1789'—Barker) উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী শব্দ তিনটি আঠার শতকের আন্দোলন-তরঙ্গ-প্রসূত হয়ে আজও যে মানুষের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে চলেছে তার কারণ হল শব্দগুলো সেই পরিণতিই নির্দেশ করে, যে পরিণতির উদ্দেশ্যে মানুষের বিবর্তন চিরকালই অগ্রসর হচ্ছে। এই যে স্বাধীনতা যার দিকে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হচ্ছি তা

১. Speeches of Sri Aurobindo

২. The Ideal of the Karmayogin

৩. The Ideal of Human Unity

৪. Lajpat Rai : Young India—Nationalist Movement ; also Valentine Chirol : Indian Unrest

বন্ধনদশার মুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।…আমাদের দেশের দর্শনে সেই পরিণতিকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।" তাঁর মতে, এই মুক্তির দুটো দিক আছে ঃ আভ্যন্তর ও বাহ্যিক। আমরা ভারতীয়রা আভ্যন্তর মুক্তির পথে চলেছি; অপর দিকে আমাদের ইয়োরোপীয় ভাইরা চলেছেন বাহ্যিক মুক্তি-অভিমুখে। তবুও আমরা সমান্তরাল ভাবেই চলেছি। "তাঁরা আমাদের কাছে শিখেছেন আভ্যন্তর মুক্তিকে মর্যাদা দিতে, আর আমরা শিখেছি বাহ্যিক মুক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করতে।"[১]

অতএব, শ্রীঅরবিন্দের মতে, মাত্র পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাই—আভ্যন্তর ও বাহ্যিক মুক্তির সমবায়ে গঠিত পূর্ণ স্বাধীনতাই—মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারে, কারণ স্বাধীনতা হলো সম্প্রসারণের মূলমন্ত্র। 'স্বাধীনতা ও সম্প্রসারণ' (liberty and growth) সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের এই ধারণা স্বামী বিবেকানন্দকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্ততঃ দুজনের চিন্তাধারা যে একই সূত্রে গাঁথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ঐক্যের মন্ত্র ঃ

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আত্মিক প্রকৃতির বলে ঐক্য অভিমুখে প্রসারিত। অর্থাৎ, বিশ্বজনীনতা এই স্বাধীনতার মৌল প্রকৃতির অঙ্গীভূত। ডক্টর কে. আর. আয়েঙ্গারের ভাষায়, "প্রথম থেকেই শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ব্যক্তি-মুক্তির মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জগৎকে তার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে একক মুক্তির প্রচেষ্টা অপেক্ষা অকাম্য আর কিছু শ্রীঅরবিন্দের ছিল না।"[২] ফলে তিনি জাতীয়তাবাদের বিমূর্ত লক্ষ্য স্বরাজকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার পরিপূর্ণতা বলেই বর্ণনা করেছেন।[৩] এমনকি রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণের বহুদিন পরে ১৯২১ সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃ "আমাদের যোগসাধনা আমাদের নিজেদের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। ব্যক্তি-মুক্তি এর লক্ষ্য নয় লক্ষ্য হল সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।"[৪] এই ঘোষণা কি স্বামী বিবেকানন্দের সেই সুবিখ্যাত উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় না ঃ "তুমি বা আমি মুক্তি লাভ করি, না করি, তাতে কি যায় আসে? আমাদের পক্ষে সারা জগৎকে যে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে হবে।"[৫]

শ্রীঅরবিন্দের মতে, স্বাধীনতা আজ বিশেষ সংকটে পতিত এবং এর কারণ হলো ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে, সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ঐক্যভাবের অভাব একমাত্র যে ঐক্যভাবই স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলতে পারে। "যদি প্রকৃত আত্মিক ও মানসিক ঐক্যভাব গড়ে তোলা যেত তবে স্বাধীনতার কোন সংকটই থাকত না,"

১. Speeches, of Sri Aurobindo
২. Op. cit.
৩. Dr. R. C. Majumdar : History of Freedom Movement, I
৪. The Yoga and its Objects
৫. Swami Nikhilananda : Vivekananda—A Biography

কারণ মুক্ত ব্যক্তিসমুদয় ঐক্যের আকর্ষণে নিজেদের সম্প্রসারণের সঙ্গে অপরের সম্প্রসারণের সামঞ্জস্যবিধান করত।[১]

স্বাধীনতা, ঐক্য এবং সম্প্রসারণের (growth) মধ্যে এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক-নির্দেশ—এ কি স্বামী বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তেরই বাণী নয়?

ভারতের জীবনবেদ ঃ

শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব, জাতি হিসাবে ভগবৎ-ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে ভারতকে তাঁর পুনরুদ্ধার করতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আত্মিক ঐক্যের উপলব্ধিই আত্মার পুনরুদ্ধারের মন্ত্র। এই মন্ত্র আবার ভারতের মুক্তি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্প্রসারণের চাবিকাঠিও বটে। অন্যভাবে নিতে গেলে, ভারতের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের প্রকৃতি হবে সম্পূর্ণ আভ্যন্তর (growth from within)। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যক্তিধর্ম ও গোষ্ঠীধর্মের ('individual and group Dharmas') প্রতিবন্ধকহীন অভিযানের জন্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করবেন, তা সহজেই অনুমেয়।[২]

স্বভাবতই শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী, যদিও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বিজয়কে স্বাগত জানাতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই।[৩] তাঁর মতে, অনুকরণপ্রবণতা সম্পূর্ণ অ-ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, এবং এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অনুকরণের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ কৃত্রিম।[৪] ঐ অনুকরণ গীতার উপদেশ যে স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয় তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ভারতে আর এক ইয়োরোপের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। "স্বধর্মে মৃত্যু আনে নূতন জীবনের সম্ভাবনা, আর পরধর্মাচরণে মৃত্যু ঘটলে তাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।"[৫]

তবে শ্রীঅরবিন্দ মোটেই নৈরাশ্যবাদী নন, কারণ আশাবাদই যে নয়া বেদান্তের মর্মবাণী। সকল অন্ধকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি নূতন ঊষার আলোকই দেখেছেন, যে-ঊষা প্রভাতে রূপান্তরিত হলে ভারত জগৎকে দেখিয়ে দেবে যে "সনাতন ভারত মৃত নয়। শেষ কথাটি সে আজও বলেনি। ভারত দেখিয়ে দেবে যে, সে এখনও বেঁচে এবং শুধু তার নিজের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তার কিছু করণীয় আছে।"[৬]

১. The Ideal of Human Unity, Op. cit
২. D. M. Brown : White Umbrella
৩. Rohand : Prophets of the New India, op. cit.
৪. The Spirit and Form of Indian Polity
৫. The Ideal of Karmayogin
৬. The Spirit and Form, above

নেতাজীর চিন্তা ও রচনায় স্বামীজী

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মর্মগত বিরোধের ফলে ঊনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রাথমিক পর্বে জাতির মনে বহু-দ্বিধা-সংশয় ও আদর্শহীনতার লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠলেও ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই জাতির মানস-প্রবণতায় সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আত্মোৎবোধনের প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; আর তা সম্ভব হয়েছিল এই বাংলার বুকে কয়েকজন মহামানবের শুভ অভ্যুদয় এবং তাঁদের কর্মকাণ্ডের বিচিত্র পন্থায়। তাঁদের সুদৃঢ় চরিত্রশক্তি, ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিস্ময়কর প্রতিভা অসাধ্য-সাধন করেছিল। যুগোচিত নবীন ভাবনা ও আদর্শের সঙ্গে প্রয়োজন মতো সঙ্গতি রক্ষা করে তাঁরা গৌরবময় অতীত ভারতের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন—সাহিত্য-সংস্কৃতি ধর্ম, বা স্বদেশ ও সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে। বিরল-সংখ্যক এই সমস্ত মহাপুরুষদের মধ্যে ঊনিশ শতকেই যাঁদের জন্ম এবং যাঁদের কীর্তিকথা এ-দেশের মধ্যে সীমিত না থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এমন দুজন কর্মবীর দেশের জন্য নিবেদিত-প্রাণ চিন্তাশীল ব্যক্তির সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। এঁদের দুজনের মধ্যে একজন মূলত অধ্যাত্মজগতের মহাপুরুষ হলেও ঐ জগতের ঈশ্বরের সঙ্গে এই জগৎ ও জীবনের যোগকে তিনি অস্বীকার করেন নি। আর একজন মূলত রাজনৈতিক জগতের পুরুষ হলেও অধ্যাত্মজীবনকে সর্বদা স্মরণে রেখেছিলেন। একজন যখন তাঁর জীবনের কর্মব্রত উদ্‌যাপনের শেষে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো তাঁর পঞ্চভূতাত্মক দেহটিকে বিসর্জন দিয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তখন আর একজন মাত্র পাঁচ বছরের অবোধ-অবুঝ এক মানবক মাত্র। ঊনিশ শতকের বিশেষ পরিমণ্ডল একজনের জীবনকে লালন করে তার আশ্চর্য বিকাশে সহায়তা করেছে, অন্যজন বিংশ শতকের প্রতিবেশে নিজের জীবন-ছন্দকে গতিশীল রাখার উপাদান সংগ্রহ করলেও তাঁর সকল কর্ম-প্রচেষ্টা ও ভাব-ধারার মূল-উৎস দেশে ঐ প্রথমজনেরই নিগূঢ় প্রভাব ক্রিয়াশীল—প্রথমজনেরই অভিলষিত মহৎ-সাধনা ও বৃহত্তর স্বপ্নের বাস্তবরূপ যেন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাই এই দুই বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবদ্বয়ের মধ্যে যে একটি গভীরতর আত্মিক সম্পর্ক আছে—শুধুমাত্র সেই দিকেই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে আগ্রহী হয়েছি। বলাই বাহুল্য, এঁরা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। স্বামীজী ও নেতাজী নামেই তাঁরা দেশবাসীর কাছে পরিচিত বলে আমি নেতাজীর চিন্তা, কর্ম ও রচনায় স্বামীজীর গূঢ়তর প্রভাব কি-ভাবে নিহিত আছে এবং তার ফলে দুজনের ভাবগত সম্পর্কটি কিরূপ বিশিষ্টতা-লাভ করেছে—সে আলোচনার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রসঙ্গত একটি কথার উল্লেখ করি। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) হাওড়ার 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ' আয়োজিত একটি আলোচনা-চক্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামীজী ও নেতাজী'। এই সভায় দুইজন সুপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ বক্তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষ আমাকেও ঐ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ-দান করেছিলেন। সেখানে সংক্ষেপে যা সেদিন বলেছিলাম, তাই কিছুসংখ্যক শ্রোতার অনুরোধে কতকটা বিস্তারিত আকারে এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। সেদিন বলেছিলাম, আজও বলি যে এই দুই মহামানব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। অধ্যাত্ম ও রাজনৈতিক জগতের এ দুই মহাপুরুষের ভাব-চিন্তা ও আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ ও গ্রহণ করবার শক্তি আমার কোথায়? তা সত্ত্বেও আমার মাস্টারমশায় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের পরিচালক মণ্ডলীর একান্ত ইচ্ছায় আমার মতো শক্তি-দীন ব্যক্তির ওপর এই গুরু-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ঠাকুরের কৃপায় সেদিন কি বলেছিলাম জানি না তবে শ্রোতাদের কেউ কেউ যে প্রসন্ন হয়েছিলেন—এই সত্য আমাকে এ-লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

সে যাই হোক, পূর্বেই বলেছি নেতাজীর জীবনে, কর্মে ও চিন্তায় স্বামীজীর আদর্শ যে-ভাবে অনুসৃত হয়েছে, স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার মূল সূত্রগুলি নেতাজীর প্রাণে যে-ভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছে, তাতে তাদের মানস-সম্পর্ক বা ভাগবত যোগ তুলনা করে দেখবার বিষয়।

প্রথমেই আমি স্বামীজী ও নেতাজী—এই দুই নামের তাৎপর্য এবং এ-দুয়ের মর্মগত যোগ নির্ণয়ে যে আপাত-বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়—সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। কোনো নামের বা শব্দের অন্তে 'জী' যুক্ত করে আমরা কোনো ব্যক্তির প্রতি সম্মান, ভালবাসা বা আদর তো জানাই, উপরন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্যকেও ইঙ্গিত করি। 'স্বামী' শব্দের নানা অর্থ প্রচলিত থাকলেও স্বামীজী বলতে ধর্মগুরুকেই মূলত আমরা বুঝে থাকি—অধ্যাত্ম জগৎ-পথের তিনিই আমাদের দিশারী। এই ধর্মগুরু আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আদরের পাত্র; আবার ঐ একই শব্দের দ্বারা অধ্যাত্ম রাজ্যের বহু মানুষ থেকে তাঁকে আমরা স্বতন্ত্র করেও দেখতে চাইছি। 'নেতাজী' শব্দটির দ্বারাও বহু নেতার মধ্য থেকে বিশিষ্ট কোনো নেতাকে আমরা যেমন স্বতন্ত্র করতে চাই, তেমনি ঐ দেশ-নায়কের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মানের মনোভাবটাও ব্যক্ত করি। স্বামীজী প্রধানত অতীন্দ্রিয় ধর্মজগতের গুরু। আর নেতাজী রূঢ়-রুক্ষ ধূলি-ধূসর বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশ-নায়ক—রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবাসীর নেতৃত্ব-দানই যাঁর লক্ষ্য। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে স্বামীজী ও নেতাজীর মধ্যে কোনো অন্তরতর যোগ থাকার কথা নয় বলেই মনে হয়। কারণ ধর্মজগতের গুরু সাধারণত বাস্তব-জগতের কল-কোলাহল থেকে একটু দূরে ধ্যান-সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যেই মানস-প্রয়াণ করতে অধিকতর উদ্‌গ্রীব। বিশেষ করে ঐ ধর্মগুরু যদি মায়াবাদী বৈদান্তিক

সন্ন্যাসী হন, তাহলে তো পরিচিত প্রত্যক্ষ এই সংসারকে মায়া বা মিথ্যা বলে তিনি এর জালে জড়িত হতে চাইবেন না—এইটেই স্বাভাবিক। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকায় সাধনায় সিদ্ধ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীটির সংসারের প্রতি বিরূপতা ও বিদ্বিষ্টতার কথা মনে আসা সম্ভব। আর তা যদি হয়, তাহলে স্বামীজী ও নেতাজীর মধ্যে অন্তর-সংযোগ নির্ধারণের চেষ্টা কি ঠিক? এর উত্তরে বলতে পারি যে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীমাত্রই সংসার-বিদ্বিষ্ট নন। বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যে জগৎ ও জীবনকে মায়া বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার ব্যবহারিক উপযোগিতা অস্বীকৃত হয় নি। তাছাড়া একই বেদান্তের যেমন শঙ্করভাষ্য আছে তেমনি রামানুজ,বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক প্রভৃতিরও ভাষ্য আছে—আর সেইজন্যই বেদান্তের ব্যাখ্যা যেখানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—ইত্যাদিতে পৌঁছেছে সেখানে জগৎ জীবনের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। স্বামীজী ধর্মচেতনায় যে-গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, যাঁর চরণতলে বসে তিনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব-ধর্মের সমন্বয় হয়েছিল। সকল ধর্মের প্রতিই শ্রীরামকৃষ্ণের সমান শ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যকে অতি মূল্যবান মনে করলেও তার অন্যান্য ভাষ্যগুলিকেও স্বীকার করতেন। তাই জীবন ও জগৎকে উপেক্ষা করে কর্মসাধনায় ব্যক্তির মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে তিনি চঞ্চল হননি—গুরুর কাছে একবার সেই ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। আর তার পর থেকে গুরুর নির্দেশিত সর্বধর্ম-সমন্বয়ের অতি উদার পথেই তাঁকে বিচরণ করতে দেখেছি। এই কারণেই দেশ, দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর জন্যে তাঁর প্রাণ সর্বদা উৎকণ্ঠিত ছিল। তাই ধর্মগুরু হলেও স্বামীজী গভীরভাবে দেশপ্রেমিক। লাঞ্ছিত, দুর্গত, দরিদ্র দেশবাসীর জন্যে তাঁর অন্তরের গভীরে ছিল নিরুদ্ধ কান্না। গুরুর শিক্ষায় জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা এবং জীবের মধ্যে ব্রহ্মের বা নারায়ণের অবস্থানকে তিনিও অনুভব করেছিলেন। আবার একই সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের প্রেম ও করুণার বাণী তাঁকে জীব-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই কারণে একদিকে ঐ ব্রহ্মের কথাও যেমন, অন্যদিকে দেশ, জাতি ও বিশ্বমানবের সকল রকম সমস্যার কথাও তিনি চিন্তা না করে পারেন নি। স্বামীজীর দেশপ্রীতি তাঁর আধ্যাত্ম-সাধনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর তাই যদি হল, তাহলে এমন মানুষ দেশনায়ক নেতাজীর জীবনে নানাভাবে ছায়া ফেলতে অবশ্যই পারেন।

আর একটি কথাও উল্লেখ করা দরকার। উনিশ শতকে অতীন্দ্রিয় লোকের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আর মানুষের যে মর্ত্য জীবন—এ দুয়ের ব্যবধান দূর করার একটা প্রবল তাগিদ জাতির চিন্তাশীল কবি, সাহিত্যিক, ধর্মসংস্কারক, ধর্মগুরু এমন কি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনে রেখাপাত করেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অরূপ-দেবতার

জীবন-চর্চার অন্তর্গত করা যায় ধর্মতত্ত্বে তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 'বনে মনে ও কোণে' উপাসনার শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দেশ করলেও এবং জীবনের প্রতি তাঁর মোহ না থাকলেও জীবনকে তিনি ভালবাসতে শিখিয়েছেন—'জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেবা' তাঁর এই নির্দেশে তিনি ঈশ্বর ও জীবকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন তা সহজেঃ অনুমেয়। বিশ শতকের রাজনীতির ক্ষেত্রেও অধ্যাত্মবাদকে যুক্ত করে নেওয়ার একটা প্রেরণা এসেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ঋষি অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক ও মহাত্মা গান্ধী—এঁরা অধ্যাত্মবাদকে বর্জন করে রাজনীতির অনুশীলন করেন নি। সুতরাং স্বামীজী ও নেতাজীকে দুই ভিন্ন জগতের মানুষ বলে প্রতিভাত হলেও বস্তুতপক্ষে স্বরূপত এঁদের সাদৃশ্য আছে এবং স্বামীজীর আদর্শ নেতাজীর জীবনে প্রবলতম বলে সিদ্ধান্ত করলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না।

অতঃপর নেতাজীর ওপর স্বামীজীর প্রভাবের প্রকৃতি নিরূপণ। স্বামীজীর আদর্শ সুভাষচন্দ্র যে জীবনের একটি সময়ে নানাভাবে অনুসরণ করেছেন তার বড় প্রমাণ আত্মপরিচয়জ্ঞাপক জীবনী-গ্রন্থে নেতাজীর বারংবার স্বামীজীর নামোল্লেখ। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যখন সুভাষচন্দ্র সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি, সেইকালে দুটি দিক থেকে এই প্রভাবের বিষয়টি লক্ষ্য করা যেতে পারে। একটি হল জীবনের ঐ পর্বে সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী থেকে তার নিজস্ব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এর সন্ধান, এবং আর একটি হল তাঁর মাকে লেখা কতকগুলি চিঠি-পত্রের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর ধারণা ও চিন্তায়। আর রাজনীতিতে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করার পর থেকে তাঁর আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী গঠন, যুদ্ধ পরিচালনা ও নানা বক্তৃতার মধ্যে স্বামীজীর নিগূঢ় প্রভাব এবং কিছু কিছু দৈনন্দিন ক্রিয়া, চিঠিপত্র ও মাঝে মাঝে কিছু কিছু উক্তির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে স্বামীজীর উল্লেখ আমরা দেখি।

প্রথমেই সুভাষচন্দ্রের লিখিত আত্মজীবনীর আলোকে বিষয়টিকে দেখছি। কিশোর বয়স থেকেই সুভাষচন্দ্র একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে যে-বয়সে মাঠে ফুটবল খেলে কাটাবার কথা, সেই বয়সে তিনি গুরুগম্ভীর নানা সমস্যার চিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিলেন। কটকে র‍্যাভেন-শ কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি জীবনের একটি আদর্শ··· সন্ধানের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তাঁর তখন অভিপ্রায় জেগেছিল ঐ আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর জীবনকে গড়ে তুলবেন। এই সময় তাঁর মধ্যে যে যৌনচেতনা দেখা দিয়েছিল তাকে অত্যন্ত দুর্নীতিমূলক মনে করে তিনি দমন করতেন। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ করার কামনা একদিকে তাঁর মনকে বয়োধর্মে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিত আবার তার সঙ্গে নবজাগ্রত একটা আধ্যাত্মিক চেতনাও তাঁকে বিহ্বল করত···দুয়ের সংঘাতে তিনি মানস-পীড়িত হতেন। কখনো কখনো একটি আদর্শকে বারণ করবার আগ্রহ জাগ্রত হত, কিন্তু দেহ-মনে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন বলে তখন কোনো আদর্শকে বরণ করতে তিনি পারছিলেন না। এই রকম

মানসিক ভারসাম্যহীনতার সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সুভাষচন্দ্র সমাধান খুঁজে পেলেন। কটকে একদা তাঁর এক আত্মীয় সুহৃৎচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী দেখতে পেয়ে পড়বার জন্য সেগুলি বাড়ি নিয়ে এলেন তিনি। তন্ময় হয়ে কয়েকটি দিন সেগুলির জগতেই তিনি রইলেন। তাঁর দেহ-মন স্বামীজীর চিন্তায় কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তাঁকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করল স্বামীজীর বক্তৃতা ও পত্রাবলী। বক্তৃতা ও পত্রাবলীর মধ্য থেকে বিবেকানন্দের কয়েকটি কথা তাঁর সমগ্র মনকে তখন অধিকার করে বসল। স্বামীজীর মানবসেবা ও আত্মার মুক্তি-সম্পর্কিত চিন্তা, মাতৃভূমিকে আরাধ্যা দেবীরূপে গ্রহণ ও তাঁর সেবায় সর্বস্ব নিবেদনের সংকল্প, দেশের সর্ববিধ আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজীর যোগ—মূর্খ, দরিদ্র, চণ্ডাল, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ ভারতবাসীকে ভ্রাতৃরূপে বরণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অবসানে পৃথিবীতে অবহেলিত শূদ্রদের অভ্যুত্থান-দিনের প্রত্যাশা, ইংরেজ-বিদ্বেষ…প্রভৃতি সুভাষচন্দ্রকে সেই বয়সে একেবারে অভিভূত করল। সেই পনের ষোল বছরের সুভাষের জীবনে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চেহারা এবং তাঁর ঐ সমস্ত বাণী—বিশেষ করে জাতিকে উজ্জীবিত করবার জন্যে তাঁর শক্তিমন্ত্র, মানুষের আত্মপ্রত্যয়কে অবিচল রাখার জন্যে তাঁর জলদ-গম্ভীর আশ্বাসবাণী সুভাষ-চিত্তে আপনেয় রেখায় অঙ্কিত হয়ে গেল। তাঁর জীবনের বহু অশান্ত জিজ্ঞাসার সমাধান মিলেছিল এইখানে স্বামীজীর রচনাবলীতে। তিনি নিজেই বলেছেন, "বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে গ্রহণ করলাম, তখন আমার বয়স বছর পনেরো হবে কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। ……চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রধান শিক্ষকের আদর্শ তখন মন থেকে দূরে সরে গেল। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম"।[১] কী করে এই নবলব্ধ আদর্শকে তিনি জীবনে সফল করে তুলবেন…এই ছিল তখন চিন্তা। পার্থিব সকল প্রলোভন ও অন্যায় বাধাকে দূরে করে কিভাবে জনসেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করবেন…স্বামীজীর আদর্শে কীভাবে সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করবেন…এই ছিল তখন তাঁর ভাবনা। এই সময় বিবেকানন্দের কয়েকটি উক্তি তাঁর প্রাণের জপমন্ত্র হয়ে উঠলো। "First believe in yourself, then in God." The Will is stronger than anything else. Everything must go down before the Will; for that comes from God and God himself; a pure and strong Will is omnipotent." "Arise, awake and stop not till the goal is reached. Arise awake! Awake from this hypnotism of weakness. None is really weak; the soul is infinite, omnipotent and omniscient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you, do not deny Him." "Faith, faith, faith in ourselves, faith, faih in God—this is the

secret of greatness." কিংবা "What our country now wants, are muscles of iron and nerves of steel, gigantic wills which can penetrate into the mysteries and secrets of the universe" অথবা "Be not afraid of anything. It is fear that is the great cause of misery in the world. ...And it is fearlessness that brings heaven in moment" [২] স্বামীজীর এই কয়েকটি বাণীর সঙ্গে তাঁর আত্মত্যাগী নিঃস্বার্থ জনসেবার আদর্শ ও অবিচলিত দেশপ্রীতির ধারণা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার পরমতম সম্পদ হয়ে রইল।

এই সময় সুভাষচন্দ্র কিছুদিনের জন্যে যোগ-অভ্যাসে আকৃষ্ট হন এবং অলৌকিক শক্তি-অর্জনের নেশায় নব্বই বছরের এক মঠাধ্যক্ষের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর নির্দেশে কিছুদিন সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন তিনি যাপন করেছিলেন। কিন্তু এ-পথের পথিক তিনি নন। তাই অচিরেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ-লোকেই তিনি ফিরে এলেন। বিবেকানন্দের বাণীতেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবাই প্রয়োজন। আর এ সেবা হল দেশসেবা, দরিদ্রসেবা বা ভগবানের সেবা। তাই এইকালে বিবেকানন্দের আদর্শে অকম্পিত আস্থা রেখেই তিনি ভিক্ষুক, ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। এই কালেই কটকে একবার কয়েকজন বন্ধুসহ দলবেঁধে পল্লী সংস্কারের কাজও কিছু তিনি করেছিলেন। তখনো পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে কটকের স্কুলে পড়ার সময় বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একটি কলকাতার ছেলে হেমন্ত সরকার সেখানে গেলে তিনি তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং রাজনৈতিক আদর্শের প্রথম প্রেরণা তার কাছ থেকেই পান। কটকের স্কুলে পড়া শেষ করে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন। এই সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন যে, দৈনন্দিন জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আমার আদর্শ ও স্বামীজীর আদর্শেই তখন তিনি মন থেকে ভূত-প্রেত-ওঝা প্রভৃতির কুসংস্কার দূর করেছিলেন। কলেজ-জীবনে দীর্ঘ দুবছর তাঁর ওপর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রবল প্রভাব ছিল। এই আদর্শে বিশ্বাসী একটি দলও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। এই দলের মনে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও নৈতিকবোধ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জাগ্রত হত। বড় কিছু একটা করতে গেলে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথাও মনে আসত। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শটিকে যে জীবনে সত্য করে তোলা দরকার তাও ঐ দল মনে করত! এমনও মনে হত যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা বিবেকানন্দের আদর্শ ঠিকভাবে পালন করছেন না—সেগুলির সংশোধনের ইচ্ছাও সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দলের হত। ধর্ম ও জাতীয়তার মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চাইছিলেন তাঁরা। স্বামীজীর সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ সুভাষচন্দ্রকে এতো বেশী মুগ্ধ করেছিল যে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিন তিনি শান্তিপুরে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। কিন্তু এ-

জীবনের মধ্যে বদ্ধ থেকে তিনি ঈপ্সিত পথে চলতে পারবেন না জেনে এ-পথ থেকে এলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ঋষি অরবিন্দের আদর্শের আলোকচ্ছটা তাঁকে কম আকৃষ্ট করে নি। ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে পূর্ণ স্বরাজের দাবী তুলেছিলেন তখন অরবিন্দ। তৎকালীন কংগ্রেসের নরমপন্থী মনোভাবে তিনি প্রসন্ন না হয়ে বামপন্থী আদর্শ প্রচার করেছিলেন এবং কারাবরণও করেছিলেন।

চরিত্র-গঠনে বিবেকানন্দের জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তির কথা এবং শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন যোগ সমন্বয়ের কথা—দুইই তখন সুভাষচন্দ্রকে আকর্ষণ করত। স্বামীজীর আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তিনি কলকাতার এক অনাথ-ভাণ্ডারের সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত হয়ে দরিদ্রদের জন্যে চাল-ভিক্ষা করেন এবং কলেজের একটি বড় ছুটিতে কটকে গিয়ে সেখানকার গ্রামাঞ্চলের কলেরা রোগীদের সেবা করেন। তখন মনে জাগত স্বামীজীর সেই বাণী—"You have long oppressed these forbearing masses, now is the time for their retribution."[৪] সুভাষচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র, তখন যথার্থ গুরুর সন্ধানে ভারতের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করার সুযোগ নিয়েছিলেন। বেদান্ত-ভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁর মায়াবাদকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি বলেছেন, "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শই আমার কাছে অনেক সহজ ও বাস্তবপন্থী মনে হত।"[৫] এরপর কলেজ-জীবনেই সুভাষচন্দ্রের ওপর বিপদের কালোমেঘ দেখা দেয়। ওটেন-ঘটিত ব্যাপারে কলেজ থেকে তিনি হলেন বহিষ্কৃত; কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানেও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেই শক্তির মূলে ছিল—বিবেকানন্দের বাণীর গোপন অনুরণন—"If the whole world stands against you sword in hand, would you still dare to do what you think right ?"[৬] সে যাই হোক দু বছর তাঁর পড়া বন্ধ হল। এই সময় কটকে গিয়ে সমাজসেবা ও পুজো-পার্বণে মেতে তিনি যুব-সংগঠনে মন দিয়েছিলেন। তারপর আবার স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময় চার মাস ভারতরক্ষা বাহিনীতে 'ইউনিভার্সিটি ইউনিট' গড়া হবে জেনে তিনি ক্যাম্প করেন ও সৈনিক-জীবনের প্রথম স্বাদ লাভ করেন। এতো বিপত্তির মধ্য দিয়েও সুভাষচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে তাঁকে বিলেত যাত্রা করতে হয়। ঐ পরীক্ষায় সাফল্য এবং লোভনীয় চাকরীর মোহ ত্যাগ করে তিনি সানন্দে দেশ-সেবার কাজে নেমে পড়লেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথম পর্বের এই ইতিহাস যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে তার মধ্যে স্বামীজীর কী নিগূঢ় প্রভাব তা নানাভাবেই আমরা এতক্ষণ লক্ষ্য করেছি।

জীবনের এই পর্বে তাঁর জননীকে লেখা কতকগুলি চিঠিতেও তাঁর মানস-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিঠিগুলিতে তিনটি দিক খুব নজরে পড়ে। দেশপ্রীতি, দেশবাসীর প্রতি গভীর মমতা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস। কিশোর সুভাষ তাঁর মাকে যে চিঠিগুলি লেখেন, তাতে একাধিক চিঠিতে দেশের জন্য তাঁর

গর্ববোধ ও দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ্য করি। এ-দেশকে তিনি ভগবানের 'আদরের দেশ' বলে মনে করতেন। আবার দেশবাসীর দুর্বলতা, পরদাসত্ব, ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতার জন্যে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় চোখের জল ফেলেছেন তিনি। নিরাকার ব্রহ্ম নয় সাকার ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে তিনি একখানি চিঠিতে লিখেছেন, "অনন্ত জন্ম-মৃত্যুর বাঁধনে পিষ্ট এই জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন। আমি চাই ভক্তি, জ্ঞান নয়। বিশ্বাসই নিয়ে আসবে ভক্তিকে ও ভক্তি জ্ঞানকে। আমি তাঁকেই সম্মান করি যাঁর হৃদয়ে প্রেম উদ্বেলিত।"[৭] তিনি নীচজাতিয় হলেও তাঁর পায়ের ধুলো তিনি মাথায় নেবেন। "ধিক সেই শিক্ষা যাতে ঈশ্বরের নাম নেই।" মনের দিক থেকে বিবেকানন্দের শিষ্যতা সূত্রেই যে সুভাষচন্দ্রের এই সমস্ত উক্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবার সুভাষচন্দ্রের জীবনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা মূলত স্বামীজীর নিগূঢ় প্রভাবের বিষয়টি অনুসন্ধান করব। কিন্তু তার পূর্বে সংক্ষেপে সুভাষচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি একটুখানি স্মরণে রাখা প্রয়োজন। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন করে ও উচ্চতম চাকরীর প্রলোভন ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মীরূপে রাজনীতিতে তথা দেশের সেবায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেন। এখন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। গান্ধীজী তখন সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় নেতা। সারা দেশ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত। সুভাষচন্দ্রেরও গান্ধীভক্তি যথেষ্টই ছিল। কিন্তু দেশ মাতৃকার মুক্তিযুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে গান্ধীজীর আপোষমূলক নীতি তথা তৎকালীন কংগ্রেসের গৃহীত নীতিতে সুভাষচন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন না। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, পূর্ণ স্বরাজের পরিবর্তে স্বায়ত্ত শাসনলাভের চেষ্টা এবং অত্যাচারী ইংরাজদের সঙ্গে একটা রফা করে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার পথে চলা সুভাসের মনঃপূত হয় নি। তিনি কংগ্রেসের মধ্যে থেকে যাঁরা গান্ধীনীতিতে খুশী নন, তাঁদের নিয়ে একটি নূতন সাম্যবাদী দলও গঠন করলেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশের বহু সমস্যা আছে। সেগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে। কিন্তু সকলের আগে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আর তার জন্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন তাকে কাজে লাগাতে হবে। ত্রিশকোটি জনগণের এই জাগরণকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। ইংরেজরাই দেশের শাসক ও হৃদয়হীন শোষক—দেশের সকল প্রকার অবনতির মূল কারণ তারাই। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর থেকে সুভাষচন্দ্রের বারবার কারাবরণ, অন্তরীণ হয়ে থাকা, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ যাত্রা, প্রত্যাবর্তন, গান্ধীজীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সভাপতি পদে ভোটযুদ্ধে জয়লাভ—আবার অন্তরীণ হয়ে গৃহ-বন্দী জীবন ও ফকিরীবেশে দেশোদ্ধারের জন্য তাঁর জার্মানী-গমন ও সেখান থেকে জাপানে গিয়ে

আজাদহিন্দ্ ফৌজ সংগঠন এবং মণিপুরে প্রবেশ করে ভারতীয় পতাকা প্রোথিতকরণ পর্যন্ত—তিনি যে-মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর ভয়শূন্যতা, আত্মত্যাগ, দেশের জন্যে অশেষবিধ কৃচ্ছ্রতাবরণ-সহিষ্ণুতা, সংগঠনী শক্তি, অসীম আত্মপ্রত্যয় এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক সংগ্রামী মনোভাবকে লক্ষ্য করি। এই পর্বে সুভাষচন্দ্র অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, গ্রন্থ লিখেছেন এবং আজাদহিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে জ্বালাময়ী বেতার-ভাষণ দান করেছেন। তাঁর এই পর্বের জীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল। দেশের বহু প্রতিষ্ঠান ও নানা কর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি, ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক-পদে থেকে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে, Forward পত্রিকার সম্পাদকরূপে ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের প্রধান নায়করূপে, শ্রমিক আন্দোলনেও ক্ষেত্র-বিশেষে নেতৃত্ব দিয়ে এইকালে তিনি সারা দেশে নিজের ব্যক্তিত্বকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পর্বে সুভাষচন্দ্রের যে বিশাল ব্যক্তিত্ব, দুর্লভ সংগঠনী শক্তি এবং প্রবন্ধ বক্তৃতা ও গ্রন্থে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা ও চিন্তার পরিচয় পাই, তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অনুরূপ চিন্তার সাদৃশ্য মনে না এসে পারে না। মনে হয় এ-কালেরও সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও পরিকল্পনার নেপথ্যে স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের ধ্বনি আধ্মাত ছিল।

প্রথমেই বলদর্পী অত্যাচারী শাসক ইংরাজদের সম্পর্কে দুজনের মনোভাবের কথা বলা যেতে পারে। স্বামীজী সমকালীন ভারতবর্ষের সকল আন্দোলনের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজে অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রটিকে নির্বাচন করে নিলেও দেশবাসীকে নানাভাবে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তারা জাগ্রত না হলে নিজেদের চিনতে না পারলে কোনো সমস্যারই যে সমাধান হবে না—একথা বারবার তিনি বলেছেন। দেশের শাসনতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত, বিদেশীদের হাত থেকে দেশকে যে মুক্ত করা দরকার এবং সেইজন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের কথাও তিনি জানিয়েছেন। সশস্ত্র সংগ্রাম বা বিপ্লবের পথই যে এর প্রকৃষ্ট পন্থা—এও তিনি মনে করতেন। বিপ্লববাদের সমর্থক স্বামীজী নিজে রাজনীতির আন্দোলনে যোগ না দিলেও শাসক ইংরেজদের প্রতি তাঁরও ছিল নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ। নিজে রাজনীতিতে বিপ্লববাদের তরঙ্গ সৃষ্টি না করতে পারলেও শিষ্যা নিবেদিতা তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, আর তা পূর্ণতা লাভ করেছে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। দেশবাসীর ওপর হৃদয়হীন বর্বরোচিত আচরণ, শোষণ ও পীড়নের জন্যে বিবেকানন্দ ইংরেজদের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। লণ্ডনে একদা স্বামীজী তাঁর স্টেনোগ্রাফার গুডউইনকে বলেছিলেন, "লড়ে মরে ভারতীয় সেপাইরা, বাহবা

পায় ইংরেজ সেপাইরা। তোদের জাতের এই বীরত্ব এই ন্যায়বিচার। দ্যাখ্ এই ভারতবর্ষটি-কে hypnotise করে ফেলেছে, তাইতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীদের বুকের উপর বসে রক্ত চুষে খাচ্ছে। কিন্তু যেদিন hypnotise চুলোয় যাবে এবং ভারতবাসীরা নিজেদের ভিতরকার শক্তি বুঝতে পারবে, সেদিন তোদের মেরে ফেলবে—"Will squeeze you like a leamon"[৮] ইংরেজদের প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেছেন, "যত জাতি ভারতে এসেছে তারমধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল ইংরেজ। ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরাজরা? স্তূপীকৃত ব্রাণ্ডির ভাঙা বোতল—আর কিছু নয়।···আমাদের গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের শেষরক্ত-টুকু তারা নিজের তৃপ্তির জন্য পান করে নিয়েছে, আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তারা নিজের দেশে চালান দিয়েছে।[৯] আবার আর এক স্থলে বলেছেন যে ইংরেজ-রাজত্বে দেশে শিক্ষা-বিস্তার বন্ধ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, সামান্য স্বায়ত্ব-শাসন যা দেওয়া হয়েছিল তাও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে তারা ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে। "বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান? মেরী তুমি আশাবাদী হতে পারো কিন্তু আমি কি পারি?"[১০] নিদারুণ বেদনা ও ঘৃণা বর্ষণ করে তিনি ইংরেজদের কথায় বলেছেন, "ভারতবর্ষকে সভ্য করার জন্য ইংরাজরা তিনটে বি-র ব্যবহার করেছে—বাইবেল, ব্র্যাণ্ডি ও বেয়নেট"।[১১] বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কেও তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের রাজ্য বিস্তারের পরিণতি কখনোই ভালো হতে পারে না। "It will crumble to pieces out of sheer weight"[১২] বলে তিনি মনে করতেন।

স্বামীজীর এ-সব উক্তির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনিও বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সকলের আগে দরকার। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়ে তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন যে অত্যাচারী ক্রুর ইংরাজদের বিতাড়িত করে দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে গান্ধীজীর অহিংসার পথ খুব বেশী সহায়ক হবে না—তাই সশস্ত্র বিপ্লবের পথই প্রশস্ত। আর এই কারণেই নিরস্ত্র ভারতবাসীর এ দীনতা দূর করার জন্যে তাঁকে ত বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছিল—জার্মান-জাপানের সাহায্য নিতে হয়েছিল এবং আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। ইংরেজদের প্রতি প্রবলতম ঘৃণা ও বিদ্বেষে তিনিও তাদের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। দু একটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণে ১৯৪২-এর ১লা মে তিনি বলেন, "I have known Britishers from my childhood". ৩১-এ আগস্ট

বলেছেন "I shall one day be able to give them the fight of their lives." আবার আমাদের এই বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে একদা ইংরেজরা এ-দেশে প্রবেশ করেছিল তাই এখন "Bengali should now show them the way out." তিনি তখনও জোর দিয়ে বলেছেন ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবার জন্যে শেষ যুদ্ধে যোগ দিতে তিনি বেঁচে থাকবেনই। ১৯৪৫এর ২৬-এ জুন আর একটি বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র তথা নেতাজী (আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী গঠনের পর থেকে তিনি সকলের কাছে নেতাজী রূপেই পরিচিত হলেন) বললেন, "প্রথমত স্বাধীনতার ব্যাপারে কোনো রফাই চলতে পারে না। দ্বিতীয়ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এখনো যদি সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাই, তাহলে যুদ্ধের শেষে স্বাধীনতা-লাভ অবশ্যম্ভাবী।......আমার সহকর্মীগণ এখন ভীষণতম যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে। আমার সঙ্গীরা রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করছে। রেঙ্গুন শহরের আজাদ-হিন্দ ফৌজের হাসপাতাল সমভূমিতে পরিণত হয়েছে।" কিন্তু এ সমস্ত কিসের জন্যে ? দেশকে বৃটিশের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার দুর্জয় সংকল্পেই নেতাজী সেদিন সৈন্যাধ্যক্ষ। নেতাজী স্বাধীনতার জন্যে যে এ-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তারও নিশানা পেয়েছিলেন স্বামীজীর একটি পরিকল্পনা ও তার ব্যর্থতার মধ্যে। ভগিনি ক্রিস্টিনকে একদা স্বামীজী বলেছিলেন, "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্য আমি বন্দুক নির্মাতা হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোনো সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত।"[১৩] মোটকথা স্বামীজী বিপ্লবের পথ ধরে রাজনৈতিক সংগ্রামে না নামলেও তাঁর এই বিষয়ক চিন্তাদর্শ বাংলার বিপ্লবীদের যেমন, তেমনি নেতাজীকে প্রাণিত করেছিল। সেইজন্যে বাংলার বিপ্লবীরা স্বামীজীকে তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরু বলে মনে করতেন। অনুশীলন সমিতির নেতা সতীশচন্দ্র বসু, যুগান্তর দল সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ একথা স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে স্বামীজী সন্ন্যাসী হলেও দেশের স্বাধীনতার কথা সর্বদা চিন্তা করতেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবতেন—এ কাজের দায়িত্ব তিনি নিবেদিতার হাতে দিয়ে যান। আর সেখান থেকেই সেই দীপকে অনির্বাণ রাখার প্রয়াস করেন নেতাজী—একথা আমরা বলতে পারি।

স্বামীজী এবং নেতাজী দুজনেই ভারতের অতীত-সম্পদ সম্পর্কে গর্ববোধ করতেন এবং দেশের যুবসমাজ ও যুবশক্তির ওপর দুজনেরই ছিল গভীর আস্থা। এক্ষেত্রে স্বামীজীর চিন্তা ও বক্তব্যের সঙ্গে নেতাজীর ভাব-চিন্তার সাদৃশ্য এতো বেশী যে স্পষ্টই মনে হয় স্বামীজীর ভাবনাকে তিনি সচেতনভাবেই যেন অনুসরণ করেছেন।

বেদ-উপনিষদের মধ্যে ভারতের যে প্রাচীন অধ্যাত্মসম্পদ নিহিত আছে তার

প্রতি স্বামীজীর ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা। সর্বান্তঃকরণে তিনি ধর্মকেই বরণ করার কথা বলতেন, কিন্তু কপটতা, মিথ্যাচার ও তমোগুণের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে ধর্মকেও বরণ করা যাবে না। অতীতে এ-সব ছিল না। তাই অতীতের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে প্রেরণা নিতে হবে এবং যুগোচিত সামঞ্জস্যের পথে অগ্রসর হতে হবে। লোকাচার ও অন্ধ কুসংস্কারকে তিনি মানতে কখনও বলেননি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী কলম্বোয় প্রথম বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "আগে আমি ভাবতাম ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।...এই পুণ্যভূমি থেকে ধর্মনায়কেরা বারবার পৃথিবীতে অধ্যাত্ম-সত্যের বান বইয়ে দিয়েছেন। এখান থেকেই দর্শনের বিপুল জোয়ার প্রবহমান হয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্লাবিত করেছে,আর এখান থেকেই ফের সে-স্রোত বইবে যার স্পর্শে জগতের বস্তুতান্ত্রিকতা শৃঙ্খলাভ করবে। আপনাদের বলেছি আমি—এ হবেই হবে।" নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নানা-প্রসঙ্গে বিশেষত যুবসমাজের কাছে তাঁর অভিভাষণে দেশের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেছেন। তিনিও অন্ধভাবে অতীতকে আঁকড়ে থেকে বর্তমান জীবন-সমস্যার সমাধান আসবে —একথা মনে করতেন না। একস্থলে তিনি বলেছেন, "আমি ভারতের অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহি। ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে তাহাকে তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।...এক কথায় আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞানের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে আমাদিগকে একটি সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।"[১৪] স্বামীজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নেতাজীও বলেন, আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত একটা বাণী প্রচারের জন্য··· আনন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব—সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব।"[১৫] স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই নেতাজী দেশের যুব সমাজের ওপর অত্যন্ত আস্থা রাখতেন। তাদের জাগ্রত করার জন্যে নেতাজী যে-সব কথা বলেছেন তার মূল সুর স্বামীজীর বক্তব্যেই মিলবে। দেশের সকল কাজেই প্রয়োজন তরুণদের। আর দেশের মানুষের বিশেষ করে অনুন্নত, দুর্বল, অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্গতির চিন্তায় অস্থির হয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে দেশমাতৃকার পূজাই পরবর্তী পঞ্চাশ বছর আমাদের সাধনার মূলমন্ত্র হোক। "For the next fifty years this alone shall be our key-note—this, our great Mother India. Let all other Vain Gods disappear for the time from our minds. This is the only God that is awake, our own race, Everywhere. His hands, everywhere His feet, everywhere His ears. He covers everything. All other Gods are sleeping.[১৬] আর সেই সঙ্গে দেশের নিরক্ষর শ্রমিক-চাষীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুবসমাজকে তিনি বলছেন—"তোদের মত তারা কতকগুলো বই-ই

না হয় পড়েছে। তোদের মত শার্ট কোর্ট পরে সভ্য না হয় না-ই হতে শিখেছে, তাতে কার এল গেল! এরাই হচ্ছে জগতের মেরুদণ্ড সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি?"[১৭] দেশের শিক্ষিত ও সুবিধাবাদী লোভী মানুষেরা এতকাল ঐ সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে শোষণ করেছে। কিন্তু সে-দিন বদলে যাচ্ছে—তাই তিনি বলেন "তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকেদের বুঝিয়ে দেওয়া যে আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, 'ভাই সব ওঠ, জাগো! কতদিন আর ঘুমুবে?'"[১৮] এই জন্যই স্বামীজী বারবার বলেছেন "Man making is my misssion." ভারতের অগণিত মানুষ জাগ্রত হলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধ্বসে পড়বে।

নেতাজীও দেশের তরুণদের বলেছেন 'অমৃতের পুত্র'। তাদের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে তার উদ্বোধন-প্রয়াস করেছেন তিনি—দেশের কাজে নেমে জাতি-জাগরণের দায়িত্বও নিতে বলেছেন তাদের। দেশের নারীসমাজ, অনুন্নত সমাজ ও কৃষক-শ্রমিক সমাজ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। এদের কাছে যুবসমাজকে তিনি যেতে অনুরোধ করেছেন এবং তাদের বলতে বলেছেন, 'তোমরাও মানুষ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমরাই পাইবে। অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের অধিকার কাড়িয়া লও।"[১৯] দেশের তরুণদের তিনি পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হতে বলেছেন। 'স্বরাজ' যে জনসাধারণের জন্যে একথা বিবেকানন্দ বলে গেলেও তার মর্ম এখনো আমরা বুঝতে পারিনি বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। যৌবনশক্তির সাহায্যে কী অসাধ্যসাধন সম্ভব তার কথা মনে রেখে তিনি বলেছেন, "আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা—সেখানেই আমরা কুঠারহস্তে উপস্থিত হই···স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই বিড়ম্বনা।···কি সমাজনীতি কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।···এই নব জাগরণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা···তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ।···ওগো আমার তরুণ জীবনের দল তোমরা ওঠো, জাগো, উষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে।" স্বামীজির মানুষ গঠনের কথা মনে রেখে নেতাজী বলেছেন,—"আমিও নূতন মানুষ তৈরী করবার কাজে নিরত। দুই বৎসর ধরিয়া আমি ছাত্র-আন্দোলন যুব আন্দোলন ও নারী আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে এতো জোর দিয়া বলিয়া আসিতেছি।"[২০]

আমরা পূর্বেই বলেছি তৎকালীন গান্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের নীতি দেশের মুক্তি আন্দোলনে সুফলপ্রসূ হবে বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতে পারেন নি। তাই কংগ্রেসের মধ্যে তিনি একটি বামপন্থী সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় (গান্ধীজীর স্বাধীনতার সারমর্ম নয়) এবং স্বাধীনতা-

লাভের উপায় হিসেবে আপোষহীন জাতীয় সংগ্রামে যিনি বিশ্বাসী তাকেই সুভাষচন্দ্র বামপন্থী বলেন। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপরে এই বামপন্থী প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই কারণেই তিনি কংগ্রেস থেকে সরে এসে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা হিসেবেই জন্ম থেকে কাজ করে আসছে বলে তিনি দাবী করেছেন। ১৯৩৯-এর মে মাসে জাত এই 'ফরওয়ার্ড' ব্লক' দল জগৎসভায় ভারতকে পুনরায় তার যোগ ও ন্যায়সঙ্গত আসন দান করবে। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন ও আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টায় স্বামীজীও সন্তুষ্ট ছিলেন না। লণ্ডনে সারদানন্দজীকে স্বামীজী বলেছিলেন, "ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস করে মিছিমিছি হৈ চৈ করছে কেন? চেপে বসুক, নিজেদের Independent বলে declare করুক—'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলুম। আর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রকে নিজেদের Declaration পাঠিয়ে দিক। কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়?…তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে আমার বুকে পড়ুক।"[২১] ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্তকেও তিনি বলেছিলেন, "বলতে পারেন কংগ্রেস জনসাধারণের জন্যে কি করেছে? আপনি কি মনে করেন কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করলেই স্বাধীনতা আসবে। তাতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম জাগাতে হবে জনাসাধারণকে।"

ভারতে নিজ নিজ কালে নারীসমাজের প্রতি অবহেলা, অসম্মান এবং তাকে দুর্বল করে রাখার জন্যে দেশের অগ্রগতি ও জাতীয়-জাগরণ যে সম্পূর্ণতা লাভ করে না—এ সম্পর্কে দুজনেই গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। মেয়েদের দুর্দশার জন্যে স্বামীজী পুরুষদেরই দাবী করে বলেছেন, 'তোরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী সকল সময় প্রাণ দিয়ে সেবা করে তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস।"[২২]

মেয়েদের manufacturing machine করে তোলার জন্যে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মীমাংসা করে নিতে পারে। আদর্শ চরিত্র-গঠনের অনুকূল শিক্ষা তাদের দরকার। তিনি বলেছেন, "ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।[২৩] ধর্ম-শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের দ্বারাই নারীরা সতীত্বধর্মের রূপটি উপলব্ধি করতে পারবে। ভগিনী নিবেদিতা আদর্শ ভারতীয় নারী সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"ভারতীয় কৃষ্টির ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলকথা পারিবারিক শুচিতো ও মাধুর্য। স্ত্রী সহধর্মিণী, মাতৃত্ব—উৎকর্ষের চরম শিখর "(Wifehood is a religion, motherhood a dream of perfection)"…প্রাচ্য নারী এই আদর্শের অনুগামী হয়ে চলেছে, যাতে সে আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে সুসমৃদ্ধ সুনাগরিকরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।"[২৪] স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন বলে বিবেকানন্দ বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বহু বিবাহ-নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নারীদের মতামত

গ্রহণের প্রয়োজনীতার কথা ব'লেছেন। দেশের কাজের জন্যে কিছু ব্রহ্মচারিণীর দরকার বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মানসিক ঔদার্য ছিল সীমাহীন। তিনি অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করেছেন এবং আন্তর্জাতিক বিবাহেরও তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। এ-বিবাহ সমর্থন করার কারণ বিভিন্ন বর্ণের বা বিভিন্ন জাতির রক্তগত সংযোগে শক্তিশালী শিশুর জন্ম হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও দেশে নারীসমাজের অধোগতির জন্যে স্বামীজীর মতো পুরুষদেরই দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, "আজ যদি বাংলাদেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইত।"[২৫] ছাত্রদের সম্বোধন করে তিনি বলেছেন যে ইংরেজদের তারা নিন্দা করলেও নারীজাতির সম্মান করতে জানে। মুখে আমরা 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' বললেও সমস্ত অন্তর দিয়ে জননী ও জন্মভূমিকে ভালোবাসি না। "জননীকে ভালোবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালোবাসা নয় সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালোবাসা।······মাতৃজাতিকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর। নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কৃতসংকল্প হও।"[২৬] মনু-সংহিতার একটি শ্লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নেতাজী বলেছেন যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতারা আনন্দ-লাভ করে থাকেন ; আর যেখানে নারীর সম্মান নেই, সেখানে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ফল। নারীকে বীরপ্রসূ হতে হবে। তাই তাঁর বক্তব্য, "আমাদের মাতৃজাতিকে যদি আমরা শক্তিরূপিণী করিতে চাই, তাহা হইলে বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে ; স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্যপালনের অধিকার দিতে হইবে ; উপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে ; অবরোধ প্রথা দূর করিতে হইবে ; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম-শিক্ষার এবং লাঠি ও ছোরা খেলার শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—স্বাবলম্বী হইবার মতো অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে।"[২৭] স্বামীজী বীর্যবতী নারীর কথা বলতেন। সেই বীর্যবতী নারীর বাস্তব রূপ নেতাজীর ঝান্সির রাণী-বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে কি ফুটে ওঠেনি ?

স্বামীজী স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে কারিগরী বিদ্যা, বিজ্ঞান-চর্চা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন। Industry বাড়ানোর জন্যে তিনি টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন-এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। দেশে শিল্পের প্রসারও তিনি চাইতেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যাওয়ার পথে তিনি জামসেদজী টাটাকে বলেন, "জাপান থেকে দেশলাই এনে বিক্রী করে তাদের টাকা দিয়ে কি লাভ ? এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে লাভ, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে। হাজারিবাগের কাছে একটি জায়গায় শিল্প বিদ্যালয় ও কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জামসেদজীর চিঠিতেই জানানো হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রও রাষ্ট্রের উন্নয়নে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। যে পুরাতন শিল্প-পদ্ধতি বিদেশের ব্যাপক উৎপাদন ও স্বদেশের

বৈদেশিক শাসনের ফলে ভেঙে পড়েছে তার পরিবর্তে নূতন শিল্প-পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্যে চেষ্টা করতে হবে। "ভারতবর্ষের মতো দেশে কুটিরশিল্পগুলির বিশেষ করিয়া কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাতে সুতা-কাটা ও হস্ত-চালিত তাঁত-শিল্পের মতো শিল্পগুলির প্রচুর অবকাশ থাকিবে।[২৮] আধুনিক শিল্পায়নের প্রতি আমাদের যতই বিরূপতা থাক ইচ্ছে করলেও এখন তার শিল্প পূর্ব যুগে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই ঐ একই ভাষণে তিনি জানালেন, 'আমাদের নিজদিগকে শিল্প-রূপায়ণের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া উচিত এবং ইহার কুফল যত কম হয়, সেজন্য উপায় উদ্ভাবন করা উচিত।' কারিগরী শিক্ষা ও বিজ্ঞান-গবেষণাকে তাই তিনি উপেক্ষা করেন নি। সুভাষচন্দ্র জাতির জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্যে রক্ত সংমিশ্রণের কথা স্বামীজীর মতোই বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যাঁহারা বর্ণসংস্কারের ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন না এবং তাঁহারা মানববিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজ অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করিয়া রক্ত সংমিশ্রণের সহায়তা করিতে হইবে।"[২৯]

দেশের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণের ব্যাপারে স্বামীজী ও নেতাজী নিরন্তর চিন্তান্বিত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বন্টন—এবং সমস্যা সমাধানের জন্যে সমাজতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করতে হবে -একথা দুজনেরই। স্বামীজী বলেছেন 'I am a socialist', এবং সোসালিজম ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে মিলিয়ে নিয়ে বেদান্তের পথ ধরেই আসবে--বলেই তাঁর ধারণা। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'ভারতের মুক্তি ও সেই সঙ্গে বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের উপর। অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা থেকে ভারতকে শিক্ষালাভ করতে হবে। ভারতের উচিত নিজস্ব ধরণের সমাজতন্ত্রের জন্ম দেওয়া।[৩০]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে যে ভারতের সমস্যা-সমাধান হবে না এ বিষয়েও দুজনেরই ধারণা এক। স্বামীজী বলেছেন যে লোকে গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু 'দু' একজনের কর্তৃত্বই প্রধান, বাকী সব ভেড়ার দল। আসলে দুজনেই ছিলেন সমন্বয়বাদী। পাশ্চাত্য সত্ত্বগুণের অভাবে মরছে, অথচ তার রজোগুণের প্রাচুর্য, কিন্তু ভারতের ঠিক তার বিপরীত। ভারতের চাই রজোগুণ —চাই কর্মের প্রবাহ। নেতাজী ও স্বামীজী দুজনেই পাশ্চাত্য-অনুকরণের ঘোরতর বিরোধী—অথচ পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট যা কিছু তা গ্রহণে দুজনেই সমুৎসুক। নেতাজী যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলেছেন তা পুরোপুরি মার্কসবাদ বা কম্যুনিজমের বাস্তবরূপ হবে না—তা National Socialism ও Communism থেকে সার জিনিষগুলি নিয়ে ভারতীয় প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এমনই এক ভারতীয় সমাজতন্ত্র—যা বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দেবে। আদর্শ রাষ্ট্রের কথায় স্বামীজীও বলেছিলেন যে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশীলতা ও শূদ্রের সাম্যভাব—এ সমস্ত নিয়ে অথচ এ-গুলির ত্রুটিসমূহ বর্জন করে একটি

আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে স্বামীজী ও নেতাজী দুজনের দেশপ্রীতি অত্যন্ত গভীর হলেও উচ্চ স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা তাঁদের মধ্যে ছিল না। ভারতবাসীর সর্বপ্রকার মুক্তির কথা চিন্তা করলেও বিশ্ববাসীর সমস্যা সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত ছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "আমরা শুধু ভারতের স্বার্থেই সংগ্রাম করিতেছি না, আমাদের এ সংগ্রাম মানবতার স্বার্থে। ভারতের মুক্তির অর্থ মানবতার পরিত্রাণ।"

ভারতবর্ষের বাইরে ফকিরীবেশে পলায়ন করে দেশের মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্র যা করেছেন সে-কাহিনী আমাদের রোমাঞ্চিত করে। নিজের ওপর কতোখানি বিশ্বাস ও আত্মশক্তির ওপর কতোখানি আস্থা থাকলে এই কাজ সম্ভব তা আমরা স্বাধীন ভারতের বুকে বসে চিন্তাও করতে পারি না। কিন্তু নেতাজী যে তা পেরেছিলেন তাঁর মূলে ছিল বিবেকানন্দের শক্তি-সঞ্চোদক বাণী, মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির দিকে তিনি বারবার অঙ্গুলি-সংকেত করে গেছেন! সহায়-সম্বলহীন এক সন্ন্যাসী চিকাগো শহরে গিয়ে যে-ভাবে ভারতের মর্যাদা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই ভাবেই পরাধীন দেশের নিরস্ত্র সুভাষও একাকী একদিন দেশত্যাগ করে আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর এক দিন ভারতের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা এতক্ষণ ধরে স্বামীজীর প্রভাব সুভাষচন্দ্রের কর্মময় জীবনের দ্বিতীয় পর্বে কিভাবে কাজ করেছে তা নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এবার সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব কিছু কিছু বাণী উধৃত করে তাঁর জীবনে স্বামীজীর স্থান কেমন তা দেখিয়ে এ-প্রবন্ধের উপসংহারে আসব।

ক. শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমি যে কতো ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ।... আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয় আমার গুরু হইতেন।...যাহা হউক যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের" একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—একথা বলা বাহুল্য।

(উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদককে লেখা পত্র ১৩৫৪ আশ্বিন)

খ. বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই আমি আত্মহারা হয়ে যাই।... এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর মনকে যেরূপ আকৃষ্ট করে, এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বেহিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনী বহুমুখী।...ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw him'-এ বলেছেন, 'The queen of his adoration was his Motherland' আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভণ্ডামি বলতে পারেন স্বামীজীর মধ্যে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না।...স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন মানুষ—তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে সংগ্রামী, সেইজন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক।...আজ তিনি জীবিত থাকলে

আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা—একথা বললে বোধহয় ভুল করা হবে না।

(মধ্যপ্রদেশের সিউনি জেল থেকে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে, লেখা পত্র ১৯৩২, ৬ই মে)

গ. গান্ধীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি মহৎ। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করিয়াছে।

(উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৩৭)

ঘ স্বামীজী দুইটি জিনিসের উপর জোর দিতেন—ত্যাগ ও চরিত্রগঠন।

(উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৩৭)

ঙ তাঁহার বইগুলির মধ্যে পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।···পত্রাবলী ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়।

(মান্দালয় জেল থেকে লেখা)

চ. স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন —Man making is my misson — খাঁটি মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।···রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি।···উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপের আভাস রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। Freedom, freedom is the song of the soul—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। (১৯২৯, ২১শে জুলাই)

ছ আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোনো ism-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন Man making is my mission. জাতিগঠনের এবং ism-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি —খাঁটি মানুষ। (২২শে জুন ১৯২৯)

জ. স্বামী বিবেকানন্দই বাংলার ইতিহাসকে নূতন পথে মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, মানুষ তৈরীই আমার জীবনব্রত। মানুষ তৈরীর ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ে তাঁহার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই—সমগ্র সমাজকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী এখনো বাংলার ঘরে ধ্বনিত হইতেছে—'নতুন ভারত বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে, কল-কারখানা থেকে,—কাল মার্কসের গ্রন্থ হইতে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয় নাই। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে উহার উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচনায় ও কর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া-

ছিল···জাতি গঠনের প্রথম ভিত্তি—মানুষ তৈরী, তারপরেই সংগঠন। স্বামীজী ও অন্যান্যরা মানুষ তৈরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেশবন্ধু চাহিয়াছেন রাজনৈতিক সংগঠন (বাংলার একটি ব্রত আছে—রচনা)।

ঝ. চরিত্র-গঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না (দলাদলির হোক অবসান—রচনা)।[১১]

আর উধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বিভিন্ন সময়ে এই কয়েকটি উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় নেতাজীর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে বিবেকানন্দের স্থান তাঁর অন্তরের কতো গভীরে ছিল।

পরিশেষে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের[১২] স্বামীজী ও নেতাজী সম্পর্কে অতি মূল্যবান আলোচনার সিদ্ধান্তের কথাটি বলব এবং এ-বিষয়ে আমাদের ধারণার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটবে। স্বামীজী ও নেতাজীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কটির অতি-গভীরে কবি-দৃষ্টিতে মোহিতলাল মনে করেছিলেন স্বামীজীই নেতাজী—দুয়ের মধ্যে আত্মিক কোনো ভেদ নেই। মহাপ্রয়াণের পূর্বে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "If there were another Vivekananda he would have understood what Vivekananda has done. And yet how many Vivekanandas shall be born in time." অর্থাৎ এ বিবেকানন্দ কী করে গেলেন আরেক বিবেকানন্দ থাকলে তা বুঝতে পারতেন। তবুও কালে কালে অনেক বিবেকানন্দ আসবেন। মোহিতলাল বিশ্বাস করতেন স্বামীজীর কালেই আর এক বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি সুভাষচন্দ্র। আর একবার ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে হিমালয়ে ভ্রমণ করতে গিয়ে কাশ্মীরের একটি ঘটনায় বিবেকানন্দ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তখন তাঁর আরাধ্য দেবী কালিকা তাঁকে ধ্যানে জানান, "বিধর্মীরা যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার বিগ্রহগুলোকে অপবিত্র করে তোর কি? তোর আস্পর্ধা কম নয়? তুই আমার রক্ষাকর্তা না আমিই সকলকে রক্ষা করি"—এই কথাগুলি নিবেদিতাকে বলে বিবেকানন্দ বলেন, 'আর নয়, আমি সব ত্যাগ করিয়াছি'—অর্থাৎ দেশমাতৃকাকে ইংরেজ-কবল এবং ইংরেজ-পীড়ন থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং মাতা গ্রহণ করেছেন। মোহিতলাল মজুমদারের ধারণা 'দেবী' সুভাষচন্দ্রকেই সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। নেতাজী ও স্বামীজীর নানা চিন্তা ও কর্মের সাদৃশ্য দেখিয়ে এই দুই ঘটনার উল্লেখ দ্বারা তিনি দুজনের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন।

আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে এতোখানি অগ্রসর হয়ে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি না। অতীত যুগের শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণই একালের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—একথা ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন। আর শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। এইরূপ সিদ্ধান্তও দুই লোকোত্তর পুরুষের বহু বিষয়ে সাদৃশ্যের জন্যে ভক্তি ও বিশ্বাসবশত গৃহীত হতে পারে। কিন্তু স্বামীজীই নেতাজী—এক সিদ্ধান্ত ঠিক অনুরূপ যুক্তি ও ভক্তি-বিশ্বাস-যুক্তের ফল নয়। স্বামীজীর যে ব্যক্তিত্ব, তাঁর যে মনীষা, তাঁর যে বৈদিক ঋষিসুলভ

অপরোক্ষানুভূতি সীমাহীন মানবপ্রেম ও বিচিত্রচারী অতুলনীয় প্রতিভা—তাঁর সঙ্গে অতুলনীয় ঠিক সম-স্তরের মানুষ দুর্লভ। নেতাজীর ব্যক্তিত্ব, সাহস ও মানবপ্রেম, দেশপ্রীতি ও সংগঠনী শক্তিও অসাধারণ এবং তাঁর মতো মহামানবের আবির্ভাব রাজনীতিক্ষেত্রে বিরল-দৃষ্ট—একথা স্বীকার করেও বলব স্বামীজীর ভাব-চিন্তার রসেই তাঁর চিন্তা পুষ্ট—গুরুর অসমাপ্ত সাধনাকে তিনি পূর্ণতা দান করেছেন—তিনি যথার্থই বিবেকানন্দের ভাবধারার একনিষ্ঠ উপাসক। আর কোনো রাজনীতিবিদ বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করে স্বকীয়তায় এতোখানি সফলতা লাভ করেন নি।

উল্লেখপঞ্জী

১. আত্মজীবনী: সুভাষচন্দ্র। ২. উধৃতিগুলি Vivekananda's Message থেকে গৃহীত। ৩. আত্মজীবনী: সুভাষচন্দ্র। ৪. স্বামীজীর Message থেকে। ৫. আত্মজীবনী: সুভাষচন্দ্র। ৬. স্বামীজীর মাদ্রাজে প্রদত্ত ভাষণ। ৭. আত্মজীবনীতে সংকলিত মাকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র। ৮. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ৯. বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮। ১০. বিবেকানন্দের পত্রাবলী, পৃঃ ৬৬৩। ১১. মেরি লুই বার্কের Swamiji Vivekananda in America—New Discoveries, pp 22-23. ১২. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৬০। ১৩. স্বামী বিবেকানন্দ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩। ১৪. সুভাষ রচনাবলী (১ম খণ্ড), পৃঃ ২৯৩-৯৫। ১৫. তরুণের স্বপ্ন। ১৬. মাদ্রাজে যুবকদের উদ্দেশ্যে ২৪টি বক্তৃতার অন্যতম। ১৭. স্বামি-শিষ্য সংবাদ. পৃঃ ১। ১৮. বাণী ও রচনা—নবম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪-৩৫। ১৯. হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলন, সভাপতির ভাষণ, ১৯২৯ ২১শে জুলাই। ২০. তরুণের স্বপ্ন পৃঃ ৮-১০। ২১. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১ম খণ্ড) ১৬৬-৬৭। ২২. বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩। ২৩. শিক্ষা—বিবেকানন্দ, পৃঃ ৪১। ২৪. The Present Position of Women. A Paper by Nivedita. ২৫. হুগলী জেলা ছাত্র-সম্মেলন: সভাপতির ভাষণ ১৯২৯, ২১শে জুলাই। ২৬. তদেব। ২৭. তদেব। ২৮. হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ, ১৯৩৮, ১৯শে ফেব্রুয়ারী। ২৯. তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ ৯৭। ৩০. হরিপুরা ভাষণ। ৩১. ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরী প্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত বিশ্ববিবেক গ্রন্থের 'আমার জীবনে বিবেকানন্দ' থেকে উধৃতিগুলি প্রয়োজনমতো গৃহীত। ৩২. জয়তু নেতাজী—মোহিতলাল মজুমদার।

দশম অধ্যায়

বিবেকানন্দ বিরোধিতার কথা

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের মহাজীবনী রচনায় বিবেকানন্দের জীবনের রাজকীয় মহিমার কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সহিত এ কথাও তিনি বলিয়াছেন যে কোথাও বিবেকানন্দকে দ্বিতীয় স্থলে কল্পনা করা যাইত না। যেখানে তিনি গিয়াছেন সেখানেই সর্বপ্রথম স্থানটি তাঁহার। বিবেকানন্দের মহাজীবনের আর একটি অতুলনীয় মহিমা তাঁহার জীবনীপাঠককে মুগ্ধ করে। সে মহিমার গুণে কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কিভাবে প্রথমে বিবেকানন্দের একান্ত বিরোধিতা করিয়াও শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন সেই বিস্ময়কর ইতিহাসের কিছু আভাস এই প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

মানুষের জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে যেখানে আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীর ও আচরণের ঐক্য রহিয়াছে—সেখানে মানুষে মানুষে সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। একই আদর্শে অনুরাগী ও একই কর্মপন্থায় বিশ্বাসী মানুষ যে পরস্পরকে সমর্থন করিবে ইহাই স্বাভাবিক। তেমনি যেখানে আদর্শের ক্ষেত্রে, দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এবং আচরণের ক্ষেত্রে, কেবল বিভিন্নতা নহে প্রতিকূলতা বর্তমান, সেখানে মানুষে মানুষে বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি নিতান্ত সাধারণ ঘটনা এবং সেই বিরোধীর সম্পর্ক বরাবর বিরোধিতার খাতেই প্রবাহিত হয়। কেবল বিবেকানন্দের ন্যায় আশ্চর্য মহিমান্বিত জীবনে আমরা দেখি যে এক কালের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণগত সকল বিরোধিতার প্রবল বাধাকে অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত কোন কোন উগ্র বিরোধী শ্রদ্ধানত হৃদয়ে স্বামীজীর চরণমূলে ভক্তির পুণ্য অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

বিবেকানন্দের জীবনের এই অপরূপ মহিমার দিকটি বিশেষ করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন চারজন সুপ্রসিদ্ধ প্রতিভাবান মনীষী। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে-ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী ও শ্রীযুক্ত ই. টি. ষ্টার্ডি। স্বামীজীর এই বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্যে তিনজন তাঁহার স্বদেশীয় এবং একজন শ্রীযুক্ত ষ্টার্ডি বিদেশীয়। তিনজন পুরুষ যেমন বিরোধিতার অস্ত্র পরিহার করিয়া শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইয়াছিলেন, একজন নারী, শ্রীমতী সরলা দেবীও তাহাই করিয়াছিলেন। এই বিরূপতা হইতে ভক্তিতে উপনীত হইবার বিবরণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করিতেছি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ পরিচিত প্রতিবেশী। মাণিকতলায় স্বামীজীর পিতৃগৃহের অদূরেই তিনি বাস করিতেন। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যেদিন বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীর মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরম মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিলেন, সেদিন খৃষ্টধর্ম প্রচারক ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন

Sophia নামক পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকায় তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে Who was Ramakrishna নামক প্রবন্ধে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে প্রচারের অভিযোগ করেন এবং এ কার্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি রামকৃষ্ণকে (মহাত্মা) বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিবার মূলে হিন্দুর পৌত্তলিক কুসংস্কার রহিয়াছে এই উক্তি করেন। (দ্রষ্টব্য : বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু ১ম খণ্ড পৃ ৩৪৬)।

ব্রহ্মবান্ধবের উক্তিতে কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি আছে। বিবেকানন্দ নিজে রামকৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে দেখিলেও সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার গুরুভাইদিগকে লেখা পত্রে এবং জুনাগড়ের দেওয়ান শ্রীহরিদাস বিহারী-দাস দেশাইকে লিখিত পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন যে রামকৃষ্ণ যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার ছিলেন একথা প্রচার করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি রামকৃষ্ণ জীবনের ত্যাগ, তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রেমের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার কথাই বলিতেন। যাহাই হউক বিবেকানন্দের ন্যায় ব্রহ্মবান্ধবও সত্যকে স্বয়ং উপলব্ধি না করিলে অপরের কথায় তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিবেকানন্দের ন্যায় অসীম সত্যানু-সন্ধিৎসা লইয়া তিনিও জীবনের পথে চলিয়াছিলেন। অবশেষে যেদিন আপনার সত্যোপলব্ধির মাধ্যমে তিনি রামকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন সেদিন তিনি 'জন্মোৎসব' প্রবন্ধে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন —"পুরাতন যুগের অন্তিম-কালে, নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হন।" এই সনাতন সত্যটি শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে কলিযুগের প্রারম্ভে আমাদের শুনাইয়াছিলেন—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি, যুগে যুগে"। আজ যিনি রামকৃষ্ণরূপী, তিনি সেই যুগ সম্ভাবনা।" (দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫০)।

বিবেকানন্দের বিরোধিতায় ব্রহ্মবান্ধব যে অংশ গ্রহণ করেন তাহার অন্যতম কারণ বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচার। খৃষ্টান ব্রহ্মবান্ধবের কাছে বেদান্ত কেবল মিথ্যা নয়, তাহা অধর্মের উৎস স্বরূপ। তাই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে Sophia পত্রিকায় তিনি বেদান্ত সম্পর্কে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করেন (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৩৯-৩৪০)। তিনি বিবেকানন্দের বেদান্তের হাত হইতে ভারতকে রক্ষার দায়িত্ব ক্যাথলিক প্রচারকদের উপর অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেও ব্রহ্মবান্ধব সকল পথ ও সকল মতকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে চাহিতেন। ফলে ধীরে ধীরে তিনি বেদান্তের মহাসত্যকে চিনিতে পারিলেন এবং অসঙ্কোচে বেদান্ত প্রচারকে নিজ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বিবেকানন্দের শক্তিতেই তিনি দর্শনের বক্তারূপে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়াছিলেন। তিনি স্বরাজ পত্রিকায় "বিবেকানন্দ কে?" শীর্ষক একটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—"দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইষ্টিশনে

পা দিলাম কে বলিল-কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে? কেন—তাঁহার তো অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন, তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও···বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত উদযাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে—বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে—বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইষ্টিশনে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম -বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগর পারে লইয়া যায় সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) এবং কামব্রীজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ···আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল, তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মত। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে? বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫১-৩৫২ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় —শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃঃ ৭২-৭৩)। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের সার্থক পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন —"দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।" (শেষোক্ত পুস্তক, পৃ ৭৪)।

বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক সময়ে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধ সমালোচনায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। যখন আমেরিকায় হিন্দুদর্শনের বিজয় পতাকা উড়াইয়া বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরিলেন এবং দেশবাসীর বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করিলেন তখন বঙ্গবাসী পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাঁচকড়ি বিবেকানন্দের বিরূপ সমালোচন করেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল যে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হইতে পারেন না। কারণ তিনি কায়স্থ এবং কায়স্থের সন্ন্যাসী হইবার কোন অধিকার নাই। বিবেকানন্দ সমুদ্র পারে গিয়াছেন। অতএব তাঁহার জাতি নাশ ঘটিয়াছে। তিনি বিদেশী ম্লেচ্ছদের নিকট হইতে আহার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ধর্ম নাই। পাঁচকড়ি তখন শশধর তর্কচূড়ামণির ছুঁৎমার্গ ধর্মে বিশ্বাসী। সে কারণে আচার বিচারে ছুঁৎমার্গ পন্থী নয় বলিয়া বিবেকানন্দ সনাতনী নহেন এবং সনাতনী না হইলে কেহ হিন্দু হইতে পারে না। রঘুনন্দনের স্মৃতির মানদণ্ডে পাঁচকড়ি বিবেকানন্দের বিচার

করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচকড়ি এত নিকট হইতে বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলেন যে বিবেকানন্দের অসামান্য ও তুলনাহীন প্রতিভাকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া তাঁহার অন্য কোন উপায় ছিল না। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর অপরিসীম মহিমা আপন শক্তিতেই পাঁচকড়ির চিন্তাধারায় গভীর পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় তাই পাঁচকড়ি লিখিলেন—"ভবদেব এবং রঘুনন্দনের মাপকাঠিতে ইহাদের ধর্ম কর্মকে মাপিতে চেষ্টা করিলে কুলাইবে না। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবসমাজের শাসন রঘুনন্দন করিতে পারেন নাই সেজন্য হরিভক্তি বিলাসের রচনা প্রয়োজন হইয়াছিল। তেমনি রামকৃষ্ণের শিষ্যশাখার কর্মের পরিমাণ রঘুনন্দনী গজে হইবে না।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯১-১৯২)

পাঁচকড়ি তাঁহার শ্রদ্ধাবনত প্রণাম বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছিলেন এই সাহিত্য পত্রিকাতেই—"একবার তাহাকে দেখিয়া লও। হিমালয়ের সানুদেশে বসিলে হিমালয়ের উদার মহিমা বুঝা যায় না…কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ রূপ দেখিতে হইলে দার্জিলিঙের চূড়ায় উঠিয়া দেখিতে হয়। এই হিমবান অতিমানুষের পরিমাণ ও মহিমা বুঝিতে হইলে বেলুড়ে যাইয়া ভাবের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লও।…সে ধর্ম শিখাইয়াছে, শ্রদ্ধা শিখাইয়াছে, কর্ম শিখাইয়াছে, ত্যাগ শিখাইয়াছে, বাঙালীকে আবার মানুষ গড়িবার পথ দেখাইয়াছে—সেই নিজের মানুষকে মমতার বাষ্পাকুল নয়নে, ভক্তির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লও। এই সন্ধিক্ষণে, জগদ্ব্যাপী বিরাট পরিবর্তনের মহা মুহূর্তে একবার যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের মানুষকে দেখিয়া লও।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৬)

শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর বিবেকানন্দের প্রতি বিরাগের কারণ এই ছিল যে স্বামীজী ইউরোপ, আমেরিকায় গৌরবময় অভিযানের পর দেশে ফিরিয়া অল্পকাল স্বদেশে বাস করেন, কিন্তু এর মধ্যেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহার বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজন হয়। তাহার অল্পকাল পরেই বিদেশে তাঁহার আরব্ধ কার্যকে পরিণতি দানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আবার বিদেশে যাত্রা করিতে হয়। ভারতী-সম্পাদিকা সরলাদেবী তখন স্বামীজীর অল্পকাল স্বদেশে অবস্থিতি প্রসঙ্গে তাঁহার উপর দেশ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ইঙ্গিত করিয়া একটি সমালোচনা লেখেন। স্বামীজী তাহার উত্তরে ভারতী-সম্পাদিকাকে পত্র লিখিয়া এই কথা বুঝাইয়া দেন যে তাঁহার বিদেশ-যাত্রার লক্ষ্য দেশের জন্য কল্যাণ-কর্ম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সাহায্য সংগ্রহ করা। সরলাদেবী তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন যে নিবেদিতা যেমন ভারতে স্বামীজীর কর্মযজ্ঞে আহুতি দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন সরলাদেবীও সেইভাবে ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার কর্মযজ্ঞে সহায়তা করিবেন। অভিভাবকগণের বাধায় তাহা সরলাদেবীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহার পর স্বামীজীর তিরোধান ঘটিলে সরলাদেবী স্বামীজীর প্রতি প্রথাগত শ্রদ্ধা

নিবেদন করিয়া ভারতীর পৃষ্ঠায় বেলুড় মঠ ও স্বামীজীর গুরু ভ্রাতাদের উপর বিরূপ করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের অমোঘ প্রভাব সরলাদেবীকে আমূল পরিবর্তিত করিয়াছিল। তাঁহার সে অভাবনীয় পরিবর্তনের কথা তাঁহার নিজের রচনা হইতে উধৃত করিতেছি—"বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করলেন। দেশ শোক সন্তপ্ত হল, কিন্তু দেশের ভিতর তাঁর কাজ চলতে লাগল। আমারও ভিতর বিবেকানন্দের কাজ চলতে লাগল। যেমন একটা ছোট অশ্বত্থ বীচি দেওয়ালের একটা ফাটলে উড়ে পড়ে ক্রমে ক্রমে সে ফাটলকে ঠেলে ঠেলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে একদিন ডালপালা বের করে গাছ হয়ে দেখা দেয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে চলার আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গ কাটতে থাকল…তারপর এলেন এক dynamic personality [গতিময় ব্যক্তিত্ব]—স্বামী বিবেকানন্দ। Dynamic সেই—যার ভিতরে বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড ভাঙ্গা গড়ার শক্তি। সেই বারুদের আগুন থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ আমার ভিতর এসে পড়েছিল—আমায় ভেঙে গড়েছিল।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, পৃঃ ২৪৩-২৪৪, ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীযুক্ত ই. টি. ষ্টার্ডির বিবেকানন্দ বিরোধিতা আরও তীব্র ছিল। তিনি স্বামীজীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে প্রবাস জীবনে স্বামীজী তাঁহার গৃহে অনেক দিন ছিলেন। নারদ-ভক্তিসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে তিনি স্বামীজীর অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সময়ে তিনি স্বামীজীর বিরুদ্ধে বিলাসিতার অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। স্বামীজীর সিগার খাওয়া তাঁহার নিকট গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হইল। স্বামীজী পত্রযোগে ষ্টার্ডিকে জানাইয়া দিলেন যে কতদিন স্বামীজী ষ্টার্ডির গৃহে বিনা প্রতিবাদে অর্ধাহারে ও কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিন যাপন করিয়াছিলেন। ষ্টার্ডি সে বিষয়ে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি স্বামীজীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বেলুড় মঠে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইলেও তিনি তাহার কোন উত্তর দিলেন না এবং আমন্ত্রণ গ্রহণও করিলেন না।

কিন্তু বিবেকানন্দের প্রভাব কি অলৌকিক ছিল দীর্ঘকাল পরে ষ্টার্ডির আচরণ তাহা প্রমাণ করিল। স্বামীজী দেহ রক্ষা করিবার পর ষ্টার্ডি স্বামীজী সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর পরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে একটি বিবেকানন্দ স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হইতেছিল ষ্টার্ডি তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এই সভার উদ্যোক্তাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রটি স্বামীজী-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত Reminiscences of Swami Vivekananda গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে উধৃত হইয়াছে। এই আশ্চর্যজনক পত্রে ষ্টার্ডি একদা যাঁহাকে বিলাসী বলিয়া বর্জন করিয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতেছেন —"…In fact he had a magnetic personality. associated with great tranquility. Whether he was walking in the street or standing

in a room, there was always the same dignity. And I found that all classes of educated persons, that he was brought in contact with, looked up to and admired the innate nobility that was in the man. One felt at all times that he was, to use a modern expression, 'conscious of the presenee of God' I will close this by remarking that, if we were enlightened we should see Deity in every manifestation, nevertheless, it is a great boon when we can percieve it as patent in noble and holy men. One of such was the Swami Vivekananda."—(Reminiscences of Swami Vivekananda, pp 303-304)।

যাঁহার বিরুদ্ধে ষ্টার্ডি এককালে চরম বিরূপতা দেখাইয়াছিলেন, যাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন, যাঁহার পত্রের উত্তর দিবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই তাঁহার তিরোধানের ৩৫ বৎসর পর ষ্টার্ডি স্বেচ্ছায় এই শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য তাঁহার উদ্দেশে স্মৃতি সভায় প্রেরণ করিতেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহার মত পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ, উপরোধ কিছুরই প্রয়োজন হয় নাই।

ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সরলাদেবী অথবা ই. টি. ষ্টার্ডি—কাহারও মত পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ বাদানুবাদ, যুক্তি, তর্ক বা কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই। স্বামীজী তাঁহার মহৎ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার মহতী বাণী বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত মনীষীগণ তাঁহারই অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছেন। বিরোধের সমুদ্যত অস্ত্র ত্যাগ করিয়া পূজার অঞ্জলি গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্বামীজীর চরণে নিবেদন করিয়াছেন। ইহাই স্বামীজীর জীবনের তুলনা-হীন মহিমা।

অপমানিত (?) বিবেকানন্দ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

(এক)

১৮৯৩ সালের শেষ ভাগে সহায়হীন সম্বলহীন এক তরুণ সন্ন্যাসী শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদকে পাথেয় করে নতুন পৃথিবীর সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন। অত্যুজ্জ্বল চোখে ছিল তাঁর নতুন ভারতের স্বপ্ন, অন্তরে ছিল তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, জীবন জুড়ে ছিল তাঁর অপার সংগ্রামের সংকল্প এবং অভ্রান্ত লক্ষ্য ছিল তাঁর আর্ত-শোষিত মানুষের সামগ্রিক মুক্তি।

তারপর ঠিক চার বছর পরে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সেই যুবা-সন্ন্যাসী যখন ভারতের মাটিতে ফিরে এলেন, তখন তিনি নতুন মানুষ, তখন তিনি বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। পরাধীন ভারতের সুপ্ত ও ম্রিয়মান আত্মা তাঁর দিকে তাকিয়ে সেই প্রথম আত্মবিশ্বাসে জাগ্রত হয়ে চোখ মেলে তাকাল। স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভারতের আকাশ-বাতাস হয়ে উঠল উত্তাল। তিনি যেখানেই, কাতারে কাতারে মানুষ সেখানেই। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল তাঁর চলার পথ, মালায় মালায় ঢেকে গেল তাঁর জয়রথ, সম্মানের সহস্র শিরোপায় তিনি তখন ভারতাত্মার জীবন্ত প্রতীক। পরাধীন দেশের যুবশক্তি তাঁর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করল ভাবীকালের মহান ভারতকে।

কিন্তু শুধুই কি ছিল ফুল, সঙ্গে ফুলের কাঁটা ছিল না, সবটাই কি ছিল মালা, সঙ্গে অসম্মানের তীব্র জ্বালাও কি কিছু ছিল না এবং সবটুকুই কি ছিল উৎসাহের প্লাবন, সঙ্গে কুৎসার আবর্জনা কি কিছু ছিল না ? ভারতের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম সমাজপতি এবং খৃষ্টান পাদ্রিদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে পরশ্রীকাতরতা এবং গোঁড়ামির গ্লানি কি সেদিন অঝোর ধারায় ঝরে পড়ে নি ?

কিন্তু সব থেকে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ! হ্যাঁ, সেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির, যেখানে তিনি কত রাত্রি-দিন কাটিয়েছেন তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আর সেই প্রাণের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের সাধনায়।

অথচ এই মন্দিরে এসে সেই বিশ্ববন্দিত সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন অপমানিত।

অপমানিত ? স্বামী বিবেকানন্দকে কি অপমান করা যায় ? তিনি কি জাগতিক মান-অপমানের সংকীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ ? তিনি যে এ সবের বহু ঊর্ধ্বে।

তবুও তাঁকে অপমান করে ভারত আত্মাকে অপমানিত করতে কুণ্ঠিত হননি সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। তাঁর অপরাধ ? তাঁর মস্ত বড় অপরাধ, তিনি কায়স্থ সন্তান হয়েও সন্ন্যাসী হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সন্ন্যাস দিয়েছেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যুক্ত হওয়ার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণের। তাঁর দ্বিতীয় অপরাধ, তিনি বিশ্ববিজয় করে ফিরে এসেছেন। এই বঙ্গে তথা ভারতে। সেই কালে কত বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মনায়ক, সুপণ্ডিত, ব্রাহ্মনায়ক (প্রতাপচন্দ্র মজুমদারসহ) কত খ্যাতিমান থিয়োজফিস্ট ছিলেন, তাঁরা যা পারেন নি, তা সিমলার নরেন্দ্রনাথ দত্ত পারলেন কি ভাবে? এই পারাটাই একটা 'অপরাধ'। তাঁর তৃতীয় অপরাধ তিনি কালাপানি পার হয়ে বিদেশে গেছেন এবং বিদেশিদের সঙ্গে যা খুশি তাই খেয়েছেন। ফলে তিনি আর আদৌ হিন্দু আছেন কিনা তা নিয়েই দেখা দিল প্রশ্ন।

আর সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মন্দির তাঁর কাছে হল নিষিদ্ধ স্থান। প্রথমবারেই নিষিদ্ধ হয়নি, ধাপে ধাপে হয়েছে। তাঁকে সেদিন অপমান করার জন্যই অবশেষে তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আর তিনি? সেই সর্বংসহা ধরণীর মত অচল অটল নীলকণ্ঠ মানুষটি এক চিঠিতে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) লিখছেন, 'আমার বন্ধুদের বলবে, আমার নিন্দুকদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর —একদম চুপ থাকা। তাদের ঢিল খেয়ে যদি পাটকেল মারতে চাই, তাহলে তো তাদের পর্যায়ে নেমে এলুম। বন্ধুদের বলবে, সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে—আমার জন্য কাউকে অন্যের সঙ্গে লড়তে হবে না।

(দুই)

সেদিন কালীপুজোর রাত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন শ্রদ্ধাভাজন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়েছিলাম। মন্দিরের বর্তমান অছিপরিষদের পক্ষ থেকে কুশল চৌধুরী প্রমুখ তরুণদের কয়েকজন সসম্মানে এবং সাদরে আমাদের বরণ করে নিয়ে গেলেন মন্দিরের ভিতরে—মা ভবতারিণীর পদপ্রান্তে। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে এমন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যিনি বেশ কয়েকবার বিদেশে গেছেন এবং কেউ কেউ ছিলেন, যার পূর্বাশ্রমে ব্রাহ্মণ শরীর নন। কিন্তু সেদিন দেখলাম মুক্ত চিত্তের বর্তমান ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিদের প্রতিনিধিরা এসব নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেন নি। বরং কালীপুজোর এই মহোৎসবে রামকৃষ্ণ মিশনের পূজনীয় সন্ন্যাসীরা এসেছেন বলেই তাঁরা যেন তৃপ্ত ও অনুপ্রাণিত।

সেদিনই সহস্র সহস্র মানুষের সমাগমে মুখরিত ওই মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আপন মনে ভাবছিলাম: অথচ এই মন্দিরে সেই সময় ভারতের সব থেকে খ্যাতিমান ধর্মনায়ক এবং হিন্দু ধর্মের সব থেকে খ্যাতিমান ধর্মনায়ক এবং হিন্দু ধর্মের সব থেকে বড় চিন্তানায়ককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে? যিনি বিশ্বময় হিন্দুধর্মের গৌরব ও অনন্যতা প্রতিষ্ঠা করে ফিরে এলেন, তাকেই স্বদেশে 'হিন্দু' বলে স্বীকার করা হল না।

বিশ্ববিজয় করার পর ভারতে ফিরে স্বামীজী দক্ষিণ ভারতের জনচিত্তে প্রচণ্ড উন্মাদনার সৃষ্টি করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন ১৮৯৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি। তারপর ২৮শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে আয়োজিত হয়েছিল সম্বর্ধনা সভা। এই সম্বর্ধনা সভার পর ৪ঠা মার্চ স্টার থিয়েটারে আয়োজিত হয়েছিল একটি বক্তৃতার অনুষ্ঠান। বিষয় ছিল 'বেদান্ত'।

ঠিক সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের বিপুল উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশেষ করে স্বামীজীর বিশ্ব-বিজয় এবং তার প্রত্যাবর্তনে ভারতে নবজাগরণের সূচনা —এই দুটি ঘটনা সেই উৎসবে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫২ এই ঘটনার কথা স্মরণ করে লিখেছেনঃ মার্চ মাসের প্রথম দিকে (১৮৯৭) যখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব হয়. তখন বিদেশ-প্রত্যাগত ও স্লেচ্ছাচারী স্বামী বিবেকানন্দ কালী মন্দিরে শ্রী শ্রী জগন্মাতাকে ও রাধাকান্ত মন্দিরে রাধাকৃষ্ণকে ভূমিষ্ট প্রণাম করেন। ওইদিন স্বামীজীর সহিত দুইটি ইংরেজ মহিলাও মন্দিরোদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে রক্ষণশীল দলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল।

এই উৎসবের একটা বিবরণ আমরা স্বামীজীর শিষ্য সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখাতেও পাই। 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ স্বামীজী কালী মন্দিরে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন, সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হয়েছিল। পরে রাধাকান্তকে প্রণাম করে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তারপর গিয়েছিলেন পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শনে। সেখানে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে মিলন…। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাড়ির সর্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল…। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ…বলতে লাগলেন, 'এমন ভিড় উৎসবে আর কখনও হয় নি। যেন কলকাতাটা ভেঙে এসেছিল।' এই উৎসবের পরই স্বামীজী দার্জিলিং চলে যান।

কিন্তু তারপরই কি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছিলেন? আর সেই জালে ধরা পড়েছিলেন রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস।

একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণি এবং তাঁর জামাতা মথুরামোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবতা-জ্ঞানে সেবা করতেন এবং তাঁর জন্য অঢেল অর্থব্যয় করতেও সদাই প্রস্তুত ছিলেন। তবুও কিন্তু মন্দিরের হিসেবি খাতায় শ্রী রামকৃষ্ণ 'ছোট ভট্‌চাজ' পদেই ছিলেন উল্লিখিত এবং তার মাসিক বেতন ছিল পাঁচ টাকা। সম্ভবত ত্রৈলোক্যনাথ এই শেষের কথাটি কোনদিনই বিস্মৃত হন নি। তাই একবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয়ের ক্রিয়াকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে মন্দির থেকে বিদায় করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অবশ্য সেটা আর

বাস্তবায়িত হয় নি। তবে শেষ পর্যন্ত 'পরোক্ষ' অপমানের কষাঘাতে জর্জরিত করে বিদায় করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে।

(তিন)

এখন সেদিকেই ফিরে তাকাতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ওই জন্মোৎসবের ঠিক পরেই ২১ মার্চ ১৮৯৭ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিশেষ ভক্ত ও শিষ্য রাজস্থানের খেতড়ি রাজের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর আগে তিনি গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে কি সেদিন মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি? অথবা ঢুকতে দিয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা হয়েছিল?

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ২১শে মার্চ স্বামীজির সঙ্গে যাঁরা সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন টি জে হ্যারিসন নামে এক সিংহলবাসী ইউরোপীয় বৌদ্ধ। তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় (২৮ মার্চ, ১৮৯৭) একটি চিঠি লিখে ওই ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। কারণ তিনি শুনেছিলেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত রক্ষণশীল হিন্দুদের পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' নাকি লিখেছে যে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষ অসদ্ব্যবহার করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরূপে তিনি জানান, এই খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

তারপরই 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সূত্রে ৩০ মার্চ মিররে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পত্রটি প্রকাশিত হয়। ওই পত্রে তিনি লেখেন: স্বামীজি ত্রৈলোক্যনাথের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাবেন, ত্রৈলোক্যনাথ অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন, অতিথিরা উপস্থিত হলে তিনি অসুস্থতার জন্য সাক্ষাতে আপ্যায়ন করতে পারেন নি, তবে মন্দিরের খাজাঞ্চি ভোলানাথকে দর্শনীয় স্থান ও বস্তুগুলি দেখাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খাজাঞ্চি ভোলানাথ তা করিয়েছিলেন—স্বামীজি কালীঘরে গিয়ে খেতড়ির রাজার সঙ্গে খুব নিকট থেকে প্রতিমাদর্শন ও প্রণামাদি করেন।

তারপরই ২রা এপ্রিল ইণ্ডিয়ান মিররে আরেকটি পত্র প্রকাশিত হল। এটিও জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র। তিনি লিখেছেন: গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বঙ্গবাসী স্বামী বিবেকানন্দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।···বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত বিবৃতি বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ ছাড়া কিছু নয়, যিনি তাঁর ভদ্রব্যবহার ও অমায়িক আচরণের জন্য কলকাতার সম্ভ্রান্তমহলে পরিচিত।

কিন্তু যাঁরা 'বঙ্গবাসী'র খবরকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ত্রৈলোক্যনাথকে অকাতরে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্য একটা ঘটনার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। ত্রৈলোক্যনাথ কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত আসতে পেরেছিলেন, কিন্তু সেখানে এসেও একবার স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না কেন?

তিনি যে ইচ্ছাকৃত ভাবেই সাক্ষাৎ করেন নি এবং স্বামীজীকে অপমান করবেন বলেই করেছেন—সেটা ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে দিলেন। অর্থাৎ, যাঁরা তাঁর হয়ে আগ বাড়িয়ে ওকালতি করছিলেন, তিনিই তাঁদের সকলকেই পথে বসিয়ে দিলেন।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় (১৫ই চৈত্র) মন্দিরের খাজাঞ্চি ভোলানাথ যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতেই নাকি জানিয়েছিলেন স্বামীজী প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে মন্দির প্রাঙ্গন থেকে বিতাড়িত করা হয় (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)

এরপরই ভোলানাথের প্রভু ত্রৈলোক্যনাথ বঙ্গবাসীতে (এর অনুবাদ ১৮৯৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল মিররে প্রকাশিত হয়) একটি বড় মাপের চিঠি লিখে বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেনঃ মন্দির থেকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সদলবলে স্বামী বিবেকানন্দকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এটা কি তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চাপে পড়েই করেছিলেন? সেইজন্যই কি ভোলানাথকে দিয়ে অধিকতর কঠোর ভাষা-প্রয়োগ করিয়েছিলেন? তা যদি হয়ও, তবু এটাকে কি মেনে নেওয়া যায়? কারণ, তিনি যাকে অপমানিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার নাম স্বামী বিবেকানন্দ।

চিঠিটির বক্তব্য এরকমঃ

'গত রবিবার ৯ই চৈত্র, বেলা ১১ টা নাগাদ স্বামী বিবেকানন্দের মঠের জনৈক শিষ্য ও জনৈক ইউরোপিয়ান আমার ৭১ নম্বর ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের বাসভবনে আসেন। তারা আমার দারোয়ানকে জানান, তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। দারোয়ান তাদের জানান, আগে থেকে ব্যবস্থা করে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়। তারপর সে এসে আমাকে তাঁদের কথা বলেন। আমি দেখা করতে অস্বীকার করি। সে কথা শুনে দারোয়ানের মারফৎ তারা জানান, জয়পুরের মহারাজা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে আসবেন। সুতরাং আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে ভাল হয়। জয়পুরের মহারাজা মন্দির দর্শনে আসবেন, এ খবরে আমি একটু সংশয় বোধ করি। কারণ, আমি ভাবলাম, যদি মহারাজার আসার কথা থাকে, তাহলে রেসিডেন্ট অবশ্যই আমাকে সে বিষয়ে লিখতেন। রাজাকে দেখতে আমার পুত্রগণ উৎসুক হওয়ায় তাদের অনুরোধে বেলা তিনটা নাগাদ আমি মন্দিরে উপস্থিত হই। মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ব্যাপারের মোটামুটি সঠিক বিবরণ বাবু ভোলানাথ মুখার্জি (খাজাঞ্চি) আপনার পত্রিকার ১৫ চৈত্রের সংখ্যায় দিয়েছেন। বাবু ভোলানাথ মুখার্জি ঠিকই বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর সঙ্গিগণ পরোক্ষভাবে মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য নয়।'

বিতাড়নের 'পরোক্ষ' ঘটনার কথা বলেই ত্রৈলোক্যনাথ ক্ষান্ত হন নি, তিনি আরেক

ধাপ এগিয়ে গিয়ে তাঁর হয়ে সার্টিফিকেটদাতাদের একেবারে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। ওই চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন ঃ

'স্বামীজী ও রাজাকে অভ্যর্থনা করার জন্য আমি কাউকেই বলিনি এবং আমি তাঁদের অভ্যর্থনা জানাই নি। যে ব্যক্তি বিদেশে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হিন্দু বলতে পারেন, এমন কারও সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকা উচিত বলে আমি মনে করিনি। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর সঙ্গিগণ যখন আমার মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন বাবু ভোলারাম মুখার্জি তাঁদের জানিয়ে দেন যে, আমার সঙ্গে তাদের দেখা হবে না। এই পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির ত্যাগ করেন। প্রতিমার পুনরাভিষেকের যে সংবাদ আপনারা গ্রহণ করেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।'

অর্থাৎ, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ত্রৈলোক্যনাথকে 'অসুস্থ' বানিয়ে গোটা ব্যাপারটার মুখ রক্ষার জন্য যে প্রয়াস চালান, স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথই একটি পত্রাঘাতে সেটাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ ক'রে দিলেন। সেইসঙ্গে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সজ্ঞানে এমন দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরোক্ষভাবে বিতাড়নের সামিল। এবং তাঁর প্রবেশে মন্দির অপবিত্র হয়েছে বলেই 'প্রতিমার পুনরাভিষেকে'র আয়োজন দেখা দিয়েছিল।

তাছাড়া এই ঘটনার মাধ্যমে তৎকালীন জমিদারদের হীনমন্যতার একটা নগ্নচিত্রও উদ্ঘাটিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ শুনেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে জয়পুরের মহারাজা আসছেন, তিনি সম্মানে ও প্রতাপে তাঁর তুলনায় অনেক বড়। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং সম্পর্ক গড়ে তোলা রীতিমত গৌরবজনক। তাই মন্দিরে আসতে তাঁর পুত্ররা উৎসাহী হয়ে উঠেছিল এবং তিনিও ঠিক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহারাজাকে স্বাগত জানাতে মন্দিরে উপস্থিত হন।

অর্থাৎ স্বামীজীর সঙ্গে যদি সত্যি জয়পুরের মহারাজাই থাকতেন, তাহলে ত্রৈলোক্যনাথের প্রখর ধর্মবুদ্ধি নিশ্চিতভাবেই স্বীয় মর্যাদা বৃদ্ধির বাস্তব বুদ্ধির কাছে মাথানত করত। কিন্তু মন্দিরে এসে যখন শুনলেন, জয়পুরের মহারাজ নয়, তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর রাজত্বের অধিকারী খেতড়ির রাজা স্বামীজীর সঙ্গে এসেছেন, তখনই তাঁর এবং তাঁর পুত্রদের যাবতীয় উৎসাহ এক ফুৎকারে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে উঠলেন 'গোঁড়া হিন্দু'।

(চার)

এই ঘটনায় স্বামীজী কি কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন? লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি যখন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে খেতড়ির রাজাকে নিয়ে গেলেন, তখন সরাসরি তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারোই ছিল না, যদিও তাঁর প্রবেশে হয়ত আপত্তি ছিল। কারণ তাঁর হিমালয় সদৃশ ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা সে যুগে অন্যকারোই ছিল না। তাই তিনি যে মন্দিরে ঢুকে মা ভবতারিণীকেও প্রণাম

করেছিলেন, তার প্রমাণ হচ্ছে দেব বিগ্রহের পুনরাভিষেকের ঘটনা। অর্থাৎ, তাঁর গতি সেদিনও কেউ রুদ্ধ করতে পারে নি ; যদিও তাঁকে পরোক্ষভাবে অপমান করে বিজাতীয় তৃপ্তিলাভ করতে হয়ত চেয়েছিলেন অনেকেই।

এই ঘটনার কথা তিনি ১৮৯৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর স্টার্ডিকে লেখা এক চিঠিতেও উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, 'ভারতে অনেকে···ইউরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইউরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

পারিবারিক দেবালয় বলতে নিশ্চিতভাবেই তিনি রানী রাসমণির পারিবারিক দেবালয় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকেই বুঝিয়েছেন।'

তবে এখানে আরেকটি ঘটনার দিকেও আমরা ফিরে তাকাতে পারি। রানী রাসমণির কোন পুত্র সন্তান ছিল না, ছিল চার মেয়ে। তিন জামাই। এদের মধ্যে মথুরবাবুর নাম যেমন সবিশেষ পরিচিত তেমনি ত্রৈলোক্যনাথও পিতার সুবাদে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ—সঙ্গগুণে পরিচিতি লাভ করেন। অন্য দুই জামাতা বা তাদের সন্তানগণ তেমনভাবে জনসমক্ষে হয়ত পরিচিতি লাভ করেন নি, কিন্তু তাঁরা যে সকলেই ত্রৈলোক্যনাথের মত সমর্থন করতেন, তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা প্রকাশ্যেই ভিন্নমত জানিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন নি।

স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে ত্রৈলোক্যনাথ যেভাবে 'পরোক্ষ' পদ্ধতিতে বিতাড়ন করেছিলেন, সেটা অন্ততপক্ষে অপর একজন শরিক অনুমোদন করেন নি, আমরা তার প্রমাণ পাই।

'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় ১৮৯৭ সালের ১২ই এপ্রিল চণ্ডীচরণ চৌধুরীর একটি পত্র প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন মন্দির সম্পত্তির অন্যতম শরিক এবং তিনি থাকতেন ১৮/৪ জানবাজার স্ট্রিটে।

চন্ডীচরণ চৌধুরীর ইংরেজি চিঠিটির বাংলা তর্জমা করলে এরকমই দাঁড়ায়ঃ ৭১ নম্বর ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের বাসিন্দা বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের যে চিঠিটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত পত্রলেখক একাধিকবার দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও উদ্যানের মালিক বলে নিজেকে জাহির করেছেন। কিন্তু ওই মন্দির ও উদ্যানের মালিকানা স্বত্ব তাঁর যতখানি, আমারও ততখানি এবং প্রয়াত রানী রাসমণির যে কোন উত্তরাধিকারীরও সমপরিমাণ। এই প্রসঙ্গে আমি একথা স্পষ্ট করেই বলতে পারি, মন্দির পরিচালনার দায়িত্বটা যদি আমাদের পরিবারের অন্য যে কোন শরিকের হাতে থাকত, তাহলে সাম্প্রতিক কেলেংকারি কিছুতেই ঘটত না।

অর্থাৎ চণ্ডীচরণ চৌধুরীও ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের আচরণে মর্মাহত হয়েছেন, সেটা দুটি কারণে। প্রথমত, ত্রৈলোক্যনাথ নিজেকেই শুধু মন্দিরের স্বত্বাধিকারী বলে দাবি করেছেন, অন্যান্য শরিকদের কথা উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয়ত, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের

পালা চলাকালীন স্বামী বিবেকানন্দকে যেভাবে অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেই চেষ্টার কথা যেভাবে ফলাও করে কাগজে ছাপা হয়েছে, সেটা অন্য শরিকরা নীতিবোধেই অনুমোদন করতে পারেন নি।

স্বামী বিবেকানন্দকে এভাবে অপমানিত করার উদ্যোগ ঘটিত খবরটা যেমন আর গোপন থাকে নি, তেমনি সেটা থাকেনি কলকাতাতেও সীমাবদ্ধ। মাদ্রাজের সাহেবি পত্রিকা 'মাদ্রাজ মেল' ১৮৯৭ সালের ১৫ই মে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে বিতাড়ন করাটা গোঁড়া হিন্দুদের কাছে একমাত্র পথ ছিল। কারণ, সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে তারা সদাই সরব।

অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এবং তাঁকে জাতিচ্যুত করা হয়েছে—এই সংবাদে এতকালের ম্রিয়মান খৃষ্টান পাদ্রিরা রীতিমত উল্লসিত হয়ে পড়লেন। তাঁদেরই মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ইভানজেলিক্যাল রিভিউ' পত্রিকার এপ্রিল (১৮৯৭) সংখ্যায় ঘটনাটিকে ফলাও করে লেখা হয়। সেই সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার জয়ধ্বনি করে বলা হয়, 'এটাই সবথেকে বেশি পঠিত কলকাতার হিন্দু পত্রিকা'। বলা হয় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার ২৭শে মার্চ সংখ্যায় লেখা হয়েছে, 'স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে। অথচ এই মন্দিরেই পূজারী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরু পরমহংসদেব।…সেইসঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করেছেন, স্বামীজী আর কোনদিনই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না।'

শুধু এদেশেই নয়, এই খবর সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল বিদেশেও এবং ডাঃ ব্যায়োজের মত কিছুকিছু মানুষ স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকা ও ইউরোপের চোখে হেয় করার উদ্দেশ্যে এই খবরকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে থাকে। মজা হল, তারাও স্বামীজীকে 'শূদ্র' আখ্যা দিতে কসুর করেননি।

মজার কথা হচ্ছে এই যে, নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক জনৈক 'শূদ্র'র সন্ন্যাসে অধিকার নেই, এমন তত্ত্ব প্রচার করতে যারা গলা বাড়িয়ে আসরে নেমেছিলেন, তারা সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ছিলেন অনেক তথাকথিত শূদ্র-বংশগত মানুষও। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কায়স্থ কুলোদ্ভব 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক যোগেন্দ্র নাথ বসু, প্রমদাদাস মিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস প্রমুখ।

তাঁরা শুধু একবারই স্বামী বিবেকানন্দকে 'পরোক্ষভাবে' দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বিতাড়ন করে ক্ষান্ত হননি, 'জাত-পাত-কুল' রক্ষার তাগিদে তাঁরা স্বামীজীর মুখের উপর স্থায়ীভাবে 'প্রবেশ নিষেধ' বোর্ডটি টাঙিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তারা সফলও হলেন।

আধুনিক ভারতের শংকরাচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হল—এটাই ইতিহাস।

স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে (দ্বিতীয় ভাগ, ৩৬০)

লিখেছেন ঃ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবকালে স্বামীজীকে সত্যসত্যই ওই মন্দিরে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। উৎসবের পূর্বেই বিশ্বাসদের (ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস) এই সিদ্ধান্ত জেনে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর স্বামীজী লিখেছিলেন, 'এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব, কারণ রানী রাসমণির (বাগানের) মালিক বিলাত ফেরত বলে আমাকে উদ্যানে যেতে দেবে না।'

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এর চাইতে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক ঘটনা আর কি হতে পারে? এতবড় অপমানে বিক্ষত তিনি নীলকণ্ঠের মতই স্বীয় জীবনে ধারণ করেছেন, প্রত্যাখানে অগ্নি জ্বালায় রুদ্রমূর্তিতে প্রকাশিত হন নি। তাঁরই সাধের জন্মভূমি বঙ্গদেশে, তাঁরই গুরুদেবের সাধনপীঠে এবং তাঁরই জীবনগঠনের লীলাক্ষেত্রে এমন ঘটনাও যে ঘটতে পারে, তা কি তিনি স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করেছিলেন?

সবথেকে দুঃখের কথা, যে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে, যে মন্দির থেকে নবজাগরণের বার্তা প্রথম সঞ্চারিত হয়েছিল ম্রিয়মান জনজীবনে এবং যে মন্দির থেকেই জাত-গোত্রের বেড়া ভেঙে এক নতুন সমাজ বিপ্লবের সূচনা করা হয়েছিল, সেই মন্দিরের এক বিশেষ শরিক স্বামী বিবেকানন্দকে অপমান করে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন আত্মতৃপ্তিতে।

এই যখন একদিকের কালিমালিপ্ত ছবি, অন্যদিকে তখন একটি উজ্জ্বল ছবিও যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। কলকাতায় হচ্ছে মহাক্ষেত্র কালীঘাট। চিরকালই গোঁড়ামি ও সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই তীর্থ চিহ্নিত। অথচ এই কালীঘাট মন্দিরের পরিচালকরা সেদিন কি পরম উদারতায় দুহাত বাড়িয়ে স-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, সেটা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

"বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭) এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলা হয়েছে; 'দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তাঁর প্রবেশ নিষেধ কোন 'জাতীয়' (ন্যাশনাল) ব্যাপার ছিল না। সবচেয়ে রক্ষণশীল দক্ষিণ ভারত তার মন্দিরের দরজা বিবেকানন্দের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। সারা ভারতের বিরাটসংখ্যক স্বধর্মনিষ্ঠ মানুষের দ্বারা তিনি 'ধর্মোদ্ধারক' রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আর বাংলাদেশে ওইকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দির এখনকার মত জাতীয় দেবালয় হয়ে ওঠেনি, পারিবারিক দেবালয়ের সীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্রেই কিছুটা অতিক্রম করতে পেরেছিল—তখন বাংলার প্রধান ধর্মস্থান কালীঘাটের কালীমন্দির। কালীঘাট সর্বভারতীয় তীর্থস্থল। এই কালীঘাট মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সাদরে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেল—এমন কি ইংরাজ মহিলা নিবেদিতাকে পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গনে বক্তৃতা করতে দিয়েছেন—স্মরণীয় সেই ধর্মীয় উদারতা।'

এই ঘটনার উল্লেখ পাই স্বামীজির 'বাণী ও রচনায়' (নবম খণ্ড, পৃঃ ২২৭)। এতে বলা হয়েছে ঃ বাংলা ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে স্বামীজি তাঁর

জননীর ইচ্ছায় কালীঘাট মন্দিরে পূজো করতে যান। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রণামাদি করেন এবং নাটমন্দিরে নিজেই হোম করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন কালীঘাটে এখনও কেমন উদারভাব দেখলুম। আমাকে বিলাত প্রত্যাগত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেন নি, বরং পরম সমাদরে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করতে সাহায্য করেছিলেন!'

এই কি একবার এবং প্রথমবার স্বামীজি কালীঘাট মন্দিরে গিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা ভগিনী নিবেদিতার একটি পত্রের দিকে চোখ ফেরাতে পারি – যা থেকে স্পষ্টই জানা যায়, এর আগেও স্বামীজী কালীঘাটে গিয়েছিলেন এবং সেখানে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন।

'নিবেদিতা লোকমাতা, গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯) সংযুক্ত ১৮৯৯ সালের ১৫ই মে নিবেদিতার লেখা একটি পত্র থেকে জানতে পারি, 'গতকাল স্বামীজী এক আত্মীয়ের সঙ্গে কালীঘাট গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেখানে তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনা করেছিলেন। খুবই উল্লাসের কারণ।'

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, নিবেদিতার পত্রটি ১৮৯৯ সালের ১৫ই মে লেখা এবং উল্লিখিত ঘটনাটি হচ্ছে 'গতকালের', অর্থাৎ ১৪ই মে তারিখের। তার মানে দক্ষিণেশ্বর থেকে 'পরোক্ষভাবে' বিতাড়িত হওয়ার প্রায় দুবছর পরের ঘটনা। এটাও রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে যিনি তাকে 'পরোক্ষ' এবং পরে 'প্রত্যক্ষ' অপমানের তিলক পরিয়ে বিদায় করেছিলেন, তিনি নিজেও কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বিবেকানন্দ জন্মসূত্রে যে অর্থে 'শূদ্র', তিনিও সেই একই অর্থে 'শূদ্র'। অথচ, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোঁড়ামিকে শিরোধার্য করে তিনিই স্বামীজিকে বিতাড়িত করেছিলেন।

এই ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং এ নিয়ে সে কালে তুমুল বিতর্কও দেখা দিয়েছিল। সে সব সংবাদ নিশ্চয়ই কালীঘাটের মন্দির কর্তৃপক্ষও বিলক্ষণ জানতেন, জানতেন স্বামীজী কালাপানি পার হয়েছেন, 'ম্লেচ্ছদের' সঙ্গে আহার করেছেন। তবুও কিন্তু কালীঘাটের ব্রাহ্মণেরা স্বামীজীর মুখের উপর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেন নি। যদি দিতেন, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ, ওই মন্দির ব্রাহ্মণদেরই এক্তিয়ারে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কোনভাবেই ওই মন্দিরের কোন পূর্বসম্পর্ক ছিল না, যেটা ছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অপপ্রচার এবং ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের মত সম্ভ্রান্ত মানুষের তথাকথিত উগ্র ধর্ম-সচেতনতা কালীঘাটের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণদের কিছুমাত্র স্পর্শ তথা প্রভাবিত করতে পারে নি। অথবা প্রভাবিত করলেও সেটার কোন প্রকাশ ঘটে নি। বরং তারা স্বামীজীকে 'রাজকীয় অভ্যর্থনা'ই জানিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসের ওই ঘটনার পর ১৯০২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর বাকি জীবনে তিনি কি আর কোনদিনই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করেন নি? এ ব্যাপারে যতদূর দেখা যায় এবং জানা যায়, তিনি আর কোনদিনই সে মন্দিরে ঢোকেন নি। অথবা বলা যায়, তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮) শংকরীপ্রসাদ বসু লিখেছেন ঃ 'অন্যদের নিয়ে তিনি হয়ত কখনো সখনো গিয়েছেন, কিন্তু বাইরে অপেক্ষা করেছেন।'

এ কি ভাবতে পারা যায়? সমস্ত জগতের রুদ্ধ দুয়ার যার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল, তারই চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দরজা? এ যে তাঁরই প্রাণের মন্দির, এখানে যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তাঁর জীবন দেবতা।

আজও যখন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাই, তখন প্রবেশদ্বারের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াই, চলার শক্তি যেন মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলি। মনে হয়, এই প্রবেশদ্বারের সামনেই কি বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ একান্ত অসহায়ভাবে নির্বাক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন? তবে কি সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়ের সবটুকু প্রেম উজাড় করে দিয়ে ওই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে বলতেন ঃ 'কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে!'

একাদশ অধ্যায়

স্থানিক পটভূমিকায় বিবেকানন্দ

বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, ভারতভূমি তাঁহার নিকট ছিল পুণ্যভূমি। ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ছিল তাঁহার কাম্য, জীবনের সাধনা। অতীন্দ্রিয় স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহার নিকট আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল বলিয়া তিনি পার্থিব সম্পদ গ্রাহ্য করিতেন না, বিলাস-সামগ্রী স্পর্শ করিতেন না। জ্ঞান ও মুক্তির পথে আজীবন আত্মনিবেদন করিয়া সাধনমার্গে নিয়ত বিচরণ করিতে যারপরনাই প্রয়াস পাইতেন। মাতৃভূমির প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ তিনি অকৃত্রিম অধ্যাবসায়ের সহিত ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐকান্তিক সন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হন। প্রাচীন গৌরবে সমৃদ্ধ মনপ্রাণ লইয়া ভারতীয়গণ কিভাবে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা দেশবিদেশের জনসাধারণকে জানাইতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার অমিতসাহস, প্রগাঢ়জ্ঞান, দেশমাতৃকার প্রতি নিবিড়শ্রদ্ধা তাঁহার এ সাধুসংকল্প জয়যুক্ত করিতে সাহায্য প্রদান করে। তাই তিনি বিলাতে প্রচারার্থ গমন করিলে ধর্মব্যাখ্যার সুনিপুণ ভাষণ, ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণ, বেদান্তশাস্ত্রের সুললিত আলোচনা, হিন্দুধর্মের মর্মবাণী সরল-সুবিন্যস্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ইংলণ্ডবাসীকে বিমুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। তদ্দেশবাসী সকলে তাঁহার বাগ্মিতা, তত্ত্বকথা-পরিস্ফুটনে অসীমপ্রজ্ঞা, ধীশক্তি ও বাচন-ভঙ্গীদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

॥ ইংলণ্ডে ॥

ইউরোপখণ্ডে যেসকল বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিশ্বপ্রেমে নিবেদিতাত্মা বিবেকানন্দের জগদবাসীকে মানসিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির আবেদন ছিল। তিনি নির্ভীকভাবে সকলকে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে বলিতেন। বাঁচিবার দৃঢ়সংকল্প সকলকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও কর্মকুশলতা অর্জন করা দরকার। স্বকর্মসাধনে দৃঢ় প্রত্যয়, পরসেবা প্রভৃতি অভীষ্ট লক্ষ্যে লইয়া যাইবে। নির্ভীক বীর সন্ন্যাসী বলিলেনঃ "কষ্টের মধ্যেও নিজের শক্তি ও সাহস বজায় রাখিতে হইবে। স্বকীয় মনোবৃত্তি সুন্দর ও প্রফুল্ল রাখিতে পারিলে সাফল্য সকল কার্যে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে"।

স্বামীজীর সহোদর শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা হইতে লণ্ডনে গমন করেন। লণ্ডনে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যার আয়োজন হইলে বহু লোক সমাগম হইতে দেখা যাইত।

মিস্ মুলার, মিঃ ষ্টার্ডি প্রভৃতি ৫৭নং সেণ্ট জর্জ স্ট্রীটের ভবনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলে বহুলোক তথায় উপস্থিত হইতেন। ধর্মব্যাখ্যা তাঁহার ছিল প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত বক্তৃতার কাল নির্দিষ্ট ছিল। প্রায় মাসাবধিকাল এইভাবে কাটিলে, বক্তৃতার স্থান পরিবর্তিত হইতে দেখা গেল। সুবিখ্যাত পিকাডেলী নামক স্থানে রয়েল ইনস্টিটিউটের চিত্রশালার একটি রমনীয় কক্ষে (Water Painting Gallery of the Royal Institute) বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই বক্তৃতাগুলির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'Class Lectures'। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। বেদান্তসূত্র, দর্শনশাস্ত্র, রাজযোগ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিতে করিতে প্রখর মেধা স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ফিজিক্স, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের নীতিগুলির অবতারণা ও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। পরিশেষে প্রশ্ন করিবার রীতি ছিল। পণ্ডিতপ্রবর স্বামীজী যথাযথ উত্তরদানে সকলকে তখন প্রীত করিতেন।

স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেনঃ "১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর লণ্ডনের "প্রিন্সেস হলে" এক জনসভায় তাঁর ইংরেজবন্ধুগণ তাঁকে সাড়ম্বরে যে বিদায়-অভ্যর্থনা জানান তার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।"

আমেরিকার বেদান্ত সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত কর্ণধার ও ধর্মব্যাখ্যাতা স্বামী অভেদানন্দ আরও বিবৃত করিয়াছেনঃ "ইংলণ্ডে সাধারণের কাছে তাঁর (বিবেকানন্দের) সাধনবাণী প্রচার হওয়ার পর অধ্যাত্মমনা লোকদের মনে একটা উদাত্ত সাড়া পড়ে যায়। এই ভাষণগুলি প্রথমে ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয় এবং পরে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি সেগুলিকেই 'জ্ঞানযোগ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।"

[শ্রদ্ধাভাজন স্বামী অভেদানন্দ-কর্তৃক "স্বামী বিবেকানন্দ" পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য]

লণ্ডনের কয়েকটি স্থানে কতিপয় বক্তৃতা ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার ফলে বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শন ও হিন্দুধর্মের সারকথা এমন সুষ্ঠুভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, তৎকালীন বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। আপামর জনসাধারণকে তিনি বুঝাইলেন অপূর্ব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কল্যাণের পথে মানবসম্প্রদায়কে আগাইয়া লইয়া যায়। জীবনে জড়তা আসিয়া দেখা দিলে, কর্মপ্রবণতা নষ্ট হইয়া যায়, অন্তরের সৌন্দর্য, কর্মশক্তির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া পড়ে, মানবীয় ঔদার্য ক্ষুণ্ণ হয়। বহির্জগতের বিরাট কোলাহল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার ঝঞ্ঝাবাত্যার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উপায় নির্জনসাধনা ও সমাজসেবা। সেকারণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আর্তত্রাণ ও দুর্গতজনের সেবা পরমার্থলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে জার্মানী এবং সুইটজারল্যাণ্ডের শিক্ষিত সমাজকে নির্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেনঃ নিরলস অধ্যবসায় গুণে দরিদ্রনারায়ণের সেবা বাঞ্ছনীয়, শিষ্টাচার রক্ষা করিতে গিয়া সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিলে চলিবেনা। সত্যই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, সত্যসাধনার উপর অনন্ত সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতি স্বকীয় স্বার্থসাধনের জন্য

আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে চায়, নিজের দুর্বলতা দমন করিতে পারে না, স্বজন-বান্ধবের বিরুদ্ধাচরণ করে,—ফলে আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে।

॥ জার্মানীতে ॥

জার্মানীর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে তিনি বলিয়াছিলেন : "প্রয়োজনবোধে আমরা যে সকল কাম্যবস্তু লাভ করি তাহা প্রকৃতির বুকে সযত্নে সঞ্চিত আছে। রূপরস-গন্ধভরা বিচিত্র এ জগতে যে সকল সুন্দর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অকৃপণ হস্তে ঢালিয়া দেওয়া আছে তাহা যথাসম্ভব আহরণ করিয়া অভাব মিটাইতে হইবে। মানব-সমাজ হইতে প্রেম-মৈত্রীর সাহায্যে, সহানুভূতি ও অনুরাগের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিতে হইবে। পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বজনীন প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া এক সম্প্রদায়, এক মানবজাতির কল্পনা ও সংগঠন দুঃসাধ্য মনে হইবে না। সহযোগিতা, ঐক্যবোধ বিশ্বপ্রেমের মূলমন্ত্র। প্রাণের স্পর্শ, হৃদয়ের বিনিময় দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে জগতে, তথা ইহ সংসারে স্বর্গ রচনা করা যায়।"

গভীর চিন্তাক্ষেত্রে এইপ্রকার অনুশীলন ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের ফলে ভারতীয় দর্শনের ও হিন্দুসাধনার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত বোধ করিলেন। বিশ্রামহেতু শান্তিপূর্ণ নির্জন স্থানে গমনের বাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন বন্ধুর আহ্বান আসিল। ঈশ্বরপরায়ণ বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সে আমন্ত্রণ বিধিনির্দিষ্ট নিমন্ত্রণ বলিয়া গণ্য করিয়া অপার তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাঁহার তিনজন বিশিষ্ট সুহৃদের নিকট হইতে আহ্বান-লিপি আসে। তাঁহারা স্বামীজীকে ইউরোপে ভ্রমণ ও অবসরবিনোদনের জন্য অনুরোধ জানাইলে শিশুসুলভ সরলতাপূর্ণ বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমান ও শ্রীমতী জে. এইচ সেভিয়ার (J. H. Scvier) এবং কুমারী হেনরিয়েটা মুলার (Miss Henrietta Muller) তাঁহার ইউরোপখণ্ডে ভ্রমণ ও বিশ্রামের পরিকল্পনা স্থির করিয়া স্বামীজীর সহিত পরিভ্রমণে সঙ্গ লয়েন। এ প্রস্তাবে স্বামীজী ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সম্মতি প্রদান করেন। সুইটজারল্যাণ্ড দেখিতে সমধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া স্বামীজী বলিলেন : "আমি সুমনোহর তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী ও বিস্ময়কর পার্বত্য পথগুলি দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসিয়া আছি।"

॥ সুইটজারল্যাণ্ডে ॥

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে এক শুভ্র আপাহ্নে স্বামীজী বন্ধুগণ-সমভিব্যাহারে লণ্ডন মহানগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ছাত্রবর্গ ও শিষ্যগণ অন্তরের সহিত বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সুন্দর সুইটজারল্যাণ্ডের এক নিভৃত পল্লীর মনোরম পরিবেশে স্বামীজী আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক শুভমুহূর্তে তিনি

একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। এই হৃদ্যতাপূর্ণ পত্রখানি তাঁহার পরিভ্রমণের পরিকল্পনায় আমূলে পরিবর্তন সাধন করে।

সুইটজারল্যান্ডের অপূর্ব সুষমামণ্ডিত পল্লীশ্রীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ প্রেমপূর্ণ আহ্বান লিপিখানি প্রাপ্ত হন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পল ড্যসেনের নিকট হইতে। Paul Deussen (1845-1919) ছিলেন জার্মানী দেশের অন্তঃপাতী কিড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক। ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় চিন্তা-ধারার সুমনোহর অনুবাদ ও সুবিস্তৃ ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্ভিন্ন এই মনীষী সোপেনহারের (A. Schopenhauer) একনিষ্ঠ শিষ্য হিসাবে সোপেনহার-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ **পল ড্যসেন** ॥

অধ্যাপক ডাসেন কিছুকাল ধরিয়া স্বামীজীর বক্তৃতা ও দার্শনিকতত্ত্বের বিশদ-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সেকারণ লণ্ডনের ঠিকানায় স্বামীজীকে পত্রযোগে স্বকীয় ভবনে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। স্বামীজীকে তিনি মৌলিক চিন্তার এক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রতিভাবান পুরুষ মনে করিতেন। তাঁহার নিজের বেদান্তদর্শনের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়া এবং স্বয়ং সম্প্রতি হিন্দুস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করার জন্য তিনি স্বভাবতই স্বামীজীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে এবং তাঁহার সহিত ভারতীয় দর্শনের কতিপয় দুরূহ সমস্যা আলোচনা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

স্বামীজী সেজন্য ইংলণ্ডদেশে ফিরিবার পূর্বে কীয়েল (Kiel) নগরীতে গমন করিতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু তাঁহার গৃহস্বামী বা অভিভাবকগণ তাঁহাকে সুইটজার-ল্যাণ্ড-ভ্রমণ সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়িতে চাহিলেন না এবং বলিলেন কীয়েল-যাত্রা করিবার পূর্বে পথে জার্মানীর আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

সেকারণ স্বামীজী তৎপরে পর্যবেক্ষণ করেন শফহ্যান সেন (Schaffhansen)। এ স্থান হইতে রাইননদীর সুদৃশ্য জলপ্রপাত সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি মুগ্ধনেত্রে দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তিনজন ভ্রমণকারী হাইডেলবার্গ (Heidelberg) অভিমুখে যাত্রা করেন। এইস্থান প্রসিদ্ধ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কেন্দ্রস্থল। কীয়েলে দুইদিন অতিবাহিত করিয়া এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং নগরীর উপর প্রাসাদ-দুর্গ অবলোকন করিয়া তাঁহারা কোবলেনজে (Coblenz) আসেন। একরাত্রি এখানে কাটাইয়া পরদিন স্টীমারযোগে ভ্রমণকারীগণ মনোরম রাইননদীর উৎপত্তির দিকে গমনপূর্বক কোলন নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মহতী নগরীতে তাঁহারা কয়েকদিন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন। পুলকনেত্রে স্বামীজী বিরাট কোলন-গির্জার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সেখানের

প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন। এই পবিত্র ধর্মস্থান দেখিয়া স্বামিজী প্রীত হইয়াছিলেন।

শ্রীমান ও শ্রীমতী সেভিয়ার (Sevier) তাঁহাদের প্রিয় অতিথিকে (স্বামীজী) কোলন হইতে একেবারে কীয়েল লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বার্লিন মহানগরী দেখতে বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ করায় তাঁহারা তাঁহার মনস্তুষ্টিবিধান উদ্দেশ্যে পর্যটনতালিকার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এইভাবে স্বামীজীর পরিক্রমার প্রসার বাড়িয়া যায় এবং ড্রেসডেন প্রভৃতি নগরীগুলি পরিদর্শন করিয়া পরমতৃপ্তিবোধ করেন। দেশের সাধারণ সমৃদ্ধি এবং বহুবিধ সহরের অগণিত আধুনিক বাসভবন দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। বার্লিন-মহানগরীর সুপ্রশস্ত পথঘাট, সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ, রমণীয় উদ্যান প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বামীজী ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ প্যারিস সহরের সহিত তুলনা করিলেন।

ড্রেসডেন তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থান বুঝিয়া স্বামিজী মৃদুস্বরে দ্বিধাপূর্ণভাবে বলিলেনঃ "অধ্যাপক ড্যসেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমাদের অধিকদিন দেরী করা উচিত হইবে না।" এজন্য তাঁহারা সদলবলে একেবারে কীয়েল-নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই যাত্রার যে একটি সুললিত বিবরণ শ্রীমতী সেভিয়ার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার স্বামী শ্রীমান সেভিয়ারের (Sevier) সহিত স্বামীজীর সঙ্গে ড্যসেন পরিবারে কীয়েল (Kiel) নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ "আমার স্মরণে আছে কীয়েল জার্মানীর একটি সহর—বলটিক সাগরে অবস্থিত। এই সুন্দর সহরের স্মৃতি আমার নিকট উজ্জ্বল-ভাবে রহিয়াছে। ঐস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পল ড্যসেনের (Paul Deussen) সঙ্গে একদিন আমরা বিপুল আনন্দের সহিত কাটাইয়াছি। তাঁহার দার্শনিকতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার শক্তি ছিল অসীম ও অসাধারণ। ইউরোপীয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চে।

স্বামীজী হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি একটি পত্র প্রেরণ করেন যে, পরদিন প্রভাতে যেন অনুগ্রহপূর্বক স্বামীজী তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে প্রাতরাশে যোগদান করেন। অতিবিনয়সহকারে আমাকে ও আমার স্বামীকেও তাঁহাদের সহিত আহারে যোগদান করিতে বিশেষ অনুরোধ জানান। পরদিন প্রভাতে ঠিক দশটার সময় আমরা তাঁহার ভবনে গিয়া উপস্থিত হই। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাদের গ্রন্থাগার-কক্ষে লইয়া গিয়া আমাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। প্রাথমিক সম্ভাষণের পর তিনি আমাদের ভ্রমণ ও স্বামিজীর পরবর্তী কার্যতালিকা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অনন্তর অধ্যাপক টেবিলের উপর খোলা একটি পুস্তকের পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থবিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করেন। জ্ঞানীসুলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে কথোপকথনে

প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন : "উপনিষৎ এবং বেদান্তসূত্রে প্রতিষ্ঠিত বেদান্তদর্শনের প্রণালী মানবজাতির সত্যসন্ধানে বিরাট প্রতিভার এক মূল্যবান অবদান। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যগুলি অপূর্ব মেধা ও শক্তিমান ধী, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির পরিচায়ক। বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যক্ষফল সর্বোচ্চ ও সুনির্মল নৈতিক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ। অধ্যাপক মহাশয় আরও বলিলেন : "আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন উৎসমুখে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার এক প্রচেষ্টা চলিতেছে। সে আন্দোলন ভারতবর্ষকে সকল জাতির আধ্যাত্মিক নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে,—জগতের সর্বোচ্চ ও মহত্তম প্রভাবকেন্দ্র রূপে গণ্য করিবে"!

ডঃ ড্যসেন স্বয়ং যেসকল অনুবাদ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন হইতে করিতেছিলেন, স্বামীজী তৎপ্রতি গভীরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, কতিপয় দুর্বোধ্য ও দুরূহ বাক্যের সঠিক তাৎপর্য ও নির্ভুল অর্থ ও উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা সুরু হইল। স্বামীজী দেখাইলেন সংজ্ঞা বা definition-এর স্পষ্টতা মুখ্য এবং পরিপাটী, লালিত্য বা সুন্দর প্রকাশভঙ্গী (elegance of diction) গৌণবস্তু-রূপে প্রয়োজনে আসে। এমন দৃঢ়তা ও বোধগম্য-রূপে প্রাচ্য শাস্ত্রব্যাখ্যাতা (স্বামীজী) উপলব্ধির সূক্ষ্মতা বুঝাইলেন যে, জার্মান বিজ্ঞপ্রবর (অধ্যাপক ড্যসেন) অবিলম্বে উহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। স্বামীজী এইভাবে তাঁহার হৃদয় জয় করিলেন"।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা

দেবব্রত চৌধুরী

"অন্যদেশের রাশি রাশি আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরিব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গালি দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভা-মাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরিব, নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না ধর্ম বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মনোবাক্যে যদি এক হয়, এক মুষ্টি লোক পৃথিবী উলটে দিতে পারে— বাধা যত হবে ততই ভাল। বাধা না হলে কি নদীর বেগ হয়?'

—এই বিদ্যুদগর্ভ বাণী স্বামী বিবেকানন্দের। আমেরিকা থেকে প্রেরিত এক পত্রে তিনি জনৈক অনুগামীর নিকট এই কথা লিখেছিলেন। প্রতীচ্য খণ্ডে আমেরিকায় তিনি কেন হিন্দুধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন: 'আমার ইচ্ছা হয়েছিল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের। অপরাপর জাতির সঙ্গে না মেশাই আমার মতে—আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ—অবনতির একমাত্র কারণ। প্রতীচ্যের সঙ্গে আমরা কখনও পরস্পরের ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। আমরা হয়ে গিয়েছিলাম কূপমণ্ডুক।

তারপরে বলেছেন: 'ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে বহিঃপ্রকৃতি জয়। আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তা হলে হিন্দু বা ইওরোপীয় বলে কিছু থাকবে না। উভয়-প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্য-সমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করছে। এই দুইটিরই মিলন দরকার।'

এ প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন: আমাদের দেশে মোক্ষলাভের প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে ধর্মের। ধর্ম কি?—যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক, ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। মোক্ষ কি?—যা শেখায় ইহলোকের সুখ গোলামি, পরলোকেরও তাই।…

'অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। বৌদ্ধদের পর থেকে ধর্মটা একেবারে অনাবৃত হল, খালি মোক্ষলাভই প্রধান হল। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষমার্গ অনুশীলন করে, সে তো ভালই, কিন্তু তা হয় না। ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। গৃহস্থই নয়, আবার মোক্ষ।'

প্রাচ্য যেমন পাশ্চাত্যের, তেমনি পাশ্চাত্যও প্রাচ্যের অনুপূরক। স্বামী

বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিশ্বমানবকে এই অভাব পরিপূরণে—এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেন শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে। প্রচণ্ড শিল্প-বিপ্লবের গতি-বেগে বিপুল সমৃদ্ধিশালী এই নূতন রাষ্ট্রটি তখন অধিকতর সম্পদ-আহরণে মত্ত—বিশ্বের বহুজন সেই রাষ্ট্রটিকে জড়বাদী বলে অভিহিত করেছেন। আমেরিকার এই বিভ্রান্তিকর জড়বাদী ভূমিকা সর্বজন-বিদিত হলেও তিনি বললেন: নানা দূর দেশ থেকে বহু মানুষ এখানে বহু পরিকল্পনা ভাব ও আদর্শ প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে এবং আমেরিকাই একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।

এর পরেই আবার এক চিঠিতে লিখেছেন: 'শুধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ আছে যে, প্রত্যেকের ভিতর যা কিছু ভাল, সমস্তই ফুটিয়ে তোলে!'

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন আদর্শ একে অন্যের অনুপূরক। বিরোধ নয়, সামঞ্জস্য—সকল ক্ষেত্রেই সহ-অবস্থান, সমন্বয়, এই বাণী দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাঁরে নরেন, তুই কি চাস? নিজের মুক্তি? কোথায় তুই বটগাছের মতো হয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে ছায়া দিবি—না, তুই নিজের মুক্তি চাইছিস।' বিশ্বমানবের মুক্তি, সর্বমানবকে অধ্যাত্মলোকে উন্নত করার ব্রত নিলেন স্বামীজী—পাশ্চাত্যের বহিঃপ্রকৃতি-জয়ের বাণী ভারতে ও প্রাচ্যখণ্ডে প্রচার, আর প্রাচ্যের অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা ভারত ও প্রতীচ্য খণ্ডে ঘুরে বেড়ালেন।

বৈষয়িক দিক থেকে মানুষ যে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, কতখানি পার্থিব উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমেরিকায়—'কলাম্বিয়ায়' একটি বিশ্বমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। আর একদিকে এরই অন্যতম অঙ্গ-হিসেবে আয়োজন করা হয়েছিল ধর্ম-মহাসম্মেলনের। শিকাগোতে বিশ্বের বহু দেশের বহু ধর্মের প্রতিনিধি-গণকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সমগ্র বিশ্ব ও ভারতের প্রয়োজন বিচার করে স্বামীজীও এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া স্থির করলেন। ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে তিনি আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার নির্দিষ্ট দিনের বেশ কিছুটা আগেই তিনি শিকাগো শহরে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সম্মেলনে যোগ দিতে হলে যে পরিচয় পত্রের প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না, অর্থাভাবও ছিল প্রচুর। রম্যাঁ রল্যাঁ তাঁর এই অভিযানকে 'বিস্ময়কর' বলে অভিহিত করেছেন। ভিক্ষা করে সমুদ্র পাড়ি দিলেন। আমেরিকায় পৌঁছবার পরই সেই অর্থ ফুরিয়ে গেল। রেল-স্টেশনে প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্রের অভাবে প্যাকিং-বাক্সের মধ্যে থেকে আত্মরক্ষা করলেন। পরিশেষে মিসেস জি. ডব্লিউ. হেল নামে জনৈক মহিলা তাঁকে মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করে রক্ষা করলেন। এঁরই কথা তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "মিঃ হেল—যাঁর বাড়িতে চিকাগোয় আমার সেন্টার, তাঁর স্ত্রীকে আমি 'মা' বলি,

আর তার মেয়েরা আমাকে 'দাদা' বলে, এমন মহাপবিত্র দয়ালু পরিবার আমি তো আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা। কি দয়া এদের, যদি খবর পেলে যে, একজন গরিব ফলানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়ে-মদ্দ চলল—তাকে খাবার, কাপড় দিতে, কাজ জুটিয়ে দিতে। আর আমরা কি করি?"

এইখানেই ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে মিস স্যানবার্ন নামে জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা এবং কালক্রমে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁরা স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয়, অপূর্ব মনীষা ও পৌরুষব্যঞ্জক চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হলেন। শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদানের পথ এঁদেরই সাহায্যে প্রশস্ত হল। ১৮৯৩ খৃঃ সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে সেই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে বক্তৃতাদানের আহ্বান এল। এই দিনটির কথা পরে তিনি এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন ঃ

"আর আমি, যে জীবনে কখন সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহা-সভায় বক্তৃতা করিবে। সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পরে সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করি নাই। সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি আরম্ভ করিলাম, যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল, সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালম্'—ভগবান বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া ফেলেন। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেইদিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই।

"প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি! এইটুকু জানিলেই তোমাদের

যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই।"

যে বৈদান্তিক আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রচার করেন, তার সঙ্গে আমেরিকাবাসীদের পরিচয় প্রায় কিছুই ছিল না। তা ছাড়া তাঁর মতবাদের মধ্যে না ছিল গোঁড়ামির স্থান, না ছিল ঐরকম আদর্শ সম্পর্কে আমেরিকাবাসীর কোনরূপ ধারণা। প্রতিকূলতার মুখেও তাঁর কিছু কিছু পড়তে হয়েছিল। তাই প্রশ্ন জাগে —তাঁর এই বিস্ময়কর সাফল্য-লাভের কি কারণ, কী ছিল তার মূলে?

তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব? সে কথা ঠিক। এ ছাড়াও একটি কারণ ছিল, যার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। সেই কারণটি হল, ঈশ্বরোপাসনায় স্বাধীনতা-সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের সনাতন মর্যাদাবোধ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের—আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধানে তাদের চিরন্তন আকুতি। অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিকতার পাতলা স্তরের নীচেই ছিল আধ্যাত্মিক এবং মননশীলতার প্রবহমান একটি গভীর স্রোত। শিল্পায়নের নানা কুফলের বিরুদ্ধে আদর্শবাদীদের প্রতিবাদ প্রভৃতিরও প্রভাব কিছু কম ছিল না। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যাদির সঙ্গে আমেরিকাবাসী বিদ্বজ্জনের পরিচয় ও ঐসকল বিষয়ে চর্চাও তখন হচ্ছিল।

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ দীর্ঘকালের, প্রথম যুগে ছিল বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কে যোগাযোগ। ১৭৮৭ খৃঃ প্রথম মার্কিন জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে, ১৮১৫ খৃঃ থেকে ১৮৩৭ খৃঃ মধ্যে সালেম থেকে কলকাতায় 'জর্জ' নামে একটি জাহাজ একুশবার যাতয়াত করে। ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক লেন-দেনে ঐ সময়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার রামদুলাল দে। আমেরিকায় তাঁর সম-ব্যবসায়ীদের সমাজে তিনি প্রভূত শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। আমেরিকার জাহাজের একজন মালিক রামদুলালের নামে তাঁর তিনখানা জাহাজের নামকরণ করেছিলেন। আমেরিকার বস্টন, নিউইয়র্ক, সালেম, মার্বলহেড এবং ফিলাডেলফিয়ার জন পঁয়ত্রিশ বণিক চাঁদা করে টাকা তোলেন। সেই অর্থে তাঁরা গিলবার্ট স্টুয়ার্টের আঁকা জর্জ ওয়াশিংটনের একটি প্রতিকৃতি ক্রয় করে ১৮০১ খৃঃ রামদুলালকে উপহার দেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকায় ধর্ম-সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল অগুনতি। সেগুলির প্রায় অর্ধেকের মধ্যেই রামমোহন সম্পর্কে এবং হিন্দুধর্ম ও খৃস্টধর্মের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাসমূহের সমন্বয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশিত হত। সাধারণ পাঠাগারগুলিতে রামমোহন-রচিত গ্রন্থসমূহ রাখা হত।

এমার্সন ও থোরো এবং তাঁহাদের অনুগামিগণ ভারতীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন, 'এমার্সনের নিবন্ধগুলি আমার কাছে পাশ্চাত্য গুরুর মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞানের বাণী বহন করে

এনেছে।' তারপর আমেরিকার প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৪ খৃঃ সংস্কৃতের অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম অধ্যাপক উইলিয়ম ডোয়াইট হুইটনিও অথর্ববেদ সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তারপর সেই বিভাগটি গড়ে তুলেছিলেন এডোয়ার্ড এলরিজ স্যালিসবেরি। ১৮৮০ খৃঃ রচিত হল বুদ্ধের জীবন 'লাইট অব এশিয়া'। এমার্সনের বন্ধু অ্যামাস ব্রনসন অ্যালকট এই পুস্তকটি রচনা করেন। এর ৮৩টি সংস্করণ হয়। কেবল বাণিজ্যিক নয়, ভাব-সম্পদের আদান-প্রদানের দিক থেকে আমেরিকার আগ্রহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই মাঝে মাঝে ক্ষীণ হলেও ফল্গু-ধারার মতো প্রবহমান ছিল।

মোটের উপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে আমেরিকাবাসীদের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি জাতির বৃদ্ধি ও বিকাশের দিকেই নিয়োজিত ছিল এবং ভারত ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্বসাধারণের আগ্রহ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

১৮৯৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে ভারতীয় জীবন-দর্শন সম্পর্কে সেই আগ্রহ নতুন করে উদ্দীপিত হল। অনেকেই তাঁর ধর্মনীতি অন্তরে গ্রহণ করলেন।

এই অধিবেশনের পরে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এদেশে টাকা অথবা উপাধি বা জাঁকজমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।' তারপর দু-বছর তিনি আমেরিকায় ছিলেন। ঐ সময়ে স্বামীজী আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন, বেদান্ত-দর্শন প্রচার করেছেন। শেষের দিকে আরও একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'এশিয়া বপন করেছিল সভ্যতার বীজ, ইওরোপ উন্নতি করেছে পুরুষের আর আমেরিকা নারী ও সাধারণ লোকের—দরিদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে এদেশ যেন স্বর্গের মতো। এদেশে দরিদ্র একরূপ নাই বললেই চলে। অন্য কোথাও মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মতো স্বাধীন, শিক্ষিত ও উন্নত নয়। সমাজে উহারাই সব—।'

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সারা লরেন্স কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক জোসেফ ক্যাম্বেলের লেখা এবং নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ রচনার কয়েকটি ছত্র ঃ

বিশ্বমানবের একটি অখণ্ড রূপ এবং একই চরম পরিণতি সম্পর্কে আধুনিক মানুষের মনে যে ধারণা বিবেকানন্দ জাগিয়ে তুলেছেন, সেই নবযুগের জাগরণ ঘটেছিল ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে তাঁর উপস্থিতিতে।

অধ্যাপক ক্যাম্বেল লিখেছেন ঃ আপন সত্তার, আত্মাতে ঈশ্বরের উপলব্ধিই সকল ধর্মের শেষ কথা। কিন্তু আমেরিকায় এসে তিনি যা দেখেছেন তা কি ভোলা যায়।

লক্ষ লক্ষ নিরন্ন দরিদ্র অধিবাসীর দুর্গতি দূর করবার উদ্দেশ্যে বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার প্রবল আগ্রহও তাঁর মনে জেগেছে। দেশে ফিরে গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবাকে ব্রতরূপে গ্রহণের আদর্শ বিবেকানন্দ প্রচার করেছেন। এই আদর্শই পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনের সমাপ্তিভাষণে স্বামীজী আমেরিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

'স্বাধীনতার মাতৃভূমি দেবী কলম্বিয়া, তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্ত কলঙ্কিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনি সহজে ধনশালিনী হইবার চেষ্টাও কর নাই। সুতরাং তুমিই সভ্যজগতের পুরোভাগে গমন করিয়া শান্তিপতাকা উড়াইবার অধিকারিণী।'

১৮৯৪ খৃঃ নিউইয়র্কে প্রথম বেদান্তপ্রচারের কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার আন্দোলনের ক্ষেত্র তারপর থেকে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে বারোটিরও বেশী কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্বামীজীর নাম আমেরিকায় স্মরণ করা হয়ে থাকে।

দেহরক্ষার কয়েক বছর আগে স্বামীজী মেরী হেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই ঊর্ধ্বে। মাকে সে-কথা বলো। গত দু-বছর মৃত্যু-উপত্যকার ভিতর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা আমাকে সেই শান্তির—সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সকল বস্তুকে তার নিজের স্থানে আমি দেখছি। সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। যিনি আত্মতুষ্ট আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে—এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম, স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে। আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনা বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নাই। আত্মাকে লাভ করাই হল শ্রেষ্ঠ লাভ। আমি মুক্ত, আমার আনন্দের জন্য দ্বিতীয় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।'

মেরী হেল তাঁকে 'দাদা' বলতেন। শিকাগোতে তাঁদের বাড়িতেই ছিল স্বামীজীর কেন্দ্র। তারপর আর একটি চিঠিতে জনৈক ভক্তকে লিখেছিলেন ঃ 'এবার আমি মুক্ত, পূর্বের মতো ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, মঠের সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি মুক্ত। গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে, ঠিক তেমনি ভাবেই আমার জীবনের শেষ।'

To love India one must know her—ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে হলে তাকে জানতে হবে। কথাটি প্রায়ই বলতেন স্বামীজী। আর সেই জানার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তাঁর ভারতভ্রমণের সূত্রপাত। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেশ পরিক্রমার রীতি চলে আসছে অনেক দিন থেকে। দেশভ্রমণের মধ্য দিয়েই তাঁরা ভারতকে জানতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে শৈব-বৈষ্ণব দ্বৈত-অদ্বৈতের কোন ভেদ ছিল না। বীর বিবেকানন্দের জীবনে সন্ন্যাসধর্মের অনেক প্রচলিত রীতি লঙ্ঘিত হলেও তরুণ বয়সেই আমরা তাঁকে পাই ভারত-পরিব্রাজক রূপে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে তাঁর যাত্রারম্ভ। তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ ইহলোকে। প্রথম প্রথম স্বামীজী দিনকয়েকের জন্য অদৃশ্য হতেন। আজ বৈদ্যনাথ-শিমুলতলা, কাল গাজিপুর-বুদ্ধগয়া —এইভাবে কিছুকাল কাটিয়ে আসতেন। প্রত্যেকবার বলে যেতেন : 'এই শেষ, আর ফিরছি না'। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁকে অল্পদিনের মধ্যে ফিরে আসতে হত।

ইতিমধ্যে পরমহংসদেব দেহরক্ষা করেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। স্বামীজীর প্রকৃত পরিব্রাজক-জীবন শুরু হয় আরও দুবছর পরে—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেবারে তিনি ভ্রমণ করেন কাশী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন এবং হিমালয়ের কয়েকটি জায়গা মাত্র। অর্থাৎ উত্তরভারতের অংশবিশেষে তাঁর ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল।

আরও দুবছর কেটে গেল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আটাশ বছরের যুবক বরানগর মঠ থেকে বেরোলেন অনেক দিনের জন্য। প্রথমে সঙ্গী নিয়ে, পরে নিঃসঙ্গ। সেই একক যাত্রা শুরু হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। এইটেই স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভ্রমণ। এই ভ্রমণকালে তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছেন তার দীনাতিদীন বেশে আবার দেখেছেন মহৈশ্বর্যরূপে। রাত কাটিয়েছেন ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এসে পৌঁছলেন দক্ষিণভারতে। তখন তাঁর বয়স তিরিশ।

বেলগাঁও থেকে সমুদ্রতটবর্তী পর্তুগীজ উপনিবেশের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-ভারতে স্বামীজীর প্রথম পদার্পণ হয় মৈসূর বা কর্ণাটকের ভূমিতে। বেঙ্গলুরে এসে পরিচিত হন মৈসূরপতি চামরাজ ওডেয়র-এর সঙ্গে। ওডেয়র এবং তাঁর দেওয়ান শেষাদ্রি অয়্যর স্বামীজীর বিশেষ গুণমুগ্ধ হন। সম্ভাব্য আমেরিকা-যাত্রা নিয়ে আলোচনা ওঠে এবং রাজা তার ব্যয়ভার বহনে সম্মতির কথাও প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বামীজী রাজার দেওয়া কোনো কিছু না নিয়ে রওনা হলেন কোচ্চি অর্থাৎ কোচীনের অভিমুখে। সেখান থেকে তিরুঅনন্তপুরম্ অর্থাৎ ত্রিবান্দ্রম্।

ত্রিবান্দ্রমে এসে যাঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন, সেই তামিলভাষী ব্রাহ্মণ কে সুন্দররাম অয়্যর্ এবং তাঁর ছেলে কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রী স্বামীজীর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্বামীজীর আগমনের কয়েক মিনিটের মধ্যে গৃহকর্তা সামান্য আলাপেই বুঝতে পারেন—এই সন্ন্যাসী একজন মহান্ ব্যক্তি। সেদিন আর ভদ্রলোকের কর্মস্থলে বেরুনো হল না। স্বামীজীর উপস্থিতি, তাঁর কণ্ঠ, তাঁর চোখের দীপ্তি এবং অনর্গল বাক্য-প্রবাহ ও চিন্তাধারায় ভদ্রলোক অভিভূত হয়ে পড়েন। সেদিন সন্ধ্যায় ত্রিবান্দ্রমের উচ্চপদস্থ সরকারী মহলে স্বামীজী পরিচিত হলে উপস্থিত সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সুন্দররাম অয়্যর্-এর গৃহে স্বামীজী ন রাত্রি বাস করেন। ইতিমধ্যে সারা শহরে প্রচার হয়ে যায় উত্তরভারত থেকে এক প্রতিভাবান সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা। সংবাদ শুনে অনেকেই স্বামীজীকে দেখতে আসেন গৃহকর্তার বাড়ীতে। মদ্রাস থেকে এই সময়ে ত্রিবান্দ্রমে আসেন এক বাঙালী ভদ্রলোক—যিনি ছাত্রজীবনে ছিলেন স্বামীজীর সহপাঠী—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ছেলে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য। মন্মথবাবু তখন মদ্রাসে সরকারী কাজে নিযুক্ত। তাঁর ত্রিবান্দ্রম্ আসার পরে স্বামীজী প্রতিদিন সকালবেলাটা কাটাতেন তাঁর বাড়ীতে। মধ্যাহ্ন ভোজনও সেইখানেই সাঙ্গ হত। স্বামীজী একদিন রসিকতা করে সুন্দররামকে বলেছিলেন: "আমরা বাঙালিরা একটু স্বজন-প্রিয় জাত (We Bengalees, are a clannish people); তাছাড়া দক্ষিণভারতে আতিথ্যগ্রহণের পরে অনেককাল মাছ-মাংস খাওয়ার সুযোগ ঘটেনি"।

একদিন সুন্দররাম স্বামীজীকে অনুরোধ জানালেন শহরের কোনো জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এ জাতীয় বক্তৃতার অভ্যাস নেই বলে স্বামীজী অসম্মত হলেন।

—তাহলে শিকাগো ধর্মসভায় গিয়ে আপনি কী করবেন?

—ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন যথাসময় আমার শক্তি যুগিয়ে দেবেন।

ন দিন পরে স্বামীজী ত্রিবান্দ্রম থেকে বিদায় নিলেন। গৃহকর্তা লিখছেন: "To everyone of us he was all sweetness, all tenderness, all grace"

কন্যাকুমারীতে এসে ভারতপথিক বিবেকানন্দ শিশুর মতো উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। ভারত-মৃত্তিকার শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখলেন—মহান্ সিন্ধু শততরঙ্গ-ভঙ্গে মাতৃবন্দনায় উচ্ছ্বসিত। আত্মহারা স্বামীজী তীরসন্নিহিত জলবেষ্টিত শিলা-খণ্ডের উপরে গিয়ে ধ্যানাসীন হলেন। মানসচক্ষে দেখলেন সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের বিশাল বিচিত্র রূপ। সেই শিলাখণ্ডের দিকে তাকিয়ে আজও ভারত-সন্তান উদ্বুদ্ধ হবে। কল্পনায় দেখতে পাবে এক মহিমাময় দৃশ্য:

সম্মুখে অনিলান্দোলিত বীচিবিক্ষোভময়ী উচ্ছ্বসিত সুনিল জলধি, পশ্চাতে শৈলকাননকান্তার-পরিশোভিত শস্যশ্যমলা ভারতবর্ষ, আর তাহার সর্বশেষ প্রস্তরখানির উপর যোগাসনে সমাসীন নব্যভারতের মন্ত্রগুরু পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ!

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—আসমুদ্র-হিমাচল ভারতভ্রমণ সম্পূর্ণ হল, স্বামীজী যথার্থ ভারতপ্রধান হলেন। পরবর্তীকালে নিজেই একসময়ে বলেছেন যে এখানে এসে তিনি হলেন—a condensed India.

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতের নানা জায়গায় অসামান্য প্রতিভাধর রূপে শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হলেও তাঁর জীবন ও বাণীর মহত্ত্ব যথার্থরূপে উপলব্ধি হয় মদ্রাসে। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর মদ্রাসে স্বামীজীকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয় তা অভূতপূর্ব হলেও অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ ইতিমধ্যে তিনি জগৎ-জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এক অখ্যাতনামা বাঙালী সন্ন্যাসী একরকম অজ্ঞাত অবস্থায় যে কয়েকমাস মদ্রাস শহরে কাটালেন সেই সময়ের কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মদ্রাসে রটে গেল···এক অদ্ভুত ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী এসেছেন। ইংরেজীর কী মহিমা! সত্য কিনা জানিনা, আমার মনে হয় স্বামীজীর বিপুল খ্যাতির মূলে রয়েছে ইংরেজী ভাষায় তাঁর আশ্চর্য অধিকার।

স্বামীজীর মতো সন্ন্যাসী প্রথম স্বীকৃতি পেলেন মদ্রাসে—ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর। কারণ, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে মদ্রাস তথা দক্ষিণভারত যতটা রক্ষণশীল, স্বামীজী ঠিক ততটাই প্রচলিত সন্ন্যাসজীবনের বিপরীত পন্থী।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণভারতীয় জনসমাজের একাংশে এখানকার মতে তখনও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, উত্তরাপথের হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় জাতির কোনো সম্পর্ক নেই। ত্রিবান্দ্রমে অবস্থানকালে সেখানকার জনৈক অধ্যাপকের মুখে এই ধরণের মন্তব্য শুনে স্বামীজী তাঁর গৃহকর্তা সুন্দররামকে বলেছিলেন যে, দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে ইতিপূর্বেই কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে তিনি এই অপ্রীতিকর জাতি-বৈর (আর্য-দ্রাবিড়-মনোভাব) লক্ষ্য করেছেন।

তৃতীয়ত, দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণসমাজে মাছ-মাংস অতিনিষিদ্ধ বস্তু। আর স্বামীজী কিনা সেই নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য বাঙালিসুলভ কাতরতা প্রকাশ করেছেন! ত্রিবান্দ্রমে তার পরিচয় পেয়েছি আমরা। দক্ষিণীদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা যে কতদূর ভয়ানক আমরা ঠিক অনুধাবন করতে পারব না। অনেকে স্বামীজীর মুখের উপর আমিষ-ভক্ষণকে ঘৃণ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই অসহিষ্ণুতা সহজবোধ্য। কারণ আমরা মৎস্যপ্রাণ বাঙালীরাও প্রত্যাশা করি—সাধু-সন্ন্যাসী নিরামিষাশী হবেন। ধূম্রপানে তাঁর আসক্তি নিন্দনীয়···ইত্যাদি। অথচ মদ্রাসে ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনার সময়ে দেখা যেত স্বামীজী অবিরত ধূম্রপানে রত!

চতুর্থত দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণসমাজে স্বামীজীর শ্রদ্ধালাভের সবচেয়ে বড় বাধা তাঁর ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মলাভ। মদ্রাসে একদিন জাতিবর্ণসমস্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন যে, কেরলের নায়র-সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ বহুকাল ধরে সেখানকার নম্বুতিরি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যেভাবে তারা প্রতিলোম বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ, তাতে মনুস্মৃতি অনুযায়ী তারা ব্রাহ্মণপদবাচ্য। কিন্তু

স্বামীজীর এই অভিমতে ব্রাহ্মণসমাজের সম্মতি দূরে থাক, উপস্থিত নায়র ভদ্র-মহোদয়গণও শংকিত হয়ে ওঠেন।

এ-হেন মদ্রাসের পক্ষে দত্তোকুলোদ্ভব নরেন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকার করে নেওয়া বড় সহজ কথা নয়। বস্তুত প্রথম মদ্রাস-দর্শনকালে স্বামীজীর প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হলেও সেখানকার নেতৃস্থানীয় প্রবীনসমাজ কিন্তু তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন। তখন যাঁরা স্বামীজীর চারপাশে এসে জমেছিলেন, তাঁরা সমাজের নেতৃস্থানীয় কেউ নন। তাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীনদল—ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, মধ্যবর্গের কর্মচারী প্রভৃতি, অর্থাৎ যাঁরা মনে-প্রাণে তরুণ, বিশেষ ধরণের গোঁড়ামী যাঁদের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মদ্রাসের এই যুবসমাজ স্বামীজীর উদার ধর্মমতে বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। স্বামীজীর শিকাগো-যাত্রার জন্য তাঁরা বিপুল উৎসাহে অর্থসংগ্রহের আয়োজন করেন এঁদেরই সাহচর্যে স্বামীজীর বিদেশযাত্রার সংকল্প একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। বিদেশে গিয়েও কপর্দকহীন স্বামীজী টাকার জন্য যাঁদের উদ্দেশ্যে কেবল্ পাঠিয়েছিলেন তাঁরা এই মদ্রাসের বন্ধু। তখনও কিন্তু সেখানকার প্রবীন সম্প্রদায় স্বামীজীর অনুগামী দলকে "অত্যুৎসাহী বিভ্রান্ত" বলে বিজ্ঞের হাসি হেসেছিলেন।

১৮৯৩-৯৪-৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামীজী দেশে ফিরে এলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে স্বামীজী-সম্পর্কে মদ্রাস তথা সমগ্র ভারতের মনোভাবের রূপান্তর ঘটে। কলম্বো থেকে আরম্ভ করে পথে পথে, স্টেশনে স্টেশনে স্বামীজীর অভ্যর্থনা হতে থাকে,- রামেশ্বর, রামনাথ, মাদুরা, কুম্ভকোণম্—তিরুচিরাপল্লী……। তার মধ্যে অবশ্য অতি স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে জমকালো হয়েছিল মদ্রাসের সম্বর্ধনা। ১৭টি বিজয়তোরণ নির্মাণ করে বিভিন্ন ভাষায় ২৪ খানা মানপত্র দিয়ে মদ্রাস স্বামীজীকে সম্মান জানালো।

এবারে কিন্তু পূর্বপরিচিত তরুণ বন্ধুদের পক্ষে স্বামীজীর কাছে আসা শক্ত হল। কারণ, ভীড় করে এগিয়ে এলেন নাগরিক জীবনের মাতব্বর সম্প্রদায়। এর থেকে একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মানুষ ও মতের যথার্থ মূল্য দিতে পারে তরুণ সমাজ।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামীজী নটি দিন মদ্রাসে অবস্থান করেন। সমুদ্র-তীরবর্তী সেই বাড়ীটি Kernan Castle নামে সুপরিচিত। এ বাড়ীতে তখন জন-সমাগম হয়েছিল তীর্থযাত্রীদের মতো। দর্শনার্থীর ভীড় লেগেই আছে। আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। যেন তারা মন্দিরে আসছে দেব-দর্শনের অভিপ্রায়ে। দক্ষিণ-ভারত প্রধানত শৈবধর্মের দেশ। তামিলনাডের শৈবসাধকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তরুণ সাধক সম্বন্ধর-কে—যিনি মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন বলে জনশ্রুতি। বর্তমানযুগেও তাঁর অসামান্য প্রভাব। মদ্রাস শহরে রটনা হয়ে গেল—শ্রেষ্ঠ শৈবাচার্য সম্বন্ধর্ আবার ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন স্বামী

বিবেকানন্দ রূপে। দক্ষিণের নরনারী কথাটি মেনে নিয়েছিল পূর্ণ বিশ্বাসে, এবং স্বামীজীকে চোখে দেখার পরে তাদের সে বিশ্বাস ভাঙেনি, বরং দৃঢ়তর হয়। বিবেকানন্দের সম্মুখে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদিত হত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের দ্বারা। পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে তারা আশীর্বাদ ভিক্ষা করত এই "নবীন সম্বন্ধর"-এর।

স্বামীজীর বিরোধিতা করবার মতো লোকও ছিল। কোনো সন্ন্যাসীর সাধনা বা পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে স্বভাবতই স্থানীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টা হয় সেই নবাগত আগন্তুকদের মহত্ব যাচাই করা। মদ্রাসেও এরূপ চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কেউ আসতেন পাণ্ডিত্য পরীক্ষায়, কেউবা করতেন বেদান্তের কূটতর্ক, কারও উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলসূত্র নিয়ে আলোচনা। তাছাড়া বিবেকানন্দের যুগোচিত মনোভাবের তো ছিলই। আমেরিকা যাত্রার আগে জনৈক গোঁড়া পণ্ডিতের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়—তিনি সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্বক ম্লেচ্ছভাষীদের নিকট স্বামীজীর হিন্দুধর্মপ্রচারের সংকল্পের কথা শুনে বিষম চটে যান এবং তারপরে স্বামীজীর সকল কথায় ঘাড় বেঁকিয়ে কেবল "কদাপি ন, কদাপি ন" বলতে থাকেন। অপর একজন ব্রাহ্মণ তো স্পষ্টই বললেন: শাস্ত্রে কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য সন্ন্যাসের বিধি রয়েছে। আপনি তো ব্রাহ্মণ নন। সুতরাং আপনার সন্ন্যাস অশাস্ত্রীয়। অবশ্য সমস্ত রকম প্রশ্নের জন্যই স্বামীজী তৈরী ছিলেন। দ্রুত ও তীক্ষ্ণ উত্তর যোগাতে তাঁর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হত না। একবার এক তামিল পণ্ডিত স্বামীজীর সংস্কৃত উচ্চারণের ত্রুটি ধরাতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছিলেন: "The fellow who cannot pronounce Jnana properly has the cheek to criticize my *pronunciation of Sanskrit.* (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তামিল রসনায় 'জ্ঞান' শব্দটির সাধারণ উচ্চারণ 'ঞান')।

কিন্তু এই ধরণের লোকের সংখ্যা স্বভাবতই কম ছিল এবং এ ভাবের মনোভাব নিয়ে এলে সাধারণ দর্শনার্থীও তাকে বড় একটা প্রশ্রয় দিত না। এই সময়ে যাঁরা কাছে থেকে স্বামীজীকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর "বিমিশ্র প্রকৃতি" (composite nature) দেখে। একজন অনুরাগী বিবেকানন্দের বাঙালি-দুর্লভ দৈহিক গঠনের উল্লেখ করে লিখছেন: আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, এমনকি মেজাজে পর্যন্ত তাঁকে সর্বদা সন্ন্যাসী বলে মনে হত না—In manner Vivekananda was natural, unaffected and unconventional. There was none of that solemn gravity, measured utterance and even temper that we usually associate with a sage.

Kernan Castle-এ নিরতিশয় কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যে অল্পকিছু অবসরের মুহূর্তে স্বামীজীর হালকা দিকের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন মদ্রাসী অনুরাগীরা। একদিন তাঁরা স্বামীজীকে অনুরোধ জানালেন "গীতগোবিন্দম্"-এর অষ্টপদী গাইতে।

বিবিধ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধারার প্রাসঙ্গিকতা

হরিপদ চক্রবর্তী

মানুষ কী চায়, কী চাই মানুষের জন্য—এ প্রশ্নগুলি পুরাতন। শুধু পুরাতন নয়, সনাতন এবং গোলমেলে। 'গোলমালে মাল আছে,' গোল ফেলে মালটি নেবে—' (কথামৃত ১।১১।৭) বলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এই মাল বা সার বস্তু কী তা নিয়েই বিতর্ক সর্বাধিক। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুবর্গের কথা বলেছেন শাস্ত্র। ভাষ্যকাররা তা নিয়ে অনেক কূট তর্ক তুলেছেন। এই চারটি কি আলাদা করে স্বতন্ত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ সমচতুর্ভূজ ক্ষেত্রের মতো, না পরস্পর বিন্যস্ত স্তরবদ্ধ সোপানের মতো? কামনার পূর্তি চাই, পূর্তির যা করণ তা অর্থ। অর্থ ধর্মমূল। কামো হি প্রথমঃ কল্পঃ। প্রথম তিনটি ত্রিবর্গ বন্ধন স্বরূপ। চতুর্থটি বন্ধন মুক্তি মোক্ষ। আবার চারটিকে স্বতন্ত্র পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেন অনেকে উপায় নয় উপেয় রূপে। কাম বা কাঞ্চন বা ধর্ম যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনদর্শ—কাম শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ধর্ম শাস্ত্র স্বতন্ত্র জীবন বেদ। ফলে বিভিন্ন কালে ওদেশে এই সব বর্গের অসম নীতি বিষাক্ত অবুর্দ বা টিউমার সৃষ্টি করেছে মানব-সমাজ দেহে।

স্থান কাল পাত্র ভেদে এই চাওয়ার নানা বৈচিত্র্য-ও লক্ষ্যণীয়। একই ব্যক্তির মধ্যে কৌমার যৌবনাদি বিভিন্ন বয়সে এই বর্গগুলির উদয়-বিলয় ঘটে। আবার সমাজে যখন যে চাওয়াটি বা বর্গটি মুখ্য হয়, তখন গড়ে ওঠে তদনুগত যুক্তি ও আনুষঙ্গিক কর্ম পদ্ধতি। এর সাধারণ নাম যুগধর্ম আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়োধর্ম। রাজনীতি-সমাজ নীতি-ধর্ম-কর্ম জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই বিশেষ মতবাদ ও আচার পদ্ধতি সৃষ্টি হয়, গড়ে ওঠে সম্প্রদায় ও দল। আন্দোলনের সমষ্টিগত বিরাট উচ্ছ্বাসের পেছনে—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের অঙ্গীভূত বিন্দু বিন্দু জল কণার মতো যে ব্যষ্টি মানুষ, খণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে, সেটি সর্বদাই থাকে অলক্ষিত কাজেই উপেক্ষিত। অথচ শক্তির মূল উৎস রূপে, সমূহের একক রূপে ব্যষ্টি মানুষের গুরুত্ব-ই সর্বাধিক। বিন্দু বিন্দু জলকণা নিয়ে সমুদ্র, এক একটি ব্যষ্টি মানুষ নিয়ে সমাজ।

এই ব্যষ্টি মানুষের চাওয়ার স্বরূপটি তবে নিজস্ব বুদ্ধি ও রুচির অনুগত। যে যেমনটা বোঝে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'দ'-এর গল্পটি মনে পড়ে। দেবতা, মানুষ অসুরকে এক-ই উপদেশ দিয়েছিলেন প্রজাপতি, একটি অক্ষর বলেছিলেন 'দ'। নিজ নিজ সংস্কার ও প্রকৃতি মতো তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন করে বুঝলেন দম্যত দত্ত, দয়ধ্বম্। দেবতার প্রয়োজন দুর্দমপ্রবৃত্তি দমন করা, স্বভাব-কৃপণ মানুষের উচিত দান করা, আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির অসুরের প্রয়োজন দয়া করা। তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।" প্রত্যেকের মনেই দেবতা,

মানব ও অসুরের সহাবস্থান। এ দিক থেকে এ তিনটি—দম, দান, দয়া—অনুশীলন-যোগ্য সামাজিক গুণ। এটাই হয়ত তাৎপর্য। কিন্তু আর-ও একটি ইঙ্গিত সূত্রে বোধ হয় প্রচ্ছন্ন আছে এই উপদেশে। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রবৃত্তিগুলির সহজাত প্রাবল্য থাকে, তা সংযত করা দরকার এবং তা করতে গেলে প্রবৃত্তির বিপরীত শক্তির সাহায্য প্রয়োজন। আর এটি জন্ম সূত্রে প্রাণধর্মে প্রাপ্ত নয়, সাধনা বা শিক্ষা সূত্রে মনোধর্মে অনুশীলন যোগ্য।

বেদান্ত চর্চার ব্যাপারে যে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধে ও প্রযোজনার কথা বলেছেন শাস্ত্র—তা ব্যাপকার্থে জীবন চর্চার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যার প্রয়োজন নেই, তা মানুষ চর্চা করে না এবং প্রয়োজন বোধটা বহুলাংশে হয়ত সর্বাংশেই অভাব বোধ জাত। আর এই অভাব বোধটা ও স্থান কাল, মুখ্যত পাত্র ভেদে বিভিন্ন। ঋষি যাজ্ঞবলক্য প্রব্রজ্যা করবেন, দুই পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে ধন-সম্পদ ভাগ করে দিলেন। কাত্যায়নীর মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু মৈত্রেয়ী জানতে চাইলেন যে ধন সম্পদ দিয়ে অমৃতত্ব লাভ হয় কিনা। শুনলেন—হয় না। তখন তাঁর মুখ থেকে বেরুল সেই বিখ্যাত উক্তিটি—'যে নাহং না মৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্'—"যা দিয়ে অমৃত লাভ হবে না, তা দিয়ে কী করব আমি।" প্রয়োজনের প্রশ্ন। যে বস্তুর প্রয়োজন নেই, তা চাই না। ধন-সম্পদ ও অমৃতত্ব দুটিই প্রয়োজন জীবনে। বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, ব্রহ্ম-এষণা সবই প্রয়োজন, কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে সর্বদা নয়। কাত্যায়নী বৃত্তি ও মৈত্রেয়ী বৃত্তি—এ যেন দুটি পথ জীবনের, প্রবৃত্তির পথ আর নিবৃত্তির পথ, অবিদ্যার ও বিদ্যার। অনেকে মনে করেন এ দুটি পথ নয়, দুটি চরণ যেন। এ দুটি-ই চাই জীবনে, দুটি দিয়ে চলা।

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদো ভয়ংসহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া ইসৃতমশ্নুতি॥ (ঈশ/১১)

যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা দুটিকেই একসঙ্গে অনুষ্ঠেয় বলে জানেন, অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে, বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন তিনি। অর্থাৎ ঈশোপনিষদের মতে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুটিই প্রয়োজনীয়, কারণ তার যথোপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা জীবনকে সার্থক করে তুলতে হয়।

কিন্তু এতো পথের কথা, করণের কথা—কোন পথে যাব, কেমন করে যাব তার কথা। যাব কোথায়, লক্ষ্য কি তা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোথায়? মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন যে সব কথা, তার মধ্যেই খোঁজা যাক। স্বামী-পুত্র বিত্তাদি বিষয়ের মধ্যে কী খোঁজে মানুষ? প্রীতি বা আনন্দ। এ প্রিয়ত্ব বোধ, প্রীতি, আনন্দ কিন্তু জায়া-পুত্র-বিত্তাদি কাম্য বস্তুতে নেই, আছে কামীয় নিজের আত্মার মধ্যে। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" কাজেই এই আত্মা (self=অহং=আমি) বস্তুটি কী, তা বুঝতে হবে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মূল বস্তু হচ্ছে আত্মজ্ঞান। আত্মানং

বিদ্ধি। নিজেকে জান। আমি কে? আমি কী? আমি এই বোধটির বাহিরে যে বিশ্বজগত আছে, বিরাট আছে, বিবিধ আছে তার সঙ্গে 'আমি'-র সম্বন্ধ কী? এই বস্তুটিকে নানা নামে অভিহিত করেছেন ভারতের ঋষিবর্গ-ব্রহ্ম, ভূমা, তৎ ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত করেছেন অহং ব্রহ্মাস্মি, সোঽহম,। ছান্দোগ্য শ্রুতির ভূমাতত্ত্বে কাব্যমণ্ডিত ভাষায় এই একই কথা বলা হয়েছে—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি (৭।২৪।১)। এই সুখ কিন্তু দুঃখের বিপরীত কোন অবস্থা নয়, তা স্বরূপতঃ আনন্দ আর আনন্দই ব্রহ্ম। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" (তৈত্তিরীয় ৩।৬।১)। গীতায় ভগবদুক্তি—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে ইজুনতিষ্ঠতি'। সর্বভূতের হৃদয়ে আছেন আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর। তার শরণ নাও—ত্বমেব শরণং গচ্ছ।" কেন? তাঁর প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান পাবে। 'তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্।' (গীতা ১৮।৬১), ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর জাতীয় শব্দ গুলি-ব্রহ্ম বাচক এবং আনন্দ, সুখ শান্তি প্রমুখ শব্দও এক পর্যায় ভুক্ত। কী চায় মানুষ জীবনে?—আনন্দ, শান্তি, শাশ্বত সুখ। তাহলে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ কী? একটি সরল, সহজ উত্তর দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব—"ঈশ্বর লাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।' (কথামৃত ১।১০।৬)

[খ]

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, জীব জগতের সম্বন্ধ কী? ঠাকুর বলেছেন—"তিনিই সব হয়েছেন। সংসারের কিছু তিনি ছাড়া নয়।" (কথামৃত ৩।৮।১) "তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।" (কথামৃত ৫।৬।৪)। স্বামীজীর ভাষ্য—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।" তবে এই বহুর মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে মানুষের একটি বিশেষ স্থান আছে। ঠাকুরের ভাষায়—"তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশি প্রকাশ। "মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে। অনন্তকে চিন্তা করতে পারে অন্য জীব পারেনা" (কথামৃত ৫।১২।৪)। জড়ের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের মূল পার্থক্য প্রকাশ শক্তির তারতম্য। ঠাকুর নিজের ভাবে বলেছেন—"যার ঈশ্বরে মন আছে সেই তো মানুষ। মানুষ আর মানহুঁশ। যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে ঈশ্বর নিত্য আর সব অনিত্য সে-ই মানহুঁশ।" (কথামৃত ৩।২০।৭)।

এই মনুষ্য জন্মের সৌভাগ্যের কথা শাস্ত্রে নানা ভাবে বিবৃত হয়েছে। পুরাণে বলা হয় যে পৃথিবী ও মনুষ্য লোক-ই কর্মভূমি, আর স্বর্গাদি অন্যান্য লোক ভোগভূমি। কিছু পেতে হলে কর্ম করতে হয়, সাধনা করতে হয় এবং সেটা কেবল মনুষ্য জীবনে সম্ভব। এজন্য দেবলোকের পিতৃলোকের বাসিন্দারাও মানব জীবন প্রার্থনা করেন। বিশ্বসার তন্ত্র বলেন—

মনুষ্য সদৃসং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে।
দেবতাঃ পিতরঃ সর্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম মানুষম্"

অনুরূপ ভাবের কথা আছে খ্রীষ্ট পুরাণেও—"God created human beings, making them to be like himself." (Geneses I) মানুষের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা তথা সাধনার নাম মনুষ্যত্ব। সৎ শক্তির যে প্রকাশ জড়ে ও প্রাণে অভিব্যক্ত, তা প্রাণী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। চিত্তে বা চৈতন্যের মধ্যে উত্তরণ কেবল মানুষের মধ্যেই সম্ভব। এই বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মানব দেহটি জটিলতম যন্ত্র। মানুষের মন, মনন বিচার শক্তি দুর্বল বস্তু। আচার্য শঙ্কর বিবেক চূড়ামণিতে বলেছেন—

দুর্লভং ত্রয়মেতেতৎ দেবানুগ্রহ হেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রবঃ ॥

দৈব্যানুকূল্য ছাড়া মনুষ্যত্ব,মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের সান্নিধ্য - এই তিনটি দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায় না। গবাদি পশুর গোত্বাদির মতো মনুষ্যত্ব জন্মসাধ্য নয় ষোল আনাই সাধনসাধ্য। অর্থাৎ মানুষ হয়ে জন্মালেই মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। মানবোচিত গুণগুলির অনুশীলন ও অর্জনের দ্বারাই কেবল মনুষ্যত্ব লাভ হতে পারে। কাজেই মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম সোপান শিক্ষা।

জন্ম, বৃদ্ধি, বংশ বিস্তার, মৃত্যু—এই চতুরাঙ্গিক দৈব ধর্মের উর্ধ্বে মানুষের মনেই কেবল কতগুলি প্রশ্ন উঠে—আমি কে—কোঽহম্! এই বিশ্ব কী—কিমিদম্? দার্শনিক পরিভাষায় এর নাম—আত্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার উত্তর যে যেমনটা পায়। তার আলোকে রচনা করে জীবন বৃত্ত। লক্ষ্য, পন্হা ধর্মাধর্ম কর্তব্য-অকর্তব্য, রীতিনীতি—সবই তার জ্ঞান ও অনুভব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয। দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-আত্মা এই পঞ্চকে নিয়ে মানুষ। এই পাঁচটির যে কোন একটিকে সার মনে করে, সেটি আত্মবুদ্ধি হতে পারে। দেহই আত্মা, দেহই আমি—এমন বোধকে বলে দেহাত্মবাদ। এটি-ও আত্মজিজ্ঞাসার ফল, কাজেই ব্যাপকার্থে আধ্যাত্মিক। তেমনি প্রাণ আমি, মন আমি, বুদ্ধি আমি, আমি আত্মা—এই বিচার ও অনুভবগুলি —একদিক থেকে পরম্পরাগত আবার অন্যদিকে যেকোন একটিতে স্থিত হলে তদাত্মক হয়ে পড়ে। আমি কি দেহ? না, আমার দেহ। কাজেই দেহ নই আমি দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু। প্রাণ নই, মন নই, বুদ্ধি নই—আমি আত্মা—এ বিচার পরম্পরাগত। বাহিরের প্রত্যক্ষ দেহ আর ভিতরের গুহাহিত পরোক্ষ আত্মা—এই দুটিতে আত্মবুদ্ধি স্থির হলে যথাক্রমে পাওয়া যায় দেহাত্মবাদ ও অধ্যাত্মবাদ। এ দুটি কেবল বিভিন্ন নয়—বিপরীত। একের ভাব-ভাবনা, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, প্রত্যয় এবং জীবন পদ্ধতি অপরের বিপরীত। মোটামুটি এই দুটি ভাবের মানুষ নিয়েই সমাজ গঠিত এমন কি একই ব্যক্তির মধ্যে এই দুই ভাবের সহাবস্থানও দুর্লক্ষ্য নয়।

গীতার পরিভাষায় এদেরকে বলা হয়েছে দৈব ও আসুর। "দ্বৌ ভূতস্বর্গে লোকে ইস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।" (১৬৬)। কতগুলি সম্পদ তথা গুণ দিয়ে এবং তদানুযায়ী কর্ম ও আচরণ দিয়ে পাওয়া যায় এদের পরিচয়। অন্যান্য অধ্যায়ে কিছু

কিছু উল্লেখ করার পর ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে গুণগুলির। নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, দান, যজ্ঞ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ত্যাগ, শান্তি, দয়া, লোভহীনতা, ক্ষমা, শৌচ ইত্যাদি ২৬টি সাত্তিক-গুণকে বলা হয়েছে দৈবী সম্পদ। আর রজঃ ও তমো গুণজাত দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অসদাচার, কেবল কামোপভোগকেই পুরুষার্থ মনে করে। অসৎ পথে অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা অহংকার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ অবলম্বন করা। অসূয়া ও লোভের বশীভূত থাকা প্রমুখ গুণগুলিকে বলা হয়েছে আসুরী সম্পদ। আসুরিক গুণগুলি মানুষকে অমানুষ করে, পশু করে ফেলে, আর দৈবী সম্পদ-গুলি মানুষকে মনুষত্বে তথা দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। দৈবাসুরী সম্পদ সর্বদাই সব সমাজে থাকে, এমন কি একই ব্যক্তির মধ্যে-ও থাকে তাদের সহাবস্থান। আনুপাতিক হ্রাস বৃদ্ধির ফলে যেমন রোগজীবাণুগুলি সক্রিয় হয়ে কখনো ব্যাধি সৃষ্টি করে, স্বাস্থ্য নষ্ট করে, আবার রক্তের শক্তি ও প্রতিষেধ ক্ষমতার জন্য কখনো বা দেহের কোন ক্ষতি করতে পারে না, অথচ দেহের মধ্যেই নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করে ব্যাপারটা তদনুরূপ। কোলরিজের একটি চমৎকার মন্তব্য আছে এ সম্বন্ধে—"As there is much beast and some devil in man, so there is some angel and some god in him. The beast and devil may be conquered, but in the life never wholly destroyed. বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রের অনুশাসন ও উপদেশে অসতের বিরুদ্ধে সতের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ ও জয়ের কথাই সরাসরি বা রূপকের মাধ্যমে উক্ত হয়েছে। এই সদ্‌বৃত্তি সমূহের তথা দৈবী সম্পদের অনুশীলন দ্বারা মানুষের উপরে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাই চিরকালের মনের সংস্কৃতির সনাতন ধারার ইতিহাস। পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রে মহাপুরুষগণের উক্তিতে মহৎ কাব্যে—নানা ভাষায় নানা চিত্রকল্প একটি কথাই বার বার বলা হয়েছে—যো বৈ ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ, (বৃহদারণ্যক ১।৪।২৩) এবং সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ (মুণ্ডক-৩।১।৬)। যা ধর্ম, তা-ই আর সত্যের-ই জয় হয়। মিথ্যার জয় হয় না।

[গ]

নির্মল আকাশে মেঘ সঞ্চারের মতো, নিরোগ দেহে ব্যাধি সঞ্চয়ের মতো কখনো কখনো সমাজে আসুরী গুণের বৃদ্ধি হয়—যুগের ব্যবধানে মনুষ্যত্বের সংকট ঘনায়। গীতার ভাষায় তাকে বলা হয় ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান। ইহুদি পুরাণে ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বন্দ্ব। নূতন নূতন রোগ লক্ষণের মাধ্যমে পুরাতন ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিরোধক ও রোগ নাশের জন্য কিছু আরোগ্যকর ভেষজ প্রয়োজন হয়। নিত্য ও সনাতনকে নূতন করে অভিসিক্ত ও জারিত করে নিতে হয়। স্থানকালের বিশেষ বিশেষ প্রতিভা বা ব্যক্তির মধ্য দিয়ে অকল্যাণ-অশুভ ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব আসে। ভারতীয় পরিভাষায় তাঁদের বলা হয় অবতার।

অশুভ শক্তির চিন্তার স্ফীতি নাশ করে, তিনি ধর্ম সংস্থাপন করেন। ঈশ্বরের অবতার তত্ত্বে যাঁদের আস্থা নেই তাঁরা-ও অতিবৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক নিয়মেই বিপরীত সংগ্রামী শক্তির আবির্ভাবকে স্বীকার করেন। রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয়-সামাজিক পরিবর্তন ও সংকটের মূলে এই শক্তির বা অবতারের আবির্ভাব হয়। নিত্যস্রোতা ক্ষীণতোয়া সনাতনী ধারাকে তিনি নবভাব বন্যায় উদ্বেল করে তোলেন। উনবিংশ শতকে এমন একটি শক্তির অবতরণ হয়েছিল বঙ্গদেশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধারে। নিত্য সত্যকে, সনাতনকে নূতন ভাষা, ভঙ্গী, তপস্যা, চারিত্র্যে নবীন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি শুধু বঙ্গদেশে নয়, ভারতে নয়—সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর সন্তান বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে। বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের তথা সভ্যতার সংকটের যে পর্যায় ঘনীভূত হয়েছে—দিকে-দিকে-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-গোষ্ঠী-জাতি-শ্রেণী প্রমুখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বিস্ফোরক উপচয়ে উন্মত্ত। সামান্য উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে। আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা—তারকা সংগ্রামের আশংকা একদিকে যেমন সর্বাত্মক বিনাশের মহৎ ভয় জন্ম উদ্যত…অপর দিকে প্রতিটি দেশে ও জাতির মধ্যে ধর্মের ভাষার লোভের প্রতিযোগিতামূলক সংঘর্ষে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে শতধা বিদীর্ণ। বৃহৎ জাতি তথা রাষ্ট্রক্ষেত্রের বিজিগীষা বৃত্তির মতো, প্রতিটি দেশের গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব এমন কি বৈষয়িক, পারিবারিক, হয়ত বা ব্যক্তির মধ্যে-ও একটি ভয়ংকর আসুরী বৃত্তির উৎকট প্রকাশ। গীতা উক্ত আসুরী বৃত্তির চিত্রটি যেন নূতন করে প্রত্যক্ষ করছে। প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি—মনে মনে ভাবছে, এই এতটা পেয়েছি আজ—কাল আরও পাব সম্পদ। এক শত্রু নিপাত করেছি, অপরগুলিকে-ও নিপাত করব। কী মজা—আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী পূর্ণমনোরম সুখী, শক্তিমান —কেউ নেই আমার মতো।

> ইদমদ্য ময়া লব্ধ মিদং প্রাপ্স্যে মনোরমম্।
> ইদমস্তীদমপী যে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ (১৬।১৩)
> তেসৌ ময়া হতঃ শত্রু ইনিষ্যে চাপবানপি।
> ঈশ্বরো ইহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান সুখী॥ ১৬।১৪)

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের বিদায়ী সভায়, ২৭শে সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বাণীটি ছিল—বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ, মত বিরোধ নয়, সম হয়ে ও শান্তি। এই উক্তির প্রতিটি শব্দের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দর্শন প্রতিফলিত। নিবেদিতা যথার্থই বলেছেন—গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন রহস্যের সূত্র লাভ করিয়াছিলেন।

শিক্ষা, সেবা, সাধনা, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যে মহাসমন্বয় সম্ভব—সব কিছুর মূলে যে একই সত্যের প্রকাশ—বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের প্রথম ভাষণে স্বামীজী শিব মহিম্নস্তোত্রের শ্লোকটি উদ্ধার করে বলেছিলেন। এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিভিন্ন ধর্ম সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এবং যত মত

তত পথ—এই মহাবাক্য বেরিয়ে ছিল তাঁর মুখ থেকে। যত মত তত পথ কেবল ধর্মের মধ্যে নয়, ব্যক্তি সম্বন্ধে, রাষ্ট্রে, আন্তর্জাতিক সমস্যার মূলসূত্র রূপে—যাকে গণতন্ত্র বলা হয় তার বীজ রূপে গ্রহণযোগ্য। মানুষের সাধনার এমন উজ্জ্বল ঘোষণা, সমাজ-জীবনে আধুনিক যুগে আর শোনা যায় নি।

কাম-কাঞ্চন, ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি অসুখী বৃত্তির চাপে মনুষ্যত্ব পীড়িত। উদার মনুষ্যত্বের জন্য মানবীয় গুণগুলি, যা দৈবী সম্পদ বলে উক্ত তার অনুশীলন প্রয়োজন। ঠাকুর বলেছিলেন—মানহুঁশ। নিজের চরিত্রের মধ্যে চৈতন্যের মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঐশী শক্তির প্রকাশ। এরই নাম মনুষ্যত্বের সাধনা, লেখায়, ভাষণে, চিঠিপত্রে, কথোপকথনে—নানা ভাবে দেশে-বিদেশের অনুগত বন্ধুর কাছে একটি কথাই বলেছেন বারবার…'মানুষ হও।' ভারত মন্ত্রের শেষ প্রার্থনাটি স্মরণ করা যাক—"আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো। আমায় মানুষ করো।"

এ প্রার্থনা সনাতন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনে এর সমবেত প্রকাশ, বিশ্ব সমস্যা সমাধানের এটি মূলমন্ত্র কাজেই এর সর্বাত্মক অনুধ্যান ও প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি : কিছু অপ্রকাশিত তথ্য

অরুণকুমার বিশ্বাস

১

খেতড়ির রাজা অজিত সিং (১৮৬১—১৯০১) তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন লাভ করেন আবু পাহাড়ে ৪ জুন ১৮৯১ তারিখে। তারপর দশ বৎসর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শুধু এক মধুর কাহিনীই নয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিচ্ছেদও বটে। স্বামীজীর জীবনী-আলেখ্যতে এই সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার তিনটি মূল্যবান পুস্তক : 'খেতড়ি কা ইতিহাস' (১৯২৭), 'খেতড়ি নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' (১৯২৭) এবং 'আদর্শ নরেশ' (১৯৪০) পুনর্মুদ্রিত হয়নি এবং সহজ-লভ্যও নয়। বেণীশংকর শর্মা তাঁর Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪০) গ্রন্থে অনেক চাঞ্চল্যকর নূতন তথ্য উপস্থাপিত করলেও ঝাবরমলজী এবং মহেন্দ্রনাথ দত্তের সংগৃহীত পুরানো তথ্য একত্র করে তাঁর গবেষণাবস্তু উপস্থাপিত করে উঠতে পারেননি।

বর্তমান লেখকের রচিত এবং অধুনা প্রকাশিত 'Khetri in the Ramakrishna Movement' (প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ১৯৪০) প্রবন্ধে স্বামীজী ও খেতড়ি সম্বন্ধে কিছু নূতন আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে সমস্ত দলিল এবং তথ্য সন্নিবেশিত করা যায়নি। এই প্রসঙ্গে কিছু অপ্রকাশিত অথবা স্বল্পজাত দলিল এবং তথ্য বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

২

ভক্তি-সঙ্গীত বিশেষ করে হিন্দী ভজন স্বামীজীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। তিনটি হিন্দী ভজন স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে বিশেষ করে তাঁর প্রথম খেতড়িবাস (৭ অগস্ট—২৭ অক্টোবর, ১৮৯১)-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রথম গানটি হল 'নর্তকী-গীত' এবং সুরদাস রচিত 'প্রভু মেরে অগুণে চিত না ধরো'। এই গানটি স্বামীজীর মনের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সুবিদিত এবং বিশদভাবে আলোচিত। [১,২,৩] কোথায়, কবে এবং কেন স্বামীজী এই গানটি শোনেন সে সম্পর্কে বর্তমান লেখকের সুচিন্তিত মতামত অন্যত্র প্রকাশিত

---

১. স্বামী বিবেকানন্দ—প্রথমনাথ বসু, প্রথম ভাগ, ১৩২৬, নূতন সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ২৫৫

২. বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ৩০৯—১০

৩. যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭—০৮

হয়েছে।[৪] স্বামীজী যে খেতড়িতে প্রথমবার অবস্থানের সময় গানটি শুনেছিলেন তার মূল্যবান প্রমাণ স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দের লেখা 'স্বামীজীর গানের খাতা' প্রবন্ধে[৫] পাওয়া যায়। স্বামীজী তাঁর গানের খাতাটি মাদ্রাজে ফেলে যান—দ্বিতীয়বার খেতড়ি গমন এবং প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার পূর্বে এবং এই গানের খাতার ১০ম পৃষ্ঠায় স্বামীজীর নিজের হাতে লেখা গানটি পাওয়া যায়। অতএব স্বামীজী গানটি দ্বিতীয়বার খেতড়ি গমনের সময় জয়পুরে শোনেন এইরূপ সংশয় [২,৩] একেবারেই ভিত্তিহীন।

সুরদাসের এই বিখ্যাত ভজনটি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তর পাঠভেদ লক্ষিত হয়।[১,২,৩,৬] তাই স্বামীজী ঠিক কি বাণীতে গানটি শুনেছিলেন অথবা মনে রেখেছিলেন এই কৌতূহল স্বাভাবিক। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত স্বামীজীর গানের খাতার ১০ম পৃষ্ঠার চিত্র (facsimilc) পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়া গেল। স্বামীজীর হাতের লেখা যতটা পড়া যায় (পেন্সিলে লেখা খুবই অস্পষ্ট হয়ে গেছে) তার অনুলিপি উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

প্রভু মেরে অগুণে[৭] চিত না ধরো / সমদর্শি নাম তুঁহারো একই ব্রহ্ম করো[৮] (কয়ো ?)/এক লোহা পূজা মে রহত হ্যায় এক ঘর বতিক[৯] পর্য্যো / পারশকো সঙ্গে[১০] নাই কাঞ্চন করেম দেয়[১১] (ত ?) খর্য্যো[১২] এক নদী এক নালী কহায়ে [১৩]

ময়রো[১৪] নীর ভরো / যায় মিলে—গঙ্গাজল জাহি দুই[১৫] —একই রূপ ধরো।[১৬,১৭]

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ লিখেছেন[৫] যে, স্বামীজীর গানের খাতার "১০ম পৃষ্ঠায় দুটি গান : 'প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো' এবং 'জয় অরু বিজয়'।" আসলে ঐ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় গানটির আরম্ভ 'দয়ানিধে তেরি গতি লখি না পরে'। এই পঙ্‌ক্তি এবং পরবর্তী পঙ্‌ক্তিটিকে হয়তো স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কোন তৃতীয় গানের অংশ অথবা প্রথম গানের শেষাংশ বলে মনে করেছিলেন। যাই হোক, বিখ্যাত এই ভজনটি সুরদাস[১৮]-রচিত এবং সুদীর্ঘ দশম পৃষ্ঠায়, স্বামীজী যতটুকু লিখেছেন তা হল :

(এ) দয়ানিধে তেরি গতি লখি না পরে
ধর্ম অধর্ম, অধর্ম ধর্ম করি—অকরণ করণ করে
অরু বিজয় পাপ কহ কীনো ব্রাহ্মণ শাপ
দিবায়ো
অসুর যোনি দীনী তাউপর ধরম উছেহ করায়ো ॥
পিতা বচন ছণ্ডে সো পাপী সো প্রহ্লাদে কিনো
তিনকে হেতু খম্ভতে প্রগটে নরহরি রূপ যো লীনো
দ্বিজকুল পতিত অজামিল বিষয়ী গণিকা প্রীতি বড়াই…[১৯]

১৪. ময়রো = ময়লা।

১৫. স্বামীজী 'দুই' কথাটি তলায় লিখেছেন—তীর চিহ্ন দিয়ে সংযোগের নিশানা।

১৬. পাঠান্তরে ২, ৩, ৬ :

"এক নদিয়া ইক নার কহাবত, মৈলো হি নীর ভরো,
জব দোউ মিলি এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।"

—নদী আর নালীর ময়লা জল একসঙ্গে মিলে গিয়ে সুরসুরী (= দেবতাদের নদী) বা গঙ্গা নাম ধারণ করে।

১৭. স্বামীজী গানটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তি[১২] লেখেননি :

"এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।"

১৮. ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর (সংগ্রহকর্তা —শ্রীবিয়োগী হরিজী) ১০৯ নং পৃষ্ঠায় গানটির সম্পূর্ণ লিপি পাওয়া যাবে। এই ভজনটি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে : সুরদাসজী—প্রকীর্ণ ; রাগ ধনাশ্রী।

১৯ গানটির আরও ৯টি পঙ্‌ক্তি আছে। শেষ দুটি হল :

"মুক্তি হেতু যোগী বহু শ্রম করৈ, অসুর বিরোধে পাবৈ।
অকথিত তুমহারী মহিমা, সুরদাস কহ গাবৈ ॥"

দশম পৃষ্ঠায় লিখিত প্রথম গানটির অর্থ, তাৎপর্য ও স্বামীজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে [১-৩], কিন্তু দ্বিতীয় গানটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করা যায়নি। প্রথমে দ্বিতীয় গানটির সরল ভাবার্থ লওয়া যাক ঃ

হে দয়ানিধি, তোমার গতি বোঝা ভার। ধর্মে কোন ভেদাভেদ না করে তুমি অকারণ কর্ম কর, জয় আর বিজয় এমন কি পাপ করেছিল যে তাদের তুমি ব্রহ্মশাপ দেওয়ালে ? তাদের সুরযোনি জন্ম দিয়ে তুমি ধর্মের উচ্ছেদ করালে। পিতার বচন লঙ্ঘন করা পাপ, যে পাপ প্রহ্লাদ করেছিল। সেই প্রহ্লাদের জন্য তুমি নরহরি রূপ ধরে থাম থেকে প্রকট হলে। দ্বিজকুলের কলঙ্ক অজামিল ঘোর বিষয়ী এবং গণিকাসক্ত থাকা সত্বেও মৃত্যুকালে নিজ পুত্র নারায়ণকে ডেকে 'নারায়ণ' নাম করার জন্য মুক্তি পেল। ···যোগীরা মুক্তি পাবার জন্য অনেক পরিশ্রম করেন, কিন্তু অসুর তোমার বিরোধিতা করেই মুক্তি পায়। তোমার মহিমা অকথনীয় এইরূপ বলা হয় –সুরদাস আর কি গাইবে !

এই গানটি স্বামীজী খুব সম্ভবত খেতড়িতেই শোনেন এবং গাইতে শেখেন, কারণ, খেতড়িবাসের পরে জুনাগড় ভ্রমণের সময় স্বামীজীকে ঐ গানটি গাইতে শোনা যায়। গানটি পরিব্রাজক স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। সুরদাসের মতন স্বামীজীর মনেও 'নিঠুর দরদী' 'দয়ানিধি' ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ অভিমান ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন তিনি অনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বড় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"এই সময় (রাজপুতানা ভ্রমণের সময়) স্বামীজীর মনের ভাব বড়ই বিষাদপূর্ণ ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বা কি হইল ! কেবলমাত্র পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান এই না ! কিছুই ত পাইলাম না, দেহরক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র ।···বুদ্ধদেবের বিষাদভাবের সহিত স্বামীজীর এই সময়কার জীবনের বিষাদভাবের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে, স্বামীজী এই সময় যে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও এইরূপ বিষাদ ও গভীর খেদোক্তি পূর্ণ ছিল।"[২০]

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি-কথায় পাই যে, "স্বামীজী যখন জুনাগড়ে, তখন (সুবিখ্যাত ও হৃদয়বান বৈদ্য) (ঝণ্ডু) ভট্টজীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। সেইখানে স্বামীজীর মুখে 'দয়ানিধি তেরী গতি লখি না পরে' এই গানটি শুনিয়া ভট্টজী কাঁদিয়াছিলেন।"[২১]

"কাঠিয়াওয়াড়ে ভ্রমণ করিবার সময় একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বামীজী মূলজীর (জনৈক ব্রাহ্মণ গায়ক) মুখে ভক্তকবি সুরদাসজীর 'দয়ানিধে তেরী গতি লখি না পরে', 'প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো' প্রভৃতি গান, বিশেষতঃ সকালে 'শশধর তিলক ভাল, গঙ্গা জটাপর' গানটি শুনিতে ভালবাসিতেন।"[২২]

স্বামীজীর প্রিয় তৃতীয় হিন্দী ভজনটি রচনা করেছেন তাঁর শিষ্য স্বয়ং খেতড়ির রাজা অজিত সিং। রচনাটি সহজলভ্য নয়[২৩] বলে সম্পূর্ণভাবে নিচে উধৃত হল:

বিন (উন) বিন মোহি কুঁ কছু ন সুহাবৈ,
তরফত চিত অতি হী অকুলাবৈ ॥২
এ রী! সখী হমরে পীতম কো,
জায় কোঈ য়হ বাত সুনাবৈ।
য়হ জীবন ছীজত হৈ ছন ছন,
বীত গয়ে পর ফির নহীঁ আবৈ!
বিন বিন…॥ ৬
বহুত কাল বীতে আবন কে,
গিনত-গিনত জিয়রা ঘবরাবৈ।
হায়, দঈ অখিয়াঁ তরসত হৈঁ,
বিরহ বিপত নিত মোহি জরাবৈ।
বিন বিন…॥ ১০
মরণ ন দেত আস মিলবে কী,
জীবন ছিন বিন (উন) বিন নাহি ভাবৈ।
সুধ বুধ সব হী ভুল গয়ী রী!
য়হ দুখ তো অব সহ্যো ন জাবৈ।
বিন বিন…॥১৪
মতলব কো গরজী জগ সারো,
অরজী মোরী কৌন সুনাবৈ।
তন মন জীতি রীতি সব করিকৈ,
ভজিহেঁ রাম কাম বনি আবৈ।
বিন বিন…॥ ১৮

২২. স্মৃতি কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ৯৬

২৩. আদর্শ নরেশ—ঝাবরমল শর্মা, ১৯৪০, পৃষ্ঠা ৮১—৮২

হে জগদীশ ঈশ বিশ্বম্ভর
তুম বিন য়হ দুখ কৌন মিটাবৈ।
করো কৃপা করুণানিধি মো পৈ,
মিলে পিয়া জিয় হরষ ন ভাবৈ।
বিন বিন··· ॥ ২২
জ্ঞানী য়াহি জ্ঞান করি দেখৈ,
রসিক য়াহি রস পচ্ছ লগাবৈ।
যোগ ভোগ গতি দোয় এক করি,
সুমতি অজিত পদ সহজ ব্রতাকৈ।
বিন বিন···॥

গানটির সরল ভাবার্থ এইরূপ[২৪] ঃ

তাঁর বিরহে আমার কিছুই ভাল লাগে না। প্রাণ অতি ব্যাকুল। সখি, আমার সেই প্রিয় কোথায় যে তাঁকে গিয়ে আমার মনের কথা বলবে। তাঁকে ছাড়া আমার যৌবন বৃথা যায়। তাঁর দর্শনের জন্য আমার দুই আঁখি তৃষিত। যদিও আমার এই জীবনের উপর আর কোন মোহ নেই তবুও যদি তিনি দেখা দেন—এই আশা আমাকে মরতেও দিচ্ছে না।

এই সংসার অতি স্বার্থপর—কে আমার হৃদয়ের ব্যথা তাঁকে গিয়ে জানাবে। রামনামই একমাত্র ভরসা। হে জগদীশ, হে বিশ্বম্ভর, তুমি ছাড়া আর কে আমার দুঃখ মেটাবে। তুমি আমায় কৃপা কর।

জ্ঞানী তাঁকে জ্ঞানস্বরূপ দেখে, আর রসিক দেখে রসস্বরূপ। অজিত বলে যে যোগ ও ভোগের সংমিশ্রণে—অর্থাৎ সাধনার সঙ্গে রস (বা প্রেম) যুক্ত হলে—ঈশ্বরলাভ সহজসাধ্য হবে।

গানটি কিভাবে রচিত হয় তা অন্যত্র[২৫] বলা হয়েছে। এই ভজনটি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি নিজে গাইতেনও। এই প্রসঙ্গে ঝাবরমল শর্মার 'খেতড়ি-নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' পুস্তকের প্রস্তাবনায় (পৃষ্ঠা ৪ –৫) স্বামী অখণ্ডানন্দ ২৭.৯.১৯২৭ তারিখে লেখেন ঃ

"ওয়ে (রাজা অজিত সিং) অচ্ছে কবি থে উনকা হৃদয় প্রেম-পূরিত থা। উনকে রচিত গীত মধুর পদকী য়াদ মুঝে অভীতক বনী হুঈ হৈ। টেক্ (ধুয়া বা আখর) থী 'বিন বিন মোকু[৩] সুহাবৈ। তড়ফত জিয় অতি হী অকুলাবৈ'

পদকী সমাপ্তিমেঁ থা—'মরণ ন দেত আস কী' বস, ইস্ শেষ পঙ্ক্তিকে ভাবকী প্রশংসা করার সময় পদ গাতে হুয়ে স্বামী বিবেকানন্দজী আজ মগন হো যাতে থে।[১৬] য়হ এক হী পদ স্বামীজীকে প্রেমপূর্ণ ভাবুক হৃদয়কা প্রকৃষ্টপরিচায়ক হৈ।"

রাজা অজিত সিং-এর কবি ও সঙ্গীত-প্রতিভা এবং খেতড়ির অন্যান্য সঙ্গীত কলাবিদ্‌দের সঙ্গে স্বামীজীর সাঙ্গীতিক যোগসূত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অন্যত্র প্রাপ্তব্য[১৭]।

৩

প্রবন্ধের এই তৃতীয় অংশে স্বামীজী ও খেতড়ি সংক্রান্ত কিছু অপ্রকাশিত দলিল পরিবেশন করছি। স্বাধীনতার পরে যখন দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন খেতড়ি রাজ্যের কিছু সরকারী দলিল, রোজনামচা এবং স্বামীজী, রাজা অজিত সিং, মোতিলাল নেহেরু, মুন্সী জগমোহন লাল ইত্যাদি লিখিত পত্রাবলী পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার সংগ্রহে আসে। এই কাগজপত্রের কিছু অংশ ঝাবরমল-সংগ্রহ হিসাবে নয়া দিল্লীর Nehru Memorial Museum & Library-তে সংরক্ষিত আছে[১৮]। বেণীশঙ্কর শর্মা এই কাগজপত্রের অধিকাংশ তাঁর মূল্যবান পুস্তকে[৯] ব্যবহার করলেও, কিছু দলিলের প্রতিলিপি (facsimile) তাঁর পুস্তকে পাওয়া যায় না; এমনকি কিছু দলিলের উল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেননি। এতাবৎ অপ্রকাশিত প্রতিলিপি (facsimile)-গুলি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার জন্য বর্তমান লেখক নেহেরু স্মারক পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ এবং ঝাবরমলজীর দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দ শর্মার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

স্বামীজী তখন মাদ্রাজে—প্রথমবার আমেরিকা (চিকাগো ধর্মসভা) যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন—সম্পূর্ণ অর্থসাহায্য জোটেনি। তাঁর প্রিয়শিষ্য রাজা অজিতসিং গুরুর আশীর্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করেছেন, এবং সচিব মুন্সী জগমোহনলালকে

মাদ্রাজে পাঠিয়েছেন যাতে স্বামীজী দ্বিতীয়বার খেতড়ি এসে নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করেন। স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করছেন জেনে রাজা অজিত সিং জগমোহনলালকে যে চিঠি লেখেন (১১ই এপ্রিল, ১৮৯১) তার বয়ান (text) পূর্বে প্রকাশিত[৩০] হলেও, হাতে-লেখা চিঠিটির আংশিক প্রতিলিপি (facsimile) এই প্রথম উপস্থাপিত করা হচ্ছে। ১২ সেন্টিমিটার × ১৬ সেন্টিমিটার মাপের দুটি কাগজ সমানভাবে মুড়ে (fold করে) এই চিঠি হাতে লেখা হয়েছে—অর্থাৎ আটটি পৃষ্ঠা বা surface-এর প্রায় মাপ ৬×৮ সেন্টিমিটার। ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৮ম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া গেল। এই চিঠি থেকে জানা যায় যে, স্বামীজী পশ্চিমে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—প্রয়োজন হলে পায়ে হেঁটে আফগানিস্তান হয়ে যাবেন—কিন্তু দক্ষিণী রাজা টাকা দিতে গড়িমসি করছেন —শিষ্য অজিত সিং যে করে হোক গুরুর প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবেন এবং 'shall never show the cloven foot'। রাজার হস্তাক্ষর-সম্বলিত এই চিঠিটি একটি অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল।

আমেরিকা যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীজী ভারতবর্ষে যত চিঠি লিখেছেন তার বেশির ভাগই মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং অজিত সিং-কে উদ্দেশ্য করে। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এই সময় খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সহিত স্বামীজীর সর্বদা চিঠি লেখা চলিত।" চিঠিগুলির মূল অথবা মর্মার্থ আলমবাজার মাঠে পাঠানো হত। "পত্রগুলি অধিক হওয়ায় কথিত আছে সেগুলি পুড়াইয়া ফেলা হয়। সে পত্রগুলি পাইবার আর কোন আশা নাই।[৩১] স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, আমেরিকা থেকে লেখা স্বামীজীর প্রথম চিঠি আলাসিঙ্গার উদ্দেশ্যে (২০শে অগস্ট, ১৮৯৩):

"জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে পৌঁছিলাম···কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌঁছিলাম। তথায় আন্দাজ বারো দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে মেলা বিরাট ব্যাপার···।"[৩২] স্বামীজী Vancober-তে পৌঁছান ২৫শে জুলাই এবং Chicago-এ পৌঁছান ৩রা জুলাই।[৩৩] 'আন্দাজ বারো দিন' অন্তত ভ্রাম্যমাণ অর্থ-সংকটে ক্লিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামীজী চিকাগো মেলার 'বিরাট ব্যস্ততা' দেখেছেন।

চিকাগো থেকে বোস্টনে যাওয়ার আগে মেলা থেকে রাজা অজিত সিংকে পাঠানো greeting card-ই সম্ভবত স্বামীজীর আমেরিকায় পৌঁছে লেখা প্রথম চিঠি। এই তথ্য

আবিষ্কৃত হয়েছে ঝাবরমল-সংগ্রহ থেকে, অথচ কোনও কারণে বেণীশঙ্করজী এই বিষয়ে নীরব। পূর্বে অজ্ঞাত এবং অপ্রকাশিত এই মূল্যবান দলিল সর্বপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। Greeting Card-এর এক দিকে Columbian Exposition-এর ছবি এবং স্বামীজীর হাতে লেখা আশীর্বাদ ও শুভকামনা। এক সেণ্ট পোস্টাল কার্ডের অপর দিকে স্বামীজীর হাতে লেখা খেতড়ি-রাজের ঠিকানা। চিকাগো ডাকঘরের ছাপের তারিখ ১২ই অগস্ট—অনুমান করা যায় বোস্টন যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী এই কার্ডটি পোস্ট করেছিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর চিড়াবা হয়ে এই কার্ডটি খেতড়ি পেঁছিয় ১৪ই সেপ্টেম্বর।

সর্বশেষ যে দলিলটির কথা উপস্থাপিত করে বর্তমান প্রবন্ধটির উপসংহার টানছি তার উল্লেখ বেণীশঙ্করজী করেছেন[৩৪], কিন্তু প্রতিলিপি (facsimile) এই প্রথম প্রকাশিত হল। চিকাগোয় স্বামীজীর বিশ্বখ্যাতি লাভের (১৮৯৩) অব্যবহিত পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে ১১ই মার্চ, ১৮৯৪। মঠের 'জননী' সদৃশ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণেশ্বরের এই উৎসবের জন্য আবেদন / আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন খেতড়ি-রাজকে। ঐ সঙ্গে তিনি মুন্সী জগমোহনলালকে ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ তারিখে চিঠি লেখেন[৩৫] যার অংশবিশেষ রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ঐ অংশটির বাংলা ভাবানুবাদ জানিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটির উপর যবনিকা টানছি ঃ

"আমরা খুবই আনন্দিত হব যদি আপনারা দয়া করে আসেন এবং এই শুভ উৎসবে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

"আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা আপনারা একবার এসে দেখুন যে, ঐ শুভদিনে কি অলৌকিক কাণ্ড সব ঘটে। যে স্বর্গোদ্যানে (দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে) ভগবান বাস করতেন সেই পুণ্যস্থানে কলকাতা থেকে হাজার হাজার ভদ্রসন্তান আসবেন এবং প্রভুর নামগানে সংসারের সব দুঃখ ভুলে গিয়ে বিমল আনন্দলাভ করবেন। 'মহতো মহীয়ান্' সেই তাঁরই মহিমাকীর্তনে তাঁরা মুখরিত হয়ে উঠবেন। এক কথায় বাগানের উৎসব স্থানটি এক অপূর্ব দিব্যশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সাধারণ চক্ষুর অগোচর হলেও ঠাকুর সকল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে দিব্যানন্দ ও শান্তি প্রদান করবেন। এমন মহান দৃশ্য দেখতে এবং অনুভূতি লাভ করতে কি আপনারা আসবেন না ?"

রাজা অজিত সিং, মুন্সী জগমোহনলাল প্রথম খেতড়ির ভক্তগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত এই আধ্যাত্মিক আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের স্মৃতি অবিস্মরণীয় ও অমর।

৩৪। Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter of His Life—Beni Shankar Sharma, p. 181

৩৫। Ibid, pp. 178—80

একশো পঁচিশ বছরে বিবেকানন্দ উপলব্ধি

গোপাল হালদার

স্বামী বিবেকানন্দের একশ পঁচিশ বৎসরের জন্মজয়ন্তী এ সময়ে (১৯৮৭-৮৮) অনেক স্থানে পালিত হচ্ছে। শুধু তাঁর স্বদেশে নয়, পৃথিবীর প্রধান সভ্য দেশেরও অনেক কেন্দ্রে। অবশ্য সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং জীবনদর্শনকে নিজ-নিজ দৃষ্টি, শ্রদ্ধা এবং আদর্শ অনুযায়ী যথাশক্তি প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, মানুষের রুচি যেমন বিভিন্ন, দৃষ্টিশক্তিও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেমনি বিভিন্নভাবে নিবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। সকলের শ্রদ্ধা এবং আদর্শের মধ্যে একটা মিল থাকলেও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতি তা আকৃষ্ট হবে, তাতে কিছু না কিছু পার্থক্যও প্রকাশিত হবে। বোধহয় কোনো জীবন্ত বা মহৎ মানুষের জীবন শুধু একভাবে দেখা চলে না। কতকটা তাঁদের প্রতিভার নানামুখী বিকাশের আর মহত্বের নানারূপ বিস্তারের কারণেই সেই একই মানুষ এরূপ সত্যের নানা রূপের আদর্শস্থানীয় হন। নানা দৃষ্টিপক্ষ থেকে যতই দেখা হোক, সত্যের প্রকাশকেন্দ্র যে তাঁর একই জীবন—তাও সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করি। এই কথা মনে রেখেই আমি আমার দৃষ্টিতে বিবেকানন্দকে প্রধানত যে-রূপে দেখেছি, এবং যে-ভাবে কিছু না কিছু উপলব্ধি করে থাকব, বিবেকানন্দের প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধি তা না-ও হতে পারে, স্বীকার করি। যাঁরা বিশেষ রকমের স্বামী বিবেকানন্দকে জীবনের প্রধানতম আলোকবর্তিকারূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে এক অধ্যাত্ম প্রেরণারূপে জীবনে যাঁরা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট এবং সক্ষম,—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে পারি—আমার অনুভূত বিবেকানন্দ প্রধানত অধ্যাত্মিক আলোক-স্তম্ভ নন ; পার্থিব জ্ঞান কর্ম আর জাতীয় চেতনার এবং মানবমাহাত্ম্যের নানা দিকের প্রেরণার উৎস-রূপেই তাঁকে বিশেষ নিকটতম বলে অনুভব করেছি। সেই বিবেকানন্দকে আমি তুচ্ছ বলে মনে করতে পারি না। যদিও জানি, বিবেকানন্দ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী।

এই একশ পঁচিশ বছরে একবার আমাদের মতো করে সেই মহৎ জীবনের কথা স্মরণ করলে তা তাঁর ভক্তদের নিকট অমার্জনীয় হবে না,—এই আমার বিনীত আশা।

আমরা স্বামীজীকে প্রত্যক্ষ দেখি নি, কিংবা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত নই, আর তাই হয়তো বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদের সম্পূর্ণতা অনুধাবনে অসমর্থ হই। আমরা অনেকেই তাঁকে জানি প্রধানত তাঁর লেখা আর বক্তৃতা পড়ে ; সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই কতকাংশে জানি তাঁর ভক্তদের কথা, লেখা এবং তাঁদের জীবন আর

সাধনা দেখে। সেসবে সহজ মানবধর্মের একটা নির্মল স্পর্শ আমরা অনুভব করি। তবু আমরা অনেকেই সাধারণ মানুষ,—বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর নানা সমস্যায় বিজড়িত মানুষ; আবার বাঙলাদেশেরও এই শতাব্দীর আধুনিক মানুষ। আধুনিক কালের প্রধান এবং বিরাট ভয়ংকর যে রূপ আজ পৃথিবীর মানুষকে মথিত আলোড়িত করছে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেক সময়ে সকলকেই ভয়ে কম্পিত করে তুলছে, সে রূপকে আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। আবার সেই বিভীষিকা সত্ত্বেও পৃথিবীর আশ্চর্য রূপ আর মানুষের মহৎ চিন্তা-ভাবনা-তপস্যা, জ্ঞান-ভাবনা-কর্মশক্তি, মানুষের আত্মবিচারের উজ্জ্বলতা মানুষ হিসেবে একেক বার উদ্‌বুদ্ধ করে তুলছে। এই অদ্ভুত কালের একেকটি আশ্চর্য মহৎ প্রতিশ্রুতিও সেইরূপ সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করেছে—আমাদেরও করে। শতাব্দীর প্রারম্ভকাল আমাদের জীবনেরও প্রারম্ভকাল। বিবেকানন্দকে জীবনের সেই প্রথম পর্বেই যুগনায়ক হিসেবে দেখেছি। শতাব্দীর প্রতিশ্রুতি যেন তাঁর জীবনে শোনা গিয়েছিল। শতাব্দী অবশ্য এগিয়ে যায়, যুগ থেকে যুগান্তরে ইতিহাসের নতুন আয়োজনে পৃথিবী বারবার পরিবর্তিত হতে থাকে। নতুন কালের নতুন পর্বে নতুন যুগে অতীতের ঐতিহ্য নতুন রকমে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের প্রেরণা জোগায়। কখনো বা একেবারে নতুন চেতনায় অনুভূতিতে মানুষকে একটু না একটু পরিবর্তিত করে, চলন্ত যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। কাজেই সেই শতাব্দীর প্রভাতে যে রূপকে আমরা দেখেছি, শতাব্দীর সন্ধ্যায় তাকে আমরা এই অদ্ভুত শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় নতুন করে উপলব্ধি করি, নতুন কালের মধ্যে তার গহনতর জীবনসত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। অন্তত তাই স্বাভাবিক এবং সমুচিত—যদি আমাদের সে শক্তি থাকে। বিবেকানন্দকেও যদি এ শতাব্দীর শেষের দৃষ্টিতে আমরা নতুন করে গ্রহণ করতে চাই, এবং আমাদের চেষ্টার মধ্যে কোনো ফাঁকি না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই বলব হয়তো শতাব্দীশেষের এই মূল্যায়নও প্রয়োজনীয়। মিথ্যা না হলে অনুধাবনযোগ্য।

আমরা যখন প্রথম বিবেকানন্দকে পাই—তিনি অবশ্য তার পূর্বেই ধরাধাম ত্যাগ করে গিয়েছেন—তখন স্বদেশী আগুনে বাঙলা উজ্জ্বল। সে আগুনে জাতীয় স্বাধীনতার একটা বৈপ্লবিক প্রেরণা ক্রমেই (১৯০৮ থেকে) জ্বলতে থাকে। আমরা বালকেরা না বুঝেও তখন তাতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছি। সে সময়ে বিবেকানন্দের বক্তৃতা, সদ্য-লেখা পড়ে তাঁকে আমাদের মনে হয়েছিল জাতীয় যুগনায়ক—সম্মুখে স্বাধীনতার যুগ, তিনিই তার নায়ক। তিনিই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে জাতির সত্যিকারের যা প্রয়োজন, ইতিহাসের নতুন চেতনা—যা শুধু ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন নয়—সে সম্বন্ধেও জাগ্রত হতে বলেন। আমরা যেন তাঁর লেখা থেকে একদিকে কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি বর্জন করার নির্দেশ পেলাম, স্বদেশী যুগের উদ্বোধনী বাণী পেলাম, অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর মানুষের

সমারব্ধ কর্মযজ্ঞের এবং ভাবনার আদর্শের আহ্বান শুনলাম। শুনলাম আধুনিক কালের ডাক। বুঝলাম, এই আধুনিক কালের জীবনমন্ত্র না গ্রহণ করলে আমাদের জাতি, সমাজ পঙ্গু হয়ে থাকবে। আমাদের এক কালের গৌরবের ঐতিহ্য মিথ্যা হয়ে যাবে। আমাদের দেশ আর জাতি পৃথিবীর মহৎ জাতিদের সঙ্গে সম-উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে না। বলা বাহুল্য, স্বামীজী তাঁর অধ্যাত্মিক আদর্শ আর অদ্বৈতবাদের আলোকে সেই সমাগত ভবিষ্যৎকেও মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর করবার কথাও বিশেষরূপেই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তথাপি আমরা তাঁকে জেনেছি প্রধানত আমাদের নতুন কালের যুগনায়করূপে, অতীত ভারতের মহৎ প্রবক্তারূপে, এবং আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষা আর আলোকে জাতীয় আদর্শের পথনির্দেশক হিসাবে, সামাজিক কুসংস্কারের অন্ধকারমুক্ত নতুন সমাজের উদ্‌বোধক হিসেবে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ধনী-দরিদ্র, শূদ্র-ব্রাহ্মণ—সকল ভারতবাসীর সমানাধিকারের প্রবক্তা হিসেবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি ভেদোত্তীর্ণ প্রাণবান নতুন জীবনের উদ্বোধক হিসেবে। সময়টা বৈপ্লবিক চেতনায় তখন চঞ্চল। সেই মুহূর্তে, মর্ত্যদেহে না হলেও, বিবেকানন্দ বিপ্লবাদর্শের মন্ত্রণাদাতা রূপেই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই আলোকেই আমরা জানতাম, তাঁর মঠ আর মিশনের যে-সাধনা, তা নিশ্চয়ই ভগবৎচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ; কিন্তু সমরূপেই পশ্চাৎপদ জাতির, সমাজের দুর্ভাগ্য দরিদ্র নরনারীর শিক্ষার, শক্তিচর্চার, নবজাগরণের সংকল্পিত পন্থা—শুধুমাত্র ব্যক্তির অধ্যাত্মমুক্তির বা সাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শন স্বামীর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর বক্তৃতা, লেখা, প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশন—সবই একটা মুমূর্ষু জাতির বাস্তব, সামাজিক, আর্থিক, এককথায় সর্বাঙ্গীণ আত্মগঠনের ভিত্তিরচনা। হতভাগ্য এই জাতিকে, সকল দেশের মানবাত্মাকে সার্থক করে তোলাই যেন বিবেকানন্দের আদর্শ। আমরা কৈশোরের চোখ খুলে দেখলাম—সে যুগে (১৯০১-২০) বন্যায়, দুর্ভিক্ষে সাধারণভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় অসহায় সাধারণ নরনারীর জীবনকে সাহসে সম্মানে শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতেই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশনের স্বামীজীদের চেষ্টা।

বিবেকানন্দের স্বল্প আয়ুর মধ্যে দশ বৎসরও ব্যাপ্ত ছিল না তাঁর কর্মজীবন; অর্থাৎ ১৮৯৩-এ শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যে কর্মকাণ্ডময় জীবন প্রকটিত হল, আর ১৯০২-এ মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর আপনার প্রাণমন্ত্র বিশ্বের কাছে, বিশেষ করে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে অর্পণ করে তা সমাধি লাভ করেছে। তা যেন বাঙলার "১৯০৫"-এর স্বদেশীতে আপন প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। সত্য বটে, হিন্দুধর্মের উদার সত্যের পুনরুদ্ধার, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়াস এবং জাতির পুনর্জাগ্রত মর্যাদা ছিল তার একটি উপাদান। বিশেষ করে সংগ্রামময় প্রাণশক্তি ডায়নামিক, মিলিটানট সাধনা অভিভূত করেছিল তখনকার সকল বাঙালিকে (কতকটা ভারতবাসীকেও)। বাঙালি স্বাদেশিকতা এইবার যেন নতুন তেজ, নতুন সাহস এবং সংকল্পের তাপে অনুরঞ্জিত হয়েছিল। অবশ্য তা তথাকথিত অদ্বৈত-

সাধনার অধ্যাত্ম রঙ ততটা নয়—বাঙালির মন রাঙা হয়ে উঠেছিল বিবেকানন্দের ক্ষাত্র-বীর্যময় জাতীয়তার দানে, জাতীয় স্বাধীনতার সংকল্পে। সেই চোখেই বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশন এবং বিবেকানন্দ-প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণসাধনা এবং অদ্বৈতবাদী প্রচারককেও আমরা দেখেছি। মনে করতে চেয়েছি—তা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সহায়ক; বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সাধনায় আমাদের রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা, এক শান্ত প্রাণদায়িনী সুস্থিরতা।

বাহ্যত রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো সম্পর্ক নেই, তবু অন্তরে-অন্তরে তখনকার বিপ্লবী ওরূপ অধ্যাত্মপ্রেরণার দ্বারা উজ্জীবিত এবং সঞ্জীবিত হত। সেদিনের বিপ্লবীরা আজ আর নেই, তবে তাঁদের স্মৃতি এখনো আছে। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাধারণ ইতিহাস অনেকেই জানেন; তাঁরা জানেন সেদিনের (১৯০১-২৫) বিপ্লবীরা অনেকেই ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তায় অনুপ্রাণিত, বৈপ্লবিক কর্মে উদ্‌বুদ্ধ। কেউ-বা তাঁরা বিপ্লবকর্ম থেকে অধ্যাত্মপ্রেরণার বশে ধর্মপথে, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণও করেন। যাঁরা ১৯২০ পর্যন্ত বাঙালার বৈপ্লবিক ধারার ইতিহাস লক্ষ করেছেন, তাঁরা মনে-মনে অনুভব করেন লর্ড রোনাল্‌ড্‌সের তৎকালীন ১৯১৬?) এই উক্তি একেবারে মিথ্যা বা অকারণ নয় যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে সেকালের বিপ্লবীরা আশ্রয় বা প্রশ্রয় পেয়েছেন। উক্তিটাতে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন খুবই সংগত কারণেই আপত্তি জানিয়েছিলেন। সে আপত্তিও মিথ্যা নয়—তাঁদের সংগঠনের উদ্দেশ্য পলিটিক্যাল নয়। কিন্তু বিবেকানন্দের মৃত্যুর একপক্ষকালের মধ্যেই স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতা কেন মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন, তা আজ আর কারো অজানা নেই। মৃত্যুর পূর্বে বিবেকানন্দও জানতেন ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লব-উদ্দেশ্যোনিবেদিতা,এবং বিবেকানন্দ মঠ আর মিশনকে বৈপ্লবিক বা অবৈপ্লবিক কোনো পলিটিকসেরই কেন্দ্র হিসেবে স্থাপন করেন নি। বিবেকানন্দের সেই প্রতিষ্ঠান কোনো কালে কার্যত পলিটিকসের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হতেও চায় নি—চায় না, এটা খুবই সত্য। যেমন বিবেকানন্দের সমস্ত বাণী আর জীবন এক অর্থে পলিটিকস-নিরপেক্ষ—মঠ-মিশনও তেমনি তার অনুরূপ। কিন্তু প্রত্যেক মহৎ স্বাধীনতাকামী এবং প্রকৃত স্বদেশানুরাগীই পলিটিকসকে শুধু বিলাতি ধারায় শাসনক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, কিংবা ক্ষমতা-প্রয়াসী পার্টিদের সংগ্রামক্ষেত্র বলে মনে করেন না। তাঁরা জানেন, পরাধীন দেশের পক্ষে, পলিটিকসের অর্থ জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা, মানুষের জীবনের প্রধানতম এক সাধনা। সেই সাধনার মধ্যে জাতির সমস্ত সৎ প্রয়াসের বীজ লুক্কায়িত থাকে, বৈপ্লবিক প্রেরণায় তাই ক্রমশ স্ফূর্ত হয়। বিবেকানন্দের সাধনাতেও জাতির সমস্ত সৎ প্রয়াসই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে—তাই তার এত মহত্ব। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিদ্যানুরাগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, লোকসেবা—জনজাগরণের সহায়ক সকল প্রচেষ্টা পলিটিকস-বর্জিত আধ্যাত্মিক ভাবনায় এবং বাস্তব কর্মধারায় কোনো-না-কোনো ভাবে অঙ্কুরিত হয়। তাই তাঁকে বিপ্লবী না ভেবে বিদেশী

শাসকদের উপায় কী ? এই দৃষ্টিতেই বিবেকানন্দকে দেশে-বিদেশে বহু জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল অন্যজাতীয় মহৎ পুরুষ, ভারতীয় বিপ্লববাদের প্রধান এক উৎস বলে মনে করেছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করতে গেলেও শেষ হবে না। কারণ ভবিষ্যতেও এই পৃথিবীর সুধী-সমাজ যখন স্থির দৃষ্টিতে ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্ম এবং প্রসারের কথা লক্ষ করবেন তাঁরাও এই অভিমতকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন। আর স্বাধীনতার পরে বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানই বর্তমান "স্বাধীন ভারতে"র পলিটিক্যাল কর্ণধারদের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—অবশ্য এখন স্বাধীনতার যুগে জাতীয় জীবনের পলিটিক্যাল বা নন-পলিটিক্যাল কোনো সত্যকারের জনসেবার আয়োজন থেকে দূরে সরে থাকার প্রয়োজনও নেই। আসলে, বিবেকানন্দের সত্যিকারের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ সাধকদের সেরূপ জাতীয় চেতনার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা রক্ষণের জন্য ব্যস্ত হওয়ার কারণই বা কী—যদি তাঁরা নিজেদের সাধনা বিস্মৃত হয়ে পলিটিকসের দলাদলিতে আত্মবিস্মৃত না হন ?

বিবেকানন্দের জীবিতকালে ভারতের পলিটিকসের অর্থ ছিল আবেদন আর নিবেদনের থালা বহন—কোনো আত্মমর্যাদাবান পুরুষ সেই সংকীর্ণ অর্থের এবং কর্মের রাজনীতি কি কোনো দিনই গ্রহণ করতে পারেন ? বিবেকানন্দ ওইরূপ পলিটিকসে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট ছিলেন না। আর সমগ্রভাবে দেখলে বলতেই হবে যে, মূলত বিবেকানন্দ ভারতের তৎকালীন জীবনক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ অর্থে প্রকৃত প্রাণবান, পেট্রিয়ট, ডাইনামিক, মিলিটানট, নির্ভীক জীবনযাত্রার জীবন্ত বিগ্রহ ;—সমগ্র জীবনকে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বে উদ্বোধনের সত্যদ্রষ্টা। তাই-ই বিবেকানন্দের জীবনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

একবার গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা তা বুঝি। বুঝি—ইতিহাসের মধ্যে বিবেকানন্দের উত্থানের আয়োজন সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই চলছিল। রামমোহন রায়, কলকাতায় হিন্দু কলেজের মারফত আধুনিক জ্ঞানের উদ্বোধন. এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার. ডিরোজিও বা ইয়ং ইনডিয়ান দল. এমন-কি ১৮৫৭-র অকালবোধন, বাঙলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, হিন্দুমেলা বা জাতীয়মেলা, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা আর ক্রমস্ফুরিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দাবি-উত্থাপন (নিশ্চয়ই তা 'আবেদন আর নিবেদনের থালা' বয়ে নতশিরে ক্ষমতার কাঙালপনা)—সুদীর্ঘ ঊনবিংশ শতাব্দীর এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি চলছিল। নরেন্দ্র দত্তের পরিবার-পরিবেশ ছিল তার দ্বারা প্রভাবিত। সেই শতাব্দীর অস্ফুট প্রেরণাকে কর্মে উজ্জীবিত করে তোলা ছিল ইতিহাসের প্রয়োজন—সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সকলে মিলে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে দৃঢ় কর্ম-যোগে উদ্বুদ্ধ করা। চোখের অগোচরে যে চেষ্টা চলেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীরই শেষ পাদ লক্ষ করলেই তা এখন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ একই কালে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিম ছিলেন সে প্রকাশের

পূর্বাভাস। অবশ্য শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিবেকানন্দ আপন কর্ম সমাপ্ত করে তিরোহিত হন। সমগ্র ইতিহাসের দিক থেকে দেখি. তারই মধ্যে অগ্রগতির প্রথম দীপ্ত শিখা জ্বালিয়ে যান। আমাদের পরম সৌভাগ্য, সে দীপ-শিখায় নব-নব প্রদীপ জ্বালাবার মতো লোকের অভাব তখনকার বাঙালায় হয় নি। স্বদেশী যুগে তৎকালীন বাঙালি নেতাদের কথা—অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, বহু নমস্যদের কথা উল্লেখ করা এখন নিষ্প্রয়োজন। তবু বেশী প্রয়োজন মনে রাখা যে বিবেকানন্দেরই সমকালীন পুরুষ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন দীর্ঘদিন (১৯৪১),—আরব্ধ জাতীয় প্রয়াসকে সর্বরকমে—জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে,—বিবেকানন্দের অনুগামী নয়, সহগামী রূপে. বাঙালীর এবং ভারতীয় সাধনার প্রদীপকে রবীন্দ্রনাথ দীপান্বিতায় পরিণত করে যান। আর সাহিত্যে সংস্কৃতিতে অধ্যাত্ম-প্রতিষ্ঠা ঘটল জাতির। অন্য প্রান্ত থেকে আর-এক উজ্জ্বল শিখা নিয়ে এগিয়ে আসেন (১৯২০-র আগেই) গান্ধীজী। তারপর থেকেই জাগরণের এই প্রভাত আর বাঙলায় সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত ভারত সমুজ্জল। কিন্তু তখন (আনুমানিক ১৯২০) থেকেই একদিকে বিবেকানন্দের শিখা ক্রমশ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাঙলা ছাড়িয়ে ভারতের নানা প্রান্তে রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—সমস্ত পবিত্র প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের সম্পদ হয়ে গেল। অন্যদিকে বিবেকানন্দ-ভক্তরা রাজনীতি-সৃষ্ট সেই জন-জাগরণে কতকটা গৌণ হয়ে পড়তে থাকেন। একজনা ছিলেন বিবেকানন্দের বাণী সেবক—সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৪৭-এ ইতিহাসের একটা পর্ব শেষ হয়েছে ধরতে পারি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার যে পর্বটি ইতিহাসে দেখা দেয়, ১৯১৭তে সে পর্বটি শেষ হয়ে একটা নতুন পর্ব আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশে তাকে স্বাগত করার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও কিছু। সাধারণভাবে বলা যায়, দেখা দেয় মহাযুদ্ধেরই ফল—পিপলস ওয়ার-এর শেষে পিপলস লিবারেশন ন্যাশনাল লিবারেশন পিরিয়ড, সাম্রাজ্যবাদের অবসান করে জাতিসমুদয়ের স্বাধীনতা লাভের পর্ব। কোথাও তা এগিয়ে গেছে, কোথাও তত এগিয়ে যেতে পারে নি ; কিন্তু অগ্রগতি চলেছে। জাতীয় স্বাধীনতা ক্রমশ জনগণতন্ত্রের রূপ নিয়ে উত্থিত হয়।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ থেকে আমরা বলি স্বাধীনতা যুগের আরম্ভ—যে যুগের প্রস্তুতি জ্ঞাতেঅজ্ঞাতে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছিল আমরা দেখেছি, এবং বিবেকানন্দের বাণীতে তা একটা বিরাট প্রেরণারূপে বাঙলা থেকে ভারতবর্ষে ছড়াতে থাকে। লক্ষণীয়—১৯৪৭-এ যে "স্বাধীনতা" আমরা পেয়েছি তা জনগণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নয়, বিবেকানন্দের চিন্তিত বা সংকল্পিত স্বাধীনতা নয়। তিনি চাইতেন ভারতীয় ঐক্য এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। ভারতের সকল ভেদ-বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে মহাজাতিক যে ঐক্য গড়ে উঠেছে (ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি)

ভারত ইতিহাসের ধারায় যেটি মূল চরিত্র, সে ইতিহাসধারা পালটে দিয়ে ১৯৪৭-এ খণ্ডিত ভারত রচিত হল—এ কি বিবেকানন্দ চাইতেন? সকল ধর্মাশ্রয়ী ভেদ (বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ), বর্ণগত ভেদ, জাতি-উপজাতিগত ভেদ, এমন-কি ভাষার নামে বিচ্ছিন্নতা—বর্তমান ভারতের এইসব ভেদকে বিবেকানন্দ কি চাইতেন? সমস্ত তুচ্ছ ভেদকে বৃহত্তর ভারতীয় চেতনার মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে গড়ে উঠবে ভারতীয় সংহতি (ইউনিটি ইন ইনটিগ্রিটি)—এই ছিল তাঁর অনুভূতি। এইসব পার্থক্যকে (ডাইভারসিটি) মিলিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এক ভারতবর্ষ যার মধ্যে ভারতীয় সকল জাতির আত্মশাসন মিলিত ভারতের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। পুরনো ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যকে আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান আর কর্মযজ্ঞের (টেক্‌নোলজির) মধ্যে প্রাণবন্ত করে রূপায়িত করবে—এই না ছিল বিবেকানন্দের আদর্শ? (তাঁর অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে মেলানো এই অভিমতকে "বিবেকানন্দ-ইডিওলজি" বা "বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ" বলতে পারি। (সেই বিবেকানন্দ-উদ্দিষ্ট ভাবাদর্শের কতটুকু ১৯৪৭-এ আমরা 'ক্ষমতা হস্তার্পণের সূত্রে "ভারতে" পেয়েছিলাম? আর সেদিনকার সেই আত্ম-বঞ্চনার ফলে আজ ভারতে সর্বব্যাপী যে কুৎসিত ভেদ আর ক্লীবত্বের কর্দমে আমরা ডুবে যাচ্ছি—এই কি বিবেকানন্দের সহনীয় হত? অর্থাৎ একথা মানতেই হবে, বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অন্তত ১৯৪৭ সালে আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম।

বিবেকানন্দের তিরোধানের পরেও তাঁর প্রেরণা সত্যই তবু—অনেক বৎসর—অন্তত ১৯০৫ থেকে ১৯২৫-৩০ পর্যন্ত, আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাণ-সঞ্চার করত। ১৯৪০-এর পূর্বেই তা আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। কিন্তু কেন? সত্যই তা বিবেকানন্দের দোষ নয়। প্রথমত, কালের নিয়মে সকল আদর্শই নব-নব প্রেরণার দ্বারা পরিপুষ্ট না হলে জীবন্ত থাকে না। একমাত্র সুভাষচন্দ্র ছাড়া বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন কয়জন নেতা? বিবেকানন্দের আদর্শ বলতে পারি ৪০-এর পর থেকে (বিশেষত হিন্দু এবং মুসলমানের বিরোধিতায়) ১৯৪৭-এ এসে মৌখিক একটা ফাঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা অবশ্য বিবেকানন্দের নামে সভা-সমিতি, মূর্তিস্থাপন প্রভৃতি অনেক অনেক জিনিষ আগের থেকে বেশি করেছি। বিবেকানন্দের ভক্তসংখ্যা, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠও এখন অনেক। কিন্তু তাঁর ভাবাদর্শকে কালোপযোগী জীবনদানে বিশেষ চেষ্টা করছি, তা বলতে পারি না। তবু জিজ্ঞাস্য—এ সবটাই কি আমাদের আত্মপ্রতারণা, কিংবা বিবেকানন্দকে ফাঁকি দেওয়া?

একবার গভীরভাবে অনুধাবন করলে বুঝতে পারি: ইতিহাসের ঐতিহাসিক সাধনার অগ্রদূত হিসেবে বিবেকানন্দ সেই সাধনাকে স্থিরভাবে এগিয়ে দেবার মতো সময়, সুযোগ এবং আয়ু পান নি। বিংশ শতাব্দীতেই ইতিহাস বাঙলাদেশে স্বদেশী যুগ নিয়ে এলেও ১৯১৭-র পরে যখন আমাদের স্বাধীনতার কর্মধারায়,

ভাবনায় ভারতবর্ষের নানা মনস্বীর এবং কর্মবীরদের দানও এসে আমাদের জাতীয় চেতনাকে ক্রমশ এগিয়ে নিতে চাইল, তখন আমরা যুগের সে আহ্বানে কান দিতে পারি নি। তখন দুটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল—স্বাধীনতার নতুন ধারণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল ঃ শুধু উচ্চবর্গের ক্ষমতা-হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আয়ত্ত হয় না। জনশক্তির শাসনক্ষমতা আয়ত্ত না হলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় না। তার অর্থ, শুধু ডেমোক্রেসি বা রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, পুরোপুরি আর্থিক সামাজিক সর্বাঙ্গিণ সমাজশাসনের ক্ষমতা সমাজের সৃষ্টিশীল কর্মীশ্রেণীর হাতে না থাকলে সমাজপরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা শোষিত শ্রেণীর লাভ না হলে, জাতি আপনাকে বিকশিত করে তুলবার সুযোগ পায় না। আধুনিক সভ্যতাও শোষক শ্রেণী কবলমুক্ত হয় না। বিবেকানন্দ একথা জানতেন না, তা নয়। এখানে তাঁর বাক্য উধৃত করে লাভ নেই, স্মরণ করাই যথেষ্ট। যথা, 'আই অ্যাম এ সোস্যালিসট', পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণের শাসন শেষ হয়েছে, বৈশ্যের রাজত্ব চলছে ভবিষ্যতে শূদ্রই হবেন শাসক।' এই মর্মের কথা নানাভাবে, নানা ভাষায়, কখনো ভারতের কথা উল্লেখ করে, কখনো অন্যদেশের কথা প্রসঙ্গে বলে, বিবেকানন্দ আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন, আর আমাদের পশ্চাদপদ চেতনাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু কথাটাকে তিনি সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন করে তুলে যান নি। পরিষ্কার করে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর যে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলে শোষক ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের রাজত্ব শেষ হয়েছে তা স্পষ্ট বলে যান নি। "শূদ্রশাসন"-ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব—শ্রেণীসংগ্রামের ফলে মানবসভ্যতায় এই নির্বিত্ত শ্রেণীর উদয় অনিবার্য। যে নতুন যুগ ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তার আভাস বিবেকানন্দ নিজের অন্তরে-অন্তরে পেয়ে থাকলেও আয়ুর অভাবে দেখে যান নি। শুধু তাই নয়—নিজে অধ্যাত্মবাদের বিশ্বাসে, গুরুর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং মধ্যযুগীয় ভগবদ্‌ভক্তি প্রভৃতি ধারণায় বিবেকানন্দ পরিষ্কার করে ভাবতে পারেন নি। যদিও তিনি ফাঁকা ভগবদভক্তির বা অদ্বৈত-বাদের মোটেই অনুরক্ত ছিলেন না, তথাপি তৎকালীন আবহাওয়ায় তিনি বস্তুবাদে (মেটিরিয়ালিজম-এ) বিশ্বাস করতে পারেন নি। স্থূল (ভালগার) জড়তাবাদ যে বস্তুবাদ নয়, তৎকালীন আবহাওয়ায় তিনি তা বুঝতে চান নি। প্রকৃত বস্তুবাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ লাভ করে যান নি। তাই তাঁর "ইডিওলজি" বা "ভাবাদর্শ" ১৯১৭-র পরে কেন, ১৯৪৫-এর সময় থেকেই জিজ্ঞাসু মনের বুদ্ধিকে এবং জনসাধারণের মনকে আর তেমন আকৃষ্ট করে না। "দরিদ্রনারায়ণের" সেবার আদর্শ নিশ্চয়ই তুচ্ছ আদর্শ নয়। কিন্তু প্রকারান্তরে তা দারিদ্র্যকে চিরন্তন অবস্থা বলে স্বীকৃতি দেওয়া। এভাবে "দরিদ্রনারায়ণ" কথাটাকে ভুল বোঝা হতে পারে, কিন্তু সে ভুল বোঝার ফাঁক বন্ধ করা যায় না—যদি আমরা না বলি, শোষিত নারায়ণের সম্পূর্ণ আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা হলেই অগণ্য দুর্গত জনের দারিদ্র্যের অবসান সম্ভব। এ ভুল জনসাধারণের হতে পারে,

কিন্তু ভুল করবার মতো ফাঁক থাকবেই যদি পরিষ্কার করে না বলা হয় যে, শ্রেণী-বিভেদই শতকরা ৯০ টি মানুষের বিকাশের পথে বাধা ; যুগে-যুগে সাধারণ মানুষের অসহনীয় দারিদ্র্যের এবং দুর্ভাগ্যের কারণ।

বিবেকানন্দের বাস্তব জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলেও আমাদের আরও সংশয় থেকে যায়। তিনি যে-স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তা জাতির—জনসাধারণের স্বাধীনতা। কৃষক-মজুর প্রভৃতি উৎপাদনশীল শ্রেণীর হাতে (শূদ্রদের) শাসনক্ষমতা না দিলে সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় না। এ কথাটি তাঁর মনে উঁকি দিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক এই বাস্তব ভাবাদর্শ এবং কর্মকাণ্ডের দিকে পা না বাড়িয়ে, বরং শ্রীরামকৃষ্ণের থেকেই যে ভক্তি এবং মানবপ্রেম প্রভৃতি লাভ করেছিলেন, তা আশ্রয় করে অধ্যাত্মবিশ্বাস অবলম্বন করে রইলেন। নিজের আশৈশব ভগবৎচেতনার মধ্যে নিজেকে মহৎ প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন। সাধারণ কথাবার্তায় যা উল্লেখ দেখি, তাতে মনে হয় মঠ আর মিশন এই অধ্যাত্মচেতনার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মঠ আর মিশনের আকারে তিনি মনে করেছিলেন মানুষকে আরও স্থিরতর একটা পথের সন্ধান দেবেন, যাতে অধ্যাত্মবাদ আশ্রয় করে একদল কর্মী সত্যকার সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর আদর্শকে সাধারণের মুক্তির মধ্যেও জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করবেন। তিনি সম্ভবত স্বদেশে-বিদেশে প্রকৃত প্রবুদ্ধ কর্মী-দল গঠনের জন্য এরূপ মঠ আর মিশনকে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন এবং তাকেই বুঝেছিলেন শ্রেষ্ঠ পথ,—একমাত্র পথ। অন্তত ভারতবর্ষের মানুষ শুধুমাত্র বাস্তবতার আশ্রয়ে জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে, এ কথা তিনিও ভাবতেন না,—তাঁরাও অধিকাংশে ভাবতেন না। এই অধ্যাত্মসীমিত বিশ্বাসই বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শকে সম্পূর্ণ হতে দেয় নি। এবং একালের নিয়মে যখন এই বস্তুবাদ মানুষের সাধনপথ হয়ে উঠছে, তখন বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ যেন ক্রমশ মনে হয় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

আন্তরিক মার্জনা ভিক্ষা করেই বলতে চাই নিজের শেষ সংশয়ের কথা। কাল তো থেমে থাকে না, ইতিহাসে যুগের পর যুগান্তর আসে। বিবেকানন্দ একটা যুগান্তরের শেষে যতদূর পেরেছেন ভাবীযুগকে দেখেছেন, কিন্তু ১৯১৭ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নতুন যুগ (যাকে তিনি মনে করেছিলেন শূদ্রের যুগ) যে সত্যই শোষকশ্রেণীর দাবি নিয়ে উদ্ভূত হবে, তা সম্পূর্ণ তাঁর অগোচর হওয়ার কথা নয়। অবতারের পরেও যেমন অবতার আসে, নতুন অবতারের দরকার হয় (ভক্তদের মতে), বিবেকানন্দের পরেও কাল এগিয়ে যাবে আরও আরও নতুন কালের দিকে। পূর্ণতর ভাবাদর্শ দাবি করে, এ ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকে নিয়ে, তাকে পূর্ণতর করবার দাবিও মনে হয় দেখা দেবে। যাঁরা বিবেকানন্দের সত্যিকারের অনুগামী, তাঁদেরও তাই চলতে হবে বিবেকানন্দকে নিয়েই—বিবেকানন্দের স্পিরিটকে নিয়ে, সীমা ছাড়িয়ে। এই দাবিটা ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে বিবেকানন্দেরই দাবি বিবেকানন্দের অনুগত ভক্ত, মঠ আর মিশনের ঐকান্তিক সাধক-কর্মী-সমাজের কাছে।

যা বিবেকানন্দ বলেছেন, মুখ্য বা গৌণ, তাই, একমাত্র অবলম্বনই নয়, যুগধর্মে তার মধ্যেই কিছু যদি নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়ে থাকে, তবু তার একটুও ত্যাজ্য, পরিবর্তনীয় হবে না—নিশ্চয়ই এরূপ আচরণ বা তথাকথিত সাধনা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নয়। তাই মঠ আর মিশনে, পুজো-আচরণে, বিধানে-নিয়মে, পুরোহিততন্ত্র আর সনাতন বিধিনিয়ম (যা হয়তো নিজের প্রাণবান ঐতিহ্যপ্রীতি আর দেশের সাধারণের সহজ বিশ্বাসের অনুকূল), সেগুলো অক্ষরে-অক্ষরে সর্বত্র প্রতিপালন কি এখনো প্রয়োজন? বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে কি তাই করতেন? সনাতন বিধিনিয়মকে অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই সাধারণভাবে সাধারণের জন্য সাময়িক প্রয়োজন বলে মনে করতেন। তিনি অদ্বৈত আশ্রমে (আলমোড়ায়) পুজো, বিগ্রহ, মূর্তি, আলেখ্য প্রভৃতি কিছুরই স্থান দেন নি। তাহলে বিবেকানন্দের আদর্শকে পূর্ণতর করতে হলে শুধু কি বিবেকানন্দের ওইসব পুজো, পুরোহিত-বিধান প্রভৃতি ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে? সব আচরণ আঁকড়ে থাকাই তাঁর অনুগত মঠ আর মিশনের পক্ষে সুসঙ্গত? তাঁদেরকে আর এগিয়ে যেতে হবে না? বিবেকানন্দের মুখ্য জীবনধারা লক্ষ্য করে নতুন পথে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে না? আইনের সুযোগ গ্রহণের জন্য মঠ-মন্দিরের আশ্রয়ী বিবেকানন্দভুক্ত ভক্ত-গোষ্ঠী হিন্দু সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অঙ্গীকার করতে হবে বিবেকানন্দের এই শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর অসামান্য আস্থা। কিন্তু তাঁদেরই চাই বিবেকানন্দকে আক্ষরিকভাবে তাঁর অনুসরণ না করে বিবেকানন্দের প্রেরণায় ইতিহাসের পথে নতুন কালে এগিয়ে যাওয়া।

এই কথাগুলো ঔদ্ধত্য বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে বিবেকানন্দের স্থান কতটা উপলব্ধি করে একজন সাম্যবাদী যেমন বলতে পারে—সাম্যবাদকেও বিবেকানন্দের মূল বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এদেশের জনসাধারণের অধিক বোধগম্য করে তোলা সমীচীন, তেমনি বলা যায়, বিবেকানন্দ-অনুগামীদেরও সেই যুগনায়কের শিক্ষা এবং সাধনাকে নতুন যুগের সমুচিত জ্ঞানে, ধ্যানে এবং সাধনায় সঞ্জীবিত করা সম্ভব। এই ১২৫ বৎসরের অনুষ্ঠানাদিতে বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাবানদের প্রয়োজন বিবেকানন্দ-আদর্শকে ইতিহাসের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তোলা।

মানুষের কাছে ইতিহাসের এই তো চিরকালের নির্দেশ ঃ চরৈবেতি চরৈবেতি ॥

প্রাসঙ্গিকী

॥ ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব ॥

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোনো স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফলভুগিতে আসিতে হইবে—যদি এমন কোনো স্থান থাকে যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে -যদি এমন কোনো স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি ধৃতি দয়া শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোনো দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে—তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোক-সর্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়-দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃত-সলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্তমান। বন্ধুগণ! বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।...

...যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দু জাতির নিকট জগৎ যতদূর ঋণী, আর কোনো জাতিরই নিকট ততদূর নহে।

যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইউরোপীয়গণের পূর্বপুরুষেরা জার্মানীর গভীর অরণ্যমধ্যে অসভ্য অবস্থায় থাকিয়া নীলবর্ণে আপনাদিগকে রঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস যাহার খবর রাখে না, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবতরঙ্গ ভারত হইতে প্রসূত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটিই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখনও অপর জাতিকে যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই, সেই কর্মফলেই আমরা এখনও জীবিত।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

…প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভা বলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি, সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্চে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপে আচার ছাড়া আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাসবৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না ; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষুসীর প্রাণ একটা পাখির মধ্যে ছিল! সে পাখিটার নাশ না হলে, রাক্ষুসীর কিছুতেই নাশ হয় না ; এও তাই। আবার দেখবে যে, যে অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয় সে অধিকার-গুলো সব যাক না, সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না ; কিন্তু, যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা, বেশ কথা। কিন্তু আসল জিনিস হচ্চে পারমার্থিক স্বাধীনতা —মুক্তি। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য …

এখন বুঝতে পারছ ত, এ রাক্ষসীর প্রাণ-পাখিটি কোথায়? ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতিটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।……যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম কর্ম সব মিথ্যা, তা হলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি ত এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য-সুবিধার বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তি লাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু, এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দীকতক নানা সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে, ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারি প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ।…

আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়? না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে ত ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে এই মাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই, দুদিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু একবার আস্তাকুঁড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে ত, আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়।

……দেশে দেশে আগে যাও, এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের

চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চক্ষে নয়, তবে দেখতে পাবে জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্ ধক্ করছে, ওপরে ছাই-চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাব ধর্ম ;—আর তোমার রাজনীতি সমাজনীতি রাস্তা ঝেঁটান, প্লেগনিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এ সব চিরকাল এ দেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে ; ······

ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলোয়ার ; আর্যের উপায়—বর্ণ বিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।

[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]

॥ ভারতের অবনতির কারণ ॥

কোনো ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব বা নীতি (Policy) সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই যে জাতি আপনাকে পৃথক্ রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়—ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া।······অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।

···যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ, ঐটি, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া উঠিতে হইবে।

[পত্রাবলী]

দোষ শুধু ইউরোপীয়দের নহে—দোষ প্রধানতঃ আমাদের।···যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোনো শক্তি নাই যাহা আমদের কোনো অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক খৃষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ ?···আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা তাহাদের

জন্য কি করিয়াছি?···আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি ; আর নিজেরা নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোক বিস্তারে সহায়তা করিয়াছি।···কাহারও দোষ দিও না, দোষ দাও নিজ কর্মকে। যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, কি মুসলমান ধর্ম, কি খৃষ্টান ধর্ম, কি জগতের অন্য কোন বাদ—কিছুই এখানে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইত না।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

* *

শত শত বৎসর কসরৎ করিয়ে, আমাদের আর্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক সঙ্গে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি,—ফলে আমরা যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি ; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছি। যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ" বাপ দাদা যেদিক দিয়ে গেছে চলে যায়, তারপর পচে ঝরে যায়।

[পরিব্রাজক]

* *

যাহাই nature-এর against-এ rebel করে (প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে) তাহাই চেতন, তাহাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্‌না, একটা সামান্য পিঁপড়ে মারতে যা, সেও জীবন-রক্ষার জন্য একবার rebel (লড়াই) করবে। যেখানে struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার) সেখানে rebellion (সংগ্রাম), সেখানেই জীবনের চিহ্ন —সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ।

···তোরা ছাড়া আর সকল জাতির সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস। তোদের hypnotise (মন্ত্রমুগ্ধ) করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে তোদের অপরে বলেছে তোরা হীন, তোদের কোনো শক্তি নাই—তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বছর হতে চল্‌ল ভাবছিস—আমরা হীন, সকল বিষয়ে অকর্মণ্য ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে 'আমরাই জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি', এই গোঁড়ামি একটি। ভারতকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সদাই বদ্ধ-পরিকর, আমাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি ; তথাপি জগৎ হইতে আমাদিগকে যে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে, এ ধারণা ত্যাগ করিতে আমি অক্ষম।···

···আমাদিগেরও জগৎকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে। ভারতের দেশসমূহের সহিত আমাদিগের সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে এক সময়ে তাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা আমাদের নির্বুদ্ধিতা মাত্র। আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ

আমরা সহস্র বৎসর ধরিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে রহিয়াছি। আমরা যে অপরাপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

* *

ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, একগালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দুচার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কাজ কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা বুঝলি রাম' হল; ওরা ইউরোপীয়রা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহারজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহাউৎসাহে দেশ দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর; আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, নলিনীদলগত-জলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্' গাচ্ছি; আর, যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপীয়। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা !! একথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গও প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী—অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘসে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে পীরিত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করছেন বল,—কিছুই নয়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে, নয় তুমি উৎসন্নে যাও, এ দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যে কিছু চেষ্টা একটু করবে, সে আট-ঘাট তোমার বন্ধ। তুমি এ দুনিয়াটা ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতি পদে বাধা। কেবল এই বৈদিক ধর্মে এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ভাগ্যফলে ইউরোপীয়গুলো প্রটেস্টাণ্ট হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেললে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয়রূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হলো। তবে ভারতবর্ষে ৩০ ক্রোর লোক, দেরী হচ্ছে। ৩০ ক্রোর লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?

বৌদ্ধধর্ম আর বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধ মতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত, ত আমাদের এ সর্বনাশ কেন হল? 'কালেতে হয়' বললে কি চলে? কাল কি কার্যকারণ সম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে? [প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য]

॥ ভাবী ভারত ॥

ভারতের কি অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে? সেই ভারত, যাহা সমুদয় মহত্ত্ব, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন জননী, যে ভূমিতে সাধুগণ বিচরণ করিতেন, যে ভূমিতে ঈশ্বর-প্রতিম ব্যক্তিগণ এখনও বাস করিতেছেন?…

ভারতের কি বিনাশ হইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা চলিয়া যাইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শসমুদয় নষ্ট হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিনষ্ট হইবে, সমুদয় ভাবুকতা নষ্ট হইবে। তাহার স্থলে কাম ও বিলাসিতারূপ দেবদেবীর রাজত্ব হইবে। অর্থ হইবেন—তাহার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে তাহার পূজোপদ্ধতি, আর মানবাত্মা হইবেন তাহার বলি। এরূপ কখনও হইতে পারে না। কার্যশক্তি হইতে সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ; ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে শক্তিমান।

[হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ]

* *

প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিষ ছিল, খারাপ জিনিষও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত— Future India—Ancient India-র অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর।

এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি? নদী বা সমুদ্রের তরঙ্গ যত থামে, ঢেউ তারপর তত জোরে ওঠে—এখানেও সেইমত হবে। দেখছিস না, পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, ওঠবার আর বিলম্ব নাই। তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের সাধন কার্য হচ্চে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে হবে না; শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতির কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে —"ভাই সব, ওঠ, জাগ, আর কতদিন ঘুমাবে?" আর শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল ভাবে তাদের বুঝিয়ে দেগে। এতদিন এদেশের ব্রাহ্মণেরা সেটা একচেটে করে বসে ছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায় তার ব্যবস্থা করগে, ব্রাহ্মণদের তোমাদেরও ধর্মের সমান অধিকার। আচণ্ডালকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ-জীবনের অত্যাবশ্যক আয়গুলি উপদেশ দেগে।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

॥ জনসাধারণ ও অভিজাত সম্প্রদায় ॥

ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য বিজাতি বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোটজাত তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রম-ফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। হে জগতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব, অনবরতনিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, স্পেন, সমরখন্দ, পর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরাজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্চর্য আর তুমি? কে ভাবে এ কথা। স্বামীজী! তোমাদের পূর্বপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য জাতির যা কিছু উন্নতি তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভিক কার্যকারিতা,—আমাদের গরীবেরা ঘর দুয়ারে দিনরাত সে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান তিনিই ধন্য, সে তোমার, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী।—তোমাদের প্রণাম করি।

[পরিব্রাজক]

এই যে চাষাভূষো, মুচি, মুদ্দফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে—দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করচে—মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপর উঠে যাবে। Capital তাহাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের তাড়না নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল বদলে দিচ্ছে—অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচজাতদের উপর এতকাল অত্যাচার করেছিস—এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে—আর তোরা 'হা চাকরী, যো চাকরী' করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

তোদের মত তারা কতকগুলি বইই না হয় না পড়েছে। তোদের মত শার্ট-কোট পরে সভ্য না হয় নাই হতে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল। কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সবদেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্ন-বস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা হুতাশ লেগে যায়—তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজোড় হয়ে

যায়। শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্ন-বস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই কচ্ছিস?

তা না হলে (জনসাধারণের প্রতি ভদ্রলোকদের সহানুভূতি না এলে) তোদের (ভদ্রজাতিদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে, সব ধ্বংস হয়ে যাবি। এই mass যখন জেগে উঠবে আর তাদের উপর তোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের ভিতর civilisation এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙ্গে দেবে। ভেবে দেখ্ গলজাতের হাতে—অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্য বলি, এই সব নীচ জাতিদের ভিতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙ্গাতে যত্নশীল হ। .এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়—তখন তারাও কৃত-উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয় নাই; এরা মানব বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে—আর বুদ্ধিমান চতুর লোকরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের অংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই এরূপ হয়েছে। এখন আর সে কাল নেই। ইংরাজ জাতেরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পারছে ও তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকায় ইতর জাতেরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে—তাতেই ঐ কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতেদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র.জাতেদের কল্যাণ। তাইত বলি, এই mass-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয় তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বল্‌গে—"তোমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভালোবাসি, ঘৃণা করি না।" তোদের এই Sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল বিজ্ঞান, সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

॥ সমাজ সংস্কার ॥

ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে তখন আত্মরক্ষার জন্য

আপনা আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

[পত্রাবলী]

সংস্কারকগণকে আমি বলতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল আমূল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা—আমার সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। ...আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে। অন্যান্য সমাজেও তদ্রূপ। ...দোষ সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা পুরাতন বাতরোগের মত। পা হইতে বাত দূর করিলে, মাথায় বাত ধরিল ; মাথা হইতে উহা তাড়াইলে, তখন আবার উহা অন্যত্র আশ্রয় লইল। ...অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়।

...সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ...সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ-ভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে, এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে,—আমাদিগকে উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। ...যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোনোরূপ সংস্কার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার এইমাত্র ফল হইয়াছে যে. যে উদ্দেশ্যে সংস্কার-চেষ্টা সেই উদ্দেশ্যই বিফল হইয়াছে।...দোষারোপে বা নিন্দাবাদের কি প্রয়োজন? সকল সমাজেই দোষ আছে।

...নিজ সমস্যা পূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর প্রবল সাধারণ মত গঠিত হইতে সময় লাগে - খুব দীর্ঘ সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজ-সংস্কার সমস্যাটি এইভাবে দাঁড়ায় —সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কার-প্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের কোনো বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু এখনও তাহা বুঝে নাই ; এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। ...প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর ; বিধান আপনা আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহার সৃষ্টি কর।

…সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

…সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি আমূল সংস্কার, প্রকৃত সংস্কার নাম দিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নি সংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকুক, একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

*　　　*　　　*

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আমি এমন একটি চক্র প্রবর্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর প্রত্যেক নরনারী আপন আপন অদৃষ্ট আপনিই গঠন করিয়া লইবে। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন : তাহা তাহারা ভাবুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক অপরে এতক্ষণে কি করিতেছে। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমরা একসঙ্গে রাখিয়া দিব মাত্র কিন্তু উহারা প্রাকৃতিক নিয়মে কোনো বিশেষ আকার ধারণ করিবে।

[পত্রাবলী]

আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু খৃশ্চান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম, মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আগে আমাদিগকে ঐগুলো ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। উহারা নিজেদের শুভকারিণী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে —এখন উহারা কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে—উহাদের কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ গুণী তাঁরা পর্যন্ত অসুরবৎ ব্যবহার করে থাকেন। এখন আমাদিগকে ঐগুলি ভাঙ্গবার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে হবে, এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত কৃতকার্য হব।

[পত্রাবলী]

॥ জাতিভেদ ॥

……ভারতের জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না। ব্রাহ্মণজাতির লোপসাধন করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ……এই ব্রাহ্মণ, এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধপুরুষের প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে না। আর আধুনিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি, আমাদিগকে ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এইটুকু বলিতেই হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকাংশ ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে।……বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন

নাই। উহাতে আমাদিগকে আরও বিভক্ত করিবে, আমাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আমাদিগকে আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া অধিকারের, একচেটিয়া দাবির দিন চলিয়া গিয়াছে।

উচ্চতরবর্ণকে নিচু করিয়া এ সমস্যার মিমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।......ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যপ্রণালী।......যাঁহাদের মস্তিষ্ক আছে, যাঁহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাঁহারাই প্রাচীনগণের কার্যপ্রণালী ও উহার পরিসর বুঝিতে সমর্থ।

সেই কার্যপ্রণালী কি? একদিকে ব্রাহ্মণ, অপরদিকে চণ্ডাল ; আর চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই তাঁহাদের কার্যপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র তাহাতে দেখিবে নিম্নতর জাতিসমূহকে ক্রমশঃ উচ্চাধিকার দেওয়া হইয়াছে।......সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে। এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত হইতেছে। কারণ জাতিবিশেষ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে?

শঙ্করাচার্য প্রভৃতি বড় বড় যুগাচার্যগণ জাতিগঠনকারী ছিলেন।......সময়ে সময়ে তাহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া একমুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন ; দলকে দল জেলে লইয়া একমুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপ ভক্তি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

......শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও তাহার সংস্কার—তিনি এতদিন যাহার রক্ষকস্বরূপ আছেন—সর্বসাধারণকে দিতে হইবে। তাঁহারা সর্বসাধারণে উহা এতদিন দেন নাই এই কারণেই মুসলমান আক্রমণ সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহারা গোড়া হইতে সর্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই কারণেই সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সে-ই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি, অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না।...তোমরা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা উপার্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল?...বিবাদ বিসম্বাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া...সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা পাইবার চেষ্টা কর—তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

॥ কার্যপ্রণালী ॥

যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক

ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর তুল্য থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাক জমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা বলি।

কর্ম কর্ম কর্ম even unto death। দুর্বলগুলোর মহাবীর হতে হবে টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা যাদের লইবে তারা নিজেদের নাম দিক, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম ? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহো ভাগ্যম্ অহো ভাগ্যম্।

[পত্রাবলী]

আমাদিগকে একটি মন্দির করিতে হইবে···উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে।···এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঐ স্থানে আসিয়া তাহাদের মতসমূহ শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

এই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটি বিদ্যালয় থাকিবে। ইহা হইতে যে সকল আচার্য গঠিত হইবে, তাহারা সর্বসাধারণকে ধর্ম ও অপর বিদ্যা শিক্ষা দিবে। আমরা এক্ষণে যেমন দ্বারে দ্বারে ধর্মপ্রচার করিতেছি তাহাদিগকে সেই ধর্ম ও বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

॥ উন্নতির উপায় ॥

(১) জনসাধারণের উন্নতিবিধান

মুসলমান হিন্দুগণকে জয় করিল —এই ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্যসভ্যতার অভাব।···বাহ্যসভ্যতা আবশ্যক; শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন—অন্ন। যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্তসুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে···। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।···যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়।···দাসেরা শক্তি চায়, অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি

এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

[পত্রাবলী]

* * *

…এককালে ভারতবর্ষে ধর্ম আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। …এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয়না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খামাকা দেশসুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক, না ওদিক।…জাতি, ব্যক্তি প্রকৃতিভেদে শিক্ষা, ব্যবহার, নিয়ম,—সমস্ত আলাদা; জোর করে এক করতে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মত আর কি আছে দুনিয়াসুদ্ধ মুক্তি নেবে চল,—বলি তা কখনও হয়?' 'তুমি গেরস্ত মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর'—একথা বলছেন হিন্দুর শাস্ত্র।…হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! 'অহিংসা' ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও তুমি পাপ করবে। আততায়িনমায়ান্তং' ইত্যাদি; হত্যা করতে এসেছে—এমন ব্রহ্ম বধেও পাপ নাই, মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড নীতি প্রকাশ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর লাথি ঝাঁটা খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই। এইটী শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য,—স্বধর্ম করছে বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ; গৃহস্থের পক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন করে, স্ত্রী, পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। ঐ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার মোক্ষ।

[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]

(২) ॥ স্বাধীনতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা ॥

এখন এই যে সার্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব তুর্কিকে ভেঙ্গে ইউরোপীয় বানাচ্ছে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জ ফৌজ, তোপ প্রভৃতি চাই ; কিন্তু আখেরে সে পয়সা দেয় কে ? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে—আর শহরে দেখবে কতকগুলো ঝাব্বা ঝুব্বা পরে সেপাই। ইউরোপময় সেপাই, সেপাই—সর্বত্র সেপাই। তবু স্বাধীনতা আর এক জিনিস, গোলামি আর এক ; পরে যদি জোর করে করায় অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোনো বড় কাজ করতে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক পরলোকেও তাই। ইউরোপের লোকেরা সার্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে,—তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে ? ভুল করবে বইকি—দ' শ' করবে—করে শিখবে—শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি দুর্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

[পরিব্রাজক]

* *

আমাদের জাতির মধ্যে organization-এর (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার শক্তি) একেবারেই অভাব। ঐসব অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করতে একেবারেই নারাজ। organization-এর প্রথম আবশ্যকতা এই যে obedience (আজ্ঞাবহতা), যখন ইচ্ছা হ'ল একটু কাজ করলাম—তারপর ঘোড়ার ডিম—তাতে কাজ হয় না—plodding industry and perseverence (স্থির ধীরভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই।…ক্রমে দুনিয়া ছেয়ে ফেলতে হবে। obedience প্রথমে দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে -তবে কাজ হয়।

[পত্রাবলী]

* *

সংকল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন একপ্রকার তেজ নির্গত হইয়া থাকে, আর তাঁহার নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করে,…৪ কোটি ইংরাজ ৩০ কোটি ভারতবাসীর উপরে কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে ? সংহতিই শক্তির মূল। এই ৪ কোটি ইংরাজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারেন, আর উহার দ্বারাই তাহাদের অসীম শক্তি লাভ হইয়া থাকে ; আর তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ভাব।

সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তি, সংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র মিলন। [ভারতে বিবেকানন্দ]

*   *

Common interest না হলে (এক প্রকারের স্বার্থচেষ্টা ভিতরে অনুভব না করলে) লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার করে সর্বসাধারণকে কখনও unite করা যায় না—যদি তাদের interest না এক হয়। গুরু গোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচারের রাজত্বে বাস করিতেছে। গুরু গোবিন্দ common interest create করেন নাই; কেবল উহা ইতর সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান সবাই তাঁকে follow করেছিল। তিনি মহাশক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় দৃষ্টান্ত বিরল।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

(৩) ॥ বিদ্যাশিক্ষা ॥

…সাধারণকে কেবল positive ideals (সকল বিষয়ে গড়ে তুলবার আদর্শ) দিতে হবে। Negative thought (নেই নেই ভাব) মানুষকে weak করে দেয়। যে সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়,—বলে, 'এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা'—তাদের ছেলেগুলো অনেক স্থলে তাই দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ অধিকারের তুলনায়—যাহারা এরূপ শিশুদের মত—তাঁদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive idea দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প—সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ বিষয়ে কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded করা হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

…এখন কেবল positive thought ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিন্দু জাতটাকে তুলতে হবে।—তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হবার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেন নাই। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে।

তোদের History, Literature, Mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে। মানুষকে কেবল বলছে—তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নাই। তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেইজন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে

বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে একভূমিতে দাঁড় করাতে হবে।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

* *

শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কখনও নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। তোমরা জগৎকে কতকগুলা জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে উহা বিশেষ কল্যাণ হইবে না॥ ঐ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই।···

সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের চিরস্থায়ী উন্নতির আশা নাই।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

(৪) ॥ স্ত্রী-শিক্ষা ॥

জগতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

[পত্রাবলী]

* * *

ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ ; রমণীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্রেরই আশ্রিত ; আর সমগ্র আর্যাবর্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া, তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধতা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই দুঃখের জীবনযাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী, নিত্য-বিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ-পত্নী সীতা, সেই নরলোকের এমন কি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শীভূতা মহনীয় চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। ···আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গঠিত করিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, যদি সে-সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতাচরিত্র হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। ···ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

(৫) ॥ শারীরিক উন্নতিবিধান ॥

শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিস্‌নে এখনও রোজ আমি ডাম্‌বেল কসি। রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমানভাবে উন্নত হওয়া চাই)। সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীর সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা বোধের জন্যই এখন education-এর দরকার।

···বাঙ্গালায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু muscle-এ শক্তি নাই। Brain ও muscles সমানভাবে developed হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain—and the whole world is at your feet.

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

(৬) ॥ প্রবল আত্মবিশ্বাস।

তোমাদের পক্ষে যতটা জানিলে কল্যাণ, তাহা অপেক্ষা তোমরা বেশী জান, ইহাই তোমাদের মুস্কিল। তোমাদের রক্ত কলুষিত, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিল, তোমাদের শরীর দুর্বল। শরীরটাকে বদলাইয়া ফেল, শরীরটা বদলাইতেই হইবে। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে। ···সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্বল, দুর্বল, অতি দুর্বল; তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারেই নাই। শত শত শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত জাতি, রাজা ও বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া পিষিয়া ফেলিয়াছে, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে পদদলিত, ভগ্নদেহ কীটের ন্যায় হইয়াছ।···তোমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীর্য।

এই বীর্য লাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা! আমার তরবারি ছেদন করিতে পারে না, কোনো যন্ত্র আমাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না; আমি সর্বশক্তিমান! আমি সর্বজ্ঞ!' অতএব এই আশাপ্রদ পরিত্রাণপ্রদ বাক্যগুলি সর্বদা উচ্চারণ কর। বলিও না আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সবই হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। উহাতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার ন্যায় বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার ভিতর শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমার ইচ্ছা তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক,তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎপরিচালনকারী মহামনীষা-সম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও।···

বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্য বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না, বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী বালক-বালিকা, যে যে কার্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

৭। ॥ জাতীয় আদর্শে শ্রদ্ধা ॥

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, তাহার পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইব ; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোনো বস্তুই নিজের হয় না ; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয় ?

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল ? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোনো প্রয়োজন নাই ? আমরা কি সম্পূর্ণ ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে,—কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনো অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, 'বুঝি কোনো ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এত প্রশংসা করিল'।

হে ভারত, ইহাই কেবল বিভীষিকা ; পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি-বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ! হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ?

…হে ভারত, এই পরমাণুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। [বর্তমান ভারত]

(৮) ॥ মহান্ আদর্শের পূজো ॥

…প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজো চালাতে হবে। যাঁরা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন তাঁদের লোকের কাছে ideal-রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজো চালিয়ে দে দিকি।…গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজো চালা, শক্তিপূজো চালা।

মহাবীরের চরিত্রকেই এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ্ না রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল!—জীবন মরণের দৃকপাত নাই। মহা জিতেন্দ্রিয় মহাবুদ্ধিমান! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে জীবন গঠিত করিতে হবে। ঐ রূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞাপালন আর ব্রহ্মচর্যরক্ষা—এই হচ্ছে secret of success; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। হনুমানের একদিকে যেমন সেবা ভাব অন্যদিকে তেমন ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত! ঐরূপ একাগ্র নিষ্ঠা হওয়া চাই।

…বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা ঐ ভাবের চরিত্র গঠন করতে পারিস, তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

(১) সেবক

কতকগুলো চেলা চাই—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক—বুঝতে পারলে? বুদ্ধিমান ও সাহসী, যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? শত শত ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ দুই।

মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নাই···শক্তির বিকাশ চাই—হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী, উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নাই—ছেলেখেলার সময় নাই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাৎ হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া) চাই—কুড়েমি দূর করে দাও; ছড়াও, ছড়াও, আগুনের মত যাও সব যায়গায়।

[পত্রাবলী]

* * *

আমি চাই—A band of young Bengal—এরাই দেশের আশা ভরসাস্থল। চরিত্রবান বুদ্ধিমান পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরে আমার ভবিষ্যৎ ভরসা; আমার idea-সকল যারা work out (জীবনে পরিণত) করে আপনাদের ও দেশের কল্যাণসাধন করতে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর অপটু—মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান দশ বারটি ছেলে পেলে, আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালিয়ে দিতে পারি।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

(২) ॥ সেবার উদ্দেশ্য ॥

(পরহিতের প্রয়োজন কি?) নিজহিতের জন্য। এই দেহটা যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, একথা ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহবুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এইরূপে কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্বজীবে সর্বঘটে বিরাজমান, এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বরসাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্ম-

বিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থ কর্মদ্বারাও ঠিক তাই হয়।···

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। আমি বৈদান্তিক, সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না। অবতার মানে যাঁহারা সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত—অবতার বিশেষত্ব আমি দেখতে পাচ্ছি না—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। সেই সহায়তার নাম ধর্ম—বাকি অধর্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম—বাকি কুকর্ম ; আর আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্মফল থাকতে পারে—কিন্তু তদবলম্বনে যথা জীবনক্ষয়—কারণ, কর্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকার মাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব। [পত্রাবলী]

(৩) ॥ নারায়ণ সেবা ॥

যে সাধনভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় একটা—মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না—কামকাঞ্চনের গণ্ডী থেকে মানুষকে বাহির হতে সহায়তা করে না, এমন সাধনভজনের কি ফল? তুই বুঝি মনে করিস, একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? ততকাল, যত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছে, ততকাল তোকেও জন্ম নিতে হবে—তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীবই যে তোর অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝবো—তোর ভিতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন—not a moment before, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা জাগরিত হলে তবে বুঝবো—ideal-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

* * *

আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি ; দুঃখী-দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।

আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক

চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি জীবনবলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র, পতিত উৎপীড়িতদের জন্য তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ একদিনের কাজ নয়, পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ, কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি, তাঁহার নামে অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শত শত যুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবে।

যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুড়েমি করছে, তার নরকেও যায়গা নাই। যে আপনি নরক পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয় চেষ্টা করে, সে-ই রামকৃষ্ণের পুত্র, ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)। যে এই মহাসন্ধিপুজোর সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সে-ই আমার ভাই, সে-ই তাঁর ছেলে। এই test, যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না; প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণ চিকীর্ষবঃ (প্রাণত্যাগ হইলে পরমকল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তাঁরা ; যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন এই সিদ্ধি।

পরপোকারই জীবন, পরহিত-চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য ; কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত; প্রেত বই আর কি ? হে যুবকবৃন্দ দরিদ্র, অজ্ঞ, ও অত্যাচার পীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও, তবে তাহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে।...বৎস, ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়ে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে, টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ প্রাচীরের মধ্যে দিয়া পথ করিয়া লইতে পরে।

[পত্রাবলী]

(৪ ॥ সেবকের গুণ ॥

ত্যাগই আসল কথা—ত্যাগী না হলে, কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস, সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে; ওরে একটা স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী আপনার বলে ভাবি কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙালবেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন তাঁকে কিছু না দিয়ে, খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রেরেই উদর নানাপ্রকার চর্বচুষ্য দিয়ে পূর্তি করা—সে ত পশুর কাজ!

[স্বামি-শিষ্য-সংবাদ]

* * *

তোমাদের আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর: উহা তোমাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত উষ্মা সমুদয় সহ্য করিতে সমর্থ করিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া সর্বপ্রকার সুখ সম্ভোগে পরিবেষ্টিত থাকিয়া একটু সুখের ধর্ম করা অন্যান্য দেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অস্থিমজ্জায় ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব জড়িত। সে সহজেই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে। তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। মহৎ হও। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোনো মহৎ কার্যই সাধিত হইতে পারে না। পুরুষ স্বয়ং জগৎ-সৃষ্টি করিবার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ করিলেন, আপনাকে বলি দিলেন। তোমরা সর্বপ্রকার আরাম, সুখস্বাচ্ছন্দ্য নাম-যশ অথবা পদ, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া মানবরূপ শৃঙ্খলগঠিত এমন একটি সেতু নির্মাণ কর, যাহার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে।

[হিন্দুধর্মের নবজাগরণ]

* * *

কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পারে না। তোমার কি মন মুখ এক হয়েছে? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পার? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? যদি এইগুলি তোমার থাকে তবে তোমার কোনো কিছুকে এমন কি মৃত্যুকে ভয় করার দরকার নাই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ, সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উহা উৎসুকনয়নে ঐ জ্ঞানালোক আনবার জন্য আমাদের দিকে আশা করে রয়েছে। কেবল ভারতের কাছে সেই জ্ঞানালোক আছে—সে জ্ঞানালোকের অলৌকিক কার্যকরী শক্তি, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি বা বুজরুগিতে নাই, আছে—সত্যধর্মের মর্মভাগের—উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের অশেষ মহিমার উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়াও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন উহা দেবার সময় এসেছে। হে সহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো

না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত পড়লেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে উঠ—উঠ, কাজ কর।

নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত কর, আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাক। কার্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগো। নেতৃত্বকার্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থ হও, আর একজন বন্ধু অপর বন্ধুকে নিন্দা করিতেছে, শুনিও না। অনন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার পদতলে।…কাজ কর কাজ কর, পরের হিতের জন্য কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। …যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনোরূপ লুকোচুরিভাব, কোনোরূপ ঢিলেমি না থাকে।…গুপ্ত বদমায়েসি, লুকানো জুয়াচুরি যেন কোন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে।…হে সহৃদয় বালকগণ, কাজে অগ্রসর হও। টাকা থাক বা না থাক, মানুষের সহায়তা পাও আর না-ই পাও, তোমার জীবে প্রেম আছে? ভগবান ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।…

গোড়া হইতে সাবধান, আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য হইব, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।…এই মনে করিয়া কাজে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে।

[পত্রাবলী]

*   *

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত—ওঠ, জাগ, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না।…সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না; কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে 'অভিঃ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভিঃ' নিভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে।…উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে…আমাদের চাই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে উহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তজ্জন্যই আমাদের উপস্থিত দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্যজাতি জড় জগতে যে আধিপত্য লাভ

করিয়াছে তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে। তাহারা তাহাদের শারীরিক বলে বিশ্বাসী। আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। ···আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া—গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

* *

মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ইট পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than to rust out—জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের ন্যায় অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে ফস্ করে মরাটা ভাল নয় কি?

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ]

* *

Leader কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কিনা? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগানো। Jealousy, selfishness আদৌ থাকবে না—তবে leader—প্রথম by birth, দ্বিতীয় unselfish, তবে leader।···

চালাকী দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ (সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর)।

প্রেমে বাঙাল, বাঙালী, আর্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল এমন কি নরনারী পর্যন্ত ভেদ নাই। প্রেম সব এক করিয়া দেয়, যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু উহা অব্যর্থ। বাঙালাদেশের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের যুবকদলের উপর সব নির্ভর করিতেছে। এই সকল যুবকদের—বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকদের মধ্যে কার্য কর। তাহাদিগকে জাগাও, এইরূপ শতশত যুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একত্রিত হউক।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া, পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখনও শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপে কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোনো বড় কাজ হইতে পারে না।

অহংভাব ও ঈর্ষা তাড়াইয়া দাও—অপরের সহিত একযোগে এবং অপরের জন্য কাজ করিতে শেখ। আমাদের দেশে এইটির বিশেষ অভাব।

পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে। অর্থাৎ যদ্যপি তুমি কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ অন্যাপেক্ষা দেখাও তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ বিবাদের মূল পত্তন হইবে।

কেহ তোমার নিকট অপর ভাইয়ের নিন্দা করিতে আসিলে তাহা বিলকুল শুনিবে না —শুনাও মহাপাপ —ভবিষ্যৎ বিবাদের সূত্রপাত তাহাতে।

অধিকন্তু সকলের দোষ সহ্য করিবে, অপরাধ লক্ষ লক্ষ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, একথা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেই সকল ঈর্ষা একেবারে ত্যাগ করিবে ; দশ জন মিলিয়া একটা কার্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য ঐভাব আনিতে অনেক যত্ন, চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে।

কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করিতে নাই। Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না বোধ হয় ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেবে। পরস্পরকে criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল। দল ভাঙবার এটি মূলমন্ত্র। "ও কি জানে", "সে কি জানে", "তুই আবার কি করবি"—আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটু মুচকি হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া বিবাদের মূলসূত্র।

[পত্রাবলী]

(৫) ॥ সেবকের স্মরণীয় ॥

এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলে একটুও কম্পিত হয় না।

হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হইয়া থাকে মস্তিষ্ক নহে (It is the heart, the heart that conquers, not the brain)। পুঁথি পাতড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান-জ্ঞান, প্রেমের কাছে সব ধূল সমান —প্রেমেই অনিমাদি সিদ্ধি, প্রেমই ভক্তি, প্রেমই জ্ঞান, প্রেমই মুক্তি। এইতো পুজো, নরনারী শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে।"

[পত্রাবলী]

সন্ন্যাস

সাংসারিক ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ, আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না।···তবে মৃত্যু ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এই,—আমাদিগকে মরিতেই হইবে—ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই। তবে আমরা কোনো মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্টি করিতেছ কিন্তু শরীর পুষ্টি করিয়া কি হইবে? যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ না করিতে পারি? তোমরা

অধ্যায়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ না করিতে পার?…অতি মাত্রায় উচ্চ আদর্শে জাতিকে দুর্বল ও হীন করিয়া ফেলে।…অপর দিকে আবার অতি মাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল! যদি একটুকুও কল্পনাশক্তি তোমার না থাকে, তবে তুমি ত একটা পশুমাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শকেও খাট করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্মকেও অবহেলা না করি।

…তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল ভাবপরায়ণতার সহিত প্রবল কার্যকারিতা সংযুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যান ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পর মুহূর্তেই যাইয়া এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে আবার পর মুহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে খুব সামান্য কাজ—যেমন পাইখানা সাফ পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

…মানুষ তাহাকেই বলা যায়, যে এত বলবান যে, যাহাকে বলের অবতার বলা যাইতে পারা যায়। আবার যাহার হৃদয়ে রমণীসুলভ কোমলতা আছে—তাহাদের দুর্বলতা নহে। তোমাদের চারিদিকে যে কোটি কোটি প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেন তোমাদের হৃদয় কাঁদে অথচ তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। কিন্তু আবার এইটি বুঝিতে হইবে যে, স্বাধীনচিন্তা যেমন আবশ্যক, তদ্রূপ আজ্ঞাবহতাও অবশ্যই চাই।

[ভারতে বিবেকানন্দ]

॥ ১ ॥

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য দেশ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"আগামী পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্যা দেবী হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।"

স্বামীজীর বক্তৃতার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৯৪৭ খৃঃ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

* * *

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, একদিন প্রসঙ্গক্রমে ভারতের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে বলতে স্বামীজীর মুখ ক্ষোভে ও করুণায় এক অপূর্ব তেজে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, চোখ থেকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবার বললেন, "ঐ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে—বেশ দেখতে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নেই); যারা বুদ্ধিমান, তারা ভাবী তিন যুগের ছবি সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়।"

তারপর বললেন—

"ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে—কালে তার উজ্জ্বল ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্য-করে আলোকিত হবে।"

* * *

১৮৯৪ খৃঃ মাদ্রাজবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী লিখেছেন—

"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশসহায়ে,...

আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন।

[হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা]

॥ ২ ॥

সিস্টার ক্রিষ্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় স্বামীজীর দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Sometimes he was in a prophetic mood, as on the day when he startled us by saying, "The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China. I can't quite see which, but it will be either Russia or China." This he said thirty two years ago, when China was still under the autocratic rule of the Manchu Emperors, from which there was no prospect of release for centuries to come, and when Czarist Russia was sending the noblest of her people to the Siberian mines. To the ordinary thinker those two countries seemed the most unlikely nations in the world to usher in a new era."

"Still the question arose ; how did he know that the commercial era was nearing its end ? and, a still greater mystery, how could he foresee that Russia or China would be the countries that would bring it about ? With him it was never an expression of opinion, begging with, "I think," but an authoritative statement."

শূদ্রযুগ কিভাবে আসবে সে বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের রূপ ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর স্মৃতি কথায় প্রকাশ করেছেন ঃ

"And as he passed to the problems of the Shudra, which would first be worked out here, his face took on a new light, as if he were actually seeing into the future ; and he told of the mixture of races, and of the great tumults, the terrible tumults through which the next state of things must be reached."

লণ্ডন থেকে ১৮৯৬খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর স্বামীজী মেরী হেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা হবে এই যে, হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।...প্রত্যেক প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।"

স্বামীজী কথিত শূদ্রযুগের স্বরূপ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—

"The Kali Yuga is about to thicken, when money comes to be worshipped as God, when might is rtght, and men oppress the weak."

ইউরোপের উপর চীনের আক্রমণের ভবিষ্যৎ-বাণী করে স্বামীজী বলেছেন—ঐ আক্রমণের ফলরূপে পুনরায় অন্ধকার যুগ নেমে আসবে (The dark ages will come)।

॥ ৩ ॥

"Europe is on the edge of a volcano. Unless the fires are extinguished by a flood of spirituality, it will blow up."

সিস্টার ক্রিস্টিন স্বামীজীর উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে অবশেষে লিখেছেন - This of Europe in 1895, when it was prosperous and at peace, Twenty years later came the explosion !

॥ ৪ ॥

চিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যে আমেরিকা যাবার পূর্বে স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন—

"The parliament of religions is being organised for this (pointing to himself), My mind tells me so."

॥ ৫ ॥

মিস্ জোসেফিন ম্যাক্লাউড তাঁর স্মৃতিকথায় বেলুড়মঠ সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যৎ-বাণী উল্লেখ করেছেন—

"The spiritual impact that has come here to Belur will last fifteen hundred years—and this will be a great University. Do not think I imagine it, I see it."

স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে বেলুড় মঠের জমিতে বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলেন—

"এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন জ্ঞানচর্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্মের একত্র সমন্বয়ে এইখানে থেকে ideals বেরোবে,..."

মঠের ঐ যে দক্ষিণভাগের জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কর্মস্থল হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ভক্তিশাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরণে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হবে। বাল-ব্রহ্মচারীরা ঐখানে বাস করে শাস্ত্রপাঠ করবে।...এখানে trained না হলে কেহ সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারবে না।"

॥ ৬ ॥

স্বামীজীর ভবিষ্যৎ-বাণী প্রসঙ্গে তাঁর একটি বিচিত্র ও রহস্যময় উক্তির উল্লেখ করা যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে এক পত্রে স্বামীজী শিবানন্দ মহারাজকে আফ্রিকায় যেতে অনুরোধ করেছেন—ভারতীয় বাসিন্দাদের 'আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণের জন্য'। কাজটি স্বামীজীর বিবেচনায় মোটেই নির্ঝঞ্ঝাট নয়। সেখানে খুব ধীরস্থিরভাবে সাবধানে চলতে হবে। হাতে হাতে ফল পাওয়ার আশা কম। তবু সে-কাজে 'সৎলোকের এগিয়ে যাওয়াই উচিত।' কারণ পরিণামে এর দ্বারা, স্বামীজীর মতে "আজ পর্যন্ত ভারতের কল্যাণের জন্য যত কাজ হয়েছে সে-সকলের অপেক্ষাও বেশী উপকার হবে।"

স্বামীজীর উক্তি খুবই বিস্ময়কর এবং আপাতভাবে অতিরঞ্জিত। আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করলে ভারতের সর্বাধিক কল্যাণ কি ভাবে হবে তা বোঝা শক্ত। অথচ বস্তুত তাই হয়েছিল—আফ্রিকায় গান্ধী আন্দোলন থেকেই ভারতের অসহযোগ আন্দোলন। স্বামীজীর উক্তিকে যে যেভাবেই নিন, ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসীদের কাছে এটি তাঁর দিব্য স্বভাবের আর একটি প্রমাণবাচক উক্তি হয়ে থাকবে।

॥ ৭ ॥

"বেলুড় মঠে একদিন আমি স্বামীজীর ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি বললেন,— 'I shall never see forty'। আমি জানতাম তখন তাঁর বয়স ঊনচল্লিশ। তাই তাঁকে আমি বললাম, কিন্তু স্বামীজী বুদ্ধদেব তাঁর সব বড় কাজ চল্লিশ থেকে আশীর মধ্যেই করে গেছেন। স্বামীজী শুধু বললেন—আমার বাণী আমি দিয়েছি —এবার আমি যাবই।"

[মিস্ ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা]

"কাশ্মীর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে লাহোরে তিনি কয়েকদিনের জন্য আমার অতিথি হয়েছিলেন। এই সময়ে অকাল মৃত্যুর পূর্বছায়া পড়েছিল তাঁর মনে। 'আমি আর তিন বছর বাঁচব।'—সম্পূর্ণ নির্লিপ্তসুরে তিনি বলেছিলেন—'আমার শুধু এই ভাবনা—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার সকল ভাব কার্যকরী করে যেতে পারব কিনা।' তিনি প্রায় ঠিক তিন বছর পরেই মারা গেলেন।"

[নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকাহিনী]

১৯০১ সালে ঢাকায় একটি বক্তৃতা শেষ করে এসে তিনি সহসা একদল শিষ্যকে বলেছিলেন 'আমি বড়জোর আর এক বছর আছি।'

১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই, শুক্রবার স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। তার পূর্বের বুধবার তিনি বলেছিলেন, 'আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।'

"একবার হিন্দু মেলায় ব্যায়াম দেখাইবার জন্য নবগোপাল মিত্তির তাঁহার নিজের জিমন্যাসটিক দলকে লইয়া গিয়াছিলেন। দাদা (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিল একজন বড় খেলোয়াড়। সেই জন্য সে দলের সঙ্গে গিয়াছিল। রামদাদা (ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত) দাদাকে দেখিবামাত্র ধমকাইয়া বলিলেন, বিলে, খবরদার, খেলবিনি। রামদাদার আদেশ —এইজন্য দাদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু যখন অপর খেলোয়াড়রা বারের খেলা দেখাইতে লাগিল, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, দৌড়িয়া বারের কাছে গেল এবং খেলা দেখাইতে লাগিল। রামদাদা তখন কিছু বলিতে পারিলেন না। হিন্দু মেলায় এই বার-এর খেলায় দাদা প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার পায়।"

—মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা

"এখন যাহাকে ক্রিকেট খেলা বলা হয়, তখন ব্যাটবল, চলিত কথায় ব্যাটম্বল। এই ব্যাটম্বল খেলা বেশ চারিদিকে নজর রাখিয়া সতর্ক হইয়া খেলিতে হইত। মোটা মুটি বেশ খেলা। বীরেশ্বরের এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। সে বল ঠিক মারিতে পারিত। পাড়ার অনেক ছেলে বাহিরে উঠানে জড়ো হইত, এবং বৈকালে ব্যাটম্বল খেলা খুব চলিত। বীরেশ্বর এই খেলার সর্দার বা মোড়ল হইয়া সব হুকুম-হাকাম করিত।"

—মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা

*

"কিছু চমৎকার নৌকা ভ্রমণ হয়েছে, এক সন্ধ্যায় নৌকো উল্টে জামাকাপড় সুদ্ধ ডুব।" (২০শে অগস্ট, ১৮৯৪ খৃঃ-এর পত্র)

"পার্সি'তে রীতিমত নৌকা চালানো গেছে। নৌ-চালনের দু-চারটে জিনিস শিখে নিয়েছি।" (৮ই জুলাই ১৮৯৫ খৃঃ-এর পত্র)

*

"১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসের শেষ ভাগে শিষ্য ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে স্বামীজী লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া জেনেভা নগরীতে উপনীত হইলেন। তখন জেনেভা নগরীতে একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামীজী সুইজারল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, উৎসাহভরে সমস্ত দিবস প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে একটি বেলুন দেখিয়া তিনি বেলুনে উঠিবার জন্য অধীরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে বেলুন আকাশে উড়িবে না শুনিয়া স্বামীজী বালকের ন্যায় অধীর-ভাবে সঙ্গিগণকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 'এখনও কি সময় হয় নাই?' মিসেস্ সেভিয়ার

আকাশভ্রমণটা নিরাপদ নহে মনে করিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার কোনোপ্রকার আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না বরং তাঁহাকে পর্যন্ত বেলুনে উঠিতে বাধ্য করিলেন। সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। ঊর্ধ্ব হইতে সূর্যাস্তের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া স্বামীজী অতীব আনন্দিত হইলেন। বেলুন হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা সকলে ফটো তুলিয়া প্রফুল্লচিত্তে হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন।"

—বিবেকানন্দ চরিত

* * *

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে কি জুন মাস। অশ্বিনীকুমার দত্ত আলমোড়ায় গিয়েছেন। একদিন পাচকের মুখে শুনলেন, এক অদ্ভুত বাঙালী সাধু এসেছে, যে 'ইংরেজী বলে, ঘোড়ায় চড়ে এবং রাজার মত ঘুরে বেড়ায়।' সাধুটি অতি অবশ্য কে অশ্বিনীকুমার তখনই বুঝলেন। এবং সৈনিক সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে পথে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

অশ্বিনীকুমার দেখলেন—দূরে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে উড্ডীন গৈরিক। একটি বাড়ির গেটে ঘোড়া থামল ; একজন ইউরোপীয় গেট খুলে ঘোড়ার মুখ ধরে বাড়ির সামনে নিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী নেমে পড়লেন।"

স্বামী বিবেকানন্দই এই সন্ন্যাসী। মেরী হেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"তুমি যদি আমাকে পার্বত্য হরিণের মত পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে, অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে রাস্তায় চড়াই-উৎরাই করতে দেখতে, তা হলে খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে।"

* *

এই সাইকেল-অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ দিয়েছেন স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তখন তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন।

"একদিন স্বামীজী খুব প্রফুল্ল ; বেলা ১২ টার সময় বলিলেন, 'চ, সকলে মিলে সুমুখের মাঠে গিয়ে বাইক চড়ি।' মিস্ মুলারের আর্থার নামে একটা মালী ছিল। সে মিস্ মুলারের গ্রীণ হাউস থেকে একটা বাইক মাঠে পৌঁছিয়া দিয়া আসিল। সারদানন্দ স্বামী বাইকটি ধরিলেন, আর স্বামীজী বর্তমান লেখকের কাঁধে হাত দিয়া বাইকে উঠিয়া বসিলেন। অনভ্যস্ত, সেইজন্য দুইজনে দুই দিক থেকে বাইকটি সামলাইতে লাগিলাম। তারপর সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, 'তুই চড়্, শেখ্না, দিন কতক চেষ্টা করলে অভ্যাস হয়ে যাবে।' সারাদানন্দ স্বামী অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাতিরে বাইকের উপর একবার চড়িয়া বসিলেন। মোটা মানুষ, বড় ভয় করিতে লাগিল, সেইজন্য দুপাশ থেকে তাঁহাকে আটকাইতে লাগিলাম। আর্থার মালী ছোঁড়া একটু দূরে বেড়াতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিয়া খুব হাসিতেছিল। স্বামীজী মালী ছোঁড়াকে হাসিতে দেখিয়া কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওরে, আমাদের চড়া দেখে মালী ছোঁড়া হাস্ করছে। আরে হাস্ করছিস ক্যান ?'...সারদানন্দ স্বামী

একটু পরে নামিয়া পড়িলেন। স্বামীজী আবার বাইকে উঠিলেন। সেদিন মনটা খুব প্রফুল্ল ছিল, মৃদুস্বরে বাংলায় গান গাহিতে লাগিলেন—

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
ভাসল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা
মধুর বহিবে সমীর ভেসে যাব রঙ্গে।"

* *

"বিবেকানন্দ সর্বপ্রকার খেলা খেলবেন --খেলাটা যখন লীলার অন্তর্গত। এমনকি গল্‌ফ—হ্যাঁ, নিতান্ত বিদেশী গল্‌ফও। 'এখানে একদিন গল্‌ফ খেলার চেষ্টা করেছি। খেলাটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হল না—শুধু কিছু অভ্যাস চাই', —১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর শেষ আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে লিখেছিলেন। চিঠিটা লিখেছিলেন 'স্নেহের বোন' মেরী হেলকে, যে মেরী হেলকে বা হেল পরিবারকে ভ্রাতা ও পুত্র বিবেকানন্দের বহু খেয়ালের ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত। যেমন, বরফের উপর স্কেটিং দেখে এই সদানন্দ বালকের বাসনা হল স্কেটিং শিখবেন, কিন্তু কিছু প্র্যাকটিস তো চাই, আর হেলদের দামী কার্পেট-পাতা সদরঘরের চেয়ে ভাল অনুশীলন-ক্ষেত্র কোথায় পাওয়া যাবে ? কার্পেট ছিঁড়ে আসবাব ভেঙ্গে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্কেটিং অভ্যাস করতে লাগলেন।"

* *

"১৯০০ খৃঃ ৯ ডিসেম্বরের রাত্রিতে স্বামীজী অপ্রত্যাশিত ভাবে বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে—মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় বাগানের মালী দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, একজন সাহেব আসিয়াছেন, গেট খুলিবার জন্য চাবির প্রয়োজন। গেট খোলা হইলে দেখা গেল যে, গাড়ী খালি, সাহেব তন্মধ্যে নাই। এ দিকে সাহেব মাথার টুপীটা একটু টানিয়া দিয়া ভোজনগৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন--স্বামী প্রেমানন্দজী দীপহস্তে দেখিলেন, সাহেব আর কেহ নহেন—তাঁহার প্রিয়তম বিবেকানন্দ। স্বামীজী বালকের মত উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম, যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তাহলে রাত্রে আর খেতে পাব না। তাই পাঁচিল টপ্‌কে এসে পড়লুম'।"

—বিবেকানন্দ চরিত

* *

"স্বামীজী মঠে গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস ও হরিণ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বাঘা, মটরু, হংসী প্রভৃতি নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন এবং পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় তাহাদের সহিত খেলা ও দৌড়াদৌড়ি করিতেন। মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা জমিতে স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ এই মাঠের ও বাগানের একটি সীমা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর গাভী ছাগল প্রভৃতি উক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে ব্রহ্মানন্দ

অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইত। তাঁহাদের পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা এবং তাঁহাদের গুরুভ্রাতারা আনন্দে আপ্লুত হইতেন।"

—'স্বামী ব্রহ্মানন্দ'

* *

[শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণ বিধিমত দীক্ষা না পেলেও গুরুর কাছ থেকে গেরুয়া বস্ত্র ও সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ লাভ করেছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুরে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণ সন্ন্যাস-সংকল্প গ্রহণ করেন এবং বরানগর মঠে ফিরে বিরজাহোম করে বিধিমত সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম গ্রহণের ইচ্ছা হলেও শশী মহারাজের উক্ত নাম পছন্দ হওয়ায় স্বামীজী 'বিবিদিষানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। পরিব্রাজক জীবনে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গ এড়াবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে 'সচ্চিদানন্দ' নাম গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩১ শে মে তারিখে স্বামীজী বোম্বাই থেকে চিকাগো মহাসভার উদ্দেশে আমেরিকা রওনা হন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি খেতড়ির মহারাজা অজিত সিং-এর অনুরোধে 'বিবেকানন্দ' নামটিই গ্রহণ করেছিলেন।]

আমেরিকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামের বিচিত্র বানান লক্ষ্য করা যায়। তারই কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল।

১। Rajah Swami Vive Kananda, ২। Swani Viv'c Kyonda ৩। Rajah Swami Vivi Rananda, ৪। Indian Rajah Swami Vivikananda, ৫। Swami Virckananda, ৬। The Swami Vere Kananda, ৭। Mr Sivanei Vivcksnanda, ৮। Rajah Rananda, ৯। Mr. Kananda, ১০। Swami Kananda, ১১। Mr. Vivecan-anda, ১২। Paramahansa Swami Vivekananda, ১৩। S. Vive Kananda, ১৪। Rev Swarri Vivekananda, ১৫। Vale Kananda.

মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী, তামিল, এই পাঁচটি ভাষায় স্বামীজীর অল্পাধিক ব্যুৎপত্তি ছিল।

সংস্কৃতঃ—সংস্কৃত ভাষাতে স্বামীজী বিশেষ ব্যুৎপন্ন হলেন। স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রের উপর অনুরাগ ছিল এবং পরিব্রাজক-জীবনে তিনি পণ্ডিত নারায়ণ দাসের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মারাঠা উচ্চারণের পক্ষপাতী ছিলেন। "ওং হ্রীং ঋতং" ইত্যাদি ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র ও প্রণামমন্ত্র স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষায়-রচনা। তাছাড়া ১৭।৯।৯৬, ১।৬।৯৭, ৩।৮।৯৭ তারিখের পত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

ইংরাজীঃ—ইংরাজী ভাষায় স্বামীজীর দক্ষতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ মহল ও পত্র পত্রিকাগুলি উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেছে। পরিব্রাজক জীবনে তিনি 'ইংরাজী জানা সাধু' বলে দেশীয় রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

আমেরিকার পত্র পত্রিকার অভিমত ঃ—

He showed himself to be one of the best orators at the congress speaking faultless English without notes, and with an utterance at many of his hearers declared would of self have been music had you not understood a word. (New discoveries, P 186)

অথবা

In conversation he is a most pleasant gentleman ; his choice of words are the gems of the English language, and his general bearing thanks him with the most cultured people of the western etiquette and custom···. He speaks, English not only distinctly, but gently, and his ideas, as new as sparkling drop from his tongue in a perfectly bewildering overflow of ornamental language.

(New Discoveries, P 149)

ফরাসীঃ—ফরাসী ভাষাতেও স্বামীজীর কিছু অধিকার ছিল। পরিব্রাজক জীবনে তিনি পোরবন্দরে শঙ্কর পাণ্ডুরাং-এর কাছে ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন এবং সে সময়ে ফরাসী ভাষায় লেখা একটা রান্নার বই ও একটা ফরাসী সঙ্গীতের বই নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। প্যারিস ধর্মেতিহাস সম্মেলনে তিনি ফরাসী ভাষাতেই বক্তৃতা করেছিলেন।

১।৯।১৯০০ তারিখে প্যারিস থেকে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখেছেন স্বামীজী— "ফরাসী ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দু একমাস তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে। এ ভাষাটা আর জার্মান এ দুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে একরকম ইউরোপীয় বিদ্যায় যথেষ্ট প্রবেশলাভ হয়।"

অক্টোবর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অবস্থানকালে ভগিনী ক্রিশ্চিন ও মাদাম কাল্‌ভেকে লেখা পত্র দুটি ফরাসী ভাষায় লেখা।

হিন্দী :—২৯শে জুলাই ১৮৯৭ খৃঃ আলমোড়া থেকে স্বামীজী লিখেছেন রামকৃষ্ণানন্দকে—"কাল এখানে ইংরেজ মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুশী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দিতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুশী—হিন্দিতে যে oratory (বাগ্মীতা) করতে পারবো তাতো আগে জানতাম না।

স্বামীজীর পরিবারে ফরাসীপ্রভাব ছিল। বাড়ির হিন্দিভাষী কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কিছু হিন্দী শিখেছিলেন। পরিব্রাজক জীবনের দীর্ঘ আট বৎসর সময় হিন্দীভাষী লোকের সঙ্গে মিশবার ও কথাবার্তা বলবার ফলে হিন্দী ভাষা আয়ত্তে আসে।

১৯০১ সালের ডিসেম্বরের শেষে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সকল নেতা এসেছিলেন তাঁরা বেলুড়মঠে এসেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীতেই কথাবার্তা বলেছিলেন। স্বামীজীর তিরোভাবের পর এই সময়ের কথা আলোচনা করে লক্ষ্ণৌর 'অ্যাডভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক লেখেন—"গত কংগ্রেসের সময় সর্বশেষবার তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম। বিশুদ্ধ ও সাধু হিন্দী ভাষায় তিনি অনর্গল আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথিত হিন্দী ভাষা যে কোনো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-বাসীকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত।"

তামিল :—১৮৯৬ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন থেকে স্বামীজী লিখছেন আলাসিঙ্গা পেরুমলকে "মহীশুরে তামিল লিপিতে সমগ্র ১০৮টি উপনিষদসম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক ডয়সনের পুস্তকাগারে সেটি দেখলাম। ও বইয়ের কোনো দেবনাগরী সংস্করণ আছে। যদি থাকে তো আমায় একখানি পাঠাবে। যদি না থাকে তামিল সংস্করণটিই পাঠাবে এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষর সহ) পাশে পাশে নাগরিকে লিখে পাঠাবে—যাতে আমি তামিল অক্ষর শিখে নিতে পারি।"

বাংলাভাষা :—স্বামীজীর মাতৃভাষা বাংলা। সে ভাষায় তাঁর অধিকারের কথা বলাই বাহুল্য। এইখানে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যর ইতিহাসে স্বামীজীর দানকে। তিনি সাধু ও চলিত ভাষায় নানা প্রয়োগমূলক পরীক্ষা করেছেন। তাঁর বাংলা গদ্যরচনা কেবল ভাবের গাম্ভীর্য ও বহুমুখ প্রকাশ ক্ষমতায় সমৃদ্ধ নয় তার মধ্যে পরবর্তী লেখকদের সামনে অনুসরণী ভাষার আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। চলিতভাষার পক্ষে রচিত তাঁর 'বাংলা ভাষা' নামক প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিগ্‌দর্শন।

১. দক্ষিণেশ্বর

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর প্রেম ভক্তমুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। বাহিরের উদ্যানে, বৃক্ষপত্রে, বিশাল ভাগীরথীবক্ষে এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। সত্য সত্যই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—উদ্যানের ধূলি পর্যন্ত মধুময়। ইচ্ছা হয় গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই। ইচ্ছা হয়, উদ্যানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্তদিন এই মনোহারি গঙ্গাবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের লতা, গুল্ম, বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেম-আলিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ পদচারণ করেন। ইচ্ছা করে জ্যোতির্ময় গগনপানে অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া থাকি, কেন না দেখিতেছি ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে। ঠাকুর বাড়ীর পূজোরী, দৌবারিক, পরিচারক সকলকে পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে। আকাশ, দেবমন্দির সেবকগণ, ভক্তগণ সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিষে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও সেই জিনিষের হইবেন। যেন একটি মোমের বাগান, বাগানের মালীগণ, নিবাসীগণ, গৃহ সমস্তই মোমের এখানকার সব, আনন্দ দিয়ে গড়া।

২. বেলুড় মঠ

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেনঃ—'ত্রিশ কোটি মানবের দ্বিসহস্রব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতি স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন সহস্র সুরের একটি সমন্বিত ঐক্যতান, যেখানে মানব জাতির সহস্র ধর্ম ও মতবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের মর্মবাণী—যাহা বেদবাণী-তাহা সমন্বয়! স্বামীজী বলিয়াছেন—প্রত্যেক নর নারীকে, সকলকেই ঈশ্বর বুদ্ধিতে দেখিতে থাক, তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এই সমন্বিত ত্যাগ ও সেবাধর্মেরই মূর্ত প্রতীক। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—বেলুড় মঠের ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ।

৩. কামার পুকুর

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

'বেদ-বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। তাহার জীবন অত্যন্ত শক্তিপূর্ণ একটি সার্চ্চলাইট আলো;

ইহা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্য-স্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্ম জীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়াছেন।'

প্রেমাবতার যীশুর পবিত্র জন্মভূমি বেথেলহাম ও তাঁহার লীলাকীর্তি বিজড়িত জেরুজালেম ও ইসলাম ধর্মপ্রবর্তক কোরেশ-কুলতিলক মহম্মদের জন্ম-কর্মভূমি মক্কা মদিনা। আজও অযোধ্যাপুরী শ্রীরামচন্দ্রের নাম গানে দিবা নিশি মুখরিত ; মথুরা-বৃন্দাবন ও দ্বারকাপুরীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মহিমা কাহিনী আজও লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। কত যুগ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে তথাপি শ্রীবুদ্ধ, শঙ্কর, মহাবীর, রামানুজ, নানক এবং শ্রীগৌরাঙ্গাদি লোকোত্তর মহাপুরুষগণের জন্ম লীলাভূমি ভক্ত হৃদয়ে অসীম তৃপ্তি ও শান্তি প্রদান করিতেছে।

প্রেম পাথার পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণের (যত মত তত পথ এর দিশারী) আবির্ভাব লীলাভূমি কামারপুকুরও সংসার ত্রিতাপ-দগ্ধ মানুষের নিকট-পরম শান্তি আনন্দের আকার।

৪. শিবপুরী

জয়রামবাটী

শ্রীভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাকে চিনিবার উপায়স্বরূপ শ্রীগীতায় বলা হইয়াছে—'বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে এরূপ বলিতেছেন' ১০/১৩)। কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটী আসিতেছেন শ্রীশ্রীমা, সঙ্গে শিবু দাদা। তিনি বলিলেন ঃ 'বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর সাক্ষাৎ মা কালী কিনা'; মা বলিলেন 'হাঁ, তাই'। এই সর্বদেবদেবী স্বরূপ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটীতে (বাঁকুড়া) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে "শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির"। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি— ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে ও—আমার শক্তি।' সেই ভগবতী জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে আবির্ভূতা হন লোককল্যাণে।

৫. শ্রীসারদা মঠ

স্বামীজী বলিয়াছেন—'শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না;—'মা ঠাকুরাণী' ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মিবে।' 'স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।' 'সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী গুরু গ্রহণ, নারীভাবে সাধন, মাতৃভাব প্রচার, সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।' তাই ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীসারদা মঠ' প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভোজন রসিক বিবেকানন্দ

বকুল ভদ্র

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সাইক্লোনিক হিন্দু সমগ্র বিশ্বতোলপাড় করেছিলেন, যাঁর তেজোদ্দীপ্ত বাণী বিশ্বময় বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত সঞ্চারিত হয়েছিল, শত শত যুবক যাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিজেদের জীবন দেশ সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন, শরীর রক্ষা ও ভোজন সম্বন্ধে তাঁরই চিঠিপত্রে এমন কিছু পাওয়া যায়, যা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক।

আলমোড়া থেকে শশী ডাক্তারকে লেখা ২৯।৫।১৮৯৭-এর চিঠিতে লেখেন, "আমি সকাল-বিকেল ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু করেছি এবং তার ফলে সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করছি। ব্যায়াম শুরু করে প্রথম সপ্তাহে শরীর এতোই ভালো বোধ করেছিলাম যে, ছেলেবেলা যখন কুস্তি করতাম, তারপর তেমনটি কখনও বোধ করিনি।"

ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে চাই শরীর গঠনের উপযোগী খাদ্য। এ বিষয়েও স্বামীজী সর্বদা খেয়াল রাখতেন। তাই উল্লেখিত চিঠিতেই রয়েছে—"এখানে একটি ফলের বাগান থাকায় এখানে এসেই আমি বরাবরের চেয়েও বেশি ফল খেতে শুরু করেছি।...খুব বেশি দুধ পানের ফলে বোধ হয় অত্যন্ত চর্বি জমতে শুরু করেছে।" আবার ফ্লোরেন্স থেকে রাখালকে লিখছেন,"কলকাতায় কমলানেবু থাকলে আলাসিঙ্গার ঠিকানায় মাদ্রাজে একশ পাঠিয়ে দিও যাতে আমি মাদ্রাজে পেঁছে পেতে পারি।"

আবার খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মত মতামতও দিয়েছেন তিনি। "নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন ; তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিতেন। জীবহত্যা পাপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; তবে যতদিন রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্য শরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, ততদিন মাংস ভোজন ভিন্ন উপায় নাই"—লিখেছেন দার্জিলিং থেকে ভারতী সম্পাদককে।

কিন্তু খাদ্যগ্রহণ সম্বন্ধে খুঁতখুঁতে প্রকৃতির ছিলেন না বিবেকানন্দ—বরং তাঁকে ভোজন রসিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। নিউইয়র্ক থেকে স্বামী যোগানন্দকে লেখা ২৪।১।৯৬-এর চিঠিতে দেখা যায়, অড়হর ডাল, মুগের ডাল, আমসত্ব, আমসি, আমতেল, আমের মোরব্বা, বড়ি মসলা সমস্ত ঠিক ঠিকানায় পেঁছিয়াছে।...এখানে যদি ইংলন্ডে স্টার্ডির ঠিকানায় ঐ প্রকার ডাল ও কিঞ্চিৎ আমতেল পাঠাও তো আমি ইংলন্ডে পেঁছিলেই পাইবে।"

আধ্যাত্মিক আলোচনা, বক্তৃতা ও শতসহস্র কাজের মধ্যেও বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে রান্নারও আনন্দ উপভোগ করেছেন। লন্ডন থেকে লেখা মেরীর ৩০।৫।৯৬-এর চিঠিতে দেখি, "কালরাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল—এগুলি মিলিয়ে এমনই সুস্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলধঃকরণ করতে পারেনি। ঘরে হিং ছিল না নতুবা তার খানিকটা মিশালে গিলবার পক্ষে সুবিধা হত।" রান্না সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য বিনয়সুলভ হতে পারে কিন্তু উপকরণের তালিকাই কি অনেক দক্ষ রাঁধুনিকেও লজ্জা দেবে না ?

ক্রীড়া অনুরাগী স্বামী বিবেকানন্দ

নিমাইসাধন বসু

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতখানি সীমাবদ্ধ ছিল তা ভাবলে অবাক লাগে। গত বিশ বছরে স্বামীজীর ঐতিহাসিক জীবন, কর্ম, বাণী ও অবদানের নতুন নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। কত যে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার হিসাব নেই বলা চলে। অবশ্যই এই সব প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মেরি লুই বার্ক ও শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখনও যে জানা শেষ হয়েছে তা নয়। বিভিন্ন স্থানে লেখক-গবেষকরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবন ও ভাবধারার ওর আলোকপাত করে চলেছেন।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের এক অজানা দিক সম্বন্ধে নতুন তথ্য রয়েছে। আজকের যুব ও ছাত্র সমাজের কাছে ঐ তথ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু যুব-ছাত্র সমাজই বা বলি কেন, সকলেরই কাছে স্বামীজীকে জানা ও বোঝার জন্যে এই তথ্যগুলি একান্ত প্রয়োজন। স্বামীজী ফুটবল খেলাকে এমন গুরুত্ব দিয়েছেন যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। 'স্বর্গ লাভ' বা ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছনর জন্যে যুবকদের ফুটবল খেলার কথা বলেছেন। এমন কি গীতাপাঠের চেয়েও ফুটবল খেলা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কথাও বলেছেন। মন্দিরে যাওয়া, পূজা-অর্চনার চেয়েও শরীরের পেশী শক্ত করার ওপর জোর দিয়েছেন। লোহার মত পেশী গঠন করতে উপদেশ দিয়েছেন। সাঁতারে সমুদ্র পার হতে আহ্বান জানিয়েছেন। স্বামীজীর ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত শত যুবক নিজেদের মন ও শরীর গঠন করে একদিন দেশ স্বাধীন করার জন্যে জীবন তুচ্ছ করে সংগ্রাম করেছিলেন। শরীর ও মন গড়া যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এই কথাও স্বামীজী এত গভীরভাবে কেন উপলব্ধি করেছিলেন তা বোঝার জন্যে আমাদের জানা প্রয়োজন তিনি নিজে খেলাধুলো ও শরীর চর্চা কতটা ভালবাসতেন। কৈশোর ও যৌবনের ঐ নরেন্দ্রনাথকে জানলে পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বাণী আজকের যুব-ছাত্র সমাজের কাছে আরও আপন ও গ্রহণযোগ্য মনে হবে।

স্বামীজী ক্রিকেট খেলা ভালবাসতেন ; নিজেও খেলতেন। বিখ্যাত রণজিৎ সিংজীর সঙ্গে লণ্ডনে একটি ভোজসভায় তিনি মিলিত হয়েছিলেন। তখন রণজিৎ-এর ব্যাটিং সাফল্য নিয়ে ইংলণ্ডে ও ভারতে খুব হৈ চৈ চলেছে। সবাই 'ধন্য ধন্য' করছে। সংবাদপত্র পত্রিকায় রণজির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ভারতীয় হিসাবে একজন ভারতীয়ের এত সাফল্যে স্বামীজী অবশ্যই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু এক ভোজসভায় রণজির ইংরাজস্তুতি স্বামীজীর পছন্দ হয়। স্বামীজী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ভারতের গৌরব, আশা-আকাঙ্খার কথা। বলেছিলেন ঐ ভোজসভায়, 'ইউরোপীদের কাছ থেকে

অবশ্যই অনেক কিছু আমাদের শিখতে হবে. কিন্তু আমাদের অতীত—ভারতের গৌরবময় অতীতই হবে আমাদের প্রেরণা ও শিক্ষার বৃহত্তর উৎস।'

বিবেকানন্দ জানতেন যে মূলতঃ ক্রিকেট একটি ব্যয়বহুল খেলা। বিত্তশালী পরিবারের ছেলেদের পক্ষেই ঐ খেলা সম্ভব ছিল—অন্ততঃ সেই যুগে। তার তুলনায় ফুটবল খেলা অনেক সহজসাধ্য। সর্বসাধারণ এই খেলা শিখতে পারে। সময় ও অর্থ অনেক কম লাগে। শরীর চর্চার সুবিধাও অনেক বেশি। পেশি গড়ে তোলায় ফুটবল খেলা সহায়তা করে। ফুটবলের মধ্যে 'ব্যায়াম অ্যাডভেঞ্চার দুইই' পাওয়া যায়। তাই ফুটবল খেলা ছিল তাঁর প্রিয়। ফুটবল খেলার মাঠে 'গোরা' অর্থাৎ সাহেবদের দলকে হারিয়ে ঐ যুগে বাঙালী যুবকরা আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছিল। মোহনবাগানের ১৯১১ সালের আই. এফ. এ. শিল্ড জয় এই কারণেই ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বামীজীর বাণী ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার 'তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা করবে। খেলাধুলোর প্রতি তাঁর অনুরাগ সে যুগের যুবসমাজে এক বলিষ্ঠ মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক সাফল্যের প্রায় এক দশক পূর্বেই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস বুঝতে হলে ঐ যুগের পটভূমির গুরুত্ব আগে উপলব্ধি করা দরকার।

যুবক নরেন্দ্রনাথ কুস্তী, সাঁতার, বাইচ, বক্সিং, তলোয়ার খেলা, অশ্বারোহণ, জিম্‌নাস্টিক কী না জানতেন? প্যারালাল বার ও রিঙের খেলা ছিল তাঁর প্রিয়। ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতেন। দিনে কুড়ি তিরিশ মাইল ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটেছেন। শরীর খারাপ হলেও ঘোড়ার পিঠে চাপার শখ ছাড়তে পারেননি। শরীর চর্চার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল ও মজবুত। এমনিতেই সুদর্শন, তার ওপর চমৎকার স্বাস্থ্য। ভিড়ের মধ্যেও নজরে না পড়ে উপায় ছিল না। নিজের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে পরিহাসও করতেন সদাহাস্যময় স্বামীজী। লণ্ডনে যে ভোজসভার (১৮৯৬) কথা পূর্বেই বলেছি। ঐ সভায় বক্তৃতার শুরুতে স্বামীজী বলেন যে তাঁকে যে কেন বলতে বলা হয়েছে তা তিনি জানেন না। পরিহাস করে তিনি বলেন, একটি মাত্র কারণ সম্ভবপর --আমার গুরুভার আকারের সঙ্গে ভারতের জাতীয় প্রাণীর (হাতীর) অদ্ভূত ঐক্য আছে !!

নিজেকে নিয়ে পরিহাস করলেও পরম সত্য কথাই বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকৃতই সর্বতোভাবে ও সর্বঅর্থে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের –দেশ ও মানুষের আশা-আকাঙ্খা, আত্মমর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। তিনি ছিলেন সুস্থ সবল ভারতীয় যুবশক্তির দেহ ও মনের সমন্বিত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর দেহ ও দিব্যজীবন সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করে নিজেকে লীন করেছিলেন স্বদেশ ও মানব জাতির কল্যাণে।

শরীরচর্চা, দেহ ও মন যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা স্বামী বিবেকানন্দের নিজের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

'পজিটিভিস্ট' রামকৃষ্ণ এবং 'মেটিরিয়ালিস্ট' বিবেকানন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিনয় সরকারের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান যখন প্রায় একসঙ্গে অল্প এবং বৃহৎ আকারে চলছে তখন কৌতূহল জাগতে পারে, ভারতের এক প্রধান সমাজবিজ্ঞানী অর্থশাস্ত্রী সরকার ভারতের এককালে প্রধান আচার্য বিবেকানন্দকে কোন্ চোখে দেখেছিলেন—কী ছিল তাঁর মূল্যায়ন?

এদেশের সংস্কৃতি জগতে বিনয় সরকার এককালে প্রচণ্ড গতিশীল ব্যক্তিত্বশালী চরিত্র—ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য পুরুষ। ডন সোসাইটি ও স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় তাঁর মনোবিকাশ; বহু ভ্রমণকারী তিনি, স্বদেশ-বিদেশ এক করে ফেলছিলেন; বহু ভাষাবিদ্, কয়েকটি ইউরোপীয় ভায়ায় অনর্গল বলতে বা লিখতে পারতেন; পাণ্ডিত্যের বিশালতা এবং চিন্তার মৌলিকতার জন্য জ্যা আলবেয়ার, আলফ্রেড মার্শাল, গিলবার্ট মারে, হকিং ম্যারেট, অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার প্রমুখ বাঘা বাঘা পণ্ডিত তাঁর প্রশস্তি, করেছেন, স্বীকৃত হয়েছেন জ্ঞানের বিশ্বকোষ বলে। আমরা আরও জেনেছি, প্রচলিতের ঘাড়ে ধরে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা কেবল নয়, তাতে উল্লাস ছিল তাঁর। নিজের বিপুল পাণ্ডিত্যকে ভাষা ও ভঙ্গির বেপরোয়া গতিতে এমন মাতোয়ারা করে তুলতে পারতেন যে, অনেকের হিসেবী পাণ্ডিত্য তার ঘূরপাকে পড়ে আর্তনাদ করত। বিদ্যাক্ষেত্রে যাযাবর মানসিকতার মানুষ বলে তিনি নিন্দিত হয়েছেন কিন্তু তাঁকে বা তাঁর মৌলিকতাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারও ছিল না। আমাদের দেশে বিরল সংখ্যক আন্তর্জাতিক পণ্ডিতদের অন্যতম তিনি—পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে চিন্তাক্ষেত্রে চালেঞ্জের মোকাবিলা করার মত শক্তিধর যিনি।

এই মানুষ আমরা দেখি আধুনিককালের যে কোন বৃহৎ মানুষ অপেক্ষা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে অধিক বলেছেন বা লিখেছেন। (তার মধ্যে অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং একটি গ্রন্থ আছে। সেই লেখাগুলি তেজে প্রাণশক্তিতে মৌলিকতায় টগবগে।

বিনয় সরকারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের দুই পর্যায়ে দুইভাবে গৃহীত। প্রথম পর্যায়ে তিনি ভাববাদী—তার অধিকার ছিল ১৯১৫ পর্যন্ত। তখন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। নিবেদিতা তাঁর মতে তুখোড় মেয়ে। —পাশ্চাত্য স্বদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠ রোমান্টিকতায় ভরপুর। —গবেষণাশক্তি ব্যাখ্যাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের জোরে যুবক বাংলার মধ্যে ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন স্বদেশিকতা ও বিপ্লবনিষ্ঠা। নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও পরবর্তীকালে তিনি নিবেদিতা প্রচারিত ভারত মূর্তিকে "অতি কাল্পনিক অতি আদর্শনিষ্ঠ" বিবেচনা করে ত্যাগ করেছিলেন—ডন সোসাইটির ভাব ব্রহ্মবান্ধবের বাণী, রবীন্দ্রকাব্য একই ভাগ্য পেয়েছিল তাঁর কাছে। ১৯১১-১৩ সাল থেকে শুক্রনীতির তর্জমা শুরু করেন তখন থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির নগ্ন মূর্তি তাঁর নজর কাড়ে—যা সমরনিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ ভারত।...

বিবেকানন্দকেও কি ত্যাগ করলেন—এবং রামকৃষ্ণকে? মোটে নয়। বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত বজায় থেকে গেলেন—সেইসঙ্গে 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য' ব্যাপারটি। স্ব-উদ্‌ভাবিত এই শব্দটি সরকারের প্রচারমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭সালে যখন তিনি রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ধর্মমহাসভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তখন সবিস্ময়ে তাঁর অনুরাগী হেমেন্দ্রবিজয় যেন প্রশ্ন করেছিলেন—এ কি কাণ্ড, ধর্মকে যেখানে অর্থওয়ালার অনর্থের মূল বিবেচনা করে এসেছেন, সেখানে আপনি অর্থশাস্ত্রী, আর্থিক উন্নতি' পত্রিকার সম্পাদক, মার্কসপন্থী ফরাসী জার্মান বইগুলোর অনুবাদক ('ধনদৌলতের রূপান্তর,' পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র'), "আপনার উচিত অর্থের কোর্ট থেকে ধর্মকে কলা দেখানো"। —তা না করে আপনি ধর্মসম্মেলনে অবতারত্বের আলোচনায় মাতামাতি করেছেন? বিনয় সরকার যে উত্তর দিলেন তাতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বললেন, অর্থকে কলা দেখানো যেমন ধর্মওয়ালাদের বুজরুকি তেমনি ধর্মকে কলা দেখানো অর্থওয়ালাদের আহাম্মকি। "অর্থচিন্তা, অর্থসেবা, ধন-গবেষণা ধন-বিদ্যা সবই বাঞ্ছনীয়। তাই বলে অন্য হাজার হাজার চিন্তা, বিদ্যা, গবেষণা বর্জনীয় বা ফেলিতব্য চিজ্ নয়। একমাত্র ধনদৌলতের উপরই সংসারের সভ্যতার সবকিছু নির্ভরশীল—মার্কসপন্থীদের এই এক বগ্‌গা কথায় তাঁর একদম সম্মতি ছিল না। তার বিরুদ্ধে অর্থসর্বস্ববাদীদের বিরুদ্ধে যেমন তেমনি করে "লাগাও লড়াই।" ধর্মকে তিনি মানুষের আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনের কাজে লাগাবার যন্ত্রবিশেষ মনে করে তার চাকায় হাত লাগিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সরকার নতুন ভাবনার ছক তৈরি করেছিলেন। চমকে দেবার মত তাঁর উক্তি—'রামকৃষ্ণ পজিটিভিস্ট'—যে রামকৃষ্ণ অতিন্দ্রীয় চেতনায়নিমজ্জিত রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষবাদী ধর্মের চরিত্র ব্যাখ্যা তিনি সবিস্তারে করেছেন। রামকৃষ্ণের ধর্মে যে যা-খুশী দেবতার পুজো করতে পারে, অহিন্দুও রামকৃষ্ণের আওতায় ধর্মের খোরাক পায়। "এই দেবতা নিরপেক্ষ ধর্মপ্রচার ধর্মের ইতিহাসে পুরোদস্তুর যুগান্তর। ধর্মজীবনকে দেবদেবীর প্রভাব হইতে মুক্তিদান করিয়া রামকৃষ্ণ সত্যসত্যই যুগাবতার। তিনি সমাজহীন, শ্রেণীহীন, জাতপাতহীন নরনারীর দীক্ষাগুরু।" বিনয় সরকারের সবচেয়ে মনোহরণ করেছিল রামকৃষ্ণ-শিক্ষার অন্তর্গত আত্মগঠনের অংশ। "দুনিয়ার নরনারীকে বাঁচাইয়া রাখিতে, বাড়াইয়া তুলিতে বাড়তি পথ দেখাইয়া দিতে রামকৃষ্ণের কথাগুলির ক্ষমতা অসীম।" সে কথা সহজ সরল মন্তরের মত, কানে ফুঁকে দেবার জন্য তৈরী। তাতে আছে সাহস। "ওরে মানুষের বাচ্চা কুছ্‌পরোয়া নেই দাঁড়া খাড়া হ তুই. ছোট নোস অসাধারণ করতে তোর জন্ম।" তাতে আছে শক্তির কথা। "রামকৃষ্ণ মানুষগুলোকে গরুঘোড়ার মত বিনয়ী হতে উপদেশ দেননি। রামকৃষ্ণ কথামৃতের আসল অমৃত ছড়িতে হইবে পৌরুষ প্রচারে—চিত্তশক্তির উদ্বোধনে। প্রকৃতির উপরে চিত্তের সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা রামকৃষ্ণ-দর্শনের বুনিয়াদ আর রামকৃষ্ণ-কথার কেন্দ্রবস্তু—ব্যক্তি। তিনি রাষ্ট্রগঠন প্রণালী 'সামাজিক প্রবন্ধ,'

'পারিবারিক প্রবন্ধের' রচয়িতা নন। রামকৃষ্ণ চেনেন ব্যক্তিকে —এক একটা হাত মাথা-হৃদয়ওয়ালা পুরুষ-নারীকে।…বল্ তুই আপন মতে, বেছে নে তুই আপন পথ—এই হল রামকৃষ্ণ কথামৃতের স্বাধীনতা ঘোষণা।…জগতে নিজ নিজ চিন্তাশক্তির ঝাণ্ডা খাড়া করিবার অধিকার পাইয়াছে মানুষ রামকৃষ্ণের সমাজদর্শনে।" এই সূত্রে সরকার বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন রামকৃষ্ণের মনেই বন্ধ মনেই মুক্ত" বাণীকে —যা মানুষের স্বাধীনতা, সাহস ও আত্মঘোষণার মন্ত্র। তারপর নিয়েছেন "জীবনই শিব"—যা "যুগসৃষ্টিকারী সমীকরণ।" তারপর "যত মত তত পথ"—যে বাণীর জন্য "পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্মীয় সাধারণতন্ত্র স্থাপনে রামকৃষ্ণতুল্য স্থপতি আর নেই।" এবং "তাঁর কথামৃত এদেশের সবচেয়ে গতিশীল সমাজদর্শন, যা তাঁকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সংগঠনকর্তাদের অন্যতম করেছে।"

অভিজ্ঞ পাঠককে বলে দিতে হবে না —রামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ ইতিমধ্যেই এসে গেছেন। সরকারের কাছে "বিবেকানন্দের প্রতিটি কাজ ফলিত রামকৃষ্ণ।"

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সরকারের ছিল বাসনাময় ভালবাসা। তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে যে ধরণের ফুটন্ত তেজ ছিল নিশ্চয় বিবেকানন্দের মধ্যে তারই বৃহৎ আগ্নেয়গিরি দেখেছিলেন। বিনয় সরকারের বাংলা ভাষার ঝাঁঝালো অশালীনতারমধ্যেবিবেকানন্দী ভাষায় দুরন্ত চলতি-গতির অতিকৃত অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। সরকার নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি বীর পূজক। সেইজন্য তিনি "যুবশক্তির অবতার" "বাংলার বিশ্ববিজেতা" বিবেকানন্দের পূজক। "আমি বিবেকানন্দকে নবভারতের কার্লাইল আখ্যা দিয়া থাকি। নেপোলিয়নের ন্যায় শক্তিশালী ও বীর বলিয়া সম্মানিত করিয়া থাকি।" আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের স্রষ্টা হিসাবে তাঁকে মার্কিন ডিউক, ইংরাজ রাসেল, ইতালিয়ান ক্রোচে, জার্মান স্প্রাঙ্গার, ফরাসি বার্গস-র পাশে আসন দিয়ে মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। "বিবেকানন্দের বাণী নিছক হিন্দুধর্মের বা বেদান্তের বাণী নয়—নব্য আদর্শের প্রতিষ্ঠাতারূপে, নূতন চিন্তাপ্রেরকরূপে তিনি ভবিষ্যৎ জগতের মানবমনে প্রভুত্ব করবেনই।" নীট্সের দর্শনে ছিল খ্রীষ্টীয় পাপবাদের প্রতিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শক্তিবাদের সমর্থন। কিন্তু সে দর্শন আবার অবিশ্বাসে নৈতিবাদে জর্জর। তার সংশোধন মেলে বিবেকানন্দের দর্শন। "জীবনের আনন্দ —যাহার জন্য ধর্মদর্শন ও সমাজের চিন্তাধারা একদিন অপেক্ষা করিতেছিল—তাহা হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে, ভারতের এক অপরিচিত যুবকের নিকট হইতে আসিল। বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের অগ্রণী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। নীটশের নৈতিমূলক সমালোচনা পরিপূরক রূপে জগতের গঠনশক্তির ইতিমূলক ভাবধারার পুনপ্রতিষ্ঠা করিতে আসিলেন—বিবেকানন্দ।"

এইখানেই শেষ নয়। বিবেকানন্দকে এক বিচিত্র ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন সরকার। বিবেকানন্দ আধুনিক বস্তুবাদের বার্তাপ্রচারক। বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী পাঠক জানেন, তিনি ভারতে রজোগুণের প্রতিষ্ঠাকামী আধ্যাত্মিক সভ্যতার

সঙ্গে সভ্যতার গুণপানকারী, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের পক্ষে প্রচারকারী—এহেন বিবেকানন্দকে বস্তুবাদের দিক থেকে দেখা খুবই উচিত ছিল কিন্তু তা বিশেষ করা হয়নি। শুদ্রনীতির তর্জমাকারী বস্তুবাদী বিনয় সরকার' এক প্রবন্ধে ('বিবেকানন্দ 'কান্ট অ্যাণ্ড মডার্ন মেটিরিয়ালিজম্') বলেছেন ;: 'অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কাণ্ট ইউরোপ আমেরিকার জন্য যা করেছেন উনিশ শতকের শেষভাগে বিবেকানন্দ তা করেছেন ভারতের জন্য। পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে কাণ্ট আধুনিক বস্তুবাদের জনক, ভারতে আধুনিক বস্তুবাদের জনক বিবেকানন্দ। এঁরা মানবসমাজের দুই প্রধান পরিত্রাতা।"

অবশ্যই চাঞ্চল্যকর কথা।

বিনয় সরকারের সিদ্ধান্ত : "আমাদের পৌরাণিক বিশ্বামিত্র অথবা অ্যাসকাইলাসের প্রোমিথিউসের মত তিনি নূতন জগৎ তৈরি করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তিনি স্বাধীনতার অগ্নি দেবত্ব ও অমরত্ব মানবসমাজকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন।"

বিনয় সরকারী ভাষায় বিবেকানন্দ বাণী বা চরিত্র কিছুটা দেখা ভাল। তাঁর একটি বিখ্যাত রচনা "বিবেকানন্দ দুমুখো ছুরি।" সে ছুরির একটা মুখ পাশ্চাত্যের দিকে উঁচান। "বিবেকানন্দের ব্যবসা দুনিয়াকে লড়াইয়ে ডাকা।...তাঁর তেরিয়া ডাক বাপের বেটা হস্ তো একে-একে লড়ে যা।" ছুরির অন্য মুখ খোলা বাংলা ও ভারতের দিকে। ভারতবাসী তো ম্যাড়াকান্ত, বাঙালীরা তো গরু। বিবেকানন্দের চাবুক খেয়ে "নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার রেওয়াজ কাটিতে শুরু করিল, যুবক বাংলার জন্ম হইল, যুবক ভারত দেখা দিল।" খুবই বিস্ময়ের কথা, "দেশের লোক বিবেকানন্দের যত জুতা খাইয়াছে, ততই তাহাকে বেশি সম্মান করিয়াছে।...একালে যাহারা মজুর আন্দোলন চালাইতেছে তাহাদের বোধহয় প্রায় সকলেই বিবেকানন্দকে নিজ নিজ জীবন প্রভাতের গুরু সমঝিতে অভ্যস্ত ছিল। আজও সোস্যালিজম কমিউনিজমের জোয়ারকালে বিবেকানন্দ পূজো বেশকিছু বজায় আছে। তাছাড়া অন্যান্য ন্যাশনালিস্ট পন্থী স্বদেশসেবকরা তো বিবেকানন্দকে নিজেদের ভগীরথ বা পথপ্রদর্শকরূপে চিরকাল পূজা করিয়া আসিতেছে।"

এ হল প্রত্যক্ষদর্শী সমাজবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

বিবেকানন্দ যে মুহুরি, উকিল কেরানি, বণিক, দালাল, মাস্টার, মজুর—সকলকে টান দিতে পেরেছেন তার কারণ, সরকার লক্ষ্য করেছেন, বিবেকানন্দের "মানুষ গড়ার কলের" মধ্যে "আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক বুজরুকি কিছুমাত্র নেই।" তাঁর বাণীর চার খুঁটিরপয়লা নম্বর—"লাগা কুস্তী জোর্‌সে।" দোসরা খুঁটি—"খা দুবেলা পেট ভরে।" তেসরা খুঁটি—"বামুন-সেবা চামার-সেবা মুদ্দফরাস সেবা।" চৌঠা খুঁটি—"দেখা কলা দুনিয়াকে।" শেষোক্ত খুঁটির প্রশস্তিতে বিনয় সরকার বলেছেন, বিবেকানন্দের কর্মে ও চিন্তায় যদি কোনও আধ্যাত্মিকতা থাকে তবে তাকে "এই অহঙ্কারের ভিতর ঢুঁড়িতে হইবে।" এই অহঙ্কার যার মধ্যে নেই তার মধ্যে বিবেকানন্দও নেই। যদি একে কেউ বেদান্ত বলে তাহলে বিবেকানন্দের পক্ষে তার উত্তর" বিনয় সরকার দিয়েছেন :

"আরে ভাই পদা, আরে ভাই আবদুল, এসব বেদান্ত কিনা জানি না—এ সবই আমি—এসবই বিবেকানন্দ।"

এই বিবেকানন্দেই সৃষ্টি করেছেন বিনয় সরকার কথিত "রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য।" এ সাম্রাজ্য অবশ্যই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এর ভিতরের কথাটা সংস্কৃতির সম্প্রসারণ, ঐ অর্থে দিগ্‌বিজয়-ভাবনা, এবং শক্তিচেতনা। রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের সূচনা বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে করেছিলেন—সেখানে বোমার মত ফেটে পড়ে অহঙ্কৃত পাশ্চাত্যবাসীদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন—প্রাচ্যের কাছেও পাশ্চাত্যের শিক্ষার বস্তু আছে—পারস্পরিক শিষ্যত্ব, পারস্পরিক শিক্ষকত্বই হবে উভয় ভূমির ভবিষ্যতের সম্পর্ক।

"একপাক্ষিক উচ্চম্মন্যতা বা একপাক্ষিক হীনম্মন্যতা যেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-বিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে নিয়ামক-নীতি না হয়।" আধুনিক ভারতের সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে এই যে স্বীকৃতি বিবেকানন্দ প্রথম পাশ্চাত্য থেকে আদায় করে নিতে পেরেছিলেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনায় বিনয় সরকার অভ্রান্ত ছিলেন।

বিবেকানন্দের পর থেকে ভারতবাসী বিপুল সংখ্যায় পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়েছে—সম্প্রসারণের তাগিদে। সেই সাম্রাজ্যের নেমিকেন্দ্র অবশ্যই রামকৃষ্ণ মিশন। কিন্তু তা কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের সৃষ্টি, এমনকি হিন্দুদের সৃষ্টি—একথাও বলতে সরকার রাজি নন। সর্বশ্রেণীর, সর্বধর্মের ভারতীয়দের সর্বপ্রকার বিস্তারকামী কার্যাবলীকে তিনি রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের কর্মকীর্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। এ বস্তু মোটেই হিন্দু রিভাইভ্যালিজম্-এর বহির্ভারতীয় ব্যাপ্তি নয়, "নিউ থট্ থিয়জফি, নিরামিষ-ভোজন ইত্যাদির সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলাও যাবে না।" সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য—সবকিছু এর আওতায় পড়ে। বিনয় সরকার সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে বৃহত্তর ভারতের সমাজবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক—তিনি কেন এই ভারতীয় বিস্তার ব্যাপারটিকে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য নাম দিলেন, তার ব্যাখ্যাও করেছেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাবজগতে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য বৌদ্ধ সাম্রাজ্য। তার সহস্রাধিক বর্ষ পরে ভারতের বিস্তারসূচনা করলেন বিবেকানন্দ—রামকৃষ্ণের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে। সেজন্য এই সাম্রাজ্য 'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য' নামেই চিহ্নিত হওয়া উচিত। কৈফিয়ত দিয়ে তিনি আরও বলেছেন, বৌদ্ধ সাম্রাজ্য যেমন কেবল বৌদ্ধদের সৃষ্টি নয়, বস্তুতপক্ষে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া প্রধানত জয় করেছিল রামায়ণ-মহাভারত, তথাপি কার্যসূচক হিসাবে বুদ্ধদেবের নামের সঙ্গেই প্রথম ভারতীয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যকে জড়িত করা হয়, তেমনি দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের নামও হবে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য, যেহেতু তার সূচনা করেছেন রামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

বিনয় সরকার বলেছেন "বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণসাম্রাজ্য বর্তমান ভারতের সর্বোচ্চঘটনা।

বিনয় সরকারের পত্নী শ্রীমতী ইভা সরকার তাঁর স্বামীর দেহত্যাগের পরে উদ্বোধন সম্পাদককে চিঠিতে লেখেন· "শ্রীযুক্ত সরকার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের কথা বলিয়াছিলেন।"

ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে উত্তীর্ণ হবার পরেও বিনয় সরকারের কাছে বিবেকানন্দ সমান বরেণ্য আচার্য।